প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সাহিত্য সংসদ
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ । মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশানাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৩২ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী । শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত

প্রকাশকের নিবেদন

বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে বাংলা ভাষা যথেষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত, একথা স্বীকৃত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞানসঞ্চয়ের পথটি আজও বড় সঙ্কীর্ণ। বাঙালী জ্ঞানপিপাসু পাঠকের ইংরেজি ভাষা বা অন্য বিদেশী ভাষার মাধ্যম ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বাংলা ভাষায় জ্ঞানসমৃদ্ধ বই প্রকাশ করার কিছু কিছু প্রচেষ্টা অবশ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশ করে এই পথকে প্রশস্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আমাদের 'প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য' প্রকাশন এই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা বহন করছে।

সাহিত্য কোন আকস্মিক সৃষ্টি নয়। সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে থাকে বিরাট পটভূমি। এই পটভূমি গঠিত হয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি নানা উপাদানে। সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে এগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজকের বিশ্বসাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রাচীন বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে। তাই বাঙালী সাহিত্য-পিপাসুর পক্ষে প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান-আহরণ অপরিহার্য। তাছাড়া বর্তমানের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে কি আসনে প্রতিষ্ঠিত তাও পরিস্ফুট হবে এই গ্রন্থে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অশেষ আয়াসে প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য বইটি রচনা করেছেন। রসজ্ঞ পাঠকের নিকট বইটি সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অনেকটাই বছর দশেক আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধের আকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সেগুলির রচনার পিছনে বিশেষ কোন পরিকল্পনা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভারততত্ত্ব নিয়ে চর্চা করে থাকি, এবং আমার গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাচীন যুগের ধর্ম ও অনুষ্ঠানসমূহ। এই গবেষণাকার্যে আমাকে প্রাচীন সাহিত্যের উপর নির্ভর করতে হয়, শুধু স্বদেশের নয় বিদেশেরও, কেননা তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছাড়া প্রাচীন যুগ নিয়ে কাজকর্ম অর্থহীন। আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী, তখন তিনি সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন আমি ওই পত্রিকায় আমার গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের উপর ছোট ছোট পরিচয়জ্ঞাপক প্রবন্ধ লিখি। বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তুর একটা বড় অংশই সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল।

এতকাল পরে সেই রচনাগুলিকে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার পিছনে দুটি কারণ বর্তমান। প্রথমটি হচ্ছে উদ্দেশ্যের পরিবর্তন। দীর্ঘকালের ব্যবধানে আমার নিজের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যে বিষয়ের উপর অধ্যাপনা ও গবেষণা করি তার নিজস্ব সমস্যাগুলি আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। একটি প্রধান সমস্যা যা আমি সর্বদাই উপলব্ধি করি তা হচ্ছে প্রাচীন ভারতকে বুঝতে গেলে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের শুধুমাত্র ভারতীয় উপাদানসমূহের উপর নির্ভর করলেই চলবে না, ভারতের বাইরের দেশগুলিরও সভ্যতার ইতিহাসের উপাদানগুলির সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকার দরকার। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদান-

সমূহের ক্ষেত্রে বাংলায় না হোক ইংরেজীতে এমন কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেগুলি পাঠ করলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসমূহের বিকাশের একটা সর্বাঙ্গীন চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই সাহিত্যগত উপাদানসমূহকে একস্থানে নিয়ে আসার এবং সেগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার কোন প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত কেউ করেন নি, কোথাও তা হয় নি। বর্তমান গ্রন্থটি, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সেই প্রচেষ্টায় প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় কারণটি অবশ্য সাধারণ ধরনের এবং তা হচ্ছে বাঙালী পাঠক ও সাহিত্যের ছাত্রদের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন দেশে রচিত বিপুল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। যাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা ধরনের চর্চা ও গবেষণা করেন, বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি তাঁদের সহায়ক হতে পারে। তুলনা-মূলক সাহিত্যচর্চার যে প্রবণতা সম্প্রতি দেখা গেছে, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বর্তমান গ্রন্থটি সেই চর্চার পরিসরবৃদ্ধির ব্যাপারে কিছুটা কাজে লাগতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কালানুক্রমের ভিত্তিতে প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের একটা কাঠামো সামনে থাকলে তা যে-কোন ধরনের চর্চার ক্ষেত্রে অনুকূল হবে, এটা মনে রেখেই পারম্পর্য-রক্ষার খাতিরে কিছু বাড়তি বিষয়বস্তু এখানে ওখানে যোগ করা হয়েছে যার ফলে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে গৌণ বিষয়ও প্রাধান্য পেয়েছে। এটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভবপর নয়।

পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ, তাঁরা যেন বর্তমান গ্রন্থটিকে একটি বর্ণনামূলক তালিকা বা ক্যাটালগ হিসাবেই দেখেন। গভীরতর সাহিত্যিক আলোচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, যতটা উদ্দেশ্য পাঠকদের নানাবিধ প্রাচীন বিষয়ের খোঁজখবর দেওয়া, যাতে তাঁরা

নিজেরা প্রাচীন সাহিত্যচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন। পাদটীকাগুলিতে এই উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে। একটি প্রাচীন রচনাকে শুধু-মাত্র পরিচিত করতে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি, এবং তা বাঞ্ছনীয়ও মনে করিনি শুধু একটি কারণেই, এবং তা হচ্ছে বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চা আমার ডিসিপ্লিনের বাইরে, যেখানে আমি কার্যত অনধিকারী। তৎসত্ত্বেও প্রাচীন পুঁথিপত্র দীর্ঘকাল ধরে নাড়াচাড়া করার ফলে, প্রাচীন সাহিত্য-সম্পর্কে আমার নিজের কিছু ধারণা গড়ে ওঠা এবং মাঝে মাঝে সেগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটা খুবই সম্ভব। এই কারণেই উপসংহারে আমার কিছু কিছু সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম সেগুলি ভূমিকায় দেব, তাই গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে বন্ধনীতে 'ভূমিকা দ্রষ্টব্য' লেখা হয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে পাঠকদের উপসংহার অংশটি দেখতে অনুরোধ করি।

সামান্য কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ এই গ্রন্থে রয়ে গেছে। সেগুলি গ্রন্থ-শেষে শুদ্ধিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশী বই বা লেখকদের নামের সঠিক উচ্চারণ সর্বত্র বাংলায় দেওয়া সম্ভবপর হয়নি, সেজন্য পাশে বন্ধনীতে সেগুলি ইংরেজীতে যেভাবে লেখা হয় সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষা নিয়ে চর্চা করেন এমন বন্ধুদের সাহায্য পাওয়া গেছে। সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছি আমার পরলোকগত শ্বশুর প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, বহুভাষাবিদ্ হিসাবে যাঁর খ্যাতি ছিল। যে-সকল নাম বহুল প্রচলিত—যেমন প্লেটো, এস্কাইলাস ইত্যাদি—সে-সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণই বজায় রাখা হয়েছে।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সাহিত্য সংসদের কর্ণধার শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। সাহিত্য সংসদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ এবং শ্রীরজত নন্দী প্রমুখ কর্মিগণ

আমাকে নানাভাবে প্রচুর সাহায্য করেছেন। আমার সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীরাম রায় ও স্ত্রী মঞ্জুলার নিকট থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ রণবীর চক্রবর্তী বইটির একটি বিষয়সূচী প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সাহিত্যঃ সংস্কৃত

১॥ বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতা

খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত সারা উত্তর ভারতে আমরা একটি বিশিষ্ট, অথচ মিশ্র ও পরিবর্তনশীল বিভিন্ন সংস্কৃতির সমবায়ে গঠিত সভ্যতার পরিচয় পাই, যা বৈদিক সভ্যতা নামে কথিত। এই সভ্যতার কোন সুনির্দিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই, কিন্তু আর এক ধরনের প্রমাণ আছে। ওই সভ্যতার মানুষেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার রচনা করেছিল, যা বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। বৈদিক কথাটি বেদ থেকে এসেছে।

এই মানুষদের ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে বাইরের দেশের কয়েকটি প্রাচীন ভাষার সাদৃশ্য দেখে একদা পণ্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন যে এইসব ভাষার সৃষ্টি হয়েছে একটি আদি ভাষা থেকে যার ব্যবহারকারীরা কোন একটি কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের নামকরণ করা হয়েছিল আর্য। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এই আর্য নামক ধারণাটি অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যেহেতু আদি আর্য বা তথাকথিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন ভাষাগুলির যোগ বেশি এবং যেহেতু ইউরোপীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতর, সেইহেতু ওই আর্য নামক ধারণাটির সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়, যার ফলে আর্যদের বংশধরত্বের দাবিদারও হয়ে ওঠে অসংখ্য দেশ, ইউরোপীয় দেশগুলি তো বটেই, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষও। আর্য ধারণাটি বৃটিশ শাসনাধীন শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ভারতীয়দের হীনমন্যতা দূরীকরণে কিছুটা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই, উচ্চবর্ণের ভারতীয়রা ও তাদের মালিক ইংরাজেরা যে আসলে একই গাছের ফল, এই রকম একটা বিশ্বাস এদেশে সহজেই দানা বেঁধেছিল। সেই হিসাবে আর্য শব্দটি এখানে আজও জনপ্রিয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন জীবনের যা কিছু ভাল দিক তা সবই নাকি ওই আর্য সভ্যতার দান আর যা কিছু খারাপ ও কুসংস্কারমূলক সবই নাকি অনার্য। আজকাল বাংলায় আবার আর্যেতর বলে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যেহেতু বৈদিক সাহিত্য কোন একটি সংস্কৃতির পরিচয় দেয় না, যেহেতু সেখানে বহু জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল বহু সংস্কৃতির নিদর্শন মেলে, আর্য-অনার্য প্রসঙ্গ ভারত ইতিহাসে একেবারেই মূল্যহীন, কাজেই আর্যরা কারা ছিল, তারা কোন্ দেশ থেকে এসেছিল এসকল কথা ঐতিহাসিক বোঝাপড়ার পক্ষে একেবারেই অবান্তর। আমরা শুধু এটুকু বলব যে ভারত ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যে সাহিত্য থেকে ওই যুগের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনযাপন সম্পর্কে বহু কথা জানা যায়, যাদের সংস্কৃতি বিভিন্ন হলেও ভাষার ক্ষেত্রে একটি বন্ধন ছিল, এই পর্যন্ত।

বৈদিক সাহিত্য প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি এবং মূলত চারশ্রেণীতে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা প্রধানতঃ গান, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সংকলন, সংখ্যায় তা চারটি—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ব্রাহ্মণ গদ্যে রচিত যাগযজ্ঞ-বিষয়ক সুবিশাল সাহিত্য যা সংহিতার সঙ্গে যুক্ত। আরণ্যক অরণ্যে রচিত একজাতীয় সাহিত্য, বিশ্বরহস্যের সমাধান অন্বেষণই যার লক্ষ্য। উপনিষদেরও উদ্দেশ্য তাই। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সব সময় সুস্পষ্ট নয়। নিম্নলিখিত ছকটি থেকেই বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি পরিচয় মিলবে।

সংহিতা	ব্রাহ্মণ	আরণ্যক	উপনিষদ
ঋগ্বেদ	ঐতরেয়, কৌষীতকি	ঐতরেয়, কৌষীতকি	ঐতরেয়, কৌষীতকি
সামবেদ	পঞ্চবিংশ বা তাণ্ড্য মহা ষড়্বিংশ, জৈমিনীয়	আরণ্যক সংহিতা আরণ্যক গান জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ	ছান্দোগ্য, কেন
যজুর্বেদ	কঠ, তৈত্তিরীয়, শতপথ	কঠ, তৈত্তিরীয়, শতপথ	কঠ, তৈত্তিরীয় মৈত্রায়ণীয়, শ্বেতাশ্বতর বৃহদারণ্যক, ঈশা
অথর্ববেদ	গোপথ		মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন

এইগুলি ছাড়া কিছু সহায়ক গ্রন্থকে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে,

যেগুলি বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত। এগুলিকে বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙ্গ মোট ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) শিক্ষা, যথা ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, তৈত্তরীয় প্রাতিশাখ্য সূত্র, অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্য সূত্র, বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য সূত্র, পুষ্পসূত্র, পঞ্চবিধান (২) কল্প, যথা শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র, শুল্বসূত্র ; (৩) ব্যাকরণ (৪) যাস্করচিত নিরুক্ত—রচনাকাল, খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০—৫০০ মধ্যে . (৫) ছন্দ (৬) জ্যোতিষ।

এই বিশাল সাহিত্যসম্ভার একযুগে রচিত হয় নি। পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১০০০ এর মধ্যে, পরবর্তী সংহিতা ও প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৮০০র মধ্যে, পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনতর আরণ্যক উপনিষদগুলির রচনাকাল ৮০০ থেকে ৬০০র মধ্যে, পরবর্তী উপনিষদ ও সূত্রগ্রন্থগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০র পর থেকে। এই সুদীর্ঘ ৬০০ কি তার চেয়েও বেশি বছর ধরে যে সাহিত্য-কর্ম রচিত হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মেই একটি পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বৈদিক মানুষেরা তাদের আদিম প্রাক্‌-বিভক্ত সমাজকে পিছনে ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল, যার যথাযথ পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়।

২ ॥ বৈদিক সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্ম

ঋগ্বেদের যুগের অর্থনীতি প্রায় সর্বাংশেই ছিল পশুপালন-নির্ভর, আর এখানেই ছিল প্রাক্ বৈদিক হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার প্রধান প্রভেদ, কেননা তা ছিল সর্বাংশে কৃষিনির্ভর। পশুপালক সমাজ নাগরিক সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারে না, এবং সেই কারণেই আদি বৈদিক সভ্যতার প্রকৃতি গ্রামীণ। অসংখ্য নজীর তুলে দেখানো যায় যে ঋগ্বেদের কবিদের কল্পনায় পশু ভিন্ন আর কিছু ছিল না। মোট ১০,৪৬২টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র ২৫টিতে কৃষিকাজের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই ২৫টি শ্লোকের মধ্যে ২২টির স্থান ঋগ্বেদের অবাচীন অংশে, যা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে রচিত, বাকি তিনটিতেও ২।১৪।১১ ; ৫।৬৩।১৩ ; ৬।৬।৪) কৃষিপ্রসঙ্গ এত পরোক্ষভাবে উল্লিখিত যে তা থেকে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এগুলি যদি বৈদিক মানুষদের মধ্যে কৃষিকাজের অবধারিত পরিচায়ক হয় তাহলেও বৈদিক অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গৌণত্বই প্রমাণিত হবে, কেননা তুলনায়

গো ও তজ্জাত শব্দ সহস্রগুণ। বস্তুত সমগ্র ঋগ্বেদই যে পশু-কামনায় ভরপুর একথা বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। গরু সম্বন্ধে বৈদিক কবিদের উৎসাহ এমনই অসম্ভব যে তাঁরা দেবতাদেরও গো-জাত বলে কল্পনা করতে দ্বিধা করেন নি।

পশুপালন-নির্ভর সমাজ পুরুষপ্রধান, অতএব পশুপালকদের চিন্তা-চেতনাতেও পুরুষপ্রাধান্যের পরিচয় স্বাভাবিক। ঋগ্বেদে তাই দেবীদের তুলনায় দেবতাদেরই প্রাধান্য। পক্ষান্তরে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতির প্রাথমিক স্তরে সমাজব্যবস্থা মাতৃপ্রধান, এ পর্যায়ের চিন্তাক্ষেত্রেও তাই মাতৃপ্রাধান্য অনিবার্য, কৃষিভিত্তিক হরপ্পা সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারই রেশ টিকে থেকেছে। ঋগ্বেদে আমরা দেখি যে তখনকার মানুষেরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা হিসাবে স্বীকার করেছে। বৈদিক দেবতারা তিন শ্রেণীর—দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিত্র, পুষা, বিষ্ণু, উষা, আদিত্যগণ, অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি, অন্তরীক্ষ বা আকাশের দেবতা, যথা ইন্দ্র, ত্রিত আপ্ত্য, মাতরিশ্বা, রুদ্র, মরুদ্গণ, বায়ু, পর্জন্য ইত্যাদি ; এবং ভূলোক বা পৃথিবীর দেবতা, যেমন অগ্নি, পৃথিবী, সোম ইত্যাদি। অধিকাংশ দেবতার প্রাকৃতিক পটভূমি খুবই স্পষ্ট, যেমন উষা, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, আপঃ, পৃথিবী দ্যৌঃ ইত্যাদি অনেকের ক্ষেত্রে তা অর্ধস্বচ্ছ, যেমন ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু ইত্যাদি, অনেকের ক্ষেত্রে তা একেবারে অস্বচ্ছ, যেমন অশ্বিদ্বয়, অদিতি প্রভৃতি গোড়ার দিকে প্রত্যেক দেবতার মর্যাদা ছিল সমান এবং তাঁহাদের এই সাম্যাবস্থাকে মক্ষমূলর henotheism নামে অভিহিত করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ছিল আদি বৈদিক ট্রাইবাল মানুষদের সামাজিক সাম্যের প্রতিচ্ছবি। কালক্রমে সমাজে শ্রেণীভেদ এসেছে, ইন্দ্রের যজ্ঞভাগের পরিমাণও বেড়েছে।

পশুপালক ঋগ্বেদের মানুষদের একটি শিকারজীবী অতীত ছিল, সে যুগের আচার-অনুষ্ঠানগুলি পশুপালক পর্যায়ের নূতন ধর্মব্যবস্থার মধ্যে এসেও তারা ছাড়তে পারে নি। শিকারজীবী মানুষদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ভক্ষ্য পশুগুলির ভূমিকা থাকে। নিহত পশুটির উপর একধরনের পবিত্রতা আরোপ করা হয়, তারপর সকলের নানাপ্রকার ধ্বনি ও নৃত্যের মাধ্যমে তাকে ভক্ষণ করা হয়। এই collective eating ritual থেকেই বলিদান প্রথার সূত্রপাত। ঋগ্বেদের দেবকল্পনায় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ বিরাজ করলেও তাদের

সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে তাদের শিকারজীবী পর্যায়ের ঐতিহ্য অর্থাৎ বলিদান প্রথা তারা পরিত্যাগ করে নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন জাদু অনুষ্ঠানগুলি (magic) যার ফলে যজ্ঞ-প্রথা গড়ে উঠেছিল। বৈদিক যজ্ঞ আদিতে জাদু অনুষ্ঠানই ছিল, যা সম্পাদিত হত সমবেতভাবে। জাদু অনুষ্ঠানের মূলকথা হচ্ছে নানা ধরনের কাল্পনিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে প্রকৃতিকে সরাসরি বশ করার প্রচেষ্টা—বাস্তব কলাকৌশলের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক কাল্পনিক কলাকৌশল। একমাত্র আদিম যৌথ জীবনের পটভূমিতেই জাদুর আসল তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়। আদিম জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের মূলসূত্রগুলির সাদৃশ্য এত বেশি, যে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রথমটির প্রভাব কোন দায়িত্বশীল বেদবিদই অস্বীকার করেন নি। অবশ্য যজ্ঞের আদি রূপ ও উত্তর রূপ এক নয়।

ঋগ্বেদের গোড়ার দিকে সামাজিক শ্রেণীভেদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চতুর্বর্ণ-প্রথা ঋগ্বেদের আদি অংশে অনুপস্থিত। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত (১০।৯০) যেখানে জাতিপ্রথার কথা রয়েছে, ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশের মধ্যেই পড়ে, যা নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে রচিত। ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে মেয়েদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত তখনও সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভূমিকা খব দৃঢ় হয় নি। ওই ভূমিকা দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্বের প্রয়োজনে, মেয়েদের সতীত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনটা পুরুষদের পক্ষে অবধারিত হয়ে পড়ে. আর তখন থেকেই মেয়েদের জীবনে আসে বন্ধন. জগতের সর্বত্রই এই নিয়ম, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

ঋগ্বেদ রচিত হতে সময় লেগেছিল দীর্ঘকাল। প্রাক্-বিভক্ত পর্যায় থেকে সমাজ ততদিনে শ্রেণীবিভক্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ঋগ্বেদ শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই রচনা. তবুও তার এখানে ওখানে বহু জায়গায় প্রাক্-বিভক্ত সামাসমাজের বহু স্মারক রয়েছে যা খুঁজে নিতে মোটেই অসুবিধা হয় না। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগে সামাজিক শ্রেণীভেদ আরও অনেক ব্যাপক হয়েছে। এই যুগেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক ধারার মিশ্রণ ঘটেছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নগরজীবনেরও সূত্রপাত হয়েছে। আগের যুগের পশুপালকেরা কৃষির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ফলে, কৃষিকার্যে গবাদি পশুর ব্যবহার হবার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে,

উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে ও তার ফলভোগী একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর উদয় হয়েছে। এই নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ-সমূহকে একেবারে পরিবর্তিত করেছিল। পুরোদস্তুর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার দরুন মেয়েরা চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে তাদের শূদ্র, কাক ও কুকুরের সমগোত্রীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য অথর্ববেদ ৬:১১:৩, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭:১৫, তৈত্তিরীয় ৬।৫।৮।২)। উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশার উদ্ভব হয়েছে, এবং নিম্নবৃত্তিসমূহের অধিকারীরা শূদ্র নামে পরিচিত হয়েছে, তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নিপীড়নের বোঝা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাদের যথাকামবধ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ তারা যে কোন সময়ই প্রহৃত হবার উপযোগী। আমরা পরে দেখব, পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগেই রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজার উদ্ভব হয়েছে। ধর্মব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। পুরাতন আমলের দেবদেবীরা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিরা, দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁদের জায়গায় নূতন দেবতা সৃষ্টি হয়েছে, যেমন প্রজাপতি। ইনি স্রষ্টা এবং সকলের প্রভু, মর্ত্যের রাজার আদর্শেই যেন কল্পিত, এবং রাজারাও উপাধি নিতেন প্রজা-পতি। একেশ্বরবাদের উদ্ভবও এই যুগ থেকে, এবং তারই চরম পরিণতি উপনিষদের ব্রহ্ম-কল্পনা, সেই এক ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। যজ্ঞ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তনের লক্ষণ-সমূহ প্রকটিত হয়েছিল। উৎপাদন-কৌশলের অগ্রগতির ফলে আদিম যৌথ জীবনের অবসান হলেও জাদুবিশ্বাসের রেশ সম্পূর্ণ মুছে যায় না। কিন্তু তার আদি তাৎপর্য বিপরীতে পর্যবসিত হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে জাদুবিদ্যা ক্রমশই সুবিধাভোগী শ্রেণীর গুহ্যবিদ্যায় রূপান্তরিত হয়, পুরোহিতদের অলৌকিক শক্তি বলে প্রচারিত হয়। বৈদিক যজ্ঞের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। এখন যজ্ঞের হোতা আর যজমান নয়। একটি বিশেষ পুরোহিতশ্রেণী—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা—যারা অর্থের বিনিময়েই যজমানের হয়ে যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করত। পুরনো আমলের সাদামাটা যজ্ঞ উঠে গিয়েছিল, তার জায়গায় এসেছিল বিরাট বিরাট ব্যয়বহুল যজ্ঞ—অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, পুরুষমেধ ইত্যাদি, যেগুলি রাজা বা প্রচণ্ড ধনী ছাড়া বাকি সকলের সাধ্যের অতীত ছিল।

উপনিষদ ও সূত্রগ্রন্থগুলির যুগে, উচ্চবর্ণগুলির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটলেও, সামাজিক শ্রেণীভেদ আরও বেড়ে গিয়েছিল, এবং বলাই বাহুল্য, নিম্নবৃত্তি-সমূহের অধিকারীরা, অর্থাৎ শূদ্রেরাই এই ব্যবস্থায় ছিল সবচেয়ে উৎপীড়িত। পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক) শূদ্রদের দুভাগে বিভক্ত করেছেন, নিরবসিত ও অনিরবসিত, যা থেকে প্রমাণ হয় যে শূদ্রদের মধ্যে অনেককে নগরের বা গ্রামের সীমানার বাইরে অচ্ছুতের জীবন যাপন করতে হত। উপনয়নাদির সংস্কার শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মসূত্রগুলি থেকে জানা যায়, একই অপরাধে যেখানে উচ্চবর্ণের লোকের সাজা কম হত, শূদ্রদের উপর কথায় কথায় মৃত্যুদণ্ড প্রযুক্ত হত। বৈশ্যদের অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। যদিও কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে এই শ্রেণী বেশ সমৃদ্ধ ছিল, সেই সমৃদ্ধি ভোগ করার স্বাধীনতা তাদের ছিল না। নিরাপত্তার নামে তাদের উপর প্রচুর করভার চাপানো হত, যে কোনও অজুহাতে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত, এবং সামাজিক কাঠামোতেও তাদের স্থান খুব সম্মানের ছিল না। গবাদি পশু-ই যেহেতু সেকালে ছিল প্রধানতম সম্পদ, বিনিময়ের মাধ্যম, যাগযজ্ঞের নামে ওই সম্পদের অকারণ বিনাশ তারা চাইত না, এবং তাদের এই দাবিই পরবর্তী কালে বুদ্ধ ও মহাবীরের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপের এটাই ছিল অর্থনৈতিক কারণ, যে কারণে বহু শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের স্মরণ নিয়েছিলেন, যে কারণে আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় প্রধানত জৈন ধর্মের অনুগত। উপনিষদের যুগের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও একটা বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার উদ্গাতারা ছিল ক্ষত্রিয়-শ্রেণী, ব্রাহ্মণেরা নয়। ব্রহ্মবিদ্যার মূলকথাগুলি বহু ক্ষেত্রেই বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপের প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। ব্রহ্মবিদ্যা সর্বসাধারণের কাছে খুব বেশি আবেদন রাখতে না পারলেও বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ের চিন্তাধারার উপর পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ-বিরোধী চারিটি প্রধান ধর্মব্যবস্থার উদ্ভবের কিছু পরোক্ষ প্রেরণা ঔপনিষদীয় চিন্তাধারা জুগিয়েছিল। এই চারটি ধর্মের মধ্যে দুটি হচ্ছে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম, যে ধর্মদুটির মূল দেবতা, যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিব, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপে কল্পিত, মর্তলোকের রাজার যেন দৈব প্রতিচ্ছবি। এই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ভক্তির দ্বারা, কোন যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নয়,

যে ভক্তি মর্তে রাজাও আশা করেন। গীতায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—নরগণের মধ্যে রাজাই হচ্ছেন ঈশ্বর। বাকি দুটি ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম। এ দুটিও যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের বিরোধী। কিন্তু বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও লালিত-পালিত হয়েছিলেন ট্রাইবাল পরিবেশে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, তাই রাজার কল্পনা তাঁদের চিন্তাজগতে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে নি, কাজেই কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি, যে কারণে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্ম নিরীশ্বরবাদীই রয়ে গেছে।

৩॥ ঋগ্বেদ

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ঋগ্বেদের রচনাকাল ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরে নয়। তবে ঠিক কবে থেকে ঋগ্বেদ রচনার শুরু হয়েছে এ-বিষয়ে পাকাপাকিভাবে কোন কথা বলা যায় না। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম এবং অর্বাচীনতম অংশের মধ্যেও বহু শতাব্দীর ব্যবধান থাকা সম্ভব। ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়—শাকল, বাষ্কল, আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন এবং মাণ্ডুক, এখন শুধু-মাত্র শাকল শাখাটিই টিকে আছে। মোট ১০২৮টি অধ্যায় বা সূক্ত ঋগ্বেদে সংকলিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে দশটি খণ্ডে বা মণ্ডলে।

এতগুলি অধ্যায়ের অন্তর্গত দশ সহস্রাধিক শ্লোক নিশ্চয়ই একজনের রচনা নয়, এমনকি মধ্যযুগের টীকাকার সায়ণাচার্য পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতেন এবং তিনিও ১১টি সূক্ত বা অধ্যায়কে (যেগুলি বালখিল্য বলা হয়) উপেক্ষা করেছিলেন। বাকি ১০১৭টি অধ্যায়ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হস্তে রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটি অপর গুলির তুলনায় অনেক পরবর্তী কালের রচনা, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ, প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল এ দুয়ের মধ্যবর্তী। নবম মণ্ডলটি একটি পৃথক্ সংকলন, যা পরবর্তী কালে ঋগ্বেদে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রথম, নবম ও দশম মণ্ডলের অধিকাংশ অধ্যায়ের কবি বা ঋষি হিসাবে এক একটি স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলের কবি হিসাবে পাওয়া যায় ছয়টি গোত্রনাম, যথা গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ এবং বসিষ্ঠ।

বিষয়বস্তু হিসাবে ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহকে প্রথম শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা

করেছিলেন যাস্ক তাঁর নিরুক্ত (৭।১।২) গ্রন্থে। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী শ্লোকগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও আধ্যাত্মিকী। যে শ্লোকগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে দেবতাদের গুণগান করে তাঁদের করুণা ভিক্ষা করা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যক্ষ। দুঃখের বিষয়, অপর দুই শ্রেণীর কোন নিদর্শন যাস্ক দেখান নি। ঋগ্বেদে সংকলিত সূক্তগুলি আদিতে যে উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন, পরবর্তী যুগে এগুলিকে নানাভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে, অনেক সময় প্রাচীন ঋক্‌গুলির, এমনকি প্রাচীন শব্দগুলির নূতন অর্থ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাও হয়েছে। যাস্ক কর্তৃক নিরুক্ত রচনার যুগেই বেদবিদ্‌দের মধ্যে বেদার্থ-নিরূপণ প্রসঙ্গে নানারকম গভীর ও মৌলিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। যাস্ক অন্তত সতেরজন পূর্বানুগামী টীকাকারের উল্লেখ করেছেন, যাঁদের মতামত ও ব্যাখ্যা বহুলাংশেই পরস্পর-বিরোধী ছিল। যাস্ক পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের রচনার মতই তাঁর পরবর্তী ভাষ্যকারদের রচনা-সমূহও বিলুপ্ত হয়েছে। ঋগ্বেদের সামগ্রিক ভাষ্য বলতে আমরা যা পাই তা হল খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে সায়ণের রচনা। কিন্তু রুডলফ রোটের মত পণ্ডিতেরা বলেন, ঋগ্বেদ রচিত হবার দুহাজার বছর পরে সায়ণ ঋগ্বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তাঁর মনগড়া হতে বাধ্য, তাই সায়ণভাষ্যের উপর নির্ভর না করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা বাঞ্ছনীয়। যদিও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সায়ণের ব্যাখ্যা তাঁর একান্তই মনগড়া, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ভুললে চলবে না যে কোন না কোন প্রাচীন ঐতিহ্য, হয়ত বা কোন প্রাচীন ভাষ্যের সঙ্গে, সায়ণ পরিচিত ছিলেন, নতুবা আগাগোড়া মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ঋগ্বেদের ভাষ্য রচনার সাহস তিনি পেতেন না।

বিষয়বস্তু হিসাবে ঋগ্বেদের সূক্ত ও শ্লোকগুলিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ঋগ্বেদের বেশির ভাগ অংশটাই নিযুক্ত হয়েছে দেবদেবীর বন্দনায়। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজজীবনের পরিচয়ও বহু স্থানে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক কিছু রচনা, যেগুলির মূল বিষয়বস্তু এতই প্রাচীন যে ঋগ্বেদের যুগেই সেগুলির তাৎপর্য হয়ত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই রচনাগুলিকে আমরা ঋগ্বেদে পাই কথোপকথনের আকারে, যেমন অগস্ত্য, ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণের সংলাপ (১।১৬৫), অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার ব্যক্তিগত সংলাপ (১।১৭৯), বিশ্বামিত্র ও নদীগণের সংলাপ (৩।৩৩), ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেবের সংলাপ (৪।১৮), যম ও যমীর সংলাপ (১০।১০),

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সংক্রান্ত সংলাপ (১০।১০), উর্বশী ও পুরূরবার সংলাপ (১০।৯৫), সরমা ও পণিদের সংলাপ (১০।১০৮) এবং যম ও কুমারের সংলাপ (১০।১৩৫)। অধিকাংশ ঋগ্বেদের শ্লোকই পুরোহিতগণ কর্তৃক আবৃত্তির জন্ম রচিত হয়েছিল, কিন্তু এই কথোপকথনগুলি ছিল আসলে কোন ঘটনা বা অনুষ্ঠানের অনুকৃতি বা অভিনয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা উর্বশী ও পুরূরবার সংলাপটির উল্লেখ করতে পারি, যা পাঠ করে সহজেই মনে হয় যে সেখানে একজন হতাশ প্রেমিক ও তার প্রেমিকার কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে, নায়ক কাতরভাবে নায়িকাকে অনুরোধ করছে সে যেন তাকে পরিত্যাগ করে না যায় কিন্তু অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী ওই কথোপকথনের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্যকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে আসলে পুরূরবাকে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে দেবতাদের নিকট বলি দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল উর্বশীরই নির্দেশে, এবং পুরূরবা কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল যা তাকে মঞ্জুর করা হয় নি। অধ্যাপক কোশাম্বী দেখিয়েছেন যে ওই কথোপকথনের প্রতিটি বাক্যই ঋগ্বেদের অন্যত্র বর্তমান, এবং প্রতিক্ষেত্রেই সেগুলির ব্যবহার করা হয়েছে যজ্ঞস্থলে বলিদানের প্রসঙ্গে। এখানে একটি অত্যন্ত প্রাচীন প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। একদা যে উদ্দেশ্যে ওইভাবে বলি দেওয়া হত, ঋগ্বেদের যুগে হয় সেই উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে, না হয় কালধর্মে ওই অনুষ্ঠানটি বাস্তবে না ঘটিয়ে তার অনুকৃতি বা অভিনয়ের দ্বারা ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার রীতি প্রচলিত হয়েছে, এবং সেই কারণেই ঋগ্বেদের ওই সংলাপটির অবতারণা। এইভাবে বিশ্লেষণের দ্বারা অপরাপর কথোপকথনগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব।[১]

ঋগ্বেদের প্রধান অংশ দেবতার বন্দনাতেই নিযুক্ত। ঋগ্বেদের দেবতারা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা ও পৃথিবীর দেবতা। দ্যুলোকের দেবতাদের মধ্যে যিনি প্রাচীনতম তাঁর নাম দ্যৌঃ অর্থাৎ আকাশ। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই মাতা পৃথিবীর স্তুতি সংযুক্ত এবং উভয়ে একত্রে দ্যাবাপৃথিবী বলে উল্লিখিত। দ্যুলোকের অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেবতাদের মধ্যে বরুণের স্থান অতি উচ্চে। তিনি ঋত-যুক্ত ও ঋতের

১। দ্রঃ কোশাম্বী *Myth and Reality*. বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনার জন্ম বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ The Priest and the Queen (*Journal of the Original Institute* vol. xxi, pp. 1-21) দ্রষ্টব্য।

পালক। ঋগ্বেদে ঋত বলতে বুঝিয়েছে নিয়মশাসিত বিশ্ব, এবং সেই হিসাবে বরুণ ন্যায় ও নীতির প্রবল রক্ষক, তিনি অনৃতের (যা ঋতের বিপরীত) ধ্বংসকারী। পরবর্তীকালে বরুণের গৌরব হ্রাস পেয়েছিল, তাঁর স্থান করে নিয়েছিল ইন্দ্রের যুদ্ধ ও লুণ্ঠনমূলক কীর্তির অসীম গরিমা। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের যা কিছু কীর্তিকলাপ তার সঙ্গে অধিকতর প্রাচীন যুগের ন্যায় ও নীতিবোধের কোন সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইরাণীয় দেবগোষ্ঠীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন এই বরুণ, উপাধি অনুযায়ী যাঁর নাম হয়েছিল অসুর-মেধা (অহুর মজদা)। সেখানেও তিনি ন্যায় ও ঋতের পালক। প্রাক-বিভক্ত সাম্যসমাজ থেকে শ্রেণীসমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস ও লুণ্ঠনের দেবতা ইন্দ্রের প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে আর বরুণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাঁর নৈতিক গরিমার ক্রমবিলোপ। তাই ঋগ্বেদের কোন কোন কবি এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন: "ত্রিলোকের অবস্থানকারী দেবগণ, তোমাদের ঋত কোথায় অবস্থান করে? অনৃতই বা কেন?·· কোথায় গেল বরুণের রাগ? দুঃখনিবারক অন্ন-কারী বরুণকে আমি বলছি, আমি এ-কথা দৃঢ়হৃদয়ে বলছি—"নতন করে ঋতের জন্ম হোক (ব্যর্ণোতি হৃদা মতিম্ নব্যো জায়তাম্ ঋতম্)। আমার এই উক্তি জেনে রাখ, হে দ্যাবাপৃথিবী" (১।১০৫)। মিত্র, সবিতৃ, পূষা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ মূলত সৌরদেবতা। দেবতা হিসাবে মিত্রের উল্লেখ প্রায়ই বরুণের সঙ্গে সংযুক্ত, বহু দৃষ্টান্তে উভয়ে একত্রে মিত্রাবরুণ নামে স্তুত। এ ছাড়া পৃথকভাবে দশটি পূর্ণাঙ্গ সূক্তে সূর্যের পৃথক্ স্তুতি আছে। সবিতৃ বা সবিতা সূর্যেরই আর একটি রূপ। ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণের মতে, উদয়ের আগে পর্যন্ত দেবতার নাম সবিতা, উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সূর্য। দেবতা পূষার বর্ণনায় যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সূর্যের বর্ণনাতেও প্রায় হুবহু সেই শব্দগুলি পাওয়া যায়। বিষ্ণু পরবর্তীকালে প্রাধান্যলাভ করলেও ঋগ্বেদে তাঁর ত্রিপাদ্গমনের যে কল্পনা করা হয়েছে, তা সম্ভবত সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্নপ্রখরতা ও অস্তকেই সূচিত করেছে। দেবতা বিবস্বান্ বহু দৃষ্টান্তে মানবজাতির আদি জনক বলে কল্পিত, কিন্তু বৈদিক দেবতা হিসাবে তাঁর স্থান অবশ্যই গৌণ। আদিত্যগণ একাধিক দেবতার সমষ্টি, কিন্তু এঁদের সংখ্যার কোন স্থিরতা নেই। এঁদের মধ্যে আছেন মিত্র, বরুণ, অর্যমা, অংশ, ভগ, ধাতৃ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দক্ষ প্রভৃতিরা। পরবর্তীকালে আদিত্য বলতে যদিও সূর্যকে বুঝিয়েছে, কিন্তু ঋগ্বেদে আদিত্যের অর্থ অদিতির

পুত্র। মিত্র ও বরুণের মত প্রাচীন, এবং ইন্দ্রের মত প্রধান দেবতাও যখন অদিতির পুত্র বলে কল্পিত হয়েছেন, অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে এই অদিতি কোন সুপ্রাচীন পর্যায়ের প্রধানা দেবী ছিলেন, যদিও ঋগ্বেদ রচনা কালে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গরিমা বহুলাংশে ম্লান হয়েছে দেখা যায়। কোন স্বতন্ত্র সূক্ত তাঁর নামে নেই। বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর নাম মাত্র ৮০ বার ঋগ্বেদে উল্লিখিত। অশ্বিদ্বয়ের প্রাকৃতিক ভিত্তি কি ছিল তা বলা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন তাঁরা শুকতারা সন্ধ্যাতারার প্রতীক। ঋগ্বেদে তাঁরা যমজ ও নিত্যসহচর দেববৈদ্যরূপেই পরিকল্পিত। দ্যুলোকের অবশিষ্ট দেবতাটি হচ্ছেন উষা যিনি প্রভাতের প্রতীকরূপী দেবী। তাঁকে উদ্দেশ্য করে যে সূক্তগুলি রচিত হয়েছে কাব্যগুণ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে সেগুলি অতুলনীয়। একটি ক্ষুদ্র সূক্তের নিদর্শন আমরা এখানে তুলে ধরেছি। "হে স্বর্গের দুহিতা উষা, আমাদের আনন্দে অভিষিক্ত কর। রূপসী কুমারীর মত উষার আগমনে চরাচর আনন্দে মেতে উঠেছে। চতুষ্পদেরা জেগে উঠেছে। পাখিরা শূন্যে পাড়ি দিচ্ছে। হে স্বর্গকন্যা উষা, তোমার ঔজ্জ্বল্যের আভায় তুমি বিকশিত হও। প্রাত্যহিক যজ্ঞশালায় তোমার কান্তির ছাপ পড়ুক। পৃথিবীর প্রাণবায়ু তোমাতেই নিহিত. হে মহীয়সি. হে দীপ্যা রথারূঢ়া, আমাদের প্রার্থনায় কান দাও।" উষার উদ্দেশে ঋগ্বেদে ২০টি পৃথক্ সূক্ত আছে, এ ছাড়া তার উল্লেখ তিনশোবারেরও বেশি। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক মানুষদের চোখে তাঁর সুদতি রূপ যতখানি প্রকট, তার প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাবোধের ঠিক ততখানি অভাব। ইন্দ্র কর্তৃক উষাকে ধর্ষণের কাহিনী ঋগ্বেদের বহু স্থানেই উল্লিখিত হয়েছে (৪।৩০।৮-১১, ২।১৫।৬, ১০।৭৩।৬, ১০।১৩৮।৫) এবং ইন্দ্রের এই কার্য ঋগ্বেদের কবিগণ কর্তৃক রীতিমত প্রশংসিত হয়েছে।

অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতাদের নাম ইন্দ্র, ত্রিত আপ্ত, অপাং নপাত, মাতরিশ্বা, অহির্বুধ্ন্য, অজ একপাদ, রুদ্র, মরুদ্গণ, বায়ু-বাত, পর্জন্য ও আপঃ। ত্রিত আপ্ত নামে দেবতাটির বৈশিষ্ট্য ঋগ্বেদে অস্পষ্ট। আপ্ত শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণ বলেছেন, অপাং পুত্র, অর্থাৎ জলের পুত্র। অপাং-নপাত জলদেবতা, ও জলনির্ভর উর্বরতার কামনাই তাঁর স্তুতির মূল উপাদান। জল-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি বৈদিক দেবতার নাম পর্জন্য। ঋগ্বেদে জল ও জলনির্ভর উর্বরতার কামনা আরও সুস্পষ্ট হয়েছে আপঃ র কল্পনায়। শুধু মেঘ আর জলই নয়, বৈদিক কবিরা বাতাসেও নানাভাবে স্তুতি

করেছেন। ঋগ্বেদে প্রধানত তিনটি বায়ুদেবতার উল্লেখ দেখা যায়—বায়ু, বাত ও মাতরিশ্বা। বায়ু ও বাতের বর্ণনা মূর্ত বাতাসেরই বর্ণনা, কিন্তু মাতরিশ্বা কিছুটা পৃথক ধরনের। যে বাতাস ঝড় তুলে গাছে গাছে ঘর্ষণ লাগিয়ে দাবানলের সৃষ্টি করে, সম্ভবত সেই বাতাসেরই প্রতীক হয়েছিলেন মাতরিশ্বা। ঋগ্বেদ ৩।৯।৫-এ বলা হয়েছে : "(পিতা) যেরূপ স্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে (বলপূর্বক) আনয়ন করেন, সেইরূপ মাতরিশ্বা স্বেচ্ছাপূর্বক তিরোহিত ও মন্থন দ্বারা নিষ্পাদিত এই অগ্নিকে দেবতাদের জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন।" অহির্বুধ্ন্য ও অজ-একপাদ কয়েক স্থানে একত্রে ও প্রায় অভিন্নভাবে স্তুত হয়েছেন, জল-স্বরূপ ধনবর্ষী দেবতা হিসাবে, কিন্তু এঁদের প্রকৃতি ও পরিকল্পনা আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্ট নয়। ঋগ্বেদে রুদ্রের তেমন প্রাধান্য না থাকলেও তাঁর পরিকল্পনায় বিবিধ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কোথাও তিনি উগ্র ও পশুর ন্যায় ভয়ংকর, কোথাও তিনি জনগণের রক্ষাকর্তা। কোন কোন দৃষ্টান্তে তাঁর স্তুতি সুস্পষ্ট আতঙ্কজনিত, অন্যত্র তিনি আবার রোগ-নিরাময়কারক ওষধি প্রভৃতির কামনায় স্তুত হয়েছেন। ঋগ্বেদের নানা জায়গায় রুদ্রের সঙ্গে মরুদ্গণের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁরা একদল দেবতা বৈদিক কবিদের কল্পনায় এঁদের প্রধান কীর্তি যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করা। অন্তরীক্ষের প্রধানতম দেবতা ইন্দ্র, শুধু তাই নয়, ঋগ্বেদেরও তিনি প্রধান দেবতা। পণ্ডিতেরা ইন্দ্রকে বজ্র-বিদ্যুৎ-বর্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেও মূলত তাঁর চরিত্রটি পশুপালক যুদ্ধপরায়ণ মানবদলের নেতারই প্রতিচ্ছবি। সম্ভবত ইনি ছিলেন বাস্তবে কোন ওইরকমই দলনেতা যার বীরত্ব, নৃশংসতা ও অপরাপর ট্রাইবদের উপর বিজয়লাভের ঘটনাসমূহ তাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। ঋগ্বেদের বহু স্থলেই এমন ইঙ্গিত আছে যে তিনি একদা মানুষ ছিলেন (১।৩২।৯; ৪।১৭।১১; ৩।৫১।৪, ১।১৭৮।৩ ইত্যাদি)। ইন্দ্রের এই মানব-নেতৃত্ব যে অত্যন্ত সুপ্রাচীন সে কথাও ঋগ্বেদে বলা হয়েছে : পুরা চিৎ শূর নৃণাম (৮।৬৬।৫) পশুপালনমূলক অর্থনীতির ক্রমবিকাশের পরিণামে যুদ্ধবৃত্তির বিকাশ ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই দেবমণ্ডলীতে যুদ্ধ-নায়কের গরিমাই প্রবল হয়ে ওঠে। এবং এইদিক থেকেই রোট ও হুইটনির সিদ্ধান্তটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে ঋগ্বেদের রচনাকালেই ন্যায় ও নীতির প্রধান নায়ক বরুণকে অবদলিত করে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের নায়ক ইন্দ্রই প্রধানতম দেবতা হয়ে ওঠেন।

একটি ঋকে বলা হয়েছে : "হে ইন্দ্র, দুষ্ট মিত্ররূপী বাধাদানকারী মানবদল আসিতেছে ; তাহাদের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া পুণ্যদিনে আমাদিগকে দান কর। মায়াবী বরুণ আমাদের মধ্যে যে অনৃত দেখেন তাহা দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অপনোদন কর" (৭।২৮।৪)। অন্যত্র (৪।১৮।১২) বলা হয়েছে : "হে ইন্দ্র ! (তুমি ভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে ? তুমি যখন শয়ান থাক অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড় ? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ।"

পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছেন অগ্নি যার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে ২০০টি পূর্ণাঙ্গ সূক্ত রচনা করা হয়েছে। অজস্র দৈনন্দিন কল্যাণের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই বহু দৃষ্টান্তে অগ্নি নিকট আত্মীয়ের মত, বন্ধুর মত, ভ্রাতার মত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় বন্দিত। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনি দেবগণের নিকট আহুতি বহন করে নিয়ে যান। পৃথিবীর দেবতা হিসাবে সোমের প্রাধান্যও কম নয়। ঋগ্বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলের ১১৪টি সূক্ত ছাড়াও অন্যান্য মণ্ডলে ৭টি সূক্ত সোমের স্তুতিতে বিরচিত। বৈদিক কবিরা সোমলতার পার্বত্য আবাস ও মর্ত্যে আগমন নিয়ে অজস্র কাহিনী রচনা করেছেন। সোমলতা সংগ্রহ করা, পাথরের সাহায্যে তা নিষ্কাশন করা, নিষ্কাশিত রস মেষলোমের ছাঁকনিতে ছেঁকে কলসে ভরা, দেবতাদের উদ্দেশ্যে তার আহুতি দেওয়া, এবং অবশ্যই নিজেরা তা পান করা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁরা এমন অসম্ভব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, প্রক্রিয়াগুলির খুঁটিনাটি নিয়ে আদিম কল্পনার এমন জটিল জাল বুনেছেন যে আমাদের পক্ষে তার সমস্ত তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব নয়, তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মাদকত্বের গুণেই সোমের এত প্রশংসা, যে কারণে বলা হয়েছে যে সোমপান করে অমরত্ব লাভ করা যায়, মৃত্যু হতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আর একজন উল্লেখযোগ্য পৃথিবীর দেবতা বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তুমি গণদিগের মধ্যে গণপতি, কবিদিগের মধ্যে কবি, অন্ন তোমার শ্রেষ্ঠ উপমানস্বরূপ, তুমি ব্রহ্মদিগের (অন্নগুলির) জ্যেষ্ঠ রাজা" (২।২৩।১)। এ ছাড়া স্বয়ং পৃথিবীও দেবী হিসাবে স্তুত, যদিও ঋগ্বেদে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অল্প এবং গৌরব গৌণ। এখানে তিনি স্বর্গের দেবতা দ্যৌর সঙ্গে সংযুক্তভাবে, দ্যাবাপৃথিবী হিসাবে, স্তুত

হয়েছেন। ঋগ্বেদে পৃথিবী দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে কৃষিজীবী সমাজের উপাস্যা পৃথিবীদেবী বা বসুমাতার সাদৃশ্য খুবই অল্প।

ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের অনুবাদ এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি, যা থেকে মোটামুটি ঋগ্বেদের রচনাশৈলী ও ঋগ্বেদের যুগের চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। উদ্ধৃত সূক্তগুলি রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ থেকেই আমরা গ্রহণ করেছি। সর্বপ্রথম আমরা এখানে সুবিখ্যাত নাসদীয় সূক্তটি (১০।১২৯) তুলে ধরছি :

"তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস মুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ্বদিকে বিস্তৃত হইল। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে? এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন! অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।"

অপর একটি সূক্তের (১০।১৬) প্রথমে তিনটি ঋক্ আমরা উদ্ধৃত করছি যার মধ্য দিয়ে মৃতের প্রতি ঋগ্বেদের কবির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে :

"হে অগ্নি! এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও না, ইহার চর্ম বা ইহার শরীর ছিন্নভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা!

যখন ইঁহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইঁহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দেও। হে অগ্নি! যখন ইঁহার শরীর উত্তমরূপে পক্ক করিবে, তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইঁহাকে দিবে। যখন ইনি পুনর্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন। হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়—তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি লাভ করুক।"

ঋগ্বেদের সুবিখ্যাত অক্ষ-সূক্তটির তর্জমাও এখানে দেওয়া গেল (১০।৩৪) যা থেকে সে-যুগের সাধারণ মানুষকে চিনতে সুবিধা হবে। এই সূক্তটি উত্তমপুরুষে কথিত, দ্যূতকার স্বয়ং বক্তা:

"বড় বড় পাশাগুলি যখন ছকের উপর ইতস্তত: সঞ্চালিত হয়, দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হয়। মুজবান নামক পর্বতে যে সোমলতা জন্মে, তাহার রস পান করিতে যেমন প্রীতি জন্মে, বিভীতক কাষ্ঠনির্মিত অক্ষ আমার পক্ষে তেমনি প্রীতিকর ও তদ্রূপ আমাকে উৎসাহিত করে। আমার এই রূপবতী পত্নী কখনও আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই, কখনও আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করিত। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিণী ভার্যাকে ত্যাগ করিলাম। যে ব্যক্তি পাশাক্রীড়া করে তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ নাই। যেরূপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করে না, সেইরূপ দ্যূতকার কাহারও নিকট সমাদর পায় না। আমি যখন মনে ভাবি, আর এই পাশাখেলা করিব না, তখন খেলার সঙ্গীদের দেখিলে তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া যাই, কিন্তু পাশাগুলি সুন্দর পিঙ্গল মূর্তিতে ছকের উপর বসিয়া আছে দেখিয়া আর থাকিতে পারি না। যেরূপ ভ্রষ্টা নারী উপপতির নিকট গমন করে, আমিও তদ্রূপ খেলার সঙ্গীদের ভবনে গমন করি। ইহারা কখনও নিচে নামিতেছে, কখনও উপরে উঠিতেছে, ইহাদিগের হাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, তাহারা ইহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইহারা দেখিতে শ্রীযুক্ত, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসিয়া আছে। স্পর্শ করিতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে।"

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে বিষয়বস্তু বা আয়তনই বড় কথা নয়, ঋগ্বেদকে বিশিষ্টতায় যা মণ্ডিত করেছে, তা হচ্ছে রচনার কাব্যগুণ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলিষ্ঠতা ও সারল্য এবং সর্বোপরি প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি কবিদের আশ্চর্য মমত্ববোধ।[১]

৪ ॥ অথর্ববেদ

ঋগ্বেদের পর আর যে তিনটি বেদের কথা আমরা জানি সেগুলি হচ্ছে অথর্ববেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ। এই তিনটির মধ্যে অথর্ববেদই সবচেয়ে প্রাচীন, যার কোন কোন অংশ প্রাচীনত্বের দিক্ থেকে ঋগ্বেদের প্রায় সমকালীন। ভারতীয় সাহিত্যে অথর্ববেদের প্রাচীনতম নাম হল অথর্বাঙ্গিরস, অর্থাৎ অথর্বন্ ও আঙ্গিরস। এই দুটি শব্দের তাৎপর্য আমরা পরে ব্যাখ্যা করব। অথর্ববেদের দুটিমাত্র শাখা বর্তমানে টিকে আছে—শৌনক ও পৈপ্পলাদ। অথর্ববেদে মোট ৭৩১টি সূক্ত আছে যেগুলি ২০টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। অথর্ববেদের এক-সপ্তমাংশ ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

কুড়িটি অধ্যায়ের প্রথম সাতটি অসংখ্য ছোট ছোট সূক্তের সমষ্টি, প্রতিটি সূক্ত কয়েকটি করে শ্লোকে বিভক্ত। অষ্টম থেকে চতুর্দশ অধ্যায় এবং সপ্তদশ অধ্যায়ের সূক্তগুলি দীর্ঘ ধরনের। পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় দুটির অধিকাংশই

গদ্যে রচিত। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে অধ্যায়গুলি বিভক্ত হয় নি, শুধু দুটি অধ্যায় ব্যতিক্রম, চতুর্দশ অধ্যায়টি বিবাহ-সংক্রান্ত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়টির সামগ্রিক বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃতের সৎকার। মোটের উপর অথর্ববেদের ভাষা ও ছন্দ ঋগ্বেদের অনুরূপ হলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের নিদর্শন আছে।

অথর্ববেদের কোন কোন অংশ ঋগ্বেদের সমকালীন হলেও অধিকাংশই যে পরবর্তী কালে রচিত তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষের এমন সব স্থানের উল্লেখ অথর্ববেদে আছে যেগুলির কথা ঋগ্বেদে বলা হয় নি। অথর্ববেদে বর্ণিত যে সমাজ ব্যবস্থার চিত্র আমরা পাই তার সঙ্গে ঋগ্বেদবর্ণিত সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য দুস্তর। তৃতীয়ত অথর্ববেদে ঋগ্বেদের দেবতাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু অথর্ববেদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাদুমন্ত্র, যেগুলির উদ্দেশ্য অপদেবতাদের তুষ্টিবিধান, বন্ধুদের আশীর্বাদ এবং শত্রুদের অভিসম্পাত প্রদান। আদিম অবিভক্ত সমাজের জাদুবিশ্বাস ও তৎকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান-সমূহের নিদর্শন অথর্ববেদে প্রচুর, কিন্তু এই সকল জাদুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানসমূহ অথর্ববেদের যুগেই পেশাদার জাদুকরদের হাতে এসে গেছে। এই কারণে অথর্ববেদের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর, কেন না সেখানে আছে তৎকালীন সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি; নৃতত্ত্ববিদ্ অথর্ববেদ থেকে পর্বতপ্রমাণ তথ্য পেতে পারেন।

আমরা এখানে অথর্ববেদোক্ত কিছু তন্ত্রমন্ত্রের উদাহরণ দেব। রোগ সারানোর মন্ত্র দিয়েই আমরা শুরু করছি। এই মন্ত্রগুলির কোনটি খোদ রোগটিকেই উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে অথবা রোগের কারণ হিসাবে কোন অপদেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। রোগের এক অপদেবতার নাম তকমন, যার উদ্দেশ্যে এই জাতীয় অনেক মন্ত্র আছে। অনেক সময় কোন ঔষধকেও শ্লোকের দ্বারা বন্দনা করা হয়েছে, এবং কয়েক ধরনের ঔষধের উল্লেখও অথর্ববেদে আছে। এই দিক্ থেকে অথর্ববেদকে ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদিতম উৎসও বলা যেতে পারে। এখানে একটি চিকিৎসামন্ত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

যে তুমি সকল মানুষকে হলদে করে দাও
অগ্নির মত উত্তাপের বশ করে—

হে জ্বর, তোমার বিলুপ্তি হোক
যথা ইচ্ছা তুমি অদৃশ্য হও।

হে জ্বর তুমি মূজবন পর্বতে যাও
অথবা বাহ্লীক দেশে।
সেখানে একটি ডাগরপানা শূদ্র মেয়েকে
পাকড়াও করে যদৃচ্ছা নাচাও॥ ৫।২২।২৭

এরপর মন-দেওয়া-নেওয়া বিষয়ক মন্ত্রগুলির দু' একটি নিদর্শন দেওয়া যাক। প্রেমাস্পদকে বশীভূত করার মন্ত্রতন্ত্রের চাহিদা চিরদিনই আছে একথা বলাই বাহুল্য. সেদিক থেকে অথর্ববেদের যোগানও প্রচুর। শুধু মনের মানুষকে পাওয়ার জন্যই নয়, সপত্নীবিনাশ বা প্রতিদ্বন্দ্বীর নিধনের উদ্দেশ্যেও প্রচুর মন্ত্র রচিত হয়েছে। এই রকম একটি মন্ত্রের উল্লেখ এখানে করছি: মন্ত্রটি হচ্ছে : "হে মরুৎ তাকে পাগল করে দাও। হে অগ্নি, হে বায়ু, আমার ভালবাসার জন্য সে পাগল হোক (৬।১৩০।৪)।" অবশ্য মন্ত্রপাঠের আগে কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানও আছে, যেমন যাকে ভালবাসবে তার একটি মূর্তি তৈরী করে একটি জ্বলন্ত শলাকা দিয়ে সেই মূর্তিটির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি বলতে হবে: "প্রেম তোমাকে উত্তপ্ত করুক, যেন বিছানায় তোমায় সুস্থির হয়ে থাকতে না হয়। আমি কামের তীর দিয়ে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করেছি। এই তীরের ফলায় আছে প্রত্যাশা, প্রেমের বিষ যেখানে লাগানো আছে; তীরের দণ্ডটি হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন কামনা, ঠিকমত নিক্ষেপ করলে কাম তোমার হৃদয় বিদ্ধ করবে, ইত্যাদি।" (৩।২৫)

মন্ত্রগুলি সর্বক্ষেত্রেই রূপকধর্মী বা অলীক বা অর্থহীন নয়। অনেকক্ষেত্রেই সেগুলি বিশেষ কাব্যগুণ প্রাপ্ত হয়েছে। পারিবারিক শান্তির উদ্দেশ্যে রচিত একটি মন্ত্র অথর্ববেদে (৩।৩০) আছে, যার অনবদ্য বঙ্গানুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল।

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে ঘৃণা যাক দূরে চলে;
পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর;

ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক্ আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা করে না দান ;
জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

অথর্ববেদের দেবতারা মোটামুটি ঋগ্বেদের দেবতাদের সঙ্গে নামের দিক্ থেকে অভিন্ন, তবে তাঁদের চরিত্রের রীতিমত পরিবর্তন ঘটেছে। ঋগ্বেদের প্রায় প্রতিটি দেবতারই প্রাকৃতিক প্রচ্ছদপট আবিষ্কার করা যায় কিন্তু অথর্ববেদে তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ঋগ্বেদের ইন্দ্রের সঙ্গে অথর্ববেদের ইন্দ্রের চরিত্রগত পার্থক্য প্রচুর। এখানে ইন্দ্র নিতান্তই দানবহন্তা, তাঁর পিছনের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল একেবারেই অদৃশ্য হয়েছে। অন্যান্য দেবতাদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অথর্ববেদে হরেকরকম নতুন দার্শনিক তত্ত্ব উল্লিখিত হয়েছে যে-গুলির উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই। বেশির ভাগই সৃষ্টি-সম্পর্কিত, তবে এখানে ঋগ্বেদের অনুসন্ধিৎসা নেই, সমস্তই কৃত্রিমতায় ভরা, আগাগোড়াই রহস্যময়তায় পূর্ণ। স্রষ্টা হিসাবে প্রজাপতি নামক এক নতুন দেবতা এখানে কল্পিত হয়েছেন। কখনও বা জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে কাল বা সময়, কখনও বা প্রাণ, কখনও বা তপঃ ইত্যাদি অথর্ববেদে কল্পিত হয়েছে। এগুলির বর্ণনাও উদ্ভট একটির সঙ্গে অপরটির কোন সামঞ্জস্যবিধান করা যায় না। এইগুলি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে অথর্ববেদের উনবিংশতিতম অধ্যায়ে

জগৎ সৃষ্টির কারণ হিসাবে অথর্ববেদে যতরকম উদ্ভট কল্পনা আছে সেগুলির মধ্যে রোহিত সূক্তটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে রোহিতকে (অনুমানে মনে হয় সূর্য) জগত সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে আবার ওই একই বস্তুকে ওই নামেরই এক রাজার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আবার একটি সূক্তে (৪।১১) বীর্যযুক্ত একটি ষাঁড়কেই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ বলা হয়েছে। তবে অথর্ববেদের সকল তত্ত্বচিন্তাই উদ্ভট নয়। যদিও ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের (১০।১২৯) মত উচ্চমানের দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথর্ববেদে নেই, তথাপি অথর্ববেদের কোন কোন অংশ বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী। এই প্রসঙ্গে অথর্ববেদ-বর্ণিত পৃথিবী সূক্তটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১২।১)। ৬৩টি শ্লোকে রচিত এই সূক্তটি দার্শনিক চিন্তা ও কাব্যগুণের অপূর্ব সমন্বয়।

অথর্ববেদের প্রধানতম মূল্য নৃতত্ত্বমূলক। আদিম পর্যায়ের ধ্যানধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত এত বিস্তৃত সাহিত্যগত নিদর্শন ইন্দো-ইউরোপীয়

ভাষার আর কোথাও নেই। অথর্ববেদ-বর্ণিত মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পৃথিবীর নানা উপজাতির আচার-অনুষ্ঠানের বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।[১]

৫ ॥ সামবেদ

সামবেদের মোট তিনটি শাখা কৌথুম, রাণয়নীয় এবং জৈমিনীয় বা তালবকার, কিন্তু এগুলির মধ্যে কৌথুম শাখাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এই শাখাটির দুটি অংশ, আর্চিক ও উত্তরার্চিক। উভয় অংশ মিলিয়ে মোট শ্লোকের সংখ্যা ১৮১০টি, এবং পুনরুক্তি বাদ দিলে ১৫৪৯টি, কিন্তু মাত্র ৭৫টি ছাড়া বাকি সবগুলিই ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডলে পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি গায়ত্রী বা প্রগাথ ছন্দে রচিত, একান্তই সঙ্গীতের প্রয়োজনে।

সামবেদের প্রথম অংশ, যাকে আর্চিক বলা হয়, মোট ৫৮৫টি স্তবক বা ঋক্ নিয়ে গঠিত হয়েছে। সাম বা সামন, যে কথাটি দিয়ে সমগ্র সংহিতাটিকেই সূচিত করা হয়, তার অর্থই হল গান। সামবেদের স্তবক বা ঋক্গুলিকে যোনি আখ্যাও দেওয়া হয়। Ritual Chorus-এর সঙ্গে উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের যে সম্পর্ক নৃতত্ত্ববিদেরা টেনে থাকেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'যোনি' শব্দটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। সামবেদের দ্বিতীয় অংশ, যাকে বলা হয় উত্তরার্চিক, তা হল আসলে একটি বিশেষ ধরনের স্তোত্রসংকলন যেখানে প্রতি স্তোত্রে সাধারণত তিনটি করে ঋক বা স্তবক থাকে। উদ্গাতা (যজ্ঞ বা জাদু-অনুষ্ঠানের চার ধরনের পুরোহিতের প্রয়োজন হত—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রাহ্মণ। উদ্গাতার কাজ ছিল যজ্ঞস্থলে গান গাওয়া) প্রথমে আর্চিক অংশ মারফত সুরগুলি আয়ত্ত করবেন এবং তারপর উত্তরার্চিক অংশের সাহায্যে তিনি ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি সুর করে

১। অথর্ববেদের সম্পাদনা : Roth এবং Whitney, ১৮৫৬ ; দ্বিতীয় সম্পাদনা C. R. Lanman, ১৯০৫, Harvard Oriental Series সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড ; ইংরাজী অনুবাদ R. T. H. Griffith, ১৮৯৫-৯৬ এবং W. D. Whitney ১৯০৫ : বাছাই অংশের ইংরাজী অনুবাদ M. M. Bloomfield, ১৮৯৭ *Sacred Books of the East* Series-এর ৪২তম খণ্ড ; আংশিক জার্মান অনুবাদ : J. Grill, ১৮৮৮ ; A. Ludwig, ১৮৭৮ ; পূর্ণাঙ্গ জার্মান অনুবাদ A. Weber (১-৫, ১৪, ১৮ অধ্যায়), ১৮৯৫-৯৬ ; Th. Aufrecht (১৫ অধ্যায়) এবং C. A. Florenz (৬ অধ্যায়), ১৮৮৭ ; ফরাসী অনুবাদ (৭-১৩ অধ্যায়) : V. Henry ১৮৯১-৯৬।

গাইবেন। তবে সামবেদের সকল গানই জনসমক্ষে গাওয়া হত না, দু ধরনের গান ছিল, গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যগত দৃষ্টিকোণে সামবেদ ঋগ্বেদের কতকগুলি শ্লোকের সংকলনমাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও সামবেদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। আদিম সমাজজীবনে সঙ্গীতের তাৎপর্য যে কি তা আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি। সামবেদের সঙ্গীতের সার্থকতা ততটা সঙ্গীতে নয় যতখানি সঙ্গীতের আচার বা ritual-এ। উত্তরকালে পুরোহিতেরা এই গানগুলিকে যে উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করুন না কেন, সামগানের প্রকৃত উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের সামবেদের যুগের চেয়ে অনেক পিছনের দিকে যেতে হবে।[১]

৬॥ যজুর্বেদ

সামবেদ যেমন উদ্গাতা নামক পুরোহিত শ্রেণীর সঙ্গীতের পুস্তক, যজুর্বেদ সেইরকম অধ্বর্যু নামক পুরোহিত শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের উপযোগী গ্রন্থ। যজুর্বেদ দুভাগে বিভক্ত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদের একটিমাত্রই শাখা পাওয়া যায় যার নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের শাখা চারটি, যথা—কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতা, তৈত্তিরীয় বা আপস্তম্ব সংহিতা এবং মৈত্রায়ণী সংহিতা।

বাজসনেয়ী সংহিতা এই গ্রন্থের তথাকথিত প্রবক্তা বাজসনেয়র নামানুসারী। এই সংহিতার আবার দুটি সংস্করণ আছে—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, অবশ্য উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। বাজসনেয়ী সংহিতা মোট ৪০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, কিন্তু যতদূর মনে হয়, শেষের ২২টি অধ্যায় পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে। প্রথম দুটি অধ্যায় হচ্ছে দর্শপূর্ণমাস অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমার যজ্ঞ। তৃতীয় অধ্যায়ে গার্হস্থ্য যজ্ঞসমূহ স্থান পেয়েছে। চতুর্থ থেকে দশম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে সোমযজ্ঞ, একাদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে অসংখ্য মন্ত্র ও ক্রিয়াপদ্ধতির বর্ণনা, বিশেষ করে অগ্নিচয়ন পদ্ধতি, ঊনবিংশ থেকে একবিংশ অধ্যায়ে আছে সৌত্রামণি অনুষ্ঠানের কথা, দ্বাবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আছে

১। সামবেদের কৌথুম সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছিলেন বেনফি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী সামবেদের এই শাখার আরও একবার সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ করেছিলেন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাণায়নীয় শাখার সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন J. Stevenson ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। জৈমিনীয় সংহিতার সম্পাদনা: W. Caland ১৯০৭।

অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা। মূল সংহিতা এখানেই শেষ হচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিকে বলা হয় খিল বা পরিশিষ্ট।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারটি শাখার মধ্যে কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতার যৎসামান্য অংশই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বাকি তিনটির বিষয়বস্তু বাজসনেয়ী সংহিতার অনুরূপ তবে এখানে আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা আছে যা পূর্বোক্ত সংহিতায় অনুপস্থিত। এই কারণেই পণ্ডিতেরা বলেন যে কৃষ্ণ যজুর্বেদ অধিকতর প্রাচীন, এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদের বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনানুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে শুক্ল যজুর্বেদ বা বাজসনেয়ী সংহিতা রচিত হয়েছিল।

যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ স্থানবিশেষে শ্লোকে ও স্থানবিশেষে গদ্যে রচিত হয়েছে। যজুর্বেদ মূলত ব্রাহ্মণদের গাইড বুক, বক্তব্যে ঋগ্বেদের সারল্য একেবারেই অনুপস্থিত। আগাগোড়া রহস্যময়তা ও দুর্বোধ্যতায় ভরা এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে একেবারেই দুষ্পাঠ্য, বক্তব্যসমূহের সামঞ্জস্যবিধান করাও একেবারে অসম্ভব, একমাত্র কষ্টকল্পনার আশ্রয় ছাড়া। যজুর্বেদের দেবতাদের মধ্যে অগ্নির প্রাধান্যই বেশি কেন না আদিতে অগ্নি দেবগণের পুরোহিতই ছিলেন।

তবুও মনে হয়, শুধুই পুরোহিতদের উপযোগী গ্রন্থ বলে ঘোষণা করে যজুর্বেদের প্রতি কিছুটা অবিচার করা হয়েছে। ধর্মের ইতিহাসে প্রার্থনা, মন্ত্রপাঠ ও আচার-অনুষ্ঠানের তথা যাগযজ্ঞাদির উৎস যারা অন্বেষণ করতে চান, তাঁদের কাছে যজুর্বেদ অবশ্যই আকর্ষণীয় হবে। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলতে হবে যে যজুর্বেদের সাহিত্যমূল্য যৎসামান্য।[১]

৭ ॥ ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহ

চলতি ধারণা অনুযায়ী ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে বেদের ব্যাখ্যা বলা হয়। এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলি সম্পর্কে মক্ষমূলর বলেন, "ভারতীয় সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে এই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির যতই আকর্ষণ থাকুক না কেন, সাধারণ পাঠকের কাছে

১। মহীধরের টীকা সহ বাজসনেয়ী সংহিতা এবং মাধবের টীকা সহ তৈত্তিরীয় সংহিতার সম্পাদনা করেছেন বেবর (Weber); মৈত্রায়ণী সংহিতা ও কাঠক-সংহিতার সম্পাদনা করেছেন Von Schroeder; কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতার সম্পাদনা করেছেন রঘুবীর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরাজী অনুবাদ: বাজসনেয়ী সংহিতা R. T. H. Griffith, ১৮৯৯; তৈত্তিরীয় সংহিতা A. B. Keith ১৯১৪।

এগুলির আকর্ষণ যৎসামান্ত। ভারতীয় মনের ইতিহাসে এই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি কোন্ স্থান পূর্ণ করে সেটা আগে থেকে জেনে না নিয়ে কেউ যদি এগুলি পড়ার চেষ্টা করে তাহলে সে বিরক্ত না হয়ে দশ পাতার বেশী পড়তে পারবে না।"

আসলে কিন্তু সামবেদ যেমন উদ্গাতা নামক পুরোহিতদের আশ্রয়স্থল, যজুর্বেদ যেমন অধ্বর্যুদের, তেমনি হোতাদের জন্য এই ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ। এক একটি বেদের সঙ্গে কয়েকটি করে ব্রাহ্মণগ্রন্থ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় এবং কৌষীতকি; সামবেদের তিনটি, পঞ্চবিংশ, ষড়্বিংশ এবং জৈমিনীয়; অথর্ববেদের একটি, গোপথ এবং যজুর্বেদের তিনটি কঠ, তৈত্তিরীয় এবং শতপথ। এগুলি ছাড়াও ব্রাহ্মণ হিসাবে আরও দু'একটি গ্রন্থ আছে যেগুলি পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় এবং কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতিটি অধ্যায় আটটি করে পঞ্চকে বিভক্ত। সম্ভবত মহিদাস ঐতরেয় এই গ্রন্থের সংকলক। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সোমযাগ, অগ্নিহোত্র এবং রাজসূয় যজ্ঞ। এই গ্রন্থের শেষ দশটি অধ্যায় সম্ভবত পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে। কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, বিষয়বস্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুরূপ, প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে আছে সাধারণ গার্হস্থ্য যাগযজ্ঞ, বিশেষ করে অগ্নিযজ্ঞ, এবং সপ্তম থেকে ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে সোমযাগের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে।

সামবেদকে কেন্দ্র করে যে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের কথা। এই গ্রন্থটির অপর নাম তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, এবং এটি একটি অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ যেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন কথা ও কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের কথা আছে। সামবেদের আর একটি ব্রাহ্মণের নাম হচ্ছে ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ, এটি পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট। সামবেদের তৃতীয় ব্রাহ্মণটির নাম হচ্ছে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ দুটি থেকে আরও অনেক বেশী পুরাতন, এবং যা ধর্ম ও কথাকাহিনীর ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থের অতি সামান্ত অংশই মাত্র পাওয়া গেছে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হচ্ছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ যা পূর্বকথিত তৈত্তিরীয় সংহিতার অনুস্মৃতি। এতে পুরুষমেধ যজ্ঞ (যেখানে নরবলি দেওয়া হয়)

সম্পর্কে বিশেষ তথ্য দেওয়া আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের আর একটি ব্রাহ্মণের নাম হল কঠ ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদের একটি মাত্রই ব্রাহ্মণ আছে যার নাম শতপথ ব্রাহ্মণ যা এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। এই গ্রন্থটিরও দুটি শাখা আছে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। সমগ্র গ্রন্থটি চোদ্দটি খণ্ডে বিভক্ত। অথর্ববেদের সঙ্গে সংযুক্ত ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিকে সংহিতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলেও, দুই শ্রেণীর গ্রন্থের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক্। আসলে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণদের নানাপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিষয়বস্তুই একই রকম। প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি বহুলাংশে পরবর্তী সংহিতাগুলির কোন কোন অংশের সমকালীন, রচনাকাল আনুমানিক ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে যে ধর্মব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে তার সঙ্গে ঋগ্বেদের ধর্মের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্যই এখানে পাকাপাকি স্থানলাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা যায়: "দু'রকমের দেবতা আছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ মনুষ্যরূপী দেবতা। দেবতারা লাভ করেন যজ্ঞের ভাগ, এবং ব্রাহ্মণ দক্ষিণা। এই দু'তরফকে সন্তুষ্ট না করলে বিপর্যয় অনিবার্য।" ব্রাহ্মণদের সম্পত্তিতে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না, ব্রাহ্মণের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা তার নেই।

ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত, বিধি ও অর্থবাদ। প্রথমটি হচ্ছে নির্দেশ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যাখ্যা। নির্দেশগুলি বহুক্ষেত্রেই অর্থহীন, পরস্পরবিরোধী। এককথায়, ব্রাহ্মণসাহিত্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই, গ্রন্থকর্তাদের একমাত্র আদর্শ ছিল যজমান, এবং অবশ্যই পুরোহিতদের, ঐহিক সুখসমৃদ্ধি লাভ করা। তবে ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে ইতিহাস, আখ্যান ও পুরাণেরও কিছু কিছু স্থান আছে। এদিক থেকে ওল্ড টেস্টামেন্টের তালমুদ ও মিদ্রাসের সঙ্গে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির কিছু কিছু চরিত্রগত মিলও আছে। ঋগ্বেদ-কথিত উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণে স্থান পেয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বিখ্যাত শুনঃশেপের কাহিনী। এ ছাড়া সৃষ্টিরহস্য নিয়েও অনেক কাহিনী ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।[১]

[১] সম্পাদনা: ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (অফ্রেক্ট, ১৮৭৯; আগাসে, ১৮৯৬), শতপথ ব্রাহ্মণ (ভেবর, ১৮৮৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১৮৫৫-৭০), গোপথ ব্রাহ্মণ (মিত্র

৮ ॥ আরণ্যক ও উপনিষদ

অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আরণ্যকসমূহ কোন না কোন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থসমূহ কোন না কোন সংহিতার সঙ্গে সংযুক্ত। উপনিষদগুলি আবার একই ভাবে কোন না কোন আরণ্যকের সঙ্গে সংযুক্ত।

অর্থাৎ গুছিয়ে বলতে গেলে ঋগ্বেদের দুটি ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, দুটি আরণ্যক—ঐতরেয় ও কৌষীতকি আরণ্যক; এবং দুটি উপনিষদ—ঐতরেয় ও কৌষীতকি উপনিষদ। অনুরূপভাবে সামবেদের তিনটি ব্রাহ্মণ—পঞ্চবিংশ, ষড়্বিংশ ও জৈমিনীয়; তিনটি আরণ্যক—আরণ্যক সংহিতা, আরণ্যক গান এবং জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ; এবং দুটি উপনিষদ—ছান্দোগ্য এবং কেন। যজুর্বেদের মোট তিনটি ব্রাহ্মণ, কঠ, তৈত্তিরীয় ও শতপথ; তিনটি আরণ্যক কঠ—তৈত্তিরীয় ও শতপথ, এবং ছয়টি উপনিষদ—কঠ, তৈত্তিরীয়, মৈত্রী বা মৈত্রায়ণীয়, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক এবং ঈশা। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ একটিই, গোপথ ব্রাহ্মণ; এই বেদের কোন আরণ্যক নেই, তবে উপনিষদ আছে তিনটি—মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং প্রশ্ন

কিন্তু কাগজে কলমে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির সঙ্গে যুক্ত হলেও আরণ্যক ও উপনিষদসমূহের চরিত্র পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির চেয়ে পৃথক। আরণ্যক শব্দটিই সূচিত করে যে এই জাতীয় গ্রন্থগুলি অরণ্যে রচিত হয়েছে। সে যুগে রাজা রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে রীতি ছিল প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করার। মূলত ক্ষত্রিয় শ্রেণী অর্থাৎ রাজপুরুষ বা শাসকশ্রেণীর মধ্যেই বানপ্রস্থের রীতি ছিল।

যাই হোক, সমাজ-জীবনের বাইরে অরণ্যবাসের ফলে এই বানপ্রস্থী রাজা বা রাজপুরুষেরা কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পেরেছিলেন। তাঁরা

ও বিদ্যাভূষণ, ১৮৭১), কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (কাওয়েল, ১৮৬১), দৈবত ব্রাহ্মণ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ১৮৮১), ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ১৮৮১, এলসিং, ১৯০৮; সামবিধান ব্রাহ্মণ, সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ, আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (বার্নেল ১৮৭৩ ১৮৭, ১৮৭৬), বংশ ব্রাহ্মণ (বার্নেল, ১৮৭৩), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (বেদান্তবাগীশ, ১৮৬৯-৭৪); অনুবাদ: ঐতরেয় ও কৌষীতকি (কীথ, *Harvard Oriental Series*, ২৫ সংখ্যক গ্রন্থ), ঐতরেয় (মার্টিন হগ, বঙ্গানুবাদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী), শতপথ (এগেলিং, *Sacred Books of the East*, ১২, ২৬, ৪১, ৪৩, ৪৪ সংখ্যকগ্রন্থ)।

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছিলেন এই যে তাঁরা যে আজীবন ব্রাহ্মণদের মন্ত্রণায় যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ করে এসেছেন তার কোন সার্থকতা আদৌ আছে কিনা। এই প্রশ্ন আরণ্যকেই প্রতিফলিত হয়েছিল কিন্তু উপনিষদসমূহে তা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য আরণ্যক ও উপনিষদে যে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের কথা নেই তা নয়, বরং প্রচুরই আছে। ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত সম্প্রদায় রচিত এই সমস্ত অংশগুলি আরণ্যক ও উপনিষদসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে, বিশেষ করে উপনিষদের ক্ষেত্রে, আমরা পরিষ্কার একটি ক্ষত্রিয়-ট্রাডিশান দেখতে পাই যা চেপে রাখার কোন উপায় নেই।

উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্পূর্ণভাবেই যে ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি এই বিষয়ে পণ্ডিত-বর্গ একমত। এই ব্রহ্মতত্ত্ব যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য থেকে শুধু যে পৃথক তাই নয়, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের বিরোধীও বটে। ইউরোপে এবং অন্যত্র ইতিহাসের কোন না কোন যুগে রাষ্ট্র ও গীর্জা, স্টেট ও চার্চের সংঘাত বেঁধেছিল এবং পরিণামে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রই জয়ী হয়েছে। এখানেও সেই একই স্টেট ও চার্চ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণশক্তির সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষে স্টেট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়শক্তিই জয়ী হয়েছে। বৈদিক ধর্মকে অস্বীকার করে পরবর্তী কালে যে একেশ্বরবাদী ভাগবত ধর্ম এবং নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গড়ে ওঠে, সেগুলির প্রবক্তা যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। উত্তরকালে এই সংঘাতে যে ক্ষত্রিয় শক্তি জয়ী হয়েছিল তার প্রমাণ পরবর্তীকালে ওই তিনটি ধর্মের সার্বিক বিজয়লাভ ও বৈদিক ধর্মের ক্রমিক অবলুপ্তি। গৌতমবুদ্ধ জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করেন নি, শুধু ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণদের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। বস্তুত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও অনাচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সে প্রতিবাদের আসল বীজ কিন্তু উপনিষদেই পাওয়া যাবে।

উপ-নি-সদ কথাটির অর্থ 'কারো নিকটে বসা'। অর্থাৎ গুরুর নিকট বসে লব্ধ যে জ্ঞান তা উপনিষদ শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, কয়েকটি উপনিষদগ্রন্থ ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের ধারানুসারী। এইগুলি হচ্ছে ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, কৌষীতকি, মহানারায়ণ, বৃহদারণ্যক এবং কেন। এইগুলির মধ্যে এক মহানারায়ণ ছাড়া বাকি সবগুলিই ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির কিছুটা সমকালীন এবং নিঃসন্দেহে গৌতমবুদ্ধ ও পাণিনির পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় স্তরের উপনিষদগুলি যে পরবর্তী যুগের তা ভাষাগত বিচারে সহজেই বোঝা গেছে। এগুলি হচ্ছে কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, ঈশা, মুণ্ডক ও প্রশ্ন। এগুলি বুদ্ধপরবর্তী যুগের, এবং পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তাধারা যেমন সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি এগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। অবশিষ্ট আর দুটি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ হচ্ছে মৈত্রায়ণীয় এবং মাণ্ডুক্য। এরপর যেগুলি বাকি রইল, তা নেহাত কম নয়, কেন না উপনিষদের সংখ্যা ১০৮টি, সেগুলিকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। কেন না সর্বশেষ উপনিষদ রচিত হয়েছিল সম্রাট আকবরের সময় তবুও এই ১০৮টির মধ্যে যেগুলির উল্লেখ একান্ত না করলে অবিচার ক... সেগুলি হচ্ছে জাবাল, পরমহংস, সুবাল, গর্ভ, অথর্বশিরঃ, বজ্রসূচিকা ইত্যাদি।

উপনিষদের আসল বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহলের অন্ত নেই। বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী রাজা ও ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের মনে এই চিন্তা জেগেছিল, যে, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, পুরোহিত ও দেবদেবীদের সার্থকতা কি এবং কোথায়। তারই উত্তর খুঁজতে গিয়ে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ, এবং সেই হিসাবে জগতের প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুই সেই এক অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী পরমব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। ব্যক্তি-আত্মা ও বিশ্ব-আত্মা, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম, এক ও অভিন্ন। শাণ্ডিল্যের ভাষায়, হৃদয় পদ্ম মধ্যস্থিত আমার এই আত্মাই, যা একদিকে একটি ধান্য বা সর্ষপের চেয়েও ক্ষুদ্র এবং অপরদিকে আকাশ ও সর্বচরাচরের চেয়েও বৃহৎ, এই আত্মাই ব্রহ্ম। উপনিষদে এই ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে নেতিমূলক ভঙ্গিতে। এই উপনিষদ-কথিত ব্রহ্মবিদ্যাই পরবর্তী কালে দার্শনিক অদ্বৈতবাদের জন্মদান করেছিল। অদ্বৈতবাদের বহু ধারা, সবগুলিই নিজ বক্তব্য প্রতিপাদন করার জন্য উপনিষদকেই আশ্রয় করেছিল।

কিন্তু ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্ব-প্রতিপাদনই উপনিষদের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়, ভিন্নতর দার্শনিক আদর্শের পরিচয়ও উপনিষদে পাওয়া যায়। দেবদেবীও যে উপনিষদে নেই তা নয়, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, অগ্নি আছেন, সর্বোপরি আছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, যাঁর কাছে দেবতারা আসেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়ে। যাগযজ্ঞের কথাও মোটেই অনুপস্থিত নয়। পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলবাদও উপনিষদে খুব ভালভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলির সঙ্গে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার

সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টাও বড় কম হয় নি, সেযুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত। সহজ বুদ্ধিতে বিচার করলে, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব স্বীকার করলে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, যাগযজ্ঞ, জন্মান্তর কর্মফল সব কিছুই শেষ পর্যন্ত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এখানেই বোঝা যাবে উপনিষদ ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত বৈদিক সমাজের কোন জায়গায় আঘাত দিয়েছিল। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে উপনিষদের প্রভাব কতদূর তা বর্তমান রচনায় "দার্শনিক সাহিত্য" পর্যায়ে কিছুটা বিশদভাবে আলোচিত হবে।[১]

৯॥ সূত্রসাহিত্য

বৈদিক যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে সূত্রসাহিত্য নামে এক প্রকার সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল বিশেষ করে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষের জন্য. মূল বিষয়গুলিকে যেখানে সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে পরিবেশন করা হয়েছে। এইগুলিকে এইজন্য বেদাঙ্গও বলা হয়, কেন না এগুলি বেদ পদবাচ্য নয়, বেদপাঠের সোপান। বিষয়বস্তু হিসাবে এই সূত্রসাহিত্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত : শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

শিক্ষা : এই পর্যায়ের গ্রন্থগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ধ্বনিবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান, যাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে ছাত্র বৈদিক গ্রন্থসমূহ পড়তে পারে। তা ছাড়াও এগুলিতে আচার-অনুষ্ঠান যাগযজ্ঞ ইত্যাদিরও কথা আছে। এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'প্রাতিশাখ্য' এই শিরোনামায় রচিত গ্রন্থগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। শৌনক-রচিত ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য ও কাত্যায়ন রচিত বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য সূত্র ছাড়াও আমরা তৈত্তিরীয় ও অথর্ববেদ

১। ঐতরেয় আরণ্যকের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন কীথ (১৯০৯), শাংখ্যায়ন আরণ্যকের সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে ফ্রিডল্যাণ্ডার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), কাওয়েল (তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ খণ্ড) এবং কীথ (সপ্তম থেকে পঞ্চদশ খণ্ড), এবং সামগ্রিক অনুবাদ করেছিলেন কীথ (১৯০৮)। উপনিষদসমূহের ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদ বহুজনকৃত ও সহজলভ্য। প্রামাণ্য ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে হিউম অনুদিত *Thirteen Principal Upanisads* (১৯২১)। অপ্রধান উপনিষদগুলিও সামগ্রিকভাবে ও পৃথক্‌ভাবে ইংরাজী ও বাংলায় অনুদিত হয়েছে।

প্রাতিশাখ্য সূত্রের উল্লেখ পাই। সামবেদের ছাত্রদের জন্ম দু'টি বিশেষ ধরনের প্রাতিশাখ্য রচিত হয়েছিল, পুষ্পসূত্র ও পঞ্চবিধ সূত্র। ধ্বনিতত্ত্বের উপর পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যেগুলির লেখক হিসাবে আমরা ভরদ্বাজ, ব্যাস, বশিষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্যের নাম পাই। ব্যাসশিক্ষা এইজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে একটি। আরও একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় যার নাম পাণিনীয় শিক্ষা। বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে প্রাচীন হলেও রচনাকালের দিক্ থেকে এটি অনেক পরবর্তী কালের। শিক্ষা সিরিজের সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অনুক্রমণী বা তালিকা সাহিত্য, যাকে ইংরাজীতে বলে ক্যাটালগ। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঋগ্বেদ-সর্বানুক্রমণী। এতে ঋগ্বেদের প্রতি সূক্তের রচকের নাম, যে দেবতার উদ্দেশ্যে সূক্তটি রচিত তার নাম, সূক্তটির ছন্দ ও প্রথম লাইনটি দেওয়া হয়েছে। শৌনক-রচিত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ঋগ্বেদ-বর্ণিত দেবগণের কথা ও কাহিনী বলা হয়েছে। এটি বর্ণনামূলক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে এবং সেই হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ। অনুরূপ আরও একটি গ্রন্থের নাম ঋগ্বিধান। এটিও শৌনকের নামে প্রচলিত।

কল্প: এই শ্রেণীর রচনাগুলি সূত্রসাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এইগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে আচার-অনুষ্ঠান যা পূর্ববর্তী যুগের ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মোটামুটি তিনটি ভাগে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে ভাগ করা যায়—গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শ্রৌতসূত্র।

গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে ধর্মসূত্রের পার্থক্য অতি সামান্যই, দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই অনুসারী, তফাৎ হচ্ছে এইটুকু যে, গৃহ্যসূত্রে যেখানে পারিবারিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, ধর্মসূত্রে তার এলাকা কিছুটা বর্ধিত হয়েছে মাত্র। প্রধান প্রধান গৃহ্যসূত্রগুলির নাম হচ্ছে শাংখ্যায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর, খাদির, গোভিল, হিরণ্যকেশী, আপস্তম্ব, ইত্যাদি এবং প্রধান প্রধান ধর্মসূত্রের নাম হচ্ছে আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ, বৌধায়ন প্রভৃতি। এগুলির নামকরণ হয়েছে রচয়িতাদের নামেই।

গৃহ্যসূত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে পারিবারিক জীবনের আচার-অনুষ্ঠানসমূহের টেকনিকাল দিকগুলি। বিবাহ থেকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আরম্ভ। বিবাহিত মানুষের প্রধান কর্তব্য দৈনিক পঞ্চ-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান; দেবতা, অপদেবতা, পিতৃগণ, মানুষ ও ব্রাহ্মণের জন্ম। বিবাহের পর চতুর্থীকর্ম, গর্ভাধান,

সীমন্তোন্নয়ন ; সন্তান জন্মালে জাতকর্ম, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ; মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ, প্রতি বছরে। অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত অনুষ্ঠানের বিরাম নেই। আর সেগুলিই গৃহ্যসূত্রসমূহে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মসূত্রসমূহে এরও উপর বর্ণাশ্রমধর্ম বিশেষ করে বর্ণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং বিশেষ করে নারীদের কর্তব্যসমূহ যে কি সে কথাও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রৌতসূত্রসমূহের বিষয়বস্তু হচ্ছে যাগযজ্ঞ, এবং সেই হিসাবে চরিত্রের দিক থেকে এগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহেরই অনুরূপ। এতে বিশেষ করে তিন প্রকারের যজ্ঞাগ্নি রক্ষা, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার যজ্ঞসমূহ, পশুবলি ও বিভিন্ন ধরনের সোমযাগের কথা বলা হয়েছে। প্রধান প্রধান শ্রৌতসূত্রসমূহের নাম হচ্ছে আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, বৌধায়ন, কাত্যায়ন, শাংখ্যায়ন, লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ন ইত্যাদি। তিন প্রকার সূত্রগ্রন্থেরই রচনাকাল ৮০০ থেকে ২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে।

আরও এক শ্রেণীর সূত্রগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলিকে বলা হয় শুল্বসূত্র। এতে যজ্ঞবেদী নির্মাণের মাপজোক দেওয়া আছে, সেই হিসাবে জ্যামিতিশাস্ত্রের আদি উৎস এখানেই অনুসন্ধান করা চলে। উপরি উল্লিখিত চার শ্রেণীর সূত্রগ্রন্থকে পরবর্তী কালে বিভিন্ন সংহিতার এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন সংহিতা শিক্ষাদান করার জন্য বিভিন্ন বিদ্যায়তন ছিল। যেমন ধরা যাক, যে ছাত্র কৃষ্ণযজুর্বেদ গ্রুপে শিক্ষালাভ করবে তাকে ওই বেদেরই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং ওই বেদেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৌধায়ন বা আপস্তম্বের ধর্ম, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রসমূহ পড়তে হবে।

এই সব সূত্রগ্রন্থের অনেক টীকা-টিপ্পনী বা নোট-বই পরবর্তী কালে রচিত হয়েছিল, যেমন শ্রাদ্ধকল্প ও পিতৃমেধসূত্র। শ্রাদ্ধকল্পসমূহের রচনাকার হিসাবে মনু, শৌনক, পৈপ্পলাদ, কাত্যায়ন, গৌতম প্রমুখের নাম পাওয়া যায়, এবং পিতৃমেধসূত্রসমূহের রচয়িতা হিসাবে বৌধায়ন, হিরণ্যকেশী, গৌতম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আরও এক শ্রেণীর নোট-বই ছিল যেগুলিকে বলা হত পরিশিষ্ট। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কর্মপ্রদীপ, গৃহ্যসংগ্রহ-পরিশিষ্ট ও প্রায়শ্চিত্ত-সূত্র। প্রথম দুইটি গ্রন্থ গোভিলগৃহ্যসূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। তা ছাড়া স্থূলবুদ্ধি ছাত্রদের জন্য ছিল প্রয়োগ, পদ্ধতি ও কারিকা সিরিজ।

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ: ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমরা একটিমাত্র গ্রন্থের কথাই জানি যা হচ্ছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, যদিও এই গ্রন্থটির রচনাকাল পরবর্তী যুগে। পাণিনির ব্যাকরণের দু'টি বিশেষ দিক্ আছে, একটি হচ্ছে উণাদিসূত্রসমূহ যেগুলিতে বিশেষ্যপদসমূহ এবং সেগুলির মূল শব্দ, প্রত্যয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অপরটি হচ্ছে ফিট-সূত্রসমূহ যাতে আলোচিত হয়েছে ধ্বনিতত্ত্ব। ব্যাকরণকার পাণিনি ছিলেন বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শলাতুর গ্রামের অধিবাসী। তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ৪০০০ সূত্র ও আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাণিনির ব্যাকরণে তাঁর দু'জন পূর্বসূরীর উল্লেখ আছে যাঁরা হচ্ছেন শাকটায়ন ও শৌনক। পাণিনির তারিখ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না, তবে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। তিনি অবশ্যই যাস্কের পরবর্তী এবং পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের পূর্ববর্তী। তাঁর ব্যাকরণের ভাষা পূর্ববর্তী যুগের ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের ভাষার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু চলতি সংস্কৃতের সঙ্গে যেন অমিলটাই বেশি যা থেকে বোঝা যায় পরবর্তী কালের প্রতিনিধি-মূলক ভাষার কোন গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। পাণিনির ব্যাকরণে দক্ষিণ ভারতের কোন উল্লেখ নেই অথচ অশোকের যুগেই দক্ষিণ ভারতে রীতিমত উত্তরের নিকট পরিচিত ছিল। তা ছাড়া পাণিনি বর্ণিত সংকল নগরকে যেহেতু আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যাওয়া সঙ্গলের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়, সেই হেতু এই সিদ্ধান্তটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় যে পাণিনি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের কথা শোনেন নি। অর্থাৎ তিনি আলেকজাণ্ডারের পূর্ববর্তী ছিলেন। সব মিলিয়ে বিচার করে পাণিনিকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ফেলা যায়। গোলড্স্টুকর অন্যভাবে পাণিনির তারিখ নির্ধারণ করে তাঁকে ওই পঞ্চম শতকেই স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থেও নিজস্ব পদ্ধতিতে হিসাব করে ওই একই তারিখ বজায় রেখেছেন।

পাণিনির উত্তরাধিকারী ছিলেন কাত্যায়ন যিনি ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের লোক। পাণিনির ব্যাকরণের টীকা লিখে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি পাণিনির সূত্রগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। কাত্যায়নের পর বৈয়াকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পতঞ্জলি যিনি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম মহাভাষ্য। পাণিনি এবং কাত্যায়নের তুলনামূলক আলোচনাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

রচনাপদ্ধতির দিক থেকে এই গ্রন্থটি পরবর্তী কালের বহু লেখকেরই আদর্শ হয়েছে। এই গ্রন্থটির টীকা রচনা করেছিলেন কৈয়ট, অবশ্য অনেক পরবর্তী কালে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে।

নিরুক্ত হচ্ছে শব্দতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব যার রচয়িতা—যাস্ক। সংহিতাসমূহের যে সকল শব্দের অর্থগুলি কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল সেগুলির উপর এই গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই অপ্রচলিত শব্দসমূহের তালিকার নাম নিঘণ্টু এবং এইগুলির ব্যাখ্যাই হচ্ছে যাস্কের কৃতিত্ব। যাস্কের রচনাতে তাঁর পূর্বসূরীদের কথা বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের রচিত কোন গ্রন্থ আমরা পাইনি। জ্যোতিষ অন্যতম বেদাঙ্গ হলেও এই বিষয়ে কোন প্রাচীন রচনার নিদর্শন নেই। জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ নামক যে গ্রন্থটির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে সচরাচর করা হয় তা নিতান্তই অর্বাচীন।

ছন্দ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন প্রাচীন গ্রন্থ নেই; বৈদিক যুগে এই বিষয়ে বোধ হয় কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি, যা হয়েছে তা অনেক পরবর্তী কালের। পিঙ্গল-রচিত ছন্দঃসূত্র-ই ছন্দের উপর রচিত আদি গ্রন্থ। প্রচলিত ছাব্বিশ রকম ছন্দের তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। পিঙ্গলের তারিখ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি মহাকাব্যের অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ বা উপজাতি ছন্দের বিকাশের পরবর্তী। পক্ষান্তরে তিনি আবার শবরস্বামীর মীমাংসাসূত্রের ভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছেন। এই সব বিবেচনা করে পণ্ডিতগণ তাঁকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে স্থান দিয়েছেন। পিঙ্গলের গ্রন্থে রাত, মাণ্ডব্য, কাশ্যপ প্রভৃতি ছন্দঃকারের উল্লেখ আছে, যদিও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক) দুটি অধ্যায়ে ছন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে। পিঙ্গলের সঙ্গে ভরতের বহুক্ষেত্রেই মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আরও উল্লেখযোগ্য যে ভরত প্রতিটি ছন্দের উদাহরণ দিয়েছেন যা পিঙ্গল দেননি। এরপর ছন্দের উপর যে লেখকের নাম করতে হয় তিনি জয়দেব। ইনি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম জয়দেব ছন্দঃ। গ্রন্থ রচনায় তিনি পিঙ্গলকেই অনুসরণ করেছিলেন। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে তিনি বৈদিক ছন্দসমূহের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে মাত্রাবৃত্ত, পঞ্চম অধ্যায়ে বিষম ও অর্ধসম বর্ণবৃত্ত, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে সমবর্ণবৃত্ত, এবং অষ্টম অধ্যায়ে পিঙ্গলবর্ণিত ছয়টি প্রত্যয়ের

উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। জয়দেবের এই গ্রন্থের টীকা করেছিলেন হর্ষট।[১]

১০॥ দার্শনিক সাহিত্য

আরণ্যক ও উপনিষদগুলিতে যাগযজ্ঞ বা ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্বেরও বিকাশ দেখা যায় যা অবলম্বনে পরবর্তী কালে উত্তর মীমাংসা দর্শন গড়ে ওঠে। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে দর্শনশাস্ত্রের ছয়টি ধারার বিকাশলাভ ঘটেছিল, যেগুলির নাম যথাক্রমে, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা। দার্শনিক তত্ত্বের গভীরে না গিয়ে দার্শনিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা এখানে পেশ করব।

সাংখ্যদর্শন প্রাক্-বৈদিক যুগের সৃষ্টি, তবে প্রাচীনতম সাংখ্যগ্রন্থের কোন চিহ্ন বর্তমানে নেই। শুধুই যে মহাভারত, চরক সংহিতা, মনুস্মৃতি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সাংখ্যদর্শনের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায় তাই নয়, মহাভারতে সাংখ্যকে বেদের মতই সনাতন বলা হয়েছে। সাংখ্যের প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্তু এই দর্শনের কোন মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। ম্যাকসমূলার তত্ত্বসমাস নামক ২২টি শ্লোকের একটি সংকলনকে সাংখ্যের আদি গ্রন্থ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই দাবি সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ ছাড়া সাংখ্যদর্শনের গ্রন্থ বলতে ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত সাংখ্যকারিকা এবং কপিলের নামে প্রচলিত সাংখ্যসূত্র। প্রথম গ্রন্থটি মোট ৭০টি শ্লোকের সমষ্টি, রচনাকাল, দাশগুপ্তের মতে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী এবং গার্বে ইত্যাদির মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

১। প্রধান প্রধান গৃহ্যসূত্রগুলির অনুবাদ করেছেন ওলডেনবার্গ এবং ধর্মসূত্রগুলির অনুবাদ করেছেন বুলার যা পাওয়া যাবে Sacred Books of the East-এর দ্বিতীয়, চতুর্দশ, উনত্রিংশ ও ত্রিংশত্তম খণ্ডে। সম্পাদনা: (১) শ্রৌতসূত্র—আপস্তম্ব (গার্বে ১৮৮২-১৯০২), বৌধায়ন (ক্যালাণ্ড ১৯০৪-২১), কাত্যায়ন (বিদ্যাধর শর্মা ১৯৩৩-৩৭), শাংখ্যায়ন (হিলেব্রাণ্ট ১৮৮৬-৮৯); (২) গৃহ্যসূত্র—আশ্বলায়ন (স্টেনজলার ১৮৬৪), বৌধায়ন (শ্যামশাস্ত্রী. ১৯২০), খদির (মহাদেব শাস্ত্রী ও শ্রীনিবাসাচার্য ১৯১৩), পারস্কর (গোপাল শাস্ত্রী নেনে, ১৯২৬); (৩) ধর্মসূত্র—আপস্তম্ব (বুলার ১৮৯২), বৌধায়ন (হুলৎস ১৮৮৪), বসিষ্ঠ (ফুয়ার ১৯১৬) ইত্যাদি। দুর্গাচার্যের টীকা সহ যাস্কের নিরুক্তের সম্পাদনা করেছেন রাজবাড়ে (১৯২১-২৬), অনুবাদ করেছেন সরূপ।

সাংখ্যসূত্রের কলেবর অবশ্য কারিকার চেয়ে বৃহৎ, সূত্রের সংখ্যা ৪৫৮, কিন্তু রচনাকালের দিক থেকে গ্রন্থটি একেবারেই অর্বাচীন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক। বিষয়বস্তুর বিচারেও গ্রন্থটি বিশুদ্ধ সাংখ্য মতাশ্রয়ী নয়, বেদান্তের ভেজাল এখানে প্রচুর।[১]

দার্শনিক সম্প্রদায় হিসাবে প্রসিদ্ধ হলেও যোগের প্রধানতম আলোচ্য বিষয় দার্শনিক তত্ত্ব নয়। যোগের মূল উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ। প্রতিষ্ঠাতা পতঞ্জলির নামে যোগ পাতঞ্জল দর্শন নামেও কথিত হয়। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং যোগসূত্রকার পতঞ্জলি অভিন্ন কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধ আছে। দাশগুপ্তের মতে যোগসূত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক, পক্ষান্তরে জ্যাকোবির মতে তা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক। যোগসূত্র চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। যোগসূত্রের উপর প্রধান ভাষ্য রচনা করেছেন ব্যাস (খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ) এবং ভোজ রাজা (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ)। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাস ভাষ্যের টীকা করেছেন। এছাড়া যোগ সম্প্রদায়ের অন্যান্য গ্রন্থও আছে। কিন্তু তাহলেও যোগ সম্প্রদায়ের মোট সাহিত্য সুবিশাল নয়।[২]

বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক ছিলেন কণাদ, যাঁর রচিত সূত্রাবলী বৈশেষিক সূত্র নামে পরিচিত। গার্বে অনুমান করেছেন যে খ্রীষ্টীয় ১০০-৪০০ অব্দের মধ্যে বৈশেষিকসূত্র রচিত হয়েছিল, কিন্তু দাশগুপ্ত বৈশেষিক সূত্রকে আরও প্রাচীন যুগের রচনা বলে মনে করেন। এই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব গ্রন্থাবলী খুব বেশী নয়। কথিত আছে, লংকেশ্বর রাবণ এই দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকার। বেদান্তদর্শনে বৈশেষিক মত খণ্ডন প্রসঙ্গে শংকরাচার্য রাবণ-ভাষ্যের মত খণ্ডন করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে প্রশস্তপাদাচার্যের পদার্থধর্মসংগ্রহ বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য। কিন্তু একথা ঠিক নয়, যদিও বৈশেষিক দর্শনের বক্তব্যসমূহ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

১। ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদ সহ সাংখ্যকারিকার সম্পাদনা করেছিলেন কোলব্রুক। বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যসহ সাংখ্যসূত্রের অনুবাদ করেছিলেন ব্যালান্টাইন (১৮৬২-৬৫) এবং অনিরুদ্ধের ভাষ্যসহ গার্বে (১৮৮৮ ৯২)। এই প্রসঙ্গে দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের সাংখ্যসূত্রের বঙ্গানুবাদের কথাও উল্লেখযোগ্য।

২। ব্যাসের ভাষ্য ও বাচস্পতি মিশ্রের টিপ্পনী সহ যোগসূত্রের সম্পাদনা করেছেন বোড়াস (১৮৯২); ইংরাজী অনুবাদ করেছেন রামপ্রসাদ (১৯১০) এবং উডস (১৯১৪, **Harvard Oriental Series**)।

উদয়নাচার্যের কিরণাবলী এবং শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী পদার্থ-ধর্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টীকা। পরবর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্যে বল্লভাচার্যের ন্যায়লীলাবতী, বর্ধমানোপাধ্যায়ের কিরণাবলী-প্রকাশ ও লীলাবতী-প্রকাশ, শংকরমিশ্রকৃত বৈশেষিকসূত্রোপস্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ন্যায় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, এবং দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় অভিন্ন। এই কারণেই অধুনা ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় হিসাবে দুটি ধারাকেই একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়।[১]

ন্যায় দর্শনের প্রবক্তার নাম গোতম বা গৌতম, অক্ষপাদ নামেও যিনি প্রসিদ্ধ। গৌতম বিরচিত ন্যায়সূত্রের তারিখ নিয়েও এ পর্যন্ত কোন সুমীমাংসায় আসা যায়নি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ন্যায়সূত্রগুলি রচিত হয়েছিল, যদিও এ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কিছুই বলার উপায় নেই। ন্যায় সম্প্রদায়ের সাহিত্য সুবিশাল, ন্যায়ের ইতিহাসের আবার দুটি ভাগ বিদ্যমান, প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। গৌতমের ন্যায়সূত্রের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ভাষ্য হচ্ছে বাৎস্যায়নের (৪০০ খ্রীষ্টাব্দ)। এ ছাড়া উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্তিক (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী), বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী), উদয়নাচার্যের ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি এবং ন্যায়কুসুমাঞ্জলি (খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী), জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরী (খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী) প্রভৃতি রচনাগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নব্য ন্যায়ের শুরু বাংলাদেশে, গঙ্গেশ রচিত তত্ত্বচিন্তামণি (১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে। নব্য ন্যায়ের সাহিত্যও বড় কম নয়, এবং এই বিষয়ে বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম (১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ), রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[২]

পূর্ব মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তার নাম জৈমিনি। এই দর্শনকে মীমাংসা দর্শন

১। উপস্কার ভাষ্যসহ কণাদের বৈশেষিকসূত্র প্রকাশিত হয়েছে Bibliotheca Indica সিরিজে (১৮৬০-৬১)। ইংরাজী অনুবাদ করেছেন গাফ (A. E. Gough)।

২। বাৎস্যায়ন ভাষ্য সহ গৌতমের ন্যায়সূত্র প্রকাশিত হয়েছে Bibliotheca Indica সিরিজে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারও আগে ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ব্যালান্টাইন। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ রচিত ন্যায় দর্শনে মূল সূত্রসমূহ, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, সেগুলির অনুবাদ এবং লেখকের নিজস্ব ব্যাখ্যাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি পাঁচ খণ্ডে শ্রীতর্কবাগীশের গ্রন্থটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।

বা জৈমিনি-দর্শন বলারও প্রথা আছে। মীমাংসা দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম মীমাংসা সূত্র যা জৈমিনির রচনা হিসাবেই কথিত। জৈমিনির কাল নিয়েও পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংশয় আছে, কেউ কেউ তাঁকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মানুষ বলে মনে করেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। জৈমিনী-সূত্রের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ভাষ্যকারের নাম শবর এবং সেই হিসাবে তাঁর রচনাটিও শবর-ভাষ্য নামে কথিত। শবর-ভাষ্যেরও তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। জৈমিনী ও শবরের পর মীমাংসা সম্প্রদায়ের প্রধান দার্শনিক বলতে দুজনকে বোঝায়, কুমারিল ও তাঁর শিষ্য প্রভাকর। কুমারিল ভট্ট শংকরের সমসাময়িক ছিলেন, এবং কথিত আছে যে শংকরের নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শংকর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মানুষ ছিলেন, সেই হিসাবে কুমারিল ও প্রভাকরও ওই একই যুগের লোক। মীমাংসা দর্শনের উপর কুমারিলের গ্রন্থ বলতে শবর-ভাষ্যেরই ব্যাখ্যা বোঝায় যা তিন ভাগে বিভক্ত, শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক ও টুপটীকা। প্রভাকর রচিত শবর-ভাষ্যের নাম বৃহতী। পরবর্তী কালে মীমাংসা দর্শন দুটি উপবিভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কুমারিলের নামানুসারে একটিকে বলা হয় ভাট্ট-মীমাংসা, প্রভাকরের নামানুসারে অপরটিকে বলা হয় প্রাভাকর-মীমাংসা।[১]

উত্তর মীমাংসা দর্শনের অপর নাম বেদান্ত। বেদের অন্তভাগ বা উপনিষদকে আশ্রয় করেই এই দর্শন গড়ে উঠেছিল বলেই এর নাম বেদান্ত। উপনিষদ্ কথিত মূল তত্ত্বগুলিকে একটি দার্শনিক আকারে প্রথম উপস্থাপিত করেন বাদরায়ণ তাঁর বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে। বাদরায়ণ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য নেই। তাঁর রচিত ব্রহ্মসূত্রেরও রচনাকাল অনিশ্চিত, তবে কেউ কেউ গ্রন্থটিকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের রচনা বলে মনে করেন। সকল বেদান্ত সম্প্রদায়েরই মূল দার্শনিক গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র, এবং প্রতিটি সম্প্রদায়েরই পৃথক পৃথক ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য আছে। বেদান্ত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রধান

১। শবর-ভাষ্যসহ মীমাংসা সূত্রের দুটি উল্লেখযোগ্য সংস্করণের একটি হচ্ছে Bibliotheca Indica প্রকাশিত, অপরটি আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজের (পুনা)। মীমাংসা সূত্র ও শবর-ভাষ্য উভয়েরই ইংরাজী অনুবাদ করেছেন ডঃ গঙ্গানাথ ঝা, প্রথমটির প্রকাশ এলাহাবাদ থেকে (১৯১০) এবং দ্বিতীয়টির বরোদা থেকে (১৯৩৩-৩৬)। ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক দুই খণ্ডে রচিত মীমাংসা সূত্রের বঙ্গানুবাদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মূলত দুটি, অদ্বৈতবেদান্ত এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত। অদ্বৈত-মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বস্তুত অলীক ও ভ্রান্ত যার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানতা বা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে ব্রহ্ম নির্গুণ নয়, সর্বগুণের আধার। পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বও মিথ্যা নয়। ব্রহ্মের মধ্যেই চেতন ও জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। প্রথমটি থেকে জীবাত্মার সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি থেকে জড় জগতের। ব্রহ্মের করুণাতেই জীবাত্মা তার জড়-দেহের বন্ধন কাটিয়ে মুক্তিলাভ করবে। অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক শংকর যাঁর অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা শারীরকভাষ্য ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক রামানুজ (একাদশ শতক) যাঁর রচিত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য।[১]

১১ ॥ মহাকাব্যদ্বয়

পূর্ববর্তী অংশে আমরা বৈদিক যুগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরবর্তী যুগে রচিত সাহিত্য কর্মের কোন কোন বিভাগের কিছুটা পরিচয় দিয়েছি। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কাল নির্ণয় সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই বিষয়টি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদের অন্ত নেই। এই বিষয়ে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত অভিমতটাই এখানে পেশ করছি। ঋগ্বেদের সর্বনিম্ন তারিখ ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, অপরাপর সংহিতা ও কয়েকটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বেশীর ভাগ অংশ রচনার সর্বনিম্ন তারিখ ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌গুলির সর্বনিম্ন তারিখ ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; পাণিনি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির ব্যাকরণসহ সমগ্র সূত্র সাহিত্যের তারিখ (কয়েকটি গ্রন্থ বাদ দিয়ে) ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

এবারে আমরা ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ সাহিত্যের জগতে চলে আসব। ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয় বলতে আমরা মহাভারত ও রামায়ণকে বুঝি, যদিও মহাকাব্যের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় এই দুটি গ্রন্থ পড়ে না, এমন কি যে অর্থে গ্রীক ইলিয়াড ও অডিসি-কে Epic বলা হয় সেই অর্থেও রামায়ণ ও মহাভারত তা নয়। বরং

১। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র শংকর ও রামানুজ ভাষ্যদ্বয় সহযোগে অনুবাদ করেছেন থিব (G. Thibaut) Sacred Books of the East সিরিজে। বাংলায় শংকরের শারীরকভাষ্যের ভর্জমা করেছেন কালিবর বেদান্তবাগীশ তাঁর দুই খণ্ডে রচিত বেদান্তদর্শনম্ গ্রন্থে।

রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, এ দুটি গ্রন্থ ভারতবাসীর স্বরচিত ইতিহাস। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই দুটি গ্রন্থকে, বিশেষ করে মহাভারতকে, পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনীসমূহের অনেকগুলিরই উৎস খুঁজতে হবে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে, ক্ষেত্রবিশেষে বেদেরও সীমানা পেরিয়ে প্রাক্ বৈদিক যুগে। কিভাবে একটি agricultural myth থেকে রামায়ণের কাহিনীর উদ্ভব হতে পারে সে ইঙ্গিত আমরা ভূমিকাতে দিয়েছি। সংহিতাসমূহ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও গৃহ্যসূত্রসমূহে অনেক গাথা, কথা ও কাহিনী আছে যেগুলি থেকে এই মহাকাব্য দুটিতে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীসে যেমন ছিল র‍্যাপসোডিস্ট বা চারণ কবি যারা দেবগাথা ও বীরগাথাসমূহ সর্বত্র গেয়ে বেড়িয়ে দু'পয়সা রোজগার করত এ দেশেও সেই রকম একটি পেশাদার কথক বা চারণ শ্রেণী ছিল যাদের বলা হত সূত। যুদ্ধকালে এরা রথের সারথির কাজ করত এবং যখন যুদ্ধবিগ্রহ থাকত না তখন বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী তারা শ্রোতাদের মধ্যে পরিবেশন করত। এই বলে যাবার ট্রাডিশনটি মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী ধৃতরাষ্ট্রকে শোনাচ্ছেন সঞ্জয়, এবং সমগ্র কাহিনীটিই অল্পপরিসর 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের' মধ্যেই ব্যক্ত। কিন্তু সমগ্র মহাভারতটি পাঠ করে শোনাচ্ছেন ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের রাজসভায়, আর সেই কাহিনীটিই শোনাচ্ছেন সূত উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে ঋষিদের নিকট।

মহাকাব্যদ্বয়ের, বিশেষ করে মহাভারতের, আমরা বর্তমানে যে রূপ দেখি, তা কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। প্রায় আটশো বছর ধরে মহাভারতের বিষয়বস্তু বিবর্তিত হয়েছে। অতি সুপ্রাচীনকালে, সম্ভবত ঋগ্বেদের যুগে, দুটি ট্রাইব কুরু ও পঞ্চালদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যে যুদ্ধের স্মৃতি দীর্ঘকাল ধরে জনমনে স্থায়ী হয়েছিল এবং যে যুদ্ধের কাহিনী যুগের পর যুগ ধরে চারণগণ কর্তৃক সর্বত্র গীত হয়েছিল। এও সম্ভব যে পরবর্তী কালে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে ঘটনাচক্রে কোন মাতৃতান্ত্রিক বহুপতিক (Polyandrous) সমাজভুক্ত মানুষ রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছিল, এবং তাদেরই রাজত্বকালে কোন সভাকবি সুপ্রাচীন কুরুবংশের নামের সঙ্গে এই নতুন শাসক বংশকে সংযুক্ত করে কোন একটি ক্ষুদ্রাকার কাব্য রচনা করেছিলেন যা পরবর্তী কালে নানা উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পর্বতাকার গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

মূল কাহিনী ছাড়াও মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট আরও অজস্র কাহিনী আছে যেগুলি পরবর্তী কালের সাহিত্যিকেরা কাজে লাগিয়েছেন। এগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রামোপাখ্যান যা অবলম্বন করে পরবর্তী কালে রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান। অসম্ভব নয়, তবে রামায়ণের কাহিনীর যা মূল কথা তা তো সর্বযুগের সর্বকালের। মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার কাহিনীটি পরবর্তী কালে কালিদাস কাজে লাগিয়েছেন। অপর একটি কাহিনী নল ও দময়ন্তীর কাহিনী অনেকাংশে মহাভারতের মূল কাহিনীটিরই অনুরূপ। সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক কাহিনী অপরাপর দেশেও পাওয়া যায়। এই কাহিনীটির উপর সম্ভবত যম ও নচিকেতার উপনিষদ্‌কথিত কাহিনীর প্রভাব আছে। এই রকম কাহিনী শত শত সংখ্যায় মহাভারতে আছে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেগুলিকে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয়েছে।

মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে বলা চলে যে ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহাভারতের বর্তমান চেহারাটা গড়ে উঠেছে। ভাষা ও ছন্দের বিচারে মহাভারতে সমজাতীয়তার একান্ত অভাব, আর তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে মহাভারত কোন একটি বিশেষ যুগে রচিত হয়নি। মহাভারতে যবন ও বৌদ্ধদের উল্লেখ যেমন বুদ্ধ ও আলেকজাণ্ডারের পরবর্তী যুগকে নির্দেশ করে, অপর দিকে তেমনি বাণভট্ট ও কুমারিলের রচনায় তথা পঞ্চম শতকের লেখমালাসমূহে মহাভারতের উল্লেখ দেখে মনে হয় যে, অন্তত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল।

রামায়ণ অবশ্য আকারের দিক্ থেকে মহাভারতের মত বিশাল নয়, মহাভারতের মত সব অধ্যায়েই শাখা পল্লবিত নয়। রামায়ণের প্রথম ও শেষ অধ্যায় দুটি, অর্থাৎ বালকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের রচনা—যেগুলির সঙ্গে মূল কাহিনীর সম্পর্ক সামান্যই। এই দুই অংশেই অজস্র বাড়তি উপাখ্যান আছে যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই মহাভারতে বর্তমান। তবে রামায়ণের ঋষ্যশৃংগের কাহিনী, বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠের দ্বন্দ্বের কাহিনী ইত্যাদি উপাখ্যানসমূহ কিছুটা মৌলিকত্বের দাবি করতে পারে। রামায়ণ যে মহাভারতের পরবর্তী কালে রচিত তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ভাষা ও ছন্দ যা মহাভারতের প্রাচীনতর অংশগুলির তুলনায় অনেক অর্বাচীন। পাণিনি তাঁর গ্রন্থে বাসুদেব, অর্জুন, যুধিষ্ঠির প্রমুখ নামের উল্লেখ করেছেন কিন্তু রামায়ণের কোন চরিত্র তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে,

রামায়ণের রচনাকাল ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ মহাভারত রচনার বিবর্তন শুরু হবার ২০০ বছর পর থেকে রামায়ণ রচনার বিবর্তন শুরু হয়েছিল। তার বর্তমান আকারে উপনীত হয়ে যাবার পরেও মহাভারত রচনার বিবর্তন শেষ হয়নি।

মহাভারত বর্তমানে দুটি শাখায় পাওয়া যায়, উত্তর ও দক্ষিণদেশীয়। এই শাখাগুলি পুনরায় আবার কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে লিপির ভিত্তিতে। উত্তরদেশীয় শাখা পাঁচটি লিপিতে পাওয়া গেছে—শারদা বা কাশ্মীরী, নেপালী, মৈথিলী, বাংলা ও দেবনাগরী। দক্ষিণী শাখা পাওয়া গেছে তিনটি হরফে তেলুগু, গ্রন্থ ও মলয়ালম। উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় শাখাদুটির মধ্যে পার্থক্য অনেক, আয়তনের বিচারেও দক্ষিণদেশীয় শাখা বৃহত্তর। রামায়ণ তিনটি শাখায় আমাদের হাতে এসেছে: উত্তর-দক্ষিণদেশীয় শাখা, উত্তর-পশ্চিমদেশীয় শাখা এবং উত্তর-পূর্বদেশীয় শাখা। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে একই ধরনের রচনা প্রচলিত থাকায় ওই শাখাটিকে অধিকতর প্রামাণ্য বলা যায়। উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বে যখন কাহিনীগুলি এসেছে তখন সেগুলির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে।[১]

মহাভারত এবং রামায়ণের মূল কাহিনী প্রতিটি ভারতীয়ের নিকট এতই সুপরিচিত যে তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

১। মহাভারতের মুদ্রিত সংস্করণগুলির মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য: কলিকাতা (এন. শিরোমণি সম্পাদিত, ১৮৩৪-৩৯), বোম্বাই (কিঞ্জাওয়াদেকর সম্পাদিত, ১৯২৯-৩৩) এবং কুম্ভকোণম (কৃষ্ণাচার্য ও ব্যাসাচার্য সম্পাদিত, ১৯০৫-১০); দক্ষিণী শাখা (পি. পি. এস. শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১৯৩১)। কিন্তু কোনটিই সর্বাংশে প্রামাণ্য না হবার দরুণ পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মহাভারতের Critical edition প্রস্তুত করা হচ্ছে যা নিম্নোক্ত পণ্ডিতদের দ্বারা সম্পাদিত: (১) আদিপর্ব (সুকথাংকর), (২) সভাপর্ব (এজার্টন), (৩-৪) অরণ্যপর্ব (সুকথাংকর), (৫) বিরাট পর্ব (রঘুবীর), (৬) উদ্যোগপর্ব (এস কে. দে), (৭) ভীষ্মপর্ব (বেলভলকর), (৮-৯) দ্রোণপর্ব (এস. কে. দে), (১০) কর্ণপর্ব (পি. এল বৈদ্য), (১১) শল্যপর্ব (আর. এন. দাণ্ডেকর,), (১২) সৌপ্তিকপর্ব (এইচ. ডি. ভালেংকর), (১৩-১৭) স্ত্রী-অনুশাসন (এস. কে. বেলভলকর), (১৮) অনুশাসন (আর. ডি. কর্মকার), (১৯) আশ্রমবাসিক (এস. কে. বেলভলকর)। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন মন্মথনাথ দত্ত (১৮৯৫-১৯০৫), কে. এম. গাঙ্গুলী (১৮৮৪-৯৬, প্রতাপ চন্দ্র রায় প্রকাশিত)। রামায়ণের প্রামাণ্য সম্পাদনা করেছেন রঘুবীর (১৯৩৮), ইংরাজী অনুবাদ মন্মথনাথ দত্ত (১৮৯২-৯৪), R. T. H. Griffith (১৯১৫)। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (সম্প্রতি বসুমতী সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। পঞ্চানন-তর্করত্ন কৃত রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গবাসী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, এখন সেগুলি দুষ্প্রাপ্য।

১২ ॥ ভারতীয় সাহিত্যে মহাভারত ও রামায়ণের প্রভাব

ভারতীয় সাহিত্যের উপর মহাভারত ও রামায়ণের প্রভাব এক কথায় অপরিসীম। সংস্কৃতে অসংখ্য মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও নাটক মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে। ভারবির কিরাতার্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, ক্ষেমেন্দ্রের মহাভারতমঞ্জরী, অনন্তভট্টের ভারতচম্পূ, বাসুদেবের যুধিষ্ঠিরবিজয়, অমরচন্দ্রের বালভারত, নীতিবর্মার কীচকবধ, বস্তুপালের নরনারায়ণানন্দ প্রভৃতি কাব্যসমূহ মহাভারতের মূল কাহিনী অবলম্বনে অথবা মহাভারতের অন্তর্গত বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। মহাভারতের নলদময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বনে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, কৃষ্ণানন্দের সহৃদয়ানন্দ, বামনভট্টের নলাভ্যুদয়, বাসুদেবের নলোদয়, ত্রিবিক্রমভট্টের নলচম্পূ বা দময়ন্তীকথা প্রভৃতি কাব্য এবং রামচন্দ্রের নলবিলাস, নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের নলচরিত, ক্ষেমীশ্বরের নৈষধানন্দ প্রভৃতি নাটক রচিত হয়েছে। মহাভারত অবলম্বনে অপরাপর যে সব নাটকাবলী সংস্কৃতে রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে ভাসের মধ্যমব্যায়োগ, দূত-ঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, উরুভঙ্গ ও কর্ণভার, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, রাজশেখরের বালভারত বা প্রচণ্ডপাণ্ডব, ক্ষেমেন্দ্রের চিত্রভারত, কুলশেখরবর্মার সুভদ্রা-ধনঞ্জয় এবং তপতী-সংবরণ, প্রহ্লাদনদেবের পার্থপরাক্রম, কাঞ্চন পণ্ডিতের ধনঞ্জয়বিজয়, বৎসরাজের সমুদ্র-মন্থন, কৃষ্ণকবির শর্মিষ্ঠা-যযাতি, হস্তিমল্লের বিক্রান্তকৌরব, বিজয়পালের দ্রৌপদীস্বয়ম্বর, ব্যাসশ্রীরামদেবের পাণ্ডবাভ্যুদয় এবং সুভদ্রাপরিণয়, রামচন্দ্রের নির্ভয়ভীম, মোক্ষাদিত্যের ভীমবিক্রমব্যায়োগ, বিশ্বনাথের সৌগন্ধিকাহরণ, নীলকণ্ঠের কল্যাণসৌগন্ধিক, মাধবের সুভদ্রাহরণ, শংকরলালের সাবিত্রীচরিত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও পরবর্তী কালে অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণ রচিত হয়েছে। এছাড়া অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত বাল্মীকির রামায়ণকে মডেল করে লেখা। রামায়ণ অবলম্বনে সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাব্যসমূহ হচ্ছে কালিদাসের রঘুবংশ, ভট্টির রাবণবধ, কুমারদাসের জানকীহরণ, অভিনন্দের রামচরিত্র, শাকল্যমল্লের উদাররাঘব, বেঙ্কটেশ্বরের চিত্রবন্ধ-রামায়ণ, বেঙ্কটেশের রামচন্দ্রোদয় ও রামযমকার্ণব ও ক্ষেমেন্দ্রের রামায়ণমঞ্জরী। দ্ব্যর্থবোধক ও শ্লেষকাব্যের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, ধনঞ্জয়ের রাঘব-পাণ্ডবীয়, হরদত্ত সূরির রাঘব-নৈষধীয়, বেঙ্কটাধ্বরীর

রামায়ণ, চিদাম্বরের রাঘব-পাণ্ডব-যাদবীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ অবলম্বনে রচিত অপরাপর কাব্যসমূহের মধ্যে ভট্টভীমের রাবণার্জুনীয়, ভোজের রামায়ণ-চম্পূ, প্রবরসেনের সেতুবন্ধ প্রভৃতি ও নাটকসমূহের মধ্যে ভাসের প্রতিমা নাটক ও অভিষেক নাটক, ভবভূতির উত্তররামচরিত, রাজশেখরের বালরামায়ণ, দামোদরমিশ্রের হনুমান নাটক, যশোবর্মার রামাভ্যুদয়, মায়ুরাজের উদাত্ত রাঘব, মুরারির অনর্ঘ-রাঘব, ভীমটের স্বপ্নদশানন, জয়দেবের প্রসন্নরাঘব, শক্তিভদ্রের আশ্চর্য চূড়ামণি, বীরনাগের কুন্দমালা, ব্যাসশ্রীমাধবের রামাভ্যুদয়, মাধবের অদ্ভুতদর্পণ, ভাস্কর কবির উন্মত্তরাঘব, সুভটের দূতাঙ্গদ, রামভদ্রের জানকীপরিণয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহাভারত ও রামায়ণ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও স্থান করে নিয়েছে। বৌদ্ধ জাতকসমূহের মধ্যে বিধুর-পণ্ডিত-জাতক, ঘট-জাতক, কণাল-জাতক প্রভৃতির উপর মহাভারতের আখ্যানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। জৈনদের একটি নিজস্ব মহাভারত আছে, নাম হরিবংশ, এবং তা মূল মহাভারত কাহিনীর সামান্য পরিবর্তিত রূপ যার উপর জৈন আদর্শের প্রলেপ মাখানো হয়েছে। এছাড়া মহাভারতের কাহিনী পাওয়া যায় জৈন গুণভদ্রের উত্তর-পুরাণে, পাণ্ডবপুরাণে এবং শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যে। মালাধরী দেবপ্রভ সূরির পাণ্ডবচরিত, অসগের পাণ্ডবপুরাণ প্রভৃতি মহাভারতের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় রচিত। শীলাচার্যের চৌপন্ন-মহাপুরিস-চরিয়, পুষ্পদন্তের তিসট্‌ঠি-মহাপুরিস-গণালংকার, সোমপ্রভের কুমারপালপ্রতিবোধ, শুভশীলগণির পঞ্চশতী-প্রবোধ-সম্বন্ধ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে মহাভারতের কাহিনী ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে উল্লিখিত হয়েছে। বৌদ্ধ জাতকসমূহের মধ্যে দশরথ জাতক প্রত্যক্ষভাবেই রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে, তাছাড়া জয়দ্দিস-জাতক, বেসসন্তর-জাতক, অনামক-জাতক, সাম-জাতক ও নডিনিকা জাতকের উপর রামায়ণের প্রভাব স্পষ্ট। জৈন-রামায়ণ-সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বিমলসূরির পৌম-চরিয়, এবং তারপর রবিষেণের পদ্মপুরাণ, পদ্মদেব-বিজয়গণির রামচরিত প্রভৃতি। হেমচন্দ্রের ত্রিষষ্টি শলাকা-পুরুষ-চরিতে, হরিষেণের কথাকোশে এবং ধনেশ্বরের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যেও রামায়ণের কাহিনী আছে।

১৩॥ রামায়ণ-মহাভারত ও ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্য

শুধু সংস্কৃত বা প্রাকৃতই নয়, ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও রামায়ণ ও মহাভারত অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। বাংলা ভাষায় ষোড়শ

শতকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাণ্ডববিজয় নাম দিয়ে মহাভারতের আখ্যানাংশ বর্ণনা করেন। ওই শতকেই শ্রীকর নন্দী জৈমিনীভারত অবলম্বনে অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। পূর্ণাঙ্গ মহাভারত, মূল অনুসরণেই, রচনার সূত্রপাত করেন কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকে। তিনি বিরাটপর্ব পর্যন্ত রচনা করেন এবং অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করেন তাঁর আত্মীয় নন্দরাম। ১৫৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর দাস নল-দময়ন্তী আখ্যান ও রাজেন্দ্র দাস শকুন্তলা রচনা করেন। মূল মহাভারতের দুটি গদ্যানুবাদ উনবিংশ শতকে যথাক্রমে বর্ধমানের মহারাজা ও কালীপ্রসন্ন সিংহের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিমন্যুবধ (১৮৮১), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২) ও পাণ্ডবগৌরব (১৯০০) রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটক (১৮৯২) মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের মূল আখ্যানটিকে সংক্ষেপে তিনি নূতনভাবে রচনা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর কচ ও দেবযানী, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলিরও উৎস মহাভারত। নবীনচন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্র (১৮৯৯), রৈবতক (১৮৯৬) ও প্রভাস (১৮৯৬) মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেই রচিত হয়েছিল। রাজশেখর বসু মূল মহাভারতের একটি সারানুবাদ প্রকাশ করেন।

প্রথম বাংলা রামায়ণ রচনা করেন কৃত্তিবাস, তবে তাঁর রামায়ণ বাল্মীকির হুবহু অনুসরণ নয়। অনেক আখ্যান যা বাল্মীকিতে অনুপস্থিত তাঁর রামায়ণে স্থান পেয়েছে। অপরাপর বাংলা রামায়ণের মধ্যে নিত্যানন্দ বা অদ্ভুতাচার্যের (সপ্তদশ শতক) রচিত রামায়ণ পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত মেঘনাদবধ (১৮৬১), নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের রাবণবধ (১৮৮১), সীতার বনবাস (১৮৮১), সীতার বিবাহ (১৮৮২) প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। মূল বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদ বসুমতী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে করা হয়েছিল। রাজশেখর বসুর কৃত রামায়ণের সারানুবাদের কথাও এখানে উল্লেখ করা চলতে পারে।

অসমীয়া ভাষায় ষোড়শ শতকে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের নির্দেশে রামসরস্বতী প্রথম মহাভারত রচনা করেন। বেদব্যাসের অনুসরণে রচিত হলেও এটি অনুবাদ নয়। রামসরস্বতীর অপরাপর রচনা, যেমন কুলাচলবধ, বগাসুরবধ, ভীমচরিত ইত্যাদি, মহাভারতের অনুপ্রেরণায় রচিত। তাঁর

পূর্ববর্তী হরিহর বিপ্র (ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ) মহাভারতের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে বভ্রুবাহনর-যুদ্ধ রচনা করেছিলেন ছয়শত শ্লোকে। শংকরদেবের সমকালীন অনন্তকন্দলী মহাভারত অবলম্বনে ভারত-সাবিত্রী রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকের লেখকদের মধ্যে সূর্যখড়ি দৈবজ্ঞের কুর্মাবলিবধ এবং ঘটাসুরবধ, এবং রামকান্ত চৌধুরীর অভিমন্যুবধ কাব্য মহাভারতের অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছিল।

অসমীয়া সাহিত্যে রামায়ণের মূলানুসারী অনুবাদ করেছিলেন চতুর্দশ শতকে মাধব কন্দলী। ওই শতকে দুর্গাবর গীতি-রামায়ণ রচনা করেছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক শংকরদেব, যাঁকে অসমীয়া সাহিত্যের জনক বলা হয়, রামায়ণের কতকাংশ ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি রামবিজয় নামক একটি নাটকও রচনা করেছিলেন। শংকরদেবের আবির্ভাবের কাল ১৪৪৯ থেকে ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁর শিষ্য মাধবদেব রামায়ণ-আদিকাণ্ড নামক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। রঘুনাথের গদ্যে রচিত কথা-রামায়ণ অসমীয়া সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। উনিশ শতকের লেখকদের মধ্যে ভোলানাথ দাস মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সীতা-হরণ কাব্য রচনা করেছিলেন (১৮৮৮)।

ওড়িয়া ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন সারলা দাস, চতুর্দশ শতকে। ইনি মূলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। লোকমুখে মহাভারতের কাহিনী যা তিনি শুনেছিলেন তাই ছিল তাঁর রচনার উপাদান। কিন্তু জনপ্রিয়তায় এই রচনা আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মহাভারত রচনা করেছিলেন বিশ্বম্ভর দাস এবং রাজা কৃষ্ণ সিংহ। এ ছাড়া সপ্তদশ শতকে রচিত গোপীনাথ দাসের টীকামহাভারতও উল্লেখযোগ্য। ভীম ধীবর মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে ভারত-সাবিত্রী ও কপটপাশা রচনা করেছিলেন। উনিশ শতকের ওড়িয়া লেখকদের মধ্যে রাধানাথ রায়ের দুর্যোধনর-রক্তনদী-সন্তরণ এবং বাণহরণ কাব্যদ্বয় এবং রাধামোহন রাজেন্দ্রের পাঞ্চালী-পট্টাপহরণ নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ওড়িয়া রামায়ণ রচনা করেন বলরাম দাস ষোড়শ শতকে। তাঁর রচনা, যা জগমোহন-রামায়ণ বা দণ্ডী-রামায়ণ নামে পরিচিত, সারলা দাসের মহাভারতের মতই প্রায় স্বাধীন রচনা, স্থানীয় উপাদানসমূহ থেকে। অপরাপর রামায়ণসমূহের মধ্যে ধনঞ্জয় ভঞ্জের রঘুনাথবিলাস, হলধর দাসের অধ্যাত্ম রামায়ণ, কেশব হরিচন্দ্র এবং বিশ্বনাথ খুন্টিয়ার রামায়ণদ্বয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপেন্দ্র ভঞ্জের (১৬৭০-১৭১০) বৈদেহীশ বিলাস কাব্য রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। উনিশ শতকের বিখ্যাত ওড়িয়া রচনাসমূহের মধ্যে গঙ্গাধর মেহরের তপস্বিনী, কম্পল মিশ্রের সীতাবিবাহ, নন্দকিশোর বলের সীতাবনবাস, রামশংকর রায়ের রামবনবাস এবং হরিহর রথের রাবণবধ, রামাভিষেক, রাম-নির্বাসন ও রামজন্ম রামায়ণ অনুসরণে রচিত। ফকিরমোহন সেনাপতি কৃত রামায়ণের ছন্দানুবাদ ওড়িয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

হিন্দীভাষায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ, যদিও ২৪,০০০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত, মহাভারত রচনা করেন সবল সিংহ চৌহান, আনুমানিক ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তী হিন্দী মহাভারত ছত্রনামক কবি বিরচিত বিজই-মুক্তাবলী। ছত্র ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আবির্ভূত হয়েছিলেন। মূল থেকে সর্বপ্রথম হিন্দীতে মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন উনিশ শতকের গোকুলনাথ। বহু হিন্দী কবিই মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যানকে নিজ রচনার বিষয়বস্তু করেছিলেন। ষোড়শ শতকের সুরদাস নল-দময়ন্তীর আখ্যান অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন। আধুনিক হিন্দী লেখকদের মধ্যে মৈথিলী শরণ গুপ্তের জয়দ্রথবধ কাব্যটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

হিন্দী সাহিত্যের সবচেয়ে মূল্যবান্ সম্পদ তুলসীদাসের রামায়ণ যা রামচরিত-মানস নামে পরিচিত (রচনাকাল ১৫৭৪-৭৭ খ্রী:)। এছাড়াও তুলসীদাস রাম-গীতাবলী ও দোহা-রামায়ণ রচনা করেছিলেন। হিন্দীতে রচিত অপরাপর রামায়ণসমূহের মধ্যে কেশব দাসের (১৫৫৫-১৬১৭) রামচন্দ্রিকা, চিন্তামণি ত্রিপাঠীর (সপ্তদশ শতক) রামায়ণ, মানদাসের (জন্ম ১৬২৩) রামচরিত ও হনুমান নাটক, ঈশ্বরী প্রসাদ ত্রিপাঠীর রামবিলাস (১৬৭৩, এটি আগাগোড়াই বাল্মীকির অনুসরণ), প্রাণনাথ চৌহানের রামায়ণ মহানাটক (১৬৯০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ অনুসরণে বা তার আখ্যানসমূহ অবলম্বনে রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে জানক রসিকি শরণের অবধ-সাগর, ভগবন্ত রায়ের রামায়ণ, মধুসূদন দাসের রামাশ্বমেধ, মনিয়ার সিং-এর সৌন্দর্য লহরী, সুন্দরকাণ্ড, হনুমান-চব্বিশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সবগুলিই অষ্টাদশ শতকে রচিত। উনিশ শতকে গণেশ বাল্মীকি-রামায়ণের অংশবিশেষ হিন্দীতে অনুবাদ করেছিলেন। ললাক দাসের সত্যোপাখ্যান রামায়ণের আদিকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে জানকী প্রসাদ, মহন্ত রামচরণ দাস, বাবু রঘুনাথ দাস, মহারাজ রঘুরাজ সিং প্রমুখ অনেকেই রামায়ণকে অবলম্বন করে হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।

মৈথিলী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন চন্দ্র ঝা। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কাশ্মিরী ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন দিবাকর প্রকাশ ভট্ট। এই রামায়ণের বহু আখ্যান বিভিন্ন আঞ্চলিক রামায়ণে পাওয়া যায়, কিন্তু মূল বাল্মীকিতে অনুপস্থিত। এখানে রামায়ণের মূল ঘটনাটি শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

গুজরাতী ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন নাকর (১৫৫০ খ্রী)। গুজরাতী রামায়ণ রচয়িতা প্রেমানন্দ পূর্ণাঙ্গ মহাভারতও রচনা করেছিলেন, এবং তাছাড়া মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান অবলম্বনে চন্দ্রহাসাখ্যান (১৬৭১ খ্রী) দ্রৌপদীস্বয়ংবর (১৬৮০), নলাখ্যান (১৬৮৫), দ্রৌপদীহরণ (১৬৮০) ও সুভদ্রাহরণ (১৭০২) তিনি রচনা করেছিলেন। তারও আগে ভালন মহাভারতের নল ও দুর্বাসার আখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন পঞ্চদশ শতকে। প্রেমানন্দের পুত্র বল্লভ দুঃশাসন-রুধিরপানাখ্যান, কুন্তীপ্রসন্নাখ্যান ও যুধিষ্ঠিরবৃকোদরাখ্যান রচনা করেছিলেন। প্রেমানন্দের শিষ্য রত্নেশ্বরের শিশুপালবধও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতকে শামলভট্ট রাবণ-মন্দোদরী সংবাদ ও দ্রৌপদী-বস্ত্র-হরণ রচনা করে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। আধুনিক গুজরাতী লেখকদের মধ্যে ননলালের কুরুক্ষেত্র মহাকাব্য গুজরাতী সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। লীলাবতী মুন্সীর রেখাচরিত্র দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি।

প্রথম গুজরাতী রামায়ণকার পূর্বোল্লিখিত প্রেমানন্দ যিনি পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ ছাড়াও রামরাবণের যুদ্ধ অবলম্বনে রণযজ্ঞ নামক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। রামায়ণের অপর একটি গুজরাতী অনুবাদ করেছিলেন গিরধর (১৭৮৭-১৮৫২)। রামায়ণের আখ্যানসমূহ অবলম্বনে পূর্বোল্লিখিত ভালন রামবিরহ এবং রামবাল-চরিত এবং মন্ত্রীকর্মন (পঞ্চদশ শতক) সীতাহরণ রচনা করেছিলেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে জয়শংকর মহাশংকর বুচের সীতাবনবাস (১৯০৩) গুজরাতী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

মারাঠী ভাষায় মুক্তেশ্বর প্রথম মহাভারত রচনা করেন। ইনি সপ্তদশ শতকের লোক ছিলেন। শ্রীধরের পাণ্ডবপ্রতাপ ও মোরোপন্তের মহাভারতও মহারাষ্ট্রে বিশেষ জনপ্রিয়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে শুভানন্দ মহাভারতের অংশ-বিশেষ ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন। মহাভারতের আখ্যানসমূহ অবলম্বনে রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে রঘুনাথ পণ্ডিতের দময়ন্তী-স্বয়ম্বর, অনন্তরায়ের দুর্বাসা-

যাত্রা, দ্রৌপদী-বস্ত্রহরণ, এবং পরবর্তী কালে আন্না কির্লোস্করের শকুন্তলা ও সুভদ্রা, খদিলকরের দ্রৌপদী, পন্ত-প্রতিনিধির দ্রৌপদী-বস্ত্রহরণ ও ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা, সরনায়েকের দ্রৌপদী-স্বয়ংবর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মূল মহাভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মারাঠী পদ্যানুবাদ করেন চিপলু'কর।

প্রথম মারাঠী রামায়ণ রচনাকার ছিলেন ষোড়শ শতকের সাধু একনাথ। তাঁর পৌত্র মারাঠী ভাষার প্রথম মহাভারতকার মুক্তেশ্বর একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের সমর্থ রামদাস ও শ্রীধরও রামায়ণ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শ্রীধরের রামবিজয় মহারাষ্ট্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়। অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ মারাঠী কবি মোরোপন্ত ১০৮টি ছোট ছোট রামায়ণ নানাভাবে ও ভঙ্গীতে রচনা করেছিলেন। আধুনিক লেখকদের মধ্যে রামায়ণের আখ্যানসমূহকে অনেকেই রচনার উপজীব্য করেছিলেন। এই সকল রচনার মধ্যে পন্ত-প্রতিনিধির সীতাশুদ্ধি, অভয়ংকরের সীতা-স্বয়ংবর নাটক, আন্না কির্লোস্করের রামরাজ্যবিয়োগ নাটক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে রামায়ণের মারাঠী গদ্যানুবাদ করেছেন কুলকার্ণি এবং পদ্যানুবাদ করেছেন ভিদে। মদ্‌গুলকরের গীত-রামায়ণ মহারাষ্ট্রে বিশেষ জনপ্রিয়।

দক্ষিণী ভাষাসমূহের মধ্যে তামিল ভাষায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদ করেন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পেরুন্দেবনার। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মূল মহাভারতের আক্ষরিক তামিল গদ্যানুবাদ করেন এম. ভি. রামানুজ-চারিয়ার। মহাভারত অবলম্বনে রচিত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর বিয়াসর বিরুন্দু দক্ষিণে বিশেষ জনপ্রিয়, এবং এই গ্রন্থটির একটি ইংরাজী অনুবাদও হয়েছে। সুবিখ্যাত কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর পাঞ্চালিইন :শপতম কাব্যে মহাভারতের কাহিনীর পটভূমিকায় আধুনিক ভারতের যুগযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে।

বৈষ্ণব আড়বারদের রচিত তামিল দিব্যপ্রবন্ধে রামায়ণের বহু কাহিনী আছে, কিন্তু দশম শতকের কম্বনই প্রকৃত তামিল রামায়ণের রচয়িতা এবং তা মূলানুগ না হলেও জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যগুণে তামিল সাহিত্যের আজও অদ্বিতীয় রচনা। আধুনিককালে রাজাগোপালাচারী তাঁর চক্রবর্তী-তিরুমকন কাব্যে রামায়ণ বর্ণনা করেছেন। তামিলে রামায়ণের যাঁরা সংক্ষিপ্ত বা আংশিক অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে তেভিয়ুর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, টি. সুন্দরচারি, ও অনন্তরাম দীক্ষিতের নাম উল্লেখযোগ্য।

তেলুগু ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন নন্নয় একাদশ শতকে। ইনি

প্রথম দুটি পর্ব এবং তৃতীয় পর্বের অর্ধাংশ পর্যন্ত রচনা করতে পেরেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে তিক্কন শেষ পনেরটি পর্ব রচনা করেন। অসমাপ্ত তৃতীয় পর্বটি সমাপ্ত করেন চতুর্দশ শতকে ইয়েরপ্রগদ। পঞ্চদশ শতকে পিল্ললমরি পিনবীর-ভদ্রিয়া তেলুগু ভাষায় জৈমিনিভারত ও শৃঙ্গারশকুন্তলম্ রচনা করেন। আধুনিককালে তিরুপতি শাস্ত্রী ও বেঙ্কট শাস্ত্রী মহাভারতের আখ্যানসমূহ অবলম্বনে বহু নাটক রচনা করেছেন। মহাভারতের আধুনিক পদ্যানুবাদ করেছেন মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রী।

প্রথম তেলুগু রামায়ণ রচনা করেন রঙ্গনাথ এবং তারপর হুলকি ভাস্কর, তাঁর পুত্র মল্লিকার্জুন ভট্ট, ও শিষ্যদ্বয় অযালার্য এবং রুদ্রদেব। রঙ্গনাথের রামায়ণ দ্বিপদ-রামায়ণ নামে পরিচিত। রঙ্গনাথের নামে তা উৎসর্গিকৃত হলেও আসলে এই রামায়ণ বুদ্ধরাজুর রচনা। দ্বিতীয় রামায়ণটি ভাস্কর রামায়ণ নামে পরিচিত এবং দুটি গ্রন্থই চতুর্দশ শতকের রচনা। পঞ্চদশ শতকের মোল্লরামায়ণ মোল্ল নামক জনৈকা মহিলা কবি কর্তৃক রচিত। অষ্টাদশ শতকের গোপীনাথ-রামায়ণও তেলুগু সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রী রামায়ণের পদ্যানুবাদ করেছেন। আধুনিক তেলুগু কবি বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন।

কন্নড় ভাষায় তিনজন আদি কবি পম্প (৯০২ খ্রী), পোন্ন ও রন্ন প্রথম মহাভারত রচনা করেছিলেন। পম্পের মহাভারতের নাম বিক্রমার্জুনবিজয় যা পম্পভারত নামেও খ্যাত। রন্ন রচিত গ্রন্থের নাম সাহস-ভীম-বিজয়। ষোড়শ শতকের কুমার ব্যাস বা নারনপ্প মহাভারতের প্রথম দশটি পর্বের তেলুগু অনুবাদ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্বগুলি রচনা করেছিলেন তিম্মন্ন। অষ্টাদশ শতকে রচিত লক্ষ্মীশের জৈমিনি-ভারত কন্নড় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত। উনিশ শতকের কৃষ্ণরাজ তৃতীয় ওদেয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কৃষ্ণরাজ-বাণীবিলাস নামক মহাভারত মূলের পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদ। কন্নড় ভাষায় কয়েকটি জৈন-মহাভারতও বর্তমান।

প্রথম কন্নড় রামায়ণ রচনা করেন অভিনব-পম্প (১১০০ খ্রী)। এটি জৈন-অনুপ্রেরণায় রচিত। অপরাপর জৈন-রামায়ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমুদেন্দু রামায়ণ (১২৭৫ খ্রী), দেবচন্দ্রের রামকথাবতার (১২৯৭ খ্রী) এবং দেবপ্পের রামবিজয়চরিত (ষোড়শ শতক)। বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসরণে প্রথম রামায়ণ রচনা করেন নরহরি (১৫৯০ খ্রী), যিনি কুমার-বাল্মীকি নামে পরিচিত। সপ্তদশ

শতকে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে তিরুমল বৈদ্য এবং যোগেন্দ্র উত্তর-রামায়ণ রচনা করেন। আধুনিক কন্নড় লেখকদের রচনার মধ্যে কে. ভি. পুত্তপ্পা রচিত রামায়ণ-দর্শনম্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মলয়ালম সাহিত্যে সংক্ষিপ্তাকারে মহাভারত রচনা করেন এজুত্তাচ্চন (১৫৭৫-১৬৫০) যিনি অধ্যাত্ম-রামায়ণ নামক একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে উন্নয়ি বারিয়ার রচিত নলচরিতম্, এরন্নিম্মান থাম্পি রচিত উত্তরাস্বয়ম্বরম্ ও কীচকবধম্ মহাভারতের আখ্যানসমূহ অবলম্বনে রচিত হয়েছে। বর্তমান যুগে থোত্তকত্তু ইক্কবম্ম বিরচিত সুভদ্রার্জুনম্, চেল্লপ্পন নায়ার রচিত কর্ন, মহাকবি উল্লুর বিরচিত অম্বা, কে. এম. পাণিক্কর বিরচিত ভীষ্ম মলয়ালম নাট্যসাহিত্যের বিশিষ্ট সৃষ্টি। কৃষ্ণ পিল্লাই রচিত দেবযানী কাব্যটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম মলয়ালম রামায়ণ রচনা করেন চতুর্দশ শতকের জনৈক অজ্ঞাত কবি, এবং এই রচনাটির নাম রামচরিতম্। পঞ্চদশ শতকে পুনম নাম্বুদিরি রামায়ণ-চম্পূ, ষোড়শ শতকে কন্নস পানিক্কর কন্নস-রামায়ণ, সপ্তদশ শতকে এজুত্তাচ্চন অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রভৃতি রচনার দ্বারা মলয়ালম রামায়ণ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আধুনিক লেখকদের রচনাবলীর মধ্যে পদ্মনাভ কুরূপের রামচন্দ্র-বিলাসম, বল্লাথোলের বাল্মীকি-রামায়ণ এবং কে. এম. পাণিক্করের নাটক মন্দোদরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৪ ॥ ভগবদ্গীতা ও হরিবংশ

ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত, যদিও আসলে তা একটি পৃথক্ গ্রন্থ বা পরবর্তী কালে রচিত এবং যা পরবর্তী কালে মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থের আদিম আকার বা প্রকৃতি কি রকম ছিল এই মুহূর্তে তা বলা সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে অনেক মতবাদ আছে। সম্ভবত আদিতে গীতা উপনিষদ জাতীয় একটি গ্রন্থ ছিল যাকে পরবর্তী কালে বিষ্ণু উপাসনার উপযোগী করে পরিবর্তিত করা হয়েছিল।

বর্তমানে গীতার যে রূপ আমরা দেখি তাতে ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলি পরস্পর-বিরোধী ধারার সন্নিবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে উপনিষদ্ কথিত ব্রহ্মবাদও আছে, সাংখ্য কথিত পুরুষের ধারণাও আছে, তা ছাড়া আছে আত্মোপলব্ধির যোগশাস্ত্রসম্মত প্রণালী, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের কথা, যজ্ঞের

রহস্যাত্মক ব্যাখ্যা, দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধীয় মত প্রভৃতি। এখানে উল্লিখিত পরস্পর-বিরোধী আদর্শসমূহের সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে সুদীর্ঘকাল ধরে, সেই শংকরাচার্যের আমল থেকে আজ পর্যন্ত। হিন্দুর অতিপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ হিসাবে গীতা সর্বত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত ও আলোচিত হয়। গীতার ভক্তিবাদ ও নিষ্কাম কর্মযোগ যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। বিগত ও বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ভারতের জাতীয় জীবনের বিকাশে এই গ্রন্থোক্ত কয়েকটি আদর্শ বিশেষ অনুকূল হয়েছে। আদি গীতা সম্ভবত রচিত হয়েছিল ২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এবং গীতার যে বর্তমান রূপ আমরা দেখি তা খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে।

একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মহাভারতের পরিশিষ্ট (খিল) রূপে কল্পিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির নাম খিল-হরিবংশ। আকারে মহাভারতের তুলনায় কিছু না হলেও নেহাত অল্পায়তন নয়। মহাভারতের মত এই গ্রন্থটিও কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি বা যুগের রচনা নয়। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের জীবন-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অংশের নাম হরিবংশপর্ব যাতে পুরাণের ভঙ্গীতে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে যদুবংশের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে পৌরাণিক ধরনের কথা ও কাহিনীর সমাবেশ প্রচুর। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের নাম বিষ্ণুপর্ব যাতে গোপকন্যাদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয়োপাখ্যানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। শেষ অংশটির নাম ভবিষ্য পর্ব, যাতে অন্যান্য পুরাণসমূহের মতই কলিকালের কুৎসা গাওয়া হয়েছে।[১]

১৫ ॥ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

একান্তভাবেই রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে রচনা প্রাচীন ভারতে বিশেষভাবেই অনুপস্থিত। একমাত্র ব্যতিক্রম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। এই বিখ্যাত গ্রন্থটির কাল নির্ণয়ের বিষয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

১। গীতার সার্থক সংস্করণের জন্য বেলভলকর সম্পাদিত ভীষ্মপর্ব (১৯৪৫) দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া শংকরাচার্য ও আনন্দগিরির টীকাসহ আগাসে সম্পাদিত (আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৯০৯) গীতাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গীতার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন তেলাঙ (সনৎসুজাতীয় ও অনুগীতা সহ) Sacred Books of the East গ্রন্থমালায়; আরও একটি অনুবাদ করেছেন হিল (W. D. P. Hill) যা অক্সফোর্ড থেকে ১৯২৮ খ্রী প্রকাশিত হয়েছে। হরিবংশের উৎকৃষ্ট সম্পাদনা করেছেন কিঞ্জাওয়াদেকর (১৯৩৬)।

একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন কৌটিল্য, যিনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন এবং যিনি মৌর্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন, এবং সেই হিসাবে তাঁরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের রচনা বলে গণ্য করেন। যাঁরা এই মতবাদ পোষণ করেন তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে দণ্ডী এবং পঞ্চতন্ত্রের লেখকের মত প্রাচীন লেখকেরা অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্তের নাম উল্লেখ করেছেন, এবং বাণভট্ট, যিনি হর্ষবর্ধনের সমকালীন ছিলেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। কামন্দক রচিত নীতিসার এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্র কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মডেলেই গড়ে উঠেছিল এবং সেই হিসাবে অর্থশাস্ত্র এই সকল লেখকদের পূর্ববর্তী। এমনকি, কালিদাসও যে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। কৌটিল্য বর্ণিত আইনকানুনের ধরন দেখে মনে হয় যে, সেগুলি মনুস্মৃতিতে বর্ণিত আইনকানুনের চেয়ে বেশী প্রাচীন এবং অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ বহু ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যায়।

পক্ষান্তরে যাঁরা অর্থশাস্ত্রকে পরবর্তী কালের রচনা বলে মনে করেন তাঁদের বক্তব্য হল যে অর্থশাস্ত্রের সর্বত্রই কৌটিল্যের উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম পুরুষে, উত্তম পুরুষে নয়। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের কথাগুলি কৌটিল্যের নামে প্রচলিত কিন্তু তা রচনা করেছিলেন অন্য কেউ অনেক পরবর্তী কালে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সাদৃশ্য আছে এবং উভয়েই একই অর্থরীতিকে উদ্ধৃত করেছেন, সেই হিসাবে দুটি গ্রন্থ সমকালীন। অর্থশাস্ত্রে চীনের উল্লেখ আছে, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল না। পুরাণসমূহে কৌটিল্যের কোন উল্লেখ নেই। মহাভারতেও রাজনীতিশাস্ত্র প্রসঙ্গে বৃহস্পতি ও শুক্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু কৌটিল্যের কোন উল্লেখ নেই। পতঞ্জলি মৌর্যগণ ও চন্দ্রগুপ্তের সভার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কৌটিল্যের কথা তাঁর গ্রন্থে অনুল্লিখিত। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থের সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর কোন প্রকৃত সাদৃশ্য নেই, জোর করে তা টানা হয়েছে। এই সকল কারণে তাঁরা অর্থশাস্ত্রকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে স্থান দিতে চান। দুতরফেরই আরও অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আলোচনার পরিসর এখানে নেই। মোটের উপর কৌটিল্য সমস্যা আজও অমীমাংসিত।

সমগ্র অর্থশাস্ত্র ১৫টি অধিকরণ এবং ১৮০টি প্রকরণে বিভক্ত। পরবর্তী কালে অবশ্য অধ্যায়ভিত্তিক ভাগ করা হয়েছে। এখানে ১৫টি অধিকরণের বিষয়বস্তুর উল্লেখ করছি: (১) রাজপুত্রগণের শিক্ষা, মন্ত্রীদের যোগ্যতা, গুপ্তচর ও রাজার দৈনন্দিন কর্তব্য; (২) বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষসমূহ, তাঁদের কাজ, নগর শাসন ও প্রতিরক্ষা, শিল্প, গণিকাবৃত্তি; (৩) অসামরিক আইনকানুন; (৪) ফৌজদারী আইনকানুন; (৫) শত্রুবিনাশ ও রাজকোষ তথা রাজপুরুষদের বেতন ইত্যাদি; (৬) রাজতন্ত্রের সাতটি উপাদান; (৭) ছয় প্রকার রাজনীতি; (৮) রাজার অযোগ্যতা ও তার পরিণামসমূহ; (৯-১০) সামরিক অভিযানসমূহ, (১১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ; (১২) যুদ্ধ জয়ের কৌশল; (১৩) অধিকৃত দেশে জনপ্রিয় হবার উপায়সমূহ; (১৪) যুদ্ধ জয়ের অপকৌশলসমূহ; (১৫) অর্থশাস্ত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে বক্তব্যের স্পষ্টতা। প্রাচীন গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও অর্থশাস্ত্রে পরস্পর-বিরোধী কথা বড় একটা নেই। কৌটিল্য বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক, কিন্তু সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগতন্ত্রে বিশ্বাসী। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের উপর কৌটিল্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। আমলাতন্ত্রের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই ব্যবস্থার দোষগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। রাজকর্মচারীর পক্ষে অসাধু হওয়া খুবই সম্ভবপর একথা কৌটিল্য স্বীকার করতেন, এবং এই জন্যই তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগে যথেষ্ট সাবধানতার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সে যুগের অপরাপর আইন-প্রণেতার তুলনায় কৌটিল্য অনেক উদার ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ অপরাধীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ বধ্য নয়। কৌটিল্য কিন্তু ব্রাহ্মণদের সরাসরি প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছেন যদি সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করে। নারীজাতির প্রতিও কৌটিল্যের সহৃদয় মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থানুযায়ী তিনি বিবাহবিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজা রাষ্ট্রের প্রতীক নয়, রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ। কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্র মানবদেহের মত, যার অঙ্গ সাতটি: রাজা, মন্ত্রিমণ্ডলী, ভূভাগ, দুর্গ, রাজকোষ, সেনাবাহিনী এবং সুহৃদবর্গ। কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ছয়টি মূল আদর্শ মেনে চলবে: সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), আসন (নিরপেক্ষতা), যান (যুদ্ধপ্রস্তুতি, অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা না করে), সংশ্রয় (অপরের আশ্রয়

অন্বেষণ) এবং দ্বৈধীভাব (অর্থাৎ একের সঙ্গে মিত্রতা করে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ)। সর্বত্রই কৌটিল্যের দৃষ্টিভঙ্গী রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছে। অন্যান্য নানা বিষয়েও কৌটিল্য মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন কৃষির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে রাজা একজন সীতাধ্যক্ষ (কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর) নিযুক্ত করবেন। কৃষিকার্যের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তাঁর উপর বার্ষিক কৃষিগত সাফল্য ও বৈফল্য দুয়েরই দায়িত্ব বর্তাবে। এমন লোককে কদাচ জমি দেওয়া হবে না, সে যে কোন জাতিভুক্ত লোকই হোক না কেন, যে স্বহস্তে চাষ করবে না। কোন ব্যক্তি তার জমি অপরকে ভাগে চাষ করতে দিতে পারবে না, একমাত্র সরকারী জমিগুলিই ভাগে চাষ করতে দেওয়া চলতে পারে। সীতাধ্যক্ষ কৃষককে ভাল বীজ, সার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবেন, জলসেচের জন্য খাল খনন করাবেন এবং কৃষির উন্নতির জন্য আরও বহুবিধ চেষ্টা করবেন। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতির জন্য কৌটিল্য যে সুপারিশ করেছিলেন, তার কার্যকারিতা আজও ফুরিয়ে যায়নি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুকরণে পরবর্তী কালে (আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে) কামন্দক নীতিসার নামক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু উৎকর্ষের দিক থেকে সেই গ্রন্থের সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কোন তুলনাই হয় না।[১]

১৩। ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত ধর্ম ও গৃহ্যসূত্রগুলিকে অনুসরণ করে পরবর্তী কালে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক ও তার পরবর্তী কালে রচিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে মানব ধর্মশাস্ত্র বা মনুস্মৃতি। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির

১। অর্থশাস্ত্রের সম্পাদনা করেছেন শ্যাম শাস্ত্রী (১৯১৯) জলি ও স্মিডট (J. Jolly and R. Schmidt, দুই খণ্ডে, ১৯২৩-২৪) ও গণপতি শাস্ত্রী (তিন খণ্ডে, ১৯২৪-২৫); ইংরাজী অনুবাদ করেছেন শ্যাম শাস্ত্রী (Shamasastry), বঙ্গানুবাদ (দুই খণ্ডে) রাধাগোবিন্দ বসাক। কামন্দকীয় নীতিসারের সম্পাদনা করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৪৯-৮৪) ও গণপতি শাস্ত্রী (১৯১২), ইংরাজী অনুবাদ করেছেন এম. এন. দত্ত (১৮৯৬)। শুক্রনীতিসারের সম্পাদনা করেছেন গুস্তাভ ওপার্ট (১৮৮২) ইংরাজী অনুবাদ করেছেন বি. কে. সরকার (১৯২৩)।

বিষয়বস্তু হচ্ছে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে জীবনধারণের নিয়মকানুনগুলি শিক্ষাদান। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কিভাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ এই গ্রন্থগুলিতে দেওয়া আছে। ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রগুলির মত এই সকল স্মৃতিগ্রন্থেও বিবাহ, ঋতুসংগমন, চতুর্থীকর্ম, জাতকর্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, দৈনিক পঞ্চ মহাযজ্ঞ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। স্মৃতিগ্রন্থসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতিই সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয়। এই গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছিলেন নবম শতকে মেধাতিথি, একাদশ শতকে গোবিন্দরাজ ও ত্রয়োদশ শতকে কুল্লুক। মনুস্মৃতি ধরনের আরও কয়েকটি বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ আছে যেমন বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, ইত্যাদি। পরবর্তী কালে আরও অজস্র স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছে যেমন আপস্তম্ব, অত্রি, যম, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, পরাশর, বৃহৎপরাশর, আঙ্গিরস, আঙ্গির, হারীত, দালভ্য, বশিষ্ঠ, বৃদ্ধহারীত, বাধূল ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই অবাচীন।[১]

১৭॥ পুরাণ সাহিত্য

সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকটা জুড়ে আছে পুরাণসমূহ। মহাভারতের মত পুরাণসমূহকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। পুরাণ কথাটির অর্থ 'যা প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান রয়েছে।' মহাকাব্যদ্বয়ের মত পুরাণেও আছে অজস্র কথা ও কাহিনী,

১। মনুস্মৃতির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন জোন্স (১৭৯৪), বুলার (Sacred Books of the East গ্রন্থমালা) এবং গঙ্গানাথ ঝা (১৯২২-২৯)। বৃহস্পতি স্মৃতির সম্পাদনা করেছেন ফুহ্‌রের (Fuhrer, ১৮৭৯) ও রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার (Gaekwad's Oriental Series, ১৯৪১), অনুবাদ করেছেন জলি (Sacred Books of the East, ৩৩ সংখ্যক গ্রন্থ)। কাত্যায়ন স্মৃতির সম্পাদনা, অনুবাদ ও টীকা করেছেন, পি. ভি. কানে (১৯৩৩), নারদস্মৃতির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন জলি (SBE, ৩৩ সংখ্যক গ্রন্থ), বিষ্ণুস্মৃতির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন জাল (SBE, সপ্তম গ্রন্থ), তা ছাড়া এম. এন. দত্ত আরও এক দফা ইংরাজী অনুবাদ করেছেন (১৯০৯)। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির প্রথম সম্পাদনা করেছিলেন স্টেনৎসলার (১৮৪৯), পরবর্তী কালে এই গ্রন্থ মিতাক্ষরা ভাষ্য (১৯০৯), অপরার্কিতা ভাষ্য (১৯০৩-৪) এবং বিশ্বরূপ ভাষ্য (১৯২২-২৪) সহযোগে পুনঃসম্পাদিত হয়, এছাড়া অনুবাদ করেছেন এস. সি. বসু (১৯১৮), নরহরাইয়া (১৯১৩) এবং ঘরপুরে (১৯৩৬)। পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদনায় বঙ্গবাসী প্রেস থেকে কয়েকটি স্মৃতিগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয়েছিল। সম্প্রতি আনন্দাশ্রম সিরিজে সব কটি স্মৃতিগ্রন্থই মূল ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, অনুবাদ বহুক্ষেত্রেই বিকৃত।

ইতিহাসধর্মী বিষয়সমূহ, স্মৃতিশাস্ত্রের অনুকরণে অপরাধ ও দণ্ডের তালিকা, তদুপরি আছে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের (যেমন বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি) নানান খুঁটিনাটি দিক্। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এই সাহিত্যের প্রকৃতি এত জটিল যে এক কথায় পুরাণের কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

অমরকোষ নামক অভিধানে পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাতে প্রতিটি পুরাণে সর্গ (জগৎ সৃষ্টির বিবরণ), প্রতিসর্গ (জগতের ধ্বংস ও নবরূপ প্রাপ্তির বিবরণ), বংশ (দেবতা ও ঋষিদের বংশাবলী), মন্বন্তর (বিভিন্ন মন্বর যুগ) এবং বংশানুচরিত (রাজবংশ কথন)—এই পাঁচটি বিষয় অবশ্যই থাকবে। কিন্তু পুরাণসমূহের বিষয়বস্তু আরও বিশাল, যে জন্য পুরাণগুলিতেই বলা হয়েছে যে ওই পঞ্চলক্ষণ শুধুমাত্র উপ-পুরাণগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহাপুরাণগুলির ক্ষেত্রে আরও পাঁচটি লক্ষণ আছে যেগুলি হচ্ছে বৃত্তি (জীবিকার উপায়সমূহের বর্ণনা), রক্ষা (দেবতাদের অবতারগণের কথা), মুক্তি (মৃত্যুর পর মোক্ষলাভের কথা), হেতু (অব্যক্ত জীবন) এবং অপাশ্রয় (ব্রহ্মতত্ত্ব)। কিন্তু এই দশ লক্ষণের দ্বারাও পুরাণসমূহের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

সংখ্যা, শ্রেণীবিভাগ, রচনাকাল—প্রচলিত মত অনুযায়ী আঠারোটি মহাপুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ বর্তমান, কিন্তু আসলে উপপুরাণের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। এই আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে, প্রচলিত মত অনুযায়ী বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ সাত্ত্বিক পুরাণ যেগুলি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্ম, বামন এবং ভবিষ্য রাজসিক পুরাণ যেগুলি ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে রচিত; এবং মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ তামসিক পুরাণ যেগুলি শিবের উদ্দেশ্যে রচিত। এই শ্রেণীবিভাগ একান্তই কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং এই তালিকায় এমন কতকগুলি পুরাণ আছে যেগুলি একেবারেই অর্বাচীন।

এই কারণেই ওই কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগকে গ্রাহ্য না করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নতুন ধরনের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথম বিভাগে রয়েছে গরুড়, অগ্নি ও নারদ যেগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যবহারিক বিদ্যা, কেননা এগুলিতে চিকিৎসা, ব্যাকরণ, নাট্যতত্ত্ব, সঙ্গীত, জ্যোতিষ প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়গুলিই সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে পদ্ম, স্কন্দ ও ভবিষ্য যেগুলির প্রধান বিষয়বস্তুই হচ্ছে ব্রত ও তীর্থ কথন।

তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে ব্রহ্ম, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত। এই তিনটি পুরাণই সংশোধিতরূপে আমাদের হাতে এসেছে ; অন্তত দুবার এই তিনটি পুরাণের মূল অংশ নূতন করে লেখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীতে সেই পুরাণগুলিকে ফেলা হয়েছে প্রকৃতির দিক্ থেকে যেগুলি ইতিহাসধর্মী। এতে আছে ব্রহ্মাণ্ড ও হারিয়ে যাওয়া বায়ু। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে বায়ুপুরাণের আসল অংশটি হারিয়ে গেছে। পঞ্চম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলি যথা লিঙ্গ, বামন, মার্কণ্ডেয়, প্রথম দুটির উদ্দেশ্য শিবের বন্দনা গান এবং তৃতীয়টির উদ্দেশ্য দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে যেগুলির প্রবক্তারূপে বিষ্ণুর কোন না কোন অবতার কল্পিত হয়েছেন। এই পুরাণগুলি হচ্ছে বরাহ, কূর্ম এবং মৎস্য।

পুরাণগুলি একই সময়ে রচিত হয়নি, বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন যুগে রচিত হয়েছে। রচনাকাল মোটামুটি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কোন কোন উপপুরাণ আবার আরও পরবর্তী কালে রচিত।

মহাপুরাণ—পুরাণসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে বিষ্ণুপুরাণ। এই পুরাণটি নাকি পুলস্ত্য পেয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছ থেকে, পরাশর পেয়েছিলেন পুলস্ত্যের কাছ থেকে, মৈত্রেয় পেয়েছিলেন পরাশরের কাছ থেকে। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা তেইশ হাজার বলে দাবি করা সত্ত্বেও আসলে সাত হাজারের বেশী শ্লোক এতে নেই। এখানে পৌরাণিক পঞ্চলক্ষণ নিখুঁতভাবে মেনে চলা হয়েছে। পুরাণটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন। নারদ বা নারদীয় পুরাণের প্রবক্তারূপে নারদ কল্পিত হয়েছেন। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা তিন হাজার। বিষ্ণুর গৌরবকীর্তনই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। মহাপুরাণ হিসাবে গণ্য হলেও আসলে এটি একটি অতি অর্বাচীন রচনা যার কোন কোন অংশ ষোড়শ এমন কি সপ্তদশ শতকেও রচিত। এতে স্পষ্টতই মুসলমানদের উল্লেখ আছে যা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, রচনাকালের দিক্ থেকে এই পুরাণ কত অর্বাচীন। ভাগবতপুরাণও বিষ্ণুকেন্দ্রিক, এবং বৈষ্ণবদের নিকট প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থরূপেও বিবেচিত। সাধারণভাবে এই পুরাণকে ভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবত বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা আঠার হাজার। এতে বৃত্রাসুর বধ ও সারস্বত কল্পের বিস্তৃত বিবরণ আছে। এখানে ৩৩২টি অধ্যায় বারোটি স্কন্ধ বা খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে। এই পুরাণের দশম খণ্ডে বর্ণিত কৃষ্ণের জীবনকথা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

গরুড়পুরাণ সম্বন্ধে ওই পুরাণেই বলা হয়েছে যে, গরুড়কল্পে ভগবান্ বিষ্ণু নিজেই এই পুরাণ বর্ণনা করেছেন, বিনতার জন্ম থেকে শুরু করে। তবে এই পুরাণের বাস্তব চরিত্র ভিন্নরূপ। সেখানে ব্যবহারিক বিদ্যার কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। পদ্মপুরাণ আকারের দিক্ থেকে অতি বৃহৎ, শ্লোকসংখ্যা পঞ্চান্ন হাজার এবং মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত: সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তর। বিষয়বস্তু দেখে যা মনে হয় এই পুরাণটিও অর্বাচীন, দ্বাদশ শতকের পূর্বে রচিত নয়। বরাহপুরাণও ওই একই সময় রচিত হয়েছে। সমগ্র পুরাণটি বরাহরূপে বিষ্ণুকর্তৃক তৎপ্রিয়া পৃথিবী দেবীকে শোনান হয়েছে, শ্লোক সংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশী। উপরিউক্ত সবকটি পুরাণেরই উদ্দেশ্য বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা।

এরপর প্রচলিত মত অনুযায়ী যেগুলি রাজসিক পুরাণ সেগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথমেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের কথাই উল্লেখ করছি যে পুরাণের প্রবক্তা হিসাবে ব্রহ্মা কল্পিত হয়েছেন। এতে ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মার অণ্ডের বিশদ বর্ণনা ছাড়া ভবিষ্যৎ কল্পসমূহের বিশেষ বিবরণ আছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণ নামক জনপ্রিয় গ্রন্থটি এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরই একটি অংশ। অনুরূপভাবে ব্রহ্মপুরাণও ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত বলে পরিচিত। এই পুরাণের শ্লোকসংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশী। এখানে যে দেবতাটি প্রাধান্য পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন সূর্য। প্রথম দিক্কার অধ্যায়গুলিতে যথাক্রমে সৃষ্টি বর্ণনা, মন্বন্তরসমূহের বর্ণনা, চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত ইত্যাদি সংক্ষেপে কথিত হয়েছে। এই পুরাণে উড়িষ্যা দেশ, বিশেষ করে উড়িষ্যার মন্দিরাদির কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এর লেখক উড়িষ্যার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ একান্তই অর্বাচীন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রচিত। প্রকৃতির দিক্ থেকে একান্তই সাম্প্রদায়িক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এই পুরাণের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। শ্লোকসংখ্যা আঠার হাজারেরও বেশী। ভবিষ্যপুরাণও একটি অর্বাচীন পুরাণ যার শ্লোকসংখ্যা সাত হাজার। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই পুরাণের প্রকৃতি অপরাপর পুরাণের চেয়ে পৃথক্। এখানে বিশেষ করে ব্রত-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বামনপুরাণের শ্লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার। এই পুরাণের প্রবক্তা বামনরূপী বিষ্ণু, কিন্তু তাহলেও এই পুরাণে শিবের কিছুটা প্রতিপত্তি আছে। এটিও একটি অর্বাচীন পুরাণ। রাজসিক শ্রেণীর সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য পুরাণ হচ্ছে মার্কণ্ডেয়পুরাণ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এই পুরাণ প্রকৃতই মহাপুরাণ আখ্যা পেতে পারে। এতে আছে অজস্র কথা ও কাহিনী, নৈতিক অনুশাসন ও ধর্মীয় নির্দেশ। বিখ্যাত দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী যা যে কোন দেবীপূজায় পঠিত হয়, এই পুরাণের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক।

বাকি রইল তথাকথিত তামসিক পুরাণগুলির কথা। এখানে প্রথমেই মৎস্যপুরাণের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই পুরাণের প্রবক্তারূপে মৎস্যরূপী বিষ্ণুকেই কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিতে এটি কিছুটা শৈব। শ্লোকসংখ্যা চোদ্দ হাজারের কিছু বেশী। প্রসঙ্গের বিভিন্নতাও এই পুরাণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এটি মোটেই অর্বাচীন গ্রন্থ নয়। কূর্মপুরাণও কূর্মরূপী বিষ্ণু কর্তৃক কথিত। প্রকৃতির দিক থেকে বিষ্ণু এই পুরাণের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও এই পুরাণটিতে শিব ও দুর্গার কথাই বেশী। লিঙ্গপুরাণে লিঙ্গপূজার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শিবপুরাণকে অনেকে মহাপুরাণ বলে মানতে আপত্তি করেন, যদিও এই পুরাণ বিশালাকার এবং বেশ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। স্কন্দপুরাণ সকল পুরাণের মধ্যে বৃহত্তম যদিও তা একান্তই অর্বাচীন রচনা। দেখে যা মনে হয়, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকে 'স্কন্দপুরাণ' এই সাবিক নামের দ্বারা একত্র করা হয়েছে। তবে দেবতা স্কন্দ এই পুরাণের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে আছেন। এই পুরাণের বিভিন্ন খণ্ডগুলি যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রচিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, যেমন কাশীখণ্ড কাশীতে, আবন্ত্যখণ্ড অবন্তীতে, উৎকলখণ্ড উৎকলে, কুমারিকা খণ্ড কুমারিকায়, এই রকম। অগ্নি-পুরাণ একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণ, যা নামে অগ্নির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও আসলে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তনই এই গ্রন্থের উপজীব্য। এতে চিরাচরিত বিষয়বস্তু ছাড়াও রাজার কর্তব্য, যুদ্ধনীতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি থেকে আইনসমূহের সারাংশ, সুশ্রুত সংহিতার চিকিৎসা বিষয়ক অংশ, পাণিনির ব্যাকরণের কয়েকটি নিয়ম ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

উপপুরাণ—এই প্রসঙ্গে উপপুরাণগুলির কথাও কিছুটা বলবার আছে, কেননা রচনাকালের বিচারে সকল মহাপুরাণই যে সকল উপপুরাণের পূর্ববর্তী তা নয়, বরং কয়েকটি মহাপুরাণ রচনাকালের বিচারে এতই অর্বাচীন যে সেগুলিকে উপপুরাণের সামিল করা যায়। প্রচলিত মত অনুযায়ী মহাপুরাণের ন্যায় উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারোটি—সনৎকুমার, নরসিংহ, বৃহন্নারদীয়, শিবধর্ম,

দুর্বাসা, নন্দ (নন্দী), কপিল, বামন, উগ্র, মানব, বরুণ, মহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ, ভার্গব ও কালিকা। কিন্তু এই তালিকায় দেবীপুরাণ ও দেবীভাগবতের উল্লেখ নেই। শেষোক্ত তিনটি পুরাণ, অর্থাৎ কালিকা, দেবী ও দেবীভাগবতের অন্তর্দিক্ দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই তিনটি পুরাণই পরবর্তী কালে রচিত, একান্তভাবেই শাক্ত সম্প্রদায়ের নিজস্ব। অন্যান্য পুরাণে যেমন বিষ্ণু, শিব প্রমুখ দেবতাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিচয় আছে এই তিনটি পুরাণে তা নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেবী এক ও অদ্বিতীয়ারূপে বিরাজ করছেন। দেবীপুরাণ ও দেবীভাগবত নি:সন্দেহে বঙ্গদেশে বাঙালীর দ্বারা রচিত। কালিকাপুরাণ রচিত হয়েছে কামরূপ বা আসামে। লেখক অতি চতুর লোক ছিলেন এবং বহুক্ষেত্রেই দেবীর বর্ণনায় কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকে হুবহু টুকেছেন।

বিষয়বস্তু--আমরা প্রথমে বিভিন্ন পুরাণকথিত সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ করব। মোটামুটি এক্ষেত্রে সকল পুরাণের ছকই একরকম তবে যে পুরাণ যে সম্প্রদায়ের, সেই সম্প্রদায়ের পরমতম দেবতাটিই সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত। তিনিই আসল ব্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মহৎ বা বুদ্ধির সৃষ্টি করেন; বুদ্ধি থেকে অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্র (পার্থিব উপাদান) তথা এগারোটি ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি) ও মনের সৃষ্টি হয়। আর একটি কাহিনী অনুযায়ী ব্রহ্মা তাঁর মন থেকে তৈরী করেছিলেন যথাক্রমে দেবতা, অসুর, পিতৃগণ, মনুষ্য, প্রাণী ও উদ্ভিদাদি। তারপর তৈরী হলেন নয়জন ঋষি, রুদ্র নামক দেবতাশ্রেণী, স্বায়ম্ভুব মনু এবং শতরূপা নামক এক কন্যা। এই জাতীয় বহু ধরনের সৃষ্টিতত্ত্বই পুরাণে আছে। প্রতিটি সৃষ্টির আয়ুষ্কাল ব্রহ্মার একটি দিনের সমান এবং তা পৃথিবীতে চোদ্দজন মনুর রাজত্বকালের সমান।

এরপর পুরাণকথিত কল্প, মন্বন্তর, যুগ ইত্যাদির কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। মানুষের একবছর সমান দেবতাদের একটি দিন, দেবতাদের ১২,০০০ বছর অর্থাৎ মানুষের ৪,৩২০,০০০ বছরে চতুর্যুগ বা মহাযুগের পূর্ণতা ঘটে। চতুর্যুগ সত্য (কৃত), ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির সমাহার, এবং যুগাংশগুলি চার, তিন, দুই, এক এই অনুপাতে বর্তমান। সেই হিসাবে সত্যযুগের কাল ৪,৮০০ দেববর্ষ, ত্রেতাযুগের ৩,৬০০ দেববর্ষ, দ্বাপর যুগের ২,৪০০ দেববর্ষ এবং কলিযুগের ১,২০০ দেববর্ষ। মানুষের বছর হিসাব করতে গেলে প্রতিটি সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করলেই চলবে। দুটি যুগের মধ্যে দু'ধরনের ট্রানজিশান পিরিয়ড আছে। সত্যযুগের

৪০০ যুক্ত ৪০০ সমান ৮০০ বছর, অনুরূপভাবে ত্রেতাযুগের ৬০০ বছর, দ্বাপরের ৪০০ বছর এবং কলির ২০০ বছর। মন্বন্তর ও কল্পের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

প্রায় প্রতিটি পুরাণেই কিছু কিছু ভূবৃত্তান্ত আছে। সমগ্র পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত, এবং প্রতিটি দ্বীপ যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, দধি ইত্যাদি সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। এই সাতটি দ্বীপ হচ্ছে জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের একটি অংশে অবস্থিত যার উত্তরে হিমালয় এবং ভিতরে সাতটি পর্বত আছে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমৎ, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পরিপাত্র। এই সব পাহাড় থেকে নির্গত নদীগুলির নামও পুরাণে উল্লিখিত আছে। পুরাণ সমূহের ভৌগোলিক অংশ বিচার করলে দেখা যায় যে পুরাণকারদের ভৌগোলিক জ্ঞান বিশেষ ছিল না।

পুরাণসমূহের আর একটি বৈশিষ্ট্য বংশাবলী বর্ণনা। বৈবস্বতমনু থেকেই এই বংশাবলী বর্ণনার সূত্রপাত হয়েছে। মনুর দশ পুত্র যাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ইলা একই সঙ্গে পুরুষ এবং নারী ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁর বংশের দুটি শাখা সৌদ্যুম্ন এবং ঐল। অপর পুত্র ইক্ষ্বাকুর বংশ মধ্যদেশে রাজত্ব করেছিল। এইভাবে মনুর দশ পুত্রের বিস্তৃত বংশাবলীর পরিচয় বিভিন্ন পুরাণে দেওয়া হয়েছে। পৌরাণিক হিসাব অনুযায়ী মনু থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৯৫ পুরুষের। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরবর্তী কালের বিভিন্ন রাজবংশকে বর্ণনা করতে গিয়ে পুরাণে ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন রাজবংশের কথাও কোন কোন পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন গুপ্তবংশ বা আন্ধ্রবংশ।

বিভিন্ন পুরাণে বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের ধর্মব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তা খুবই চিত্তাকর্ষক। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বৈদিক দেবতাদের পতনটি ভাল করে লক্ষ্য করার মত। বেদের সকল প্রধান দেবতাই প্রায় পুরাণসমূহে তাৎপর্যহীন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই বিখ্যাত ইন্দ্র, বরুণ, উষা, অদিতি প্রমুখ দেবদেবীরা পুরাণে একেবারেই গৌণচরিত্রে পরিণত হয়েছেন। পক্ষান্তরে যে সব দেবতারা বেদে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেননি যেমন বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি, এঁরাই বিভিন্ন পুরাণে সকল দেবতার পুরোভাগে চলে এসেছেন। পরবর্তী কালে হিন্দুধর্ম পুরাণসমূহকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পুরাণে জৈন, বৌদ্ধ ও অপরাপর নাস্তিক মতবাদসমূহকেও নিন্দা করা হয়েছে, কেননা এগুলি পৌরাণিক ধর্মের আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। পৌরাণিক

ধর্মের প্রবণতা একেশ্বরবাদী। বৈষ্ণব পুরাণগুলিতে একমাত্র উপাস্যদেবতা বিষ্ণু, শৈবপুরাণসমূহে শিব, শাক্ত পুরাণসমূহে শক্তি। অপরাপর দেবতার অস্তিত্ব মেনে নিলেও যে পুরাণে যে দেবতাকে আশ্রয় করা হয়েছে সেই দেবতার কাছে অপর সকলে তুচ্ছ এমন ভাব দেখানো হয়েছে।

পুরাণ অনুযায়ী জীবনের উদ্দেশ্য চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্মপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিভিন্ন পুরাণে একমাত্র উপাস্য দেবতাটির গৌরবগান, পাপ ও তার শাস্তির অজস্র বিবরণ, নরকের বর্ণনা, বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা, বিভিন্ন ব্রত ও দানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থপ্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে বিশেষভাবে রাজধর্মের উপর লেখা হয়েছে। বিভিন্ন বৃত্তিরও অজস্র উল্লেখ পুরাণে আছে। কামপ্রসঙ্গে আছে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ও সেগুলির নিয়মসমূহ, স্ত্রীর কর্তব্য ইত্যাদি নানান ধরনের বিষয়। মোক্ষপ্রসঙ্গে আছে জ্ঞান ও ভক্তির কথা যেগুলির দ্বারা বহু জন্মান্তর পার হয়ে মুক্তিলাভ করা যায়। শৈব পুরাণগুলিতে যোগ সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে বৈষ্ণব পুরাণগুলিতে ভক্তির কথাটাই প্রাধান্য লাভ করেছে।[১]

১৮॥ সংস্কৃত নাটকের কথা

সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব ঠিক কবে ও কিভাবে হয়েছে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের স্রষ্টা হিসাবে ব্রহ্মার নাম করা হয়েছে এবং নাটককে পঞ্চম বেদরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নাটকের আদি উৎস পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের কথোপকথন সূক্তগুলির মধ্যে অন্বেষণ করেন, যেমন বিশ্বামিত্র ও নদীগণের কথোপকথন, যম ও যমীর কথোপকথন, উর্বশী ও

১। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদসহ সবকটি প্রধান পুরাণই পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদনায় বঙ্গবাসী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরাজী অনুবাদ যাঁরা যে পুরাণের করেছেন তার উল্লেখ এখানে করা হল। এম. এন. দত্ত: অগ্নি (১৯০১), ভাগবত (১৮৯৫), গরুড় (১৯০৮), বিষ্ণু (১৮৯৪); পার্জিটার: মার্কণ্ডেয় (১৯০৪); উইলসন: বিষ্ণু (পাঁচ খণ্ড, ১৮৬৪-৭০); স্বামী বিজ্ঞানানন্দ: ভাগবত (১৯২১-২৩): সুব্বারাও: ভাগবত (১৯২৮); জে. এম. সান্যাল (১৯৩০-৩৪); এছাড়া ভাগবত সম্পাদনা ও ফরাসী অনুবাদ করেছেন Burnouf, Hauvette-Besnault এবং Roussel (১৮৪০-৯৮)। Bibliotheca Indica থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত—অগ্নি (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ১৮৭৩-৭৯), কূর্ম (নীলমণি মুখোপাধ্যায়, ১৮৯০), লিঙ্গ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ১৮৮৫), মার্কণ্ডেয় (কে. এম. ব্যানার্জি, ১৮৬২), বায়ু (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দুইখণ্ড, ১৮৮০-৮৮)। বেঙ্কটেশ্বর প্রেস থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত স্কন্দ, ভবিষ্য (১৯১০), ব্রহ্মাণ্ড (১৯১৩), গরুড় (১৯০৬), পদ্ম (১৮৯৫), শিব, বিষ্ণু (১৮৮৯)। আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত—অগ্নি (১৯০০), পদ্ম (১৮৯৩-৯৪, চারখণ্ড), বায়ু (১৯০৫)।

ও পুরূরবার কথোপকথন, ইত্যাদি। গৃহ্যসূত্রসমূহে এবং মহাভারতে কিছু কিছু নাটকীয় সংলাপ আছে। পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে নটসূত্র কথাটির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় না যে তিনি নাটকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পণ্ডিতগুলি যে নাটক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র—ভরতের নাট্যশাস্ত্র সম্ভবত খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে বা তার পূর্বে রচিত হয়েছিল। মঞ্চ, অভিনয়, নৃত্য, গীত ইত্যাদির তাত্ত্বিক দিকসমূহের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। মোট ছত্রিশটি (পরবর্তী কালে আরও একটি সংযোজিত হয়েছে) অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থটি প্রাচীন যুগে বিশেষ আদৃত ছিল। নাট্যশাস্ত্রকে ভরত পঞ্চম বেদরূপে আখ্যাত করেছেন; নাটকের কাহিনী, চরিত্র এবং বিভিন্ন ভাবসমূহের উপর এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৈহিক ভাবভঙ্গী, তাদের বাচনভঙ্গী, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কি রকম হওয়া উচিত সে সকল বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। মঞ্চ, দৃশ্যপট ও দর্শকদের কথাও ভরত ভোলেন নি। নাটকের অঙ্গ হিসাবে কাব্য, ছন্দ সঙ্গীত ও নৃত্যের উপরও যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। রস, গুণ এবং অলংকারই হচ্ছে ভরতের মতে নাটকের সার্থকতার মাপকাঠি, যেগুলির মধ্যে আবার রসই প্রধান। রস বলতে তিনি ভাবকেই বোঝাচ্ছেন, যা তাঁর মতে আট ভাগে বিভক্ত। সংলাপের অলংকরণের জন্য তিনি ছত্রিশটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। সংলাপের কোন্ কোন্ স্থানে সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহৃত হবে, ভরত তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও ভাসের মত শক্তিমান্ নাট্যকারেরা তাঁর নির্দেশ মেনে চলেন নি। ভরত নিজেও স্বীকার করেছেন যে সব কিছুই বাঁধা ছক ধরে হওয়া সম্ভবপর নয়, এবং নাটকের দর্শকেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। নাটক অভিনীত হবার আগে পূর্বরঙ্গ নামক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ধ্রুপদী নাটকসমূহে ভরত বর্ণিত পূর্বরঙ্গ একান্তভাবেই অনুপস্থিত। নাট্যশাস্ত্রের উপর আরও একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তা অবশ্য অনেক পরবর্তী যুগে। গ্রন্থটির নাম দশরূপ, লেখক জনৈক ধনঞ্জয়।[১]

১। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

সংস্কৃত রঙ্গমঞ্চ—সংস্কৃত নাটকসমূহ বিশেষভাবে মঞ্চে অভিনয় করার জন্যই রচিত হত। প্রথমেই করা হত মঙ্গলাচরণ। প্রতিটি সংস্কৃত নাটকই কোন না কোন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনার পর অভিনীত হত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শিব বা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা হত। নাগানন্দ নাটকে অবশ্য বুদ্ধকে বন্দনা করা হয়েছে। এই প্রার্থনাকে বলা হত নান্দী। এটি আবৃত্তি করত মঞ্চের ম্যানেজার বা সূত্রধার। অতঃপর সূত্রধার নটনটীদের মঞ্চে নিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অভিনয়ের সাফল্যের জন্য দর্শকদের অগ্রিম শুভেচ্ছা চাইত। এই রীতি গ্রীক মঞ্চেও ছিল। এক একটি অঙ্ক যেন নাটকের এক একটি অধ্যায়। সকল অভিনেতারা মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেই একটি অঙ্কের সমাপ্তি হয়েছে এই রকম মনে করা হত। দুই অঙ্কের বিরতিকালকে বলা হত বিষ্কম্ভক বা প্রবেশক। ক্ষেত্রবিশেষে এই সময় একজন বক্তা নাটকের কাহিনীর সূত্রটি অক্ষুন্ন রাখার জন্য কাহিনীর কিছু অংশ স্বমুখে বিবৃত করত। বিভিন্ন রসের প্রয়োগ কয়েকটি নিয়ম শৃংখলার দ্বারা বাঁধা থাকত। অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পক্ষে তার বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মঞ্চে কখনোই যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো হত না। স্বগতোক্তির ক্ষেত্রে, জমজমাট প্রেমের দৃশ্যে বা আবেগদীপ্ত অংশসমূহে সাধারণত ছন্দোবদ্ধ সংলাপ ব্যবহার করা হত, অবশিষ্ট ক্ষেত্রে সাধারণ গদ্যেই পাত্রপাত্রীরা সংলাপ বলত। উচ্চবর্ণের চরিত্ররা সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলত, পক্ষান্তরে যেখানে পাত্র-পাত্রী একান্তই সাধারণ মানুষ, তাদের সংলাপের ভাষা ছিল প্রাকৃত। সংস্কৃত নাটকে তিন প্রকার প্রাকৃতের ব্যবহার ছিল শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী ও মাগধী। সংস্কৃত নাটকের চরিত্রসমূহ মূলত মানুষ, দেবতা ও অর্ধদেবতা, অপ্সরা, গন্ধর্ব ইত্যাদি নিয়ে রচিত হত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাস-বিখ্যাত পুরুষেরা নায়ক হয়েছেন (যেমন মুদ্রারাক্ষসে), কোথাও বা সাধারণ মানুষ (যেমন মৃচ্ছকটিকে)। নায়িকারা দু'ভাগে বিভক্ত—বধূ ও বারাঙ্গনা। রোমান্টিক নায়কেরা বেশীর ভাগই পূর্ব থেকে বিবাহিত, কিন্তু তার জন্য কুমারী নায়িকাদের সঙ্গে প্রেমে আটকাত না। কয়েকটি বাঁধা চরিত্র প্রতিটি নাটকেই থাকত, যথা বিদূষক, বিট এবং শকার। বিদূষকদের সঙ্গে সেক্সপীয়ারের ক্লাউনের তুলনা করা যায়, এরা নায়কের বিশস্ত সহচর, বুদ্ধিদাতা এবং নায়িকার সঙ্গে নায়কের মিলনের মধ্যস্থ। বিট হচ্ছে রাজসভার সাধারণ ভাঁড়। শকার হচ্ছে রাজার শ্যালক, কোন গৌণ পত্নীর ভ্রাতা। এদের কাজ ছিল রাজসভায় বসে থাকা এবং

মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে গরম গরম বক্তৃতা করা। এদের ভূমিকায় দর্শকেরা আনন্দ পেত। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষেই নাটক মঞ্চস্থ হত, কাজেই কোন্‌ বাঁধা ধরা মঞ্চ ছিল না। যে কোন একটা হলঘরেই অভিনয় করা চলত। মঞ্চে পর্দার ব্যবহার ছিল (অপ্তি-ক্ষেপণ)। হাতে আঁকা দৃশ্যাবলীও ব্যবহৃত হত। সাজঘর থাকত মঞ্চের পিছনে, যার নাম ছিল নেপথ্য। রাজসভাগৃহ, তপোবন ইত্যাদির দৃশ্যাবলী যত্নসহকারেই প্রস্তুত করা হত। বাস্তব অবস্থা দেখানোর জন্য মঞ্চে এমনকি রথ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত। নায়ক-নায়িকাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, মেক-আপ প্রভৃতির উপরেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হত।

অশ্বঘোষ : প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটকের যে পরিচয় আমরা পাই তা আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্য এশিয়ার তুরফান নামক স্থান থেকে। এই নাটকটি হচ্ছে অশ্বঘোষ বিরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ, এবং ওই একই লেখক রচিত আরও দুটি নাটকের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। শেষ দুটি নাটকের নাম অজ্ঞাত, তবে তাদের মধ্যে একটি রূপকধর্মী। বুদ্ধি, কীর্তি, ধৃতি প্রভৃতি এই নাটকের চরিত্রসমূহ। দ্বিতীয়টি সম্ভবত একটি প্রহসন যার চরিত্রসমূহের মধ্যে আছে একজন নায়ক, একজন বিদূষক, একটি দুষ্টলোক, একজন রাজকুমার ও দুজন বুদ্ধের শিষ্য, শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন। তবে নাটক দুটির অংশবিশেষ এত অল্প পরিমাণে পাওয়া গেছে যে তা থেকে নাটকের বিষয়বস্তু কি ছিল তা বোঝা যায় না।

অপরদিকে শারিপুত্রপ্রকরণ নামক নাটকটির শেষ অধ্যায়টুকু মাত্র পাওয়া গেছে। এই নাটকের কাহিনীটিতে মোটামুটি শারিপুত্রের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা-গ্রহণের কারণগুলি বর্ণিত হয়েছে। দীক্ষাগুরু হিসাবে বুদ্ধের কি যোগ্যতা আছে—এই প্রশ্ন শারিপুত্রের বন্ধু অশ্বজিৎ তাকে করেছিল এবং অপর একজন এই প্রশ্ন তুলেছিল যে ব্রাহ্মণ হয়ে সে কেন ক্ষত্রিয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করবে। উত্তরে শারিপুত্র জানিয়েছিল যে অসুস্থ মানুষ যেমন ঔষধগ্রহণের জন্য জাতিবিচার করে না, সেইরকম সেও বুদ্ধের নিকট দীক্ষাগ্রহণে কিছু আপত্তির কারণ দেখে না। তার যুক্তিতে মৌদ্‌গল্যায়নও মুগ্ধ হয় এবং তারা উভয়ে দীক্ষাগ্রহণের জন্য বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়। বুদ্ধ তাদের দীক্ষা দেন ও বলেন যে, তারা পরম জ্ঞান ও ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী হবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে বুদ্ধের সঙ্গে শারিপুত্রের একটি দার্শনিক সংলাপ আছে। শারিপুত্র-প্রকরণ নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে তা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের

নিয়মসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচিত হয়েছে। বিশুদ্ধ প্রকরণের নিয়ম অনুযায়ী নাটকটি নয় অঙ্কে রচিত। এই নাটকে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ, তথা নায়কদ্বয় সংস্কৃতে সংলাপ বলেছেন, শুধু বিদূষকের ক্ষেত্রে প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাস: ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাসের রচনাবলী জনসাধারণের নিকট অপরিচিত ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে শ্রীগণপতি শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ভাসের নামে কথিত তেরটি নাটক প্রকাশিত হয়। তবে নাটকগুলি যে ভাসেরই রচিত একথা হলফ করে বলার সময় এখনো আসেনি।

যাই হোক না কেন, এই নাটকগুলি আবিষ্কৃত হবার পূর্বেও ভাস নামক জনৈক নাট্যকারের নামের সঙ্গে পণ্ডিতেরা পরিচিত ছিলেন। কালিদাস তাঁর রচনায় পূর্বসূরী হিসাবে ভাসের উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকের প্রসিদ্ধ লেখক বাণভট্ট, অষ্টম শতকের বাক্‌পতি প্রভৃতি প্রধান লেখকেরা ভাসের উল্লেখ করেছেন। কাব্যমীমাংসা নামক গ্রন্থের রচয়িতা রাজশেখর, যিনি খ্রীষ্টীয় দশম শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ভাস সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তাঁর নাটকগুলির অগ্নিশুদ্ধি হয়েছিল যাতে একমাত্র স্বপ্নবাসবদত্তাই অদগ্ধ ছিল। ভাসের নামে আরোপিত রচনাবলীর ভাষার ধরন দেখে এবং আরও অন্যান্য বহুপ্রকার সাক্ষ্য মিলিয়ে পণ্ডিতেরা ৩০০ খ্রীষ্টাব্দকে ভাসের যুগ বলে বর্ণনা করেছেন।

বিষয়বস্তু অনুসারে ভাসের নাটকগুলিকে মোট চারভাগে বিভক্ত করা যায়। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে ভাস পাঁচটি একাঙ্ক নাটক রচনা করেছিলেন। এই পাঁচটি নাটক হল মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার এবং উরুভঙ্গ।

মধ্যমব্যায়োগ নাটকটির শুরু হচ্ছে একটি ব্রাহ্মণের আর্ত চিৎকার দিয়ে। এই ব্রাহ্মণটি তার স্ত্রী ও তিন পুত্রকে নিয়ে বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথে ঘটোৎকচ নামক জনৈক রাক্ষস নরমাংসের জন্য তাদের আটক করে। এই ঘটোৎকচ হচ্ছে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পুত্র। ভীম হিড়িম্বা নামক এক রাক্ষসীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তারই গর্ভে এই ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারটি ঘটোৎকচ কর্তৃক ধৃত হবার পর শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল যে ঘটোৎকচ তাদের ছেড়ে দেবে এবং বিনিময়ে ওই ব্রাহ্মণ তার মধ্যম পুত্রকে ঘটোৎকচের হাতে সমর্পণ করবে। তখন ঘটোৎকচ মধ্যম পুত্রটিকে নেবার

জন্য 'ওহে মধ্যম, এদিকে এস' বলে ডাকাডাকি শুরু করে। ঘটনাচক্রে সেই বনপথ দিয়ে ভীম কোথাও যাচ্ছিলেন। ভীম মধ্যম পাণ্ডবরূপে পরিচিত, কাজেই 'মধ্যম এদিকে এস' এই ডাক শুনেই তিনি ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনে ঘটোৎকচকে বললেন, "ওহে বাপু, ব্রাহ্মণপুত্রটিকে ছেড়ে দাও।" ঘটোৎকচ রাজী হল না, কেননা তার মায়ের জন্য সে খাদ্য-সংগ্রহে বেরিয়েছিল। ভীম জানতেন না যে এই ঘটোৎকচ তাঁরই পুত্র। অনেক বিতণ্ডা, যুদ্ধবিগ্রহের পর সাব্যস্ত হল যে ওই ব্রাহ্মণপুত্রের বদলে ভীমই রাক্ষসীর আহারের সামগ্রী হয়ে যাবেন। ভীমকে নিয়ে ঘটোৎকচ তার মায়ের সামনে হাজির হল। তখন সকলেই সকলকে চিনল এবং সমগ্র বিষয়টির মিলনাত্মক সমাধান ঘটল। ব্রাহ্মণপুত্রটিও ছাড়া পেল।

এই ঘটোৎকচ ভাসের আরও একটি একাংক নাটকের নায়ক যার নাম দূতঘটোৎকচ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবদের তরফ থেকে একটি শান্তির প্রস্তাব নিয়ে দূত হয়ে কৌরবসভায় ঘটোৎকচ উপস্থিত হয়। সেখানে কৌরবগণ তাকে অপমানিত করার ফলে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে কৌরবদের আসন্ন ধ্বংস সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সেইগুলিই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

দূতবাক্য নামক নাটকের কাহিনীও মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে। পাণ্ডবদের দূত হয়ে কৃষ্ণ এসেছেন কৌরবদের সভায়, এদিকে দুর্যোধন নিষেধ করেছেন যাতে কৃষ্ণের প্রতি কোন সম্মান না দেখানো হয়। তা ছাড়া তাঁকে অধিকতর অপমানিত করার জন্য দ্রৌপদীর নিগ্রহের একটি চিত্রও টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। কৃষ্ণ সভাগৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে দুর্যোধনের পতন হল যা সকলেই দুর্লক্ষণ বলে মনে করলেন। কৃষ্ণ সভায় সকলকে কুরু পাণ্ডবের মধ্যে শান্তির জন্য বিশেষ করে বোঝালেন। দুর্যোধন তো তাঁর কথা শুনলেনই না উপরন্তু তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা করলেন। পাপিষ্ঠ কৌরবদের সাজা দেবার জন্য কৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রগুলিকে স্মরণ করলেন, শেষ পর্যন্ত অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের আকুল আবেদনে তিনি শান্ত হলেন।

কর্ণভার নাটকের সূচনায় দেখা যাচ্ছে যে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর সারথি মদ্ররাজ শল্যকে তিনি বলছেন তাঁর গুরু পরশুরামের অভিশাপের কথা। পরশুরাম কর্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর চরমতম সংকটকালে তাঁর সমুদয় অস্ত্র কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে।

কর্ণের ছিল সহজাত কবচকুণ্ডল যার জন্য তিনি ছিলেন অবধ্য। অর্জুনের মঙ্গলার্থে ইন্দ্র জনৈক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের নিকট সেই কবচকুণ্ডল প্রার্থনা করলেন। কর্ণ তৎক্ষণাৎ তা দান করলেন। তার পরেই শল্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়লেন এবং অর্জুনের রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা গেল। এইখানেই নাটকের সমাপ্তি।

ভাসের পঞ্চম একাংক নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক, নাম উরুভঙ্গ, কাহিনী পূর্বের চারটি নাটকের মতই মহাভারত থেকে সংগৃহীত। গদাযুদ্ধে রাজা দুর্যোধন উরুভঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর নাবালক শিশুপুত্রটিকে সেই যন্ত্রণাকর অবস্থার মধ্যেও আদর করছেন। তাঁর পিতামাতা ও পত্নীরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন, দুর্যোধন তাঁদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন। দুর্যোধনের নিষেধ সত্ত্বেও অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। উরুভঙ্গ নাটকের এই হল বিষয়বস্তু।

মহাভারত অবলম্বনে ভাস আরও একটি নাটক রচনা করেছিলেন যার নাম পঞ্চরাত্র। আসন্ন কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের ফলাফল চিন্তা করে এই দুই শক্তির মধ্যে মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন উভয় পক্ষেরই রণগুরু দ্রোণ। তাঁর উপদেশে দুর্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন এবং যজ্ঞশেষে দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। দুর্যোধনের নিকট থেকে তখন দ্রোণ অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে তা তিনি পাণ্ডবদের দেবেন। দুর্যোধন এই শর্তে রাজী হলেন যে, দ্রোণ পাঁচদিনের মধ্যে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সংবাদ এনে দেবেন, কেন না বারো বছর বনবাসের পর পাণ্ডবদের তখন এক বছর অজ্ঞাতবাসের পালা চলছে। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়েই সন্দেহ করছেন যে পাণ্ডবেরা নিশ্চয়ই মৎস্যরাজ বিরাটের রাজ্যে আছেন। বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের রহস্যজনক মৃত্যুই এই সন্দেহের কারণ এবং তাকে হত্যার পিছনে ভীমের হাত আছে এটা উভয়েরই বিশ্বাস। কাজেই এ বিষয়ে অধিকতর অবগত হবার জন্য তাঁরা বিরাট রাজার রাজ্য আক্রমণ করলেন। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে কুরুবাহিনী সেই আক্রমণ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। এবং সেই যুদ্ধে ভীম ও অর্জুন রাজা বিরাটের পক্ষে লড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যদিও দুর্যোধনের কাছে তা নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে হল না।

ভাসের আর একটি নাটক বালচরিত হরিবংশ নামক গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণের

জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত। কৃষ্ণের জন্ম ও তাঁর অলৌকিক কার্যাবলী থেকে আরম্ভ করে কংসবধে এই নাটকের সমাপ্তি হয়েছে। এটি একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রথম অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের জন্মকথা; দ্বিতীয় অঙ্কে কংসের কারাগার থেকে শিশু কৃষ্ণকে অন্যত্র প্রেরণের কাহিনী; তৃতীয় অঙ্কে গোপ-গৃহে কৃষ্ণের বাস, দৈত্য ও রাক্ষস বধ, গোপীগণের সঙ্গে বিহার; চতুর্থ অঙ্কে কালীয়দমন; পঞ্চম অঙ্কে কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা গমন ও কংসবধ।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ভাস দুটি নাটক লিখেছেন। প্রথমটি হচ্ছে প্রতিমানাটক। রামায়ণের সমগ্র কাহিনীটুকুই এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে তবে কয়েকক্ষেত্রে নাট্যকার কাহিনীর একটু অদলবদল করেছেন। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এখানে একটি হলঘরে রঘুবংশীয় মৃত রাজাদের মূর্তির পাশে মৃত দশরথের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং ভরতকে তা দেখানো হয়েছে। সীতাহরণের কাহিনীটিও এই নাটকে ভিন্নরূপে পরিবেশিত হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে বনবাসকালে রাম পিতৃশ্রাদ্ধ করছেন, এবং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাবণ সেখানে পৌরোহিত্য করছে। পরিশেষে সে রামলক্ষ্মণকে আদেশ করল একটি স্বর্ণমৃগ ধরে আনতে যা রামচন্দ্রের পিতার আত্মার উদ্দেশ্যে দান করা হবে। সেই ফাঁকে রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিল। রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানোর ব্যাপারে কৈকেয়ীর প্রতি নাট্যকার নরম মনোভাব অবলম্বন করেছেন, কেন না দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণ হারাবেন সে তো আগে থেকেই একজন ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কৈকেয়ী রামকে মাত্র চোদ্দ দিনের জন্য বনে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুখ ফসকে তিনি চোদ্দ বছর বলে ফেলেছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় ভরতও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না। তিনিও রামের সাহায্যার্থ একটি বিরাট বাহিনী লঙ্কায় প্রেরণ করেছিলেন।

রামায়ণ অবলম্বনে ভাসের দ্বিতীয় নাটকটির নাম অভিষেক। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডকে অবলম্বন করে এই নাটক রচিত। রামের হাতে বালির মৃত্যু, হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ, সীতার অনুসন্ধান, সেতুবন্ধ, রাবণ কর্তৃক সীতাকে রাম-লক্ষ্মণের নকল মুণ্ড প্রদর্শন, রাবণ বধ ও রামের অভিষেক—এইগুলিই হচ্ছে আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু।

ভাসের অবশিষ্ট নাটকগুলি বিভিন্ন প্রাচীন আখ্যানসমূহকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এই নাটকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অবিমারক।

এই নাটকের কাহিনী হচ্ছে এই যে ঋষি দীর্ঘতমার অভিশাপে সৌবীররাজ বিষ্ণুসেন এক বছরের জন্ত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই সময় তাঁর পুত্র রাজা কুন্তীভোজের রাজ্যে বাসকালে অবি নামক এক অসুরকে বধ করে অবিমারক নামে পরিচিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি রাজকন্তা কুরঙ্গীকে মত্তহস্তীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, এবং এর ফলে রাজা কুন্তীভোজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অবিমারকের হস্তে কুরঙ্গীকে সমর্পণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু পরে যখন জানা গেল যে অবিমারক নীচ জাতি তখন রাজা মত পরিবর্তন করলেন। ইতিমধ্যে কুরঙ্গীর সঙ্গে অবিমারকের প্রেম অধিকতর জোরালো হয়েছে। একজন ধাত্রীর সহায়তায় কুরঙ্গীর সঙ্গে প্রতি রাত্রে তার গোপন মিলনও চলছে। কিন্তু একদিন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন উপায়ান্তর না দেখে অবিমারক আত্মহত্যার জন্ত প্রস্তুত হলেন। হঠাৎ একটি বিদ্যাধরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাঁকে একটি অঙ্গুরী দিলেন, এর সাহায্যে তিনি প্রতি রাত্রেই কুরঙ্গীর সঙ্গ পেতে পারেন। শেষ পর্যন্ত নারদের মধ্যস্থতায় অবিমারকের সঙ্গে প্রকাশ্যেই কুরঙ্গীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকের কথা। এই নাটকটি গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত বৃহৎকথা গ্রন্থের একটি আখ্যান অবলম্বনে চার অঙ্কে রচিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। বৎসদেশের রাজা উদয়ন মৃগয়ায় যাত্রা করেছিলেন। তিনি বীণাবাদনেও বিশেষ পটু ছিলেন এবং তার দ্বারা তিনি মত্তহস্তীকেও বশ করতে পারতেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অবন্তীর রাজা প্রদ্যোত মহাসেন একটি নকল হস্তী নির্মাণ করে তাঁর পথে রেখেছিলেন, এবং উদয়ন সেটা বুঝতে না পেরে বীণা বাজিয়ে সেই নকল হস্তীকে বশীভূত করার চেষ্টায় ছিলেন, সেই অবসরে প্রদ্যোতের লোকজন তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায়। প্রদ্যোতের মতলবই ছিল যে তিনি তাঁর কন্তা বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দেবেন, এবং যাতে উভয়ের মধ্যে প্রেম জন্মায় তার জন্য আগে থেকেই এই ব্যবস্থা। বন্দী অবস্থায় উদয়ন বাসবদত্তাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এদিকে উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ চোরের উপর বাটপাড়ি করলেন এবং বাসবদত্তা সহ উদয়নকে প্রদ্যোতের রাজভবন থেকে বার করে নিয়ে এলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটার মধুরতম নিষ্পত্তি ঘটল।

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা বা স্বপ্ননাটক পূর্ববর্তী নাটকটিরই অনুস্মৃতি

আরুণি নামক জনৈক ব্যক্তির বিদ্রোহের ফলে রাজা উদয়ন সিংহাসনচ্যুত হন। তখন উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাঁর কাছে প্রস্তাব করেন যে তিনি যেন মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করে হৃত সিংহাসনে মগধরাজশক্তির সহায়তায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু উদয়ন পত্নী বাসবদত্তাকে পরিত্যাগ করতে রাজী হলেন না। ফলে ওই মন্ত্রী বাসবদত্তাকে বুঝিয়ে বললেন যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই বিবাহ উদয়নের করা উচিত এবং এই বিষয়ে তিনি বাসবদত্তার সাহায্য চাইলেন। বাসবদত্তা রাজী হলে তিনি তাঁকে নিজ ভগিনী পরিচয় দিয়ে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর হেপাজতে রেখে এলেন। এদিকে তিনি খবর রটিয়ে দিলেন যে তিনি ও বাসবদত্তা দাবানলে দগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। তখন বাধ্য হয়েই রাজা উদয়ন পদ্মাবতীকে বিবাহ করে মগধ-রাজশক্তির সহায়তায় সিংহাসনে পুনরায় আসীন হওয়া মনস্থ করলেন। পদ্মাবতী উদয়নকে ভালবাসতে রাজী ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি জানলেন যে উদয়নের মনোরাজ্য জুড়ে তখনো বাসবদত্তা বিরাজ করছে তখন তাঁর মাথার যন্ত্রণা হতে শুরু করল। সেই যন্ত্রণা উপশম করার জন্য উদয়ন পদ্মাবতীর কক্ষে হাজির হলেন। সেখানে পদ্মাবতীকে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে বাসবদত্তা, যিনি পদ্মাবতীর আশ্রয়েই ছিলেন, সেই কক্ষে এসে হাজির হলেন, এবং ঘুমন্ত উদয়নকে পদ্মাবতী মনে করে তাঁর পাশে বসে রইলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় উদয়ন তখন বাসবদত্তারই স্বপ্ন দেখছেন এবং স্বপ্নাবস্থায় উদয়ন তাকেই উদ্দেশ্য করে নিজের ভালবাসার কথা বলে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ তা শোনার পর বাসবদত্তা সেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পরদিন প্রভাতে সংবাদ এল যে তাঁর নতুন আত্মীয়দের সহায়তায় উদয়নের জয়লাভ ঘটেছে, এবং অবন্তীরাজ প্রদ্যোত মহাসেন উদয়ন ও বাসবদত্তার দুটি প্রতিকৃতি পাঠিয়ে উদয়নকে অভিনন্দিত করেছেন। বাসবদত্তার প্রতিকৃতি দেখেই পদ্মাবতী চিনতে পারলেন যে এই সেই মেয়ে যাকে তাঁর হেপাজতে রেখে যাওয়া হয়েছে। ওদিকে উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ঘটনাস্থলে হাজির হলেন, এবং কেন তিনি নিজের ও বাসবদত্তার মৃত্যুর কাহিনী রটিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করে বললেন।

স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকটি রীতিমত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং রাজশেখরের মত পরবর্তী কালের লেখকেরা যে এই নাটকের সঙ্গে রীতিমত পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। ভাসের অবশিষ্ট নাটকটি হচ্ছে চারুদত্ত।

এটি চার অঙ্কে রচিত। অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই নাটকের অনুলিপি পাওয়া গেছে। বিষয়বস্তু হচ্ছে দরিদ্র বণিক চারুদত্ত ও নটী বসন্তসেনার প্রণয়। এই কাহিনীটিই আবার পরবর্তী কালের মৃচ্ছকটিক নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে।

সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে ভাসই সর্বাধিক লিখেছেন। রচনাশৈলীর বিচারে ভাস ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নিয়মাবলী উৎকটভাবে লঙ্ঘন করেছেন। প্লট রচনায় তিনি বহুক্ষেত্রেই কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেছেন। অলৌকিক ঘটনাবলীও তাঁর নাটকসমূহে বিশেষভাবে উপস্থিত। ভাসের সংস্কৃত মূলত পাণিনি অনুসারী, তবে কয়েক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। বহুক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজনে তিনি ব্যাকরণ লঙ্ঘন করেছেন। ভাস-ব্যবহৃত প্রাকৃত শৌরসেনী ধরনের।[১]

শূদ্রক: রাজা শূদ্রককে মৃচ্ছকটিক নামক বিখ্যাত নাটকের রচয়িতা হিসাবে মনে করা হয়। কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্যের মত রাজা শূদ্রকও একটি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তিনি কখন, কোন্ যুগে, কোথায় রাজত্ব করেছেন তা জানার কোন উপায় আপাতত নেই। ওই নাটকেই বলা হয়েছে যে শূদ্রক বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি একশত বৎসর দশ দিন বয়সে অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। স্কন্দপুরাণ, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, কথাসরিৎসাগর ও রাজতরঙ্গিণীতে শূদ্রকের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শূদ্রক অথবা তাঁর রচিত মৃচ্ছকটিক নাটকের তারিখ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। এমন কি এই নাটকটি কালিদাসের পরে বা পূর্বে রচিত হয়েছিল সে বিষয়েও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়, যদিও অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে শূদ্রক কালিদাস-পূর্ববর্তী। মৃচ্ছকটিক নাটকের প্লটের জন্য নাট্যকার নিঃসন্দেহে ভাসের নিকট ঋণী। কিন্তু ভাস যেখানে বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেখানে শূদ্রক চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেমকাহিনীর পিছনে একটি রাজনৈতিক কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। সেই কাহিনীটি হচ্ছে চারুদত্তের বন্ধু আর্যকের সিংহাসনলাভের কাহিনী। বহুবিধ ঘটনার দ্বারা নাটকটি বিবৃত যেগুলির মধ্য দিয়ে চারুদত্তের মানসিক ঔদার্য এবং গণিকা বসন্তসেনার নির্মল প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকটির নামকরণ হয়েছে

১। দ্রষ্টব্য A. D. Pusalker বিরচিত Bhasa—A Study (১৯৪০)। ভাসের নাটকাবলীর সম্পাদনা করেছেন গণপতি শাস্ত্রী, (১৯১২-১৫) যা Trivandrum Sanskrit Series-এর তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অঙ্কের একটি দৃশ্য থেকে যেখানে দরিদ্র চারুদত্তের পুত্র একটি মৃত্তিকানির্মিত খেলনাগাড়ীর জন্য বায়না ধরেছে। নাটকটির পরিণতি মিলনান্তক। মৃচ্ছকটিক আসলে একটি দশ অঙ্কের প্রকরণ। কাহিনী উদ্ভাবনের এবং বহু বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতা নাট্যকারের আশ্চর্য। এই নাটকের বাস্তব-ধর্মিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এই নাটকে পাওয়া যায়। এই নাটকের প্রাকৃত সংলাপগুলি বৈচিত্রের দিক্ থেকে অতুলনীয়। বহুধরনের প্রাকৃত এতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ভরত কথিত নাট্যশাস্ত্রের আদর্শ এই নাটকে অনুসৃত হয়েছে।[১]

কালিদাস: ইংলণ্ডের শেক্সপীয়ারের মতই কালিদাস একটি রহস্য যাঁর জীবন ও জীবনকাল সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছুই বলা সম্ভবপর নয়। কালিদাসের জীবন সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত আছে, যেমন কালিদাস প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন, পরে দেবীর কৃপায় সর্ববিদ্যাবিশারদ হন এবং সিংহলে জনৈক গণিকার গৃহে পরলোকগমন করেন। তিনি নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার একজন সদস্য ছিলেন, ইত্যাদি। ঐতিহাসিক-মহলেও কালিদাস সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। সেগুলির মধ্যে আপাতত প্রবেশ না করে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তিনি গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে স্থান দেওয়া যায়। কালিদাসের রচনাবলী থেকে এটুকু প্রতীয়মান হয় যে তিনি অশ্বঘোষের রচনাবলী এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মান্দাসোর লেখমালায় কালিদাসের রচনাবলীর কিছুটা পরোক্ষ প্রভাব আছে। তাঁর রচনাবলী পাঠ করে এটুকু বোঝা যায় যে ধর্মবিশ্বাসের দিক্ থেকে তিনি শৈব ছিলেন এবং তিনি ভারতের বহুস্থান পর্যটন করেছিলেন। কালিদাস ছিলেন একই সঙ্গে কবি ও নাট্যকার। কবি হিসাবে তাঁর পরিচয় আমরা পরবর্তী নিবন্ধে উল্লেখ করব।

কালিদাসের সর্বাধিক বিখ্যাত নাটক হচ্ছে শকুন্তলা এবং এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যান অবলম্বনে কালিদাস এই নাটক রচনা করেছেন। তবে তিনি অন্ধভাবে মহাভারতকে অনুসরণ করেন নি, বহুক্ষেত্রেই নিজস্ব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। মহাভারতে আছে

১। সম্প্রতি মৃচ্ছকটিকের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, অনুবাদক শক্তিজিৎ দাশগুপ্ত।

রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পরিচয় হয়েছিল যখন শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বমুনি ফুল তোলার জন্ত আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কালিদাস তাঁকে দীর্ঘদিনের জন্ত কাশ্যোপলক্ষে আশ্রমের বাইরে পাঠিয়েছেন। মহাভারতে শকুন্তলা নিজের পরিচয় ও জন্মকাহিনী নিজেই দুষ্মন্তের নিকট বলেছেন, কিন্তু কালিদাসের নাটকে তা অনসূয়াকে দিয়ে বলানো হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রেমের মধ্যে কিছুটা দর-কষাকষির চিহ্ন আছে, কিন্তু এ সমস্ত কালিদাসে অনুপস্থিত। দুর্বাসার অভিশাপ, শকুন্তলার অঙ্গুরী হারিয়ে যাবার কাহিনী, মাছের পেট থেকে তার উদ্ধার এবং নাটকের শেষ অঙ্ক কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টি। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কালিদাস মধুরভাবে নাটকের পরিণতি টেনেছেন। এ ছাড়া নাটকটির সর্বাঙ্গ জুড়ে আছে প্রকৃতির প্রতি নাট্যকারের অসীম ভালবাসা ও সংলাপের কাব্যময়তা। ভুললে চলবে না যে কালিদাস একজন মহাকবি ছিলেন। এই সব কারণে পণ্ডিতেরা শকুন্তলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন।

শকুন্তলার পরেই উল্লেখ করতে হয় কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের কথা। সম্ভবত এই নাটকটিই কালিদাসের প্রথম রচনা। নাটকের নায়িকা মালবিকা ছিলেন বিদর্ভ দেশের রাজকন্তা এবং তিনি ছিলেন মগধরাজ অগ্নিমিত্রের ভাবী বধূ। শত্রুহস্তে মালবিকার ভ্রাতা মাধবসেন বন্দী হলে মালবিকা অগ্নিমিত্রের সন্ধানে বিদিশার দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথে এক দস্যুদলের হাতে বন্দিনী হন। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পলায়ন করে তিনি বিদিশায় উপস্থিত হন এবং অগ্নিমিত্রের অন্যতমা পত্নী ধারিণীর গৃহে পরিচারিকারূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে খুব সহজেই তিনি রাজা অগ্নিমিত্রের দৃষ্টিপথে পড়ে যান এবং উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়ের সঞ্চার হয়। অগ্নিমিত্রের প্রথমা পত্নী ধারিণী অবশ্য ব্যাপারটাকে মেনে নেন, কিন্তু অশান্তি আসে কনিষ্ঠা পত্নী ইরাবতীর দিক থেকে। এইভাবে অন্তঃপুরে শুরু হয় একটি চক্রান্তের খেলা। শেষ পর্যন্ত এমন দুটি ঘটনা ঘটে যাতে অগ্নিমিত্রের সঙ্গে মালবিকার মিলনের পথ সুগম হয়ে যায়। বিদর্ভ থেকে সংবাদ আসে যে মালবিকার ভ্রাতা মাধবসেন শত্রুর হাত থেকে মুক্তিলাভ করে পুনরায় সিংহাসনে আসীন হতে পেরেছেন, এবং অগ্নিমিত্রের পিতা পুষ্যমিত্র যবনদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। সেই উপলক্ষে জানা গেল যে মালবিকা আসলে

দাসী নয়, বিদর্ভরাজকন্যা। বিষয়টির মধুর সমাপ্তি ঘটল। এই নাটকে চরিত্রের সংখ্যা অজস্র, এবং পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্র নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক চরিত্র। ওই নামের রাজারা শুঙ্গবংশীয় ছিলেন এবং মগধে রাজত্বও করেছিলেন। কালিদাসের প্রথম নাটক হিসাবে কিছু ত্রুটিও এখানে আছে। এই নাটকে সবচেয়ে বেশী যে চরিত্রটি ফুটেছে তা হল বিদূষকের চরিত্র। প্রেমের বিষয়ে সে-ই অগ্নিমিত্রের প্রধান মন্ত্রণাদাতা, এবং ঘটনাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ায় তার অবদান অনেকখানি।

কালিদাসের তৃতীয় নাটকটির নাম বিক্রমোর্বশী। শকুন্তলার মত সর্বাঙ্গ-সুন্দর না হলেও সুপরিপক্ব লেখনীর প্রভাব এই নাটকের সর্বত্র। উর্বশী ও পুরূরবার প্রেমকাহিনী রীতিমত পুরাতন। এই কাহিনীর আদি উৎস ঋগ্বেদ। পুরাতন কাহিনীটিকে কালিদাস নতুন করে বর্ণনা করেছেন। স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামে একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল যেখানে অভিনেত্রী উর্বশী সংলাপ বলার সময় ভুল করে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করে ফেলে। সেই অপরাধে তাকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হতে হয়। তারপর মর্তে উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার প্রণয় এবং বিচ্ছেদের চিত্র নাটকে অপূর্বভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে চতুর্থ অঙ্কে বিচ্ছেদবেদনায় বিলাপরত পুরূরবার যে চিত্র কালিদাস অঙ্কন করেছেন, তা একমাত্র মহাকবির পক্ষেই সম্ভব। উর্বশী-পুরূরবার মূল কাহিনীটি বিয়োগান্ত হলেও কালিদাসের নাটকে কিন্তু ভিন্নতর পরিণতি দেখানো হয়েছে। দানবগণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য দেবতাদের রাজা পুরূরবার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেই হিসাবে কাহিনীটিকে মিলনাত্মক করতে নাট্যকারের কোন অসুবিধা হয়নি। বিক্রমোর্বশী নাটকে প্লট রচনার চেয়েও কালিদাস চরিত্রসৃষ্টির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বিক্রমোর্বশী কালিদাসের সর্বপ্রথম রচিত নাটক। কালিদাসের কবিপ্রতিভার কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করব।[১]

১। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ বহু পণ্ডিতের দ্বারাই সম্পাদিত ও অনূদিত হয়েছে। সম্পাদনা প্রসঙ্গে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন Monier-Williams (১৮৭৬), R. Pischel এবং C. Cappeller (১৯২২) এবং K. Burkhard (১৮৮৪); প্রথম ইংরাজী অনুবাদ William Jones (১৭৯০)। মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীর সম্পাদনা করেছেন S. P. Pandit (১৮৮৯, ১৯০১), প্রথমটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন C. H. Tawney (১৮৯১) এবং দ্বিতীয়টির E. B. Cowell (১৮৫১)। সমগ্র কালিদাসরচনাবলী বঙ্গানুবাদসহ বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

ভবভূতি : কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী নিঃসন্দেহে ভবভূতি যিনি শ্রীকণ্ঠ এবং উদুম্বর নামেও পরিচিত। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতার নাম জাতুকর্ণী, জন্মস্থান বিদর্ভের অন্তর্গত পদ্মপুর। তিনি অষ্টম শতকের প্রথম দিককার মানুষ ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং ন্যায়দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভবভূতি মোট তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে দুটি রামায়ণ অবলম্বনে রচিত এবং তৃতীয়টি দশ অঙ্কে বিরচিত একটি প্রকরণ যার বিষয়বস্তু সামাজিক। মহাবীরচরিত নামক সপ্তাঙ্ক নাটকে তিনি রামের প্রথম জীবনের কাহিনীসমূহ বর্ণনা করেছেন। তাঁর সর্বশেষ নাটক উত্তররাম চরিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। এটিও সাতটি অঙ্কে বিভক্ত, রামচন্দ্রের শেষজীবনের কাহিনীই এতে স্থান পেয়েছে। তাঁর তৃতীয় নাটক মালতীমাধব মালতী এবং মাধবের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকটিকে 'রোমিও ও জুলিয়েটের' ভারতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে, যদিও এর পরিণতি পূর্বোক্ত নাটকের মত বিয়োগান্ত নয়। ভবভূতির উত্তররাম-চরিতের বিষয় অবলম্বনে তাঁর বহু পূর্বে জনৈক ধীরনাগ (আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) ছয় অঙ্কে একটি নাটক লিখেছিলেন বলে কথিত আছে। নাট্যকার হিসাবে ভবভূতি ছিলেন রীতিমত শক্তিমান, বিশেষ করে করুণ রসসৃষ্টিতে তিনি কালিদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ভবভূতির কল্পনায় প্রেম কিছুটা অধ্যাত্মধর্মী, নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার ছাড়াও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। হাস্যরস ভবভূতিতে নেই, এবং সংস্কৃত নাটকের বাঁধা বিদূষক চরিত্রটি তিনি ছেঁটে দিয়েছেন। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ গদ্য সংলাপ তাঁর রচনার বিশেষত্ব যা থেকে মনে হয় মঞ্চে অভিনয়ের চেয়ে নাটকগুলিকে পাঠযোগ্য করে তোলাই লেখকের অভিপ্রায় ছিল।[১]

শ্রীহর্ষ : কনৌজরাজ শ্রীহর্ষবর্ধন পণ্ডিত এবং সুলেখক ছিলেন এবং কথিত আছে তিনি রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ নামে তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে হর্ষ এগুলি নিজে লেখেন নি,

১। মহাবীরচরিতের সম্পাদনা করেছেন টোডরমল (১৯২৮) ও ইংরাজী অনুবাদ করেছেন J. Pickford (১৮৯২); মালতীমাধবের সম্পাদনা করেছেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর (১৮৭৬): উত্তররামচরিতের টীকা ও ভূমিকাসহ সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন শ্রীপাদ কৃষ্ণ বেলভলকর (১৯১৫, ১৯২১), এবং পৃথকভাবে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন C. H. Tawney (১৮৭১)।

কেন না তাঁর রাজসভায় বাণভট্ট, ময়ূর, দিবাকর প্রমুখ পণ্ডিতের অভাব ছিল না এবং এঁদের মধ্যে কেউ হয়ত হর্ষকে খুশী করার জন্য তাঁর নামে এগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা পোষণ করার মত সত্যই কোন কারণ নেই। তিনটি নাটকই যে একই ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হর্ষের কবিখ্যাতির কথা স্বয়ং বাণভট্ট উল্লেখ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং হর্ষবর্ধনের নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখেছিলেন। নাগানন্দ পাঁচ অঙ্কে বিখ্যাত জীমূতবাহনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যদিও রচনাটির উপরে বৌদ্ধধর্মের প্রলেপ আছে, তথাপি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীও এখানে স্থান পেয়েছে। পণ্ডিতদের মতে এই নাটকটি হর্ষের সর্বশেষ রচনা। এই রচনায় নাট্যকারের মৌলিকত্বের প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু তাঁর অপর দুটি নাটক রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের অনুকরণে রচিত, এবং দুটি নাটকের প্লটই একরকম, রাজপ্রাসাদে ছদ্মপরিচয়ে আশ্রিতা ভিন্নদেশীয় রাজকুমারীর সঙ্গে রাজার প্রণয়, তাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তি ও নানারূপ চক্রান্ত এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে নায়িকার পরিচয় প্রকাশ ও রাজার সঙ্গে বিবাহ এবং রাজমহিষী কর্তৃক সপত্নীকে স্বীকৃতি প্রদান। রত্নাবলীর তুলনায় প্রিয়দর্শিকা অধিকতর পরিপক্ক রচনা। এখানে নাট্যকার নাটকের মধ্যে একটি গর্ভনাটকের সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ মূল নাটকের মধ্যে আরও একটি নাটকের অভিনয়) যা সংস্কৃত নাটকে একটি মৌলিক সংযোজন। একমাত্র ভবভূতির উত্তররামচরিতে ও রাজশেখরের বালরামায়ণে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। হর্ষের নাটকগুলির মধ্যে কাব্যগুণেরও কোন ঘাটতি নেই।[১]

ভট্টনারায়ণ এবং অন্যান্য : ভট্টনারায়ণ অষ্টম শতকের কিছু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁর রচিত বেণীসংহার নাটকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ ভীম কিভাবে নিয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে এই নাটকের বিষয়বস্তু। আলোচ্য নাটকটি ছয় অঙ্কে রচিত, এবং এটি একটি বিরল চরিত্রের নাটক যেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বীররস প্রাধান্য পেয়েছে। তাছাড়া এই নাটকটিতে নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়মসমূহ অক্ষরে অক্ষরে

১। সম্পাদনা!—নাগানন্দ (ব্রামহে ও পরাঞ্জিপে, ১৮৯৩ ; গণপতি শাস্ত্রী ১৯১৭), প্রিয়দর্শিকা (গাদ্রে, ১৮৮৪), রত্নাবলী (কাশীনাথ, ১৮৬৪ ; পরব, ১৮৯৫)। অনুবাদ :— নাগানন্দ (P. Boyd, ১৮৭২ ; H. Wartham, ১৯১১), প্রিয়দর্শিকা (G. K. Nariman, A. V. W. Jackson এবং C. J. Ogder, ১৯২৩)।

প্রতিপালিত হয়েছে। রাজা যশোবর্মা বিরচিত রামাভ্যুদয় নামক একটি ছয় অঙ্কে রচিত নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকটি অবশ্যই রামায়ণ অবলম্বনে রচিত, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা অনাবিষ্কৃত। আর একজন সম্রাট-নাট্যকার ছিলেন পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মা (৬০০-৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) যিনি মত্তবিলাস নামে একটি উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালের আরও একজন সম্রাট-নাট্যকারের নাম পাওয়া যায় যিনি হচ্ছেন কলচুরিরাজ অনঙ্গহর্ষ মাত্ররাজ। মায়ুরাজ নামেও তিনি পরিচিত। রামায়ণ অবলম্বনে তিনি উদাত্তরাঘব নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত অপর একটি নাটকের নাম তাপসবৎসরাজ যা উদয়ন, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর ত্রিভুজ প্রেমের পুরাতন কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বিজ্জকানাম্নী জনৈকা মহিলা রচিত কৌমুদীমহোৎসব নাটকের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখিকা সম্ভবত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রাদিত্যের পত্নী বিজয় ভট্টারিকা।[১]

বিশাখদত্ত: নাট্যকার বিশাখাদত্ত ছিলেন সম্ভবত অষ্টম শতকের লোক যাঁর রচিত মুদ্রারাক্ষস সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে সংস্কৃত সাহিত্যে এটিই একমাত্র নাটক যার চরিত্র রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক। মুদ্রারাক্ষসের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে কোন স্ত্রীভূমিকা নেই। চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনলাভের কাহিনী হচ্ছে মুদ্রারাক্ষস নাটকের বিষয়বস্তু। নীরস ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে রচিত এই নাটককে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে নাট্যকার যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিশাখদত্ত বা বিশাখদেবের নামে আরও দুটি নাটক প্রচলিত আছে। একটির নাম দেবীচন্দ্রগুপ্ত। বিষয়বস্তু হচ্ছে, গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। শকদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে তিনি নিজ পত্নী ধ্রুবদেবীকে শকাধিপতির নিকটে সমর্পণ করে শান্তিস্থাপন করতে চান। রামগুপ্তের ভাই চন্দ্রগুপ্ত বিষয়টি অনুমোদন করেননি। তিনি নিজেই ধ্রুবদেবীর ছদ্মবেশে শক শিবিরে গিয়ে শকাধিপতিকে হত্যা করেন এবং ফিরে এসে রামগুপ্তকেও হত্যা করে তাঁর স্ত্রী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করে সিংহাসনে আরোহণ

১। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার সম্পাদনা করেছেন J. Grill (১৮৭১) এবং অনুবাদ করেছেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৮০)। কৌমুদীমহোৎসব নাটকের ভূমিকা ও টীকাসহ ইংরাজী অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন শকুন্তলা রাও (১৯৫২)।

করেন। বিশাখদত্তের অপর একটি নাটকের নাম অভিসারিকাবঞ্চিতক। এখানে দেখানো হয়েছে কি ভাবে উদয়নের পত্নী পদ্মাবতী শবরীর ছদ্মবেশে একটি অভিসারিকার ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর স্বামীর তাঁর প্রতি লুপ্ত প্রেমের পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।[১]

ভীমট, মুরারি, শক্তিভদ্র, হস্তিমল্ল : মুদ্রারাক্ষসেরই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে ভীম বা ভীমট লিখেছিলেন প্রতিভাচাণক্য। তাঁর অপর চারটি নাটকের মধ্যে স্বপ্নদশানন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভীমট নবম শতকের লোক ছিলেন। অষ্টম শতকের শেষের দিকে কিংবা নবম শতকের গোড়ার দিকে একজন শক্তিমান্ নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন যার নাম মুরারি। তাঁর অনর্ঘরাঘব রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকটি সাতটি অঙ্কে বিভক্ত। নাটকটির সংলাপাংশ অতি উৎকৃষ্ট যদিও কিছু কিছু ত্রুটিও বহুস্থানে দেখা যায়। মুরারির সমকালীন ছিলেন শক্তিভদ্র যাঁর রচিত নাটকের নাম চূড়ামণি বা আশ্চর্যচূড়ামণি। নবম শতকের নাট্যকারদের মধ্যে জৈন লেখক হস্তিমল্লের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ এবং তিনি গুণভদ্রের শিষ্য ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এবং শোনা যায় তিনি আটটি নাটক রচনা করেছিলেন যেগুলির মধ্যে তিনটির নাম পাওয়া যায়—বিক্রান্তকৌরব (ভিন্ননাম সুলোচনা নাটক) সুভদ্রাহরণ এবং মৈথিলীকল্যাণ।[২]

রাজশেখর : রাজশেখর জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহারাষ্ট্রে। তাঁর পিতার নাম দুর্দুক, মাতার নাম শীলাবতী। ধর্মমতে তিনি শৈব ছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন চাহমানবংশীয় রাজকন্যা অবন্তিসুন্দরী। বিখ্যাত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থ রচনার জন্য রাজশেখর বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। রাজশেখর সম্ভবত দশম শতকের লোক। তিনি মোট চারটি নাটক রচনা করেছিলেন। প্রথমটি হচ্ছে বালরামায়ণ যা রামায়ণ অবলম্বনে

১। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকের সম্পাদনা করেছেন K. T. Telang (১৯০০) এবং A. Hillebrandt (১৯১২)। ইংরাজী অনুবাদ : K. H. Dhruva (১৯২৩, ১৯৩০) এবং R. S. Pandit (১৯৪৪)।

২। মুরারির অনর্ঘরাঘব সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ (১৮৬০) দুর্গাপ্রসাদ ও পরব (১৮৯০)। শক্তিভদ্রের আশ্চর্যচূড়ামণির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন শংকররাজ শাস্ত্রী (১৯২৬-২৭)।

রচিত একটি মহানাটক। দশ অঙ্কে রচিত এই নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা অধিকন্তু স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় নাটকটি হচ্ছে বালভারত যা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই গ্রন্থটির সবটুকু এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তৃতীয় নাটকটি হচ্ছে বিদ্ধশালভঞ্জিকা যা চার অঙ্কে রচিত এবং চতুর্থটি হচ্ছে কর্পূরমঞ্জরী যা আগাগোড়াই প্রাকৃতে রচিত। রাজশেখর বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন যার ফলে ভাষা ও আঙ্গিকের দিক্ থেকে তাঁর নাটকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট হলেও বহুস্থলে সেগুলি কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট।[১]

অপরাপর নাট্যকারগণ: রাজশেখরের পর নাট্যকার হিসাবে ক্ষেমীশ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য যিনি সম্ভবত দশম শতকের লোক ছিলেন এবং যাঁর রচিত চণ্ডকৌশিক মার্কণ্ডেয় পুরাণের হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। তাঁর অপর নাটক নৈষধানন্দ নল-দময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দশম শতকে রচিত আরও একটি নাটকের পরিচয় পাওয়া গেছে যার নাম মহানাটক। এই নাটকটির বঙ্গদেশীয় সংস্করণে চোদ্দটি অঙ্ক কিন্তু উত্তরভারতীয় অন্য একটি সংস্করণে দশ অঙ্ক, এবং নাম হনুমান্নাটক। বিষয়বস্তু হচ্ছে রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের কার্যকলাপ। মূল নাটকটি সম্ভবত লুপ্ত হয়েছে তবে জনশ্রুতি অনুযায়ী নাটকটি রাজা বিক্রমাদিত্যের আদেশে মধুসূদন কর্তৃক সংশোধিত হয়েছিল এবং অপর একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী তা হয়েছিল ভোজের আদেশে দামোদর কর্তৃক। রচনাটিকে বিশুদ্ধ নাটক বলা যায় না।[২]

ইংরাজীতে যাকে বলে Monologue Play সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরূপ কিছু নাটক আছে যেগুলিকে বলা হয় ভাণ। এইরকম কয়েকটি ভাণের পরিচয়

১। রাজশেখরের বালভারতের সম্পাদনা করেছেন কাপেলার (১৮৮৫), দুর্গাপ্রসাদ এবং পরব (১৮৮৭); বালরামায়ণের, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৮৪) গোবিন্দদেব শাস্ত্রী (১৮৬৯)· কর্পূরমঞ্জরীর, দুর্গাপ্রসাদ ও পরব (১৮৮৭), মনোমোহন ঘোষ (১৯৩৯), স্টেন কোনো (১৯০১); বিদ্ধশালভঞ্জিকার, আর্তে (১৮৮৬), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৮৩), যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (১৯৪৩), কর্পূরমঞ্জরীর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন C. R. Lanman (১৯০১), বিদ্ধশালভঞ্জিকার, L. H. Gray (JAOS, ২৭তম খণ্ড)।

২। ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে জগন্মোহন তর্কালংকার (১৮৬৭), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৮৪) ও কৃষ্ণশাস্ত্রী ভাটবডেকর (১৮৬০)। জার্মান অনুবাদ করেছেন Ludwig Fritze (১৮৮৩), হনুমাননাটক সম্পাদনা করেছেন মোহনদাস (১৮৬০, ১৮৬৮) এবং ওই নাটকেরই বঙ্গদেশীয় সংস্করণ মহানাটক সম্পাদনা করেছেন জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৯০)।

পাওয়া গেছে, যেমন উভয়াভিসারিকা পদ্মাপ্রাভৃতক ধূর্তবিটসংবাদ, পাদতাড়িতক ইত্যাদি, যেগুলির লেখকত্ব যথাক্রমে বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত ও শ্যামিলকের উপর আরোপিত হয়েছে। পরবর্তী কালে আরও কয়েকটি ভাণ রচিত হয়েছে। উপরি-উল্লিখিত চারটি ভাণের রচনাকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী।[১]

১৯॥ কাব্যসাহিত্য

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বীজ ঋগ্বেদের মধ্যেই নিহিত। অনেক বৈদিক সূক্ত আশ্চর্য কাব্যগুণসম্পন্ন, এবং পরবর্তী সাহিত্যেও কাব্যলক্ষণসম্পন্ন অনুচ্ছেদের অভাব নেই। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত কাব্যসাহিত্যের বিকাশ পরবর্তী কালে ঘটেছে। কথিত আছে, পাণিনি নাকি জাম্ববতীবিজয় বা পাতালবিজয় নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নেই। পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে বাররুচ নামক একটি কাব্যের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তারও কোন বাস্তব নিদর্শন নেই। প্রায় পূর্ণাঙ্গ কাব্যের নিদর্শন আমরা পাচ্ছি কণিষ্কের যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে, অশ্বঘোষের রচনায়।

অশ্বঘোষ: নাট্যকার হিসাবে অশ্বঘোষের পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি। কবি হিসাবেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পেরেছি, একটি হচ্ছে বুদ্ধচরিত অপরটি হচ্ছে সৌন্দরানন্দ। এ ছাড়া কয়েকটি ধর্মমূলক গ্রন্থের লেখকত্বও তাঁর উপর আরোপিত, যেমন মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ, বজ্রসূচী, গণ্ডী-স্তোত্রগাথা, সূত্রালংকার বা কল্পনামণ্ডিতিকা ইত্যাদি। বুদ্ধচরিত কাব্যে কবি বুদ্ধের প্রথম জীবন ও সন্ন্যাসগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের উপর রামায়ণের প্রভাব সুপ্রচুর। শুদ্ধোধনের সঙ্গে দশরথের, সীতার সঙ্গে সুন্দরীর চরিত্রের সাদৃশ্য এত বেশি যে সাধারণ পাঠকের চোখেও তা ধরা পড়বে। রামের বনগমন ও সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ যেন একই ছকে বাঁধা। সৌন্দরানন্দ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে বুদ্ধের সৎ-ভাই নন্দের দীক্ষাগ্রহণের কাহিনী। এই নন্দ নিজপত্নীর রূপে মুগ্ধ এবং জাগতিক বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। বুদ্ধ তাকে দেখিয়েছিলেন যে, রূপ এবং অর্থ দুই অসার। এই কাব্যটি আঠারোটি

১। উপরিউক্ত চারটি ভাণকে একত্রে চতুর্ভাণী নাম দিয়ে সম্পাদনা করেছেন রামকৃষ্ণ কবি এবং রামনাথ শাস্ত্রী (১৯২২)।

সর্গে বিভক্ত। পক্ষান্তরে, বুদ্ধচরিত সম্ভবত আদিতে আঠাশটি সর্গে বিভক্ত ছিল, বর্তমানে যা পাওয়া যায় তা মাত্র সতেরটি সর্গ, এগুলির মধ্যেও প্রথম তেরটি প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষের রচনা, বাকিগুলি পরবর্তী কালের।[১]

আর্যশূর, নাগার্জুন, আর্যদেব, অসঙ্গ : এঁরা চারজনই হচ্ছেন বৌদ্ধ কবি এবং কাব্যরচনার চেয়ে ধর্মপ্রচারই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আর্যশূর জাতকের গল্পগুলিকে সংস্কৃতে রূপ দেন। তাঁর জাতকমালা গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। ৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির চৈনিক অনুবাদ হয়। সেই হিসাবে আর্যশূর তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতকের লোক ছিলেন। দার্শনিক নাগার্জুন (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন নাম সুহৃল্লেখ। তৃতীয় শতকের কবি আর্যদেব লিখেছিলেন চতুঃশতিকা এবং চতুর্থ শতকে অসঙ্গ কাব্যাকারে মহাযান ধর্মমতের পরিচয় দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, কবিতার চেয়ে ধর্মপ্রচারই এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং উক্ত রচনাগুলি নিঃসন্দেহে সেই উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

কালিদাস : কালিদাস শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারই নন, শ্রেষ্ঠ কবিও বটে। কালিদাসের কাল নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও আমরা এখানে সম্ভাবনার বিচারে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতককেই ধরে নিচ্ছি। কালিদাস মোট চারটি কাব্য লিখেছিলেন, দুটি মহাকাব্য, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব, এবং একটি গীতিকাব্য ঋতুসংহার, ও মেঘদূত। তারকাসুরের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতারা জানতে পেরেছিলেন যে শিব ও পার্বতীর যে সন্তান জন্মাবে সে-ই তারকাসুরকে নিহত করবে। সেই কুমারের জন্মবৃত্তান্তই হচ্ছে কুমারসম্ভব কাব্যের বিষয়বস্তু। মোট আঠারটি সর্গে রচিত এই কাব্যের প্রথম সাতটি সর্গই কেবল কালিদাসের রচিত একথা মল্লিনাথের মত প্রাচীন টীকাকারেরাও বলেন। চরিত্র-চিত্রণ ও বর্ণনা উভয় দিকের বিচারেই কুমারসম্ভব অনবদ্য। রতিবিলাপের দৃশ্যটির কোন তুলনা হয় না। জটিলরূপী শিবের সঙ্গে পার্বতীর কথোপকথনের দৃশ্য বা প্রথম সর্গে হিমালয়ের বর্ণনা বা তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের বিবরণ, প্রতিটি বিষয়ই এক কথায়

১। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সৌন্দরানন্দ কাব্যের প্রথম সম্পাদনা করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯১০) এবং পরে ইংরাজী অনুবাদ সহ সম্পাদনা করেছিলেন E. H. Johnston। তাঁর সূত্রালংকারের চৈনিক অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন E. Huber (১৯০৮)।

কথায় অনবদ্য। রঘুবংশে কবি ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের আশ্চর্য মিলন ঘটিয়েছেন। রঘুবংশ রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। এই কাব্যটি এতদূর জনপ্রিয় হয়েছিল যে কালিদাস 'রঘুকার' নামেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই কাব্যের উনিশটি সর্গ পর্যন্ত তিনি রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সম্ভবত মৃত্যুর জন্যই তিনি আর অগ্রসর হতে পারেন নি। ঋতুসংহার সম্ভবত কালিদাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ছয়টি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে তিনি ছয় ঋতুর আশ্চর্য বর্ণনা দিয়েছেন, তবে রচনাটির কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। মেঘদূত কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। আকারে ক্ষুদ্র হলেও রচনার গুণে এই কাব্যগ্রন্থটি অনবদ্য। একশোর কিছু বেশী শ্লোক এই কাব্যে আছে। কাব্যটি দুভাগে বিভক্ত, পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। জনৈক যক্ষ তার প্রভুর অভিশাপে অলকাপুরী থেকে রামগিরিতে নির্বাসিত, এবং সেই অবস্থায় সে মেঘকে দূত করে তার বিরহিনী প্রিয়ার নিকট বার্তা পাঠাচ্ছে—এই হল মেঘদূতের বিষয়বস্তু। সমগ্র কাব্যটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। কাব্য হিসাবে মেঘদূতের প্রকৃতি কি তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মেঘদূতকে গীতিকাব্য বললেও ঠিক মানায় না, ইংরাজীতে যাকে এলেজি বলে মেঘদূত ঠিক তাও নয়। প্রাচীন আলংকারিকরাও মেঘদূতকে নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন। স্থিরদেবের মতে মেঘদূত একটি মহাকাব্য, আবার বল্লভদেবের মতে তা একটি খণ্ডকাব্য।[১]

ভারবি ও মাঘ : ভারবি ষষ্ঠ শতকের কবি, যিনি আঠারোটি সর্গে লিখেছিলেন কিরাতার্জুনীয় কাব্য। মহাভারতে বর্ণিত কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধই এই কাব্যটির বিষয়বস্তু। কবি হিসাবে ভারবি ছিলেন রীতিমত শক্তিমান্, ভাষার উপরও তাঁর দখল ছিল পর্যাপ্ত। কিন্তু এই সুপণ্ডিত কবির রচনায় বড় বেশী কৃত্রিমতা আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কবি মাঘ সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক, তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যের নাম

১। ল্যাটিন অনুবাদসহ কুমারসম্ভবের সম্পাদনা করেছিন : A. F. Stenzler (১৮৩৮), ইংরাজী অনুবাদ R. T. H. Griffith (১৮৭৯)। মেঘদূতের সর্বোৎকৃষ্টসম্পাদনা : E. Hultzsch (১৯১১), ছন্দে ইংরাজীতে অনুবাদ : H. H. Wilson (১৮১৩), গদ্য অনুবাদ C. King (১৯৩০) রঘুবংশের সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদ : G. R. Nandargikar (১৮৯৭); ঋতুসংহারের ইংরাজী অনুবাদ E. P. Mathers (১৯২৯); বঙ্গানুবাদ : রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (বসুমতী সাহিত্য মন্দির)।

শিশুপাল বধ। এই কাহিনীরও উৎস মহাভারত। কৃষ্ণ শিশুপালের মাতার নিকট শপথ করেছিলেন যে তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করবেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল কৃষ্ণকে অপমানিত করায় শত অপরাধ পূর্ণ হয়, তখন কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাকে সভাস্থলে বধ করেন। মাঘও ভারবির মত সুপণ্ডিত কবি ছিলেন এবং সেই কারণেই বোধ হয় আঙ্গিকের দিকে বেশী মনোযোগী হওয়ায় তাঁর কাব্যেও কৃত্রিমতার প্রাবল্য অধিক।[১]

বুদ্ধঘোষ, মেণ্ঠ, কুমারদাস: পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত বুদ্ধঘোষ সংস্কৃতে দশটি সর্গে বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে একটি কাব্য লিখেছিলেন, নাম পদ্মচূড়ামণি। কহ্লণ মেণ্ঠ নামক একজন কবির নাম উল্লেখ করেছেন যিনি কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্তের সভাসদ্ ছিলেন, এবং সেই হিসাবে তিনি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম হয়গ্রীববধ। তাঁর শতাধিক বৎসর পর আরও একজন কবির নাম পাওয়া যায় যিনি হচ্ছেন কুমারদাস ? যাঁর রচনার নাম হচ্ছে জানকীহরণ।

ভট্টি ও ভৌমক: পূর্বোক্ত কবিদের চেয়ে ভট্টি কিছুটা আগের যুগের লোক যিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভট্টি রচিত কাব্যের নাম রাবণবধ কিন্তু তা ভট্টিকাব্য নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কাব্যগ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে যারা নিখরচায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি জানতে চান তাঁরা রাবণবধের কাহিনী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের সূত্রগুলিকেও কণ্ঠস্থ করতে পারবেন। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এই একই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরী কবি ভৌমক রাবণার্জুনীয় কাব্য লিখেছিলেন যার বিষয়বস্তু হচ্ছে রাবণের সঙ্গে কার্তবীর্যার্জুনের যুদ্ধ, কিন্তু কবির উদ্দেশ্য পাঠককে ব্যাকরণ শেখানো। প্রসঙ্গত কালিদাসের নামে আরোপিত তিনটি কবিতার কথা উল্লেখ করা চলতে পারে, ঘটকর্পর কাব্য যা বাইশটি শ্লোকে মেঘদূতের অনুকরণে রচিত, নলোদয় ও শৃঙ্গারতিলক। বলাই বাহুল্য, এগুলি কালিদাসের রচনা নয়।

শতকসমূহ: শতক হচ্ছে সংস্কৃত কবিতার একটি বিশেষ ধারা যা একশতটি স্তবকে রচিত হত। এই শ্রেণীর কবিতার পথিকৃৎ হিসাবে

১। কিরাতার্জুনীয় সম্পাদনা: জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৭৫), জার্মান অনুবাদ: C. Cappeller (১৯১২); শিশুপালবধ নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে সম্পাদিত হয়েছিল ১৯২৭ এ।

ভর্তৃহরির নাম করা যায়, যিনি বাক্যপদীয় গ্রন্থের লেখক এবং যিনি সম্ভবত ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে মারা গিয়েছিলেন। ভর্তৃহরি বিরচিত শতকত্রয়ের নাম শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক। বিষয়বস্তু নাম দেখেই বোঝা যায়। এরপর উল্লেখযোগ্য অমরু বা অমরুক রচিত অমরুশতক, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম। অমরুশতকের অনেকগুলি সংস্করণ আছে। একের সঙ্গে অপরের মিল বহুক্ষেত্রেই নেই, তবে ৫১টি শ্লোক সকল সংস্করণেই বর্তমান যেগুলি মূল গ্রন্থটি থেকে গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যিক বিচারে অমরুশতক সত্যই রসোত্তীর্ণ। বাণভট্টের সমকালীন ময়ূর ময়ূরশতক লিখেছিলেন, রচনাটির অপর নাম সূর্য-শতক। বাণভট্ট নিজেও দেবীশতক লিখেছিলেন, যার অপর নাম চণ্ডীশতক। এ ছাড়া আনন্দবর্ধনও একটি দেবীশতক লিখেছিলেন। নিজ নিজ উপাস্য দেবদেবীর বন্দনায় শতকের আশ্রয় এই সব কবিরা গ্রহণ করেছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈন কবিগণ : খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতক থেকেই কাব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মমতের প্রভাব উৎকটভাবে পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। শিবস্বামী নামক জনৈক বৌদ্ধ পণ্ডিত কপ্‌ফণাভ্যুদয় নামক একটি একটি কাব্য লিখেছিলেন। কুড়িটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যের বিষয়বস্তু কপ্‌ফণ নামক জনৈক বিধর্মী রাজার বৌদ্ধধর্মগ্রহণ। অষ্টম শতকে জিনসেন নামক জনৈক জৈন ভক্ত পার্শ্বাভ্যুদয় নামক কাব্য লিখেছিলেন, জৈন ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা পার্শ্বের জীবনী অবলম্বনে। এ ছাড়া তিনি জৈন আদিপুরাণের প্রথম ৪২টি অধ্যায় রচনা করেছিলেন। অসগ নামক অপর একজন জৈন কবি আঠারোটি সর্গে বর্ধমানচরিত বা মহাবীরচরিত বা সন্মিত্রচরিত রচনা করেছিলেন। এই কবি নবম শতকের লোক। দশম শতকে কনকসেন যশোধরচরিত নামক কাব্য রচনা করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে জৈন কবি ধনঞ্জয় দ্বিসন্ধান বা রাঘবপাণ্ডবীয় নামক একটি কাব্য লিখেছিলেন।[১]

রাজানক, অভিনন্দ, বাসুদেব : রাজানক রত্নাকর কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সমকালীন ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম হরবিজয়। পঞ্চাশটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে মহাদেব কর্তৃক অন্ধকাসুরকে নিহত করার কাহিনী

১। অসগের বর্ধমানচরিত বা মহাবীরচরিত মারাঠী অনুবাদসহ শোলাপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩১-এ। ধনঞ্জয়ের দ্বিসন্ধান কাব্যটির সম্পাদনা করেছেন K. Parab (১৮৯৫)। জিনসেনের পার্শ্বাভ্যুদয় টীকাসহ নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। কনকসেনের যশোধরচরিতের সম্পাদনা করেছেন গোপীনাথ-রাও (১৯১২)।

বলা হয়েছে। এ ছাড়া রাজানক লিখিত আরও একটি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়, নাম বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা। নবম শতকের অপর একজন কাশ্মীরবাসী কবির নাম অভিনন্দ, যাঁর রচনার নাম কাদম্বরীকথাসার যা বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরীর কাব্যিক সংক্ষিপ্তসার। দ্বিতীয় একজন কবি অভিনন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি রামচরিত নামক একটি কাব্য ছত্রিশটি সর্গে রচনা করেছিলেন। তৃতীয় একজন অভিনন্দ, যিনি অভিনন্দগৌড় নামেও পরিচিত, ৪৮টি সর্গে যোগ-বাশিষ্ঠের সংক্ষিপ্তসার করেছিলেন। নবম শতক কিংবা পরবর্তী কালে আমরা বাসুদেব নামক একজন কবির পরিচয় পাই যিনি যুধিষ্ঠিরবিজয় নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন।[১]

দামোদরগুপ্ত, ভল্লট, নীতিবর্মা, বুদ্ধস্বামী : দামোদরগুপ্ত ছিলেন কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের একজন মন্ত্রী। তাঁর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ বিষয়-বস্তুর গুণে সুপরিচিত, নাম কুট্টনীমত। কামকলা সংক্রান্ত নানা বক্তব্য এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। নবম শতকের অপর একজন কবির নাম ভল্লট যিনি কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্মার সভাকবি ছিলেন। এঁর রচিত ভল্লটশতক অতি উৎকৃষ্ট পর্যায়ের শতক গ্রন্থ। আনন্দবর্ধনের দেবীশতকের একটি শ্লোক অদ্ভুতভাবে এই রচনায় স্থান পেয়েছে। নীতিবর্মা নামক জনৈক কবির কীচকবধ নামক একটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা পাঁচটি সর্গে ভীম কর্তৃক কীচক বধের কাহিনী। এই রচনাটির বহু অংশ শ্লেষ ও যমকের উদাহরণ হিসাবে আলংকারিকগণের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। গুণাঢ্যের প্রাকৃত রচনা বৃহৎকথার সংক্ষিপ্তসার কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন বুদ্ধস্বামী। তাঁর রচনার নাম শ্লোকসংগ্রহ। বুদ্ধস্বামীর তারিখ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় না।[২]

চম্পূকাব্য : চম্পূকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরনের কাব্যের ধারা। আলংকারিক দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে চম্পূকে গদ্যপদ্যময় বলেছেন,

১। রাজানক রত্নাকর বিরচিত হরবিজয় কাব্যটির সম্পাদনা করেছেন দুর্গাপ্রসাদ এবং পরব (১৮৯০), অভিনন্দের কাদম্বরীকথাসারের সম্পাদকও এঁরা দুজন (১৮৯৯)। অভিনন্দ বিরচিত রামচরিতের সম্পাদনা করেছেন, ভূমিকা ও টীকাসহ, রামস্বামী শাস্ত্রী (১৯৩০)। বাসুদেবের যুধিষ্ঠিরবিজয় নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে)।

২। কুট্টনীমত মূল ও ত্রিদিবনাথ রায়ের বঙ্গানুবাদসহ বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ভল্লটশতকের জন্য কাব্যমালা চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য; বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহের সম্পাদনা ও ফরাসী অনুবাদ করেছেন **F. Lacote** (১৯০৮-২৯)।

কেননা চম্পূকাব্যে গদ্য ও পদ্য উভয়েরই ব্যবহার বর্তমান। কথা ও আখ্যায়িকা-রূপ গদ্যকাব্যের সঙ্গে চম্পূর সাদৃশ্য যথেষ্ট (গদ্যসাহিত্য দ্রষ্টব্য)। চম্পূ নানা বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা উপাখ্যানমূলক। চম্পূকাব্যের সঙ্গে দণ্ডীর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, বর্তমানে আমরা খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্বে রচিত কোন চম্পূর নিদর্শন পাই না। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চম্পূকাব্য হচ্ছে ত্রিবিক্রমভট্টের নলচম্পূ বা দময়ন্তীকথা, রচনাকাল আনুমানিক দশম শতক। সাতটি উচ্ছ্বাস বা অধ্যায়ে কাব্যটি বিভক্ত। জৈন লেখক সোমদেবের যশস্তিলকচম্পূও দশম শতকের রচনা। এতে অবন্তীরাজ যশোধরের পত্নীর চক্রান্তে মৃত্যু, পুনর্জীবনলাভ ও পরিশেষে জৈন ধর্মে দীক্ষাগ্রহণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অপরাপর চম্পূকাব্যের মধ্যে সোড্‌ঢল রচিত উদয়সুন্দরীকথা, জীবগোস্বামীর গোপালচম্পূ, ধনপালের তিলকমঞ্জরী, অনন্তের ভারতচম্পূ, লক্ষণভট্টের রামায়ণচম্পূ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইগুলি দশম শতকের পরবর্তী কালের রচনা।[১]

২০ ॥ ঐতিহাসিক রচনা

ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনার কোন ঐতিহ্য ছিল না। এদেশে কোন হেরোডটাস বা থুকিডিডেস, এমনকি লিভি বা ট্যাসিটাসও জন্মগ্রহণ করেন নি। একমাত্র কহ্লণ ছাড়া প্রকৃত অর্থে অপর কোন ঐতিহাসিকের উদ্ভব এদেশে হয়নি। তবে বিভিন্ন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন কোন কবি বা লেখক নিজেদের প্রভুর জীবনী ও গুণাবলী কীর্তন করেছেন। এই জীবনীগুলি নিশ্চয়ই ইতিহাস নয়, তবে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।

ইতিহাসাশ্রয়ী জীবনীসাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বাণভট্ট বিরচিত হর্ষচরিত। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্রাটের জীবনকথা বর্ণনা করেছেন, যদিও সে বর্ণনা সর্বক্ষেত্রে যথার্থ নয়, অনেকক্ষেত্রে তা একান্তই উপন্যাসধর্মী হয়ে গেছে। অনুরূপ আরো কয়েকটি জীবনী সাহিত্যের মধ্যে বাক্‌পতির গৌড়বহো (প্রাকৃত) এবং বিল্‌হণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে রাজা যশোবর্মার এবং দ্বিতীয়টিতে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের বীরত্ব ও সামরিক অভিযানসমূহের কাহিনী দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দী

১। সম্পাদনা: যশস্তিলকচম্পূ (শিবদত্ত এবং পরব, ১৯০১-১৯০৩) : নলচম্পূ (শর্মা, ১৯৩২ : বোম্বাই সংস্করণ, ১৮৮৫) ; উদয়সুন্দরীকথা (দালাল এবং কৃষ্ণমাচার্য, ১৯২০)।

বিরচিত রামচরিত নামক একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্যে বাংলার রাজা রামপালের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। অপরাপর জীবনী সাহিত্যের মধ্যে জয়সিংহের কুমার-প্যালচরিত, হেমচন্দ্রের দ্ব্যাশ্রয় কাব্য, পদ্মগুপ্তের নবসাহসাংকচরিত, বল্লালের ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু যথার্থ ইতিহাস বলতে বোঝায় কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী। গ্রন্থটি ছন্দে রচিত কাশ্মীরের ইতিহাস, রচনাকাল ১১৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। লেখক এই গ্রন্থটি রচনায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, সেই পদ্ধতি আজও পৃথিবীর সর্বত্র ঐতিহাসিকেরা অবলম্বন করেন। তিনি প্রচলিত সকল পুঁথি-পুস্তক ও নথিপত্র, এমনকি লেখমালাসমূহ যত্ন করে অধ্যয়নের পর রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকের আদর্শ সম্বন্ধে কল্‌হণ বলছেন, "সেই পুণ্যবান্ কবিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য যিনি প্রেম ও ঘৃণা উভয় থেকেই মুক্ত এবং ঘটনার বর্ণনায় যিনি ভাষাকে সংযত রাখেন (১।৭)।" অবশ্য রাজতরঙ্গিণীর প্রথমদিকের অধ্যায়গুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই, কেননা কল্‌হণকেও উপাদানের অভাবে পৌরাণিক কাহিনীসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কিন্তু যেখান থেকে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হচ্ছে, সেখানে কল্‌হণ অদ্বিতীয়, মোটামুটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে তাঁর নিজের যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কল্‌হণ কাশ্মীরের নিখুঁত ইতিহাস রচনা করেছেন। সাল তারিখ সহ তিনি প্রতিটি রাজার জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি পরিমিত, ক্রিটিক্যাল। সত্য কথা লিখতে তিনি ভয় পাননি। এমন কি বহুক্ষেত্রেই তিনি সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধের উপরে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। কল্‌হণের রচনার প্রভাব তাঁর দেশবাসীর উপর সত্যই পড়েছিল এবং তাঁর গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত হয়ে তাঁর আদর্শে অনেকেই পরবর্তী যুগের কাশ্মীরের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোনরাজ যিনি মারা গিয়েছিলেন ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রচিত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী কল্‌হণের গ্রন্থের সমাপ্তির পর থেকে শুরু হয়েছে এবং জৈন্-উল-আবেদীনের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর শিষ্য শ্রীবর ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তাঁর জৈনরাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে। কিন্তু রচনার বিচারে এঁরা কেহই কল্‌হণকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

রাজতরঙ্গিণী ছাড়া আরও যে কটি ইতিহাসধর্মী গ্রন্থ আছে সেগুলির মধ্যে

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল সোমেশ্বরের কীর্তিকৌমুদী, অরিসিংহের সুকৃত-সংকীর্তন, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি, রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ, বালচন্দ্রের বসন্তবিলাস ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থে মোটামুটি পশ্চিম ভারতের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই বর্ণনা একান্তই প্রাসঙ্গিক।[১]

২১ ॥ গদ্যসাহিত্য

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসও কম পুরাতন নয়। যজুর্বেদে যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত নির্দেশগুলি গদ্যে রচিত, অথর্ববেদেও কিছু কিছু গদ্যরচনা দেখা যায়। সুবিশাল ব্রাহ্মণ সাহিত্যের অধিকাংশই গদ্যে রচিত, এবং আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যেও গদ্যে রচিত অংশ বড় কম নয়। একথা সূত্রগ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আসলে সংস্কৃত গদ্যের উদ্ভবই হয়েছে বাস্তব প্রয়োজনের মুখ চেয়ে, এবং সেই হিসাবে সে যুগের যা কিছু টেকনিক্যাল রচনা তার অধিকাংশই গদ্যে রচিত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে তিনটি গদ্যকাব্যের উল্লেখ আছে—বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী। কাব্যলক্ষণাক্রান্ত কিছু কিছু গদ্যরচনার নিদর্শন লেখমালাসমূহে পাওয়া যায়। বাণভট্টের হর্ষচরিতে দুজন গদ্যকাব্য রচয়িতার নাম আছে—হরিশচন্দ্র ও আঢ্যরাজ। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে গদ্যকাব্য দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, কথা ও আখ্যায়িকা, আদি গদ্যকাব্যগুলির কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই।

অবদানসাহিত্য : অবদানসাহিত্য সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে বৌদ্ধদের অবদান। জাতকের কাহিনীগুলির সঙ্গে অবদানে বর্ণিত কাহিনীগুলির সাদৃশ্য আছে। এগুলিতে বোধিসত্ত্বের বিগত জীবনসমূহের সুমহান্ দিকগুলি

১। হর্ষচরিত, সম্পাদনা : জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৮৯২, A. Fuhrer ১৯০৯, পাণ্ডুরং বমন কানে ১৯১৮ ; অনুবাদ : E. B. Cowell এবং F. W. Thomas (১৮৯৭)। রাজতরঙ্গিণী, সম্পাদনা : দুর্গাপ্রসাদ (১৮৯২) ; অনুবাদ : M. A. Stein (১৯০০), R. S. Pandit (১৯৩৫)। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, সম্পাদনা : G. Buhler (১৮৭৫)। দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী, সম্পাদনা : P. Paterson (১৮৯৬)। নবসাহসাঙ্কচরিত, সম্পাদনা : V. S. Islampurkar (১৮৯৫)। রামচরিত, সম্পাদনা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (MASB, ৩য়), রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক ইত্যাদি (১৯৩৯)। পৃথ্বীরাজবিজয়, সম্পাদনা : S. K. Belvalkar (১৯১৪-২২)। প্রবন্ধ চিন্তামণি, সম্পাদনা : রামচন্দ্র দীননাথ (১৮৮৮), মুনি জিনবিজয় (১৯৩৩) ; ইংরাজী অনুবাদ : C. H. Tawney (১৯০১)।

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে অবদানশতক, রচনাকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে এই গ্রন্থটির চৈনিক অনুবাদ হয়েছিল। এই পর্যায়ের অপরাপর গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দিব্যাবদান, সম্ভবত যা অবদানশতকের অত্যল্পকাল পরে রচিত। মহাবস্তু বা মহাবস্তু অবদানের কথাও এই প্রসঙ্গে অনিবার্য-ভাবে এসে পড়ে, যে গ্রন্থটির তারিখ নিয়ে এখনো কিছুটা বিতর্কের অবকাশ আছে। বুদ্ধের জীবনকাহিনী ললিতবিস্তর শ্লোকবহুল গদ্যে লেখা, তবে এই গ্রন্থটিকে অবদানসাহিত্যের মধ্যে ফেলা যায় না।[১]

গল্পসাহিত্য: সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে গল্পের ভাণ্ডারও খুব ছোট নয়, এবং এই পর্যায়ের রচনাবলীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্রই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। পশুপক্ষীর গল্পের মাধ্যমে বালকদের নীতিশিক্ষাদানই বর্তমানে পঞ্চতন্ত্র নামে প্রচলিত গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পাঁচটি নীতিকে অবলম্বন করে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিকে সাজানো হয়েছে—মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, সন্ধিবিগ্রহ, লব্ধনাশ ও অপরীক্ষিত-কারিত্ব। গল্পগুলি গদ্যে রচিত হলেও মাঝে মাঝে নীতিগর্ভ শ্লোক আছে, এবং প্রতিটি গল্পের শেষে গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়কে শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের আদিরূপ কি ছিল তা অবশ্য জানার উপায় নেই তবে সুপ্রাচীনকালেই পঞ্চতন্ত্র পৃথিবীর নানাভাষায় অনূদিত হয়েছিল, প্রথম অনুবাদ ঘটেছিল সম্ভবত পহ্লবীতে। সেই হিসাবে পণ্ডিতদের মতে আদি পঞ্চতন্ত্র রচনার কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেরও আগে। পণ্ডিতেরা বলেন যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রচলিত পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলিকে অনুসরণ করে পরবর্তী কালে ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর রচিত হয়েছে এবং কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীগুলি অবলম্বনে তন্ত্রাখ্যায়িকা রচিত হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থটির তারিখ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না, তবে অনেকে মনে করেন যে পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনতর অংশগুলির কিছু কিছু এই গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে। নারায়ণের নামে আরোপিত হিতোপদেশও পঞ্চতন্ত্র অনুসরণে রচিত। এই নারায়ণ সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের লোক। পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র বা নীতির মধ্যে হিতোপদেশে চারটি অনুসৃত হয়েছে। এ ছাড়া কামন্দকীয়

নীতিসার অবলম্বনেও কিছু কিছু বিষয় এতে স্থান পেয়েছে। অপরাপর গল্পগ্রন্থের মধ্যে সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রমচরিত একটি সুপরিচিত গ্রন্থ যার রচয়িতা ও রচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। বত্রিশটি গল্পের সংকলন এই গ্রন্থটিতে রাজা বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তীযুক্ত সিংহাসনের কাহিনী বলা হয়েছে। জনৈক ভোজরাজ ওই সিংহাসনের অধিকারী হয়ে তাতে বসবার উপক্রম করলে ওই সিংহাসনবাহী বত্রিশটি পুতুল প্রত্যেকে এক একটি গল্পে রাজা বিক্রমাদিত্যের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করে বুঝিয়ে দেয় যে অন্ত কোন লোক ওই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নয়। মূল গ্রন্থটি এখনো পাওয়া যায়নি, তবে উত্তর ভারতে এই কাহিনী অবলম্বনে তিনটি এবং দক্ষিণ ভারতে দুটি রচনা প্রচলিত আছে। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে গ্রন্থটি রচিত হয়নি। আরও একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থের নাম বেতালপঞ্চবিংশতি। এতে পঁচিশটি গল্প আছে যেগুলি জনৈক বেতাল রাজা বিক্রমাদিত্যকে শুনিয়েছিল। প্রতিটি গল্পের শেষেই একটি করে ধাঁধা আছে যেগুলির উত্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দিয়েছিলেন। এটিও সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের রচনা, এবং বর্তমানে এই গ্রন্থ চারটি আকারে পাওয়া যায়, এবং এই চারটি রচনার তিনজন লেখকেরও নাম পাওয়া যায়, শিবদাস, জম্ভলদত্ত ও বল্লভদাস, চতুর্থ জনের নাম পাওয়া যায় না। আরও একটি গল্পগ্রন্থের নাম শুকসপ্ততি যার তিনটি রূপ বর্তমানে পাওয়া যায় যেগুলি যথাক্রমে চিন্তামণি ভট্ট, দেবদত্ত ও জনৈক অজ্ঞাত লেখক রচিত। শুকসপ্ততির পটভূমিকা নিম্নরূপ: এক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পত্নী অপর একজনের প্রতি আসক্তা হয়ে গৃহত্যাগের সংকল্প করলে অনুপস্থিত ব্যক্তির পালিত একটি শুকপাখী একাদিক্রমে সত্তরটি গল্প বলে ওই পত্নীকে তার স্বামী না আসা পর্যন্ত ধরে আটকে রাখতে সমর্থ হয়। দ্বাদশ শতকের পূর্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়নি। চতুর্দশ শতক ও তার পরবর্তী যুগে নিম্নলিখিত গল্প-গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল: মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি (বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি কয়েকজন রাজার কাহিনী), রাজশেখর সুরির প্রবন্ধকোষ (কয়েকজন জৈন মহাপুরুষ ও ভক্তের কাহিনী), মৈথিল বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা (পুরুষোচিত গুণ সম্পর্কে ৪৪টি গল্প), বল্লালসেনের ভোজপ্রবন্ধ (রাজা ভোজ সংক্রান্ত নানান গল্প। এই বল্লালসেন কিন্তু সেনবংশীয় বাংলার রাজা বল্লালসেন নন), জিনকীর্তির চম্পকশ্রেষ্ঠিকথানক (রূপকথাসংগ্রহ), শিবদাসের কথার্ণব (মূর্খ ও তস্করের ৩৫টি গল্প), বর্ধমান সুরির কথাকোষ (নলোপাখ্যান অবলম্বনে

রচিত), হেমবিজয়গণি রচিত কথারত্নাকর (২৫৮টি গল্পসংগ্রহ) ও অজ্ঞাতনামা লেখকগণ রচিত ভরটক-দ্বাত্রিংশিকা, সম্যকত্বকৌমুদী, ইত্যাদি।[১]

উপন্যাসধর্মী রচনা : এই শ্রেণীর রচনাবলীর মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম দণ্ডীর দশকুমারচরিতের উল্লেখ করব। দণ্ডীকে নিয়ে পণ্ডিতবর্গের কিছু সমস্যা আছে। তবে দশকুমারচরিতের লেখক দণ্ডী এবং কাব্যাদর্শ নামক অলংকারশাস্ত্রের রচয়িতা দণ্ডী যে অভিন্ন আধুনিক পণ্ডিতেরা এটাই ধারণা করে থাকেন। দণ্ডী দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মানুষ ছিলেন। দশকুমারচরিত রাজপুত্র রাজবাহন ও তার নবজন বন্ধুর কাহিনী, জীবনের পথে যারা একের থেকে অন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এবং দীর্ঘকাল পরে যখন তারা পুনর্মিলিত হল তখন তারা একে একে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে শুরু করল। এটাই হচ্ছে দশকুমারচরিতের পটভূমিকা। তবে আলোচ্য গ্রন্থে দশজনের বদলে আটজনের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে। তাই গ্রন্থের নামের সার্থকতার জন্য গ্রন্থটির আগে ও পরে দুটি পৃথক আখ্যান যোগ করা হয়েছে, পূর্বপাঠিকা ও উত্তরপাঠিকা, কিন্তু এই দুটি সম্ভবত দণ্ডীর রচনা নয়। অবন্তীসুন্দরীকথা নামক আরও একটি গ্রন্থ দণ্ডীর উপর আরোপিত, এবং কেউ কেউ মনে করেন যে এটাই দশকুমারচরিতের লুপ্ত আদ্য অংশ।[২]

দণ্ডীর পর সুবন্ধুর বাসবদত্তার কথা উল্লেখ করতে হয়। রাজকুমার কন্দর্পকেতু এবং রাজকন্যা বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনীই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। উভয় উভয়কে স্বপ্নে দেখে একে অন্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁদের মিলন হয়। গল্পলেখক

১। পঞ্চতন্ত্রের ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন বেনফি। শুকসপ্ততি-র জার্মান তর্জমা করেছেন R. Schmidt (১৮৯৪)। কথাসরিৎসাগরের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন C. H. Tawney, তাছাড়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত একটি বঙ্গানুবাদও পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি মূল সংস্কৃতের অনুবাদ নয়, হিন্দী বেতালপচীশি অবলম্বনে তা রচিত।

২। দশকুমারচরিত, সম্পাদনা : G. Buhler এবং P. Peterson (১৮৮৭, ১৮৯১), G. J. Agashe (১৯১৯), নারায়ণ আচার্য (১৯৫১) ; সম্পাদনা, টীকা ও ইংরাজী অনুবাদ : M. R. Kale (১৯২৬) ; ইংরাজী অনুবাদ : A. W. Ryder (১৯২৭) ; জার্মান অনুবাদ : J. Hertel (১৯২২), J. J. Meyer (১৯০২) ; ফরাসী অনুবাদ : H. Fauche (১৮৬২)।

হিসাবে সুবন্ধু ছিলেন শক্তিমান্, এবং তিনি বাণভট্টের পূর্ববর্তী। তাঁকে সপ্তম শতকের প্রারম্ভকালের লেখক বলে মনে করা হয়।[১]

এরপর আসছে কাদম্বরীর কথা বা সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বাণভট্টের রচিত। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর জন্মজন্মান্তরের প্রেমের কাহিনীই কাদম্বরীর বিষয়বস্তু। কাদম্বরীর পরিকল্পনা অত্যন্ত জটিল, মূল কাহিনীর সঙ্গে শাখাকাহিনী এত বেশী পরিমাণে যুক্ত হয়েছে যে পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে যায়। বাণের ভাষা দুরূহ শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ বাক্যগুলি এত দীর্ঘ যে তা থেকে রসগ্রহণ করা যে-সে লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। জার্মান পণ্ডিত ভেবেরের মতে কাদম্বরী একটি মহারণ্য যেখানে পাঠককে ঝোপঝাড় কেটে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কাদম্বরীর কোন দ্বিতীয় নেই। কল্পনাশক্তির বিচিত্র প্রকাশে, কাব্যগুণে, চরিত্র-চিত্রণে, প্রকৃতি-বর্ণনায়-সর্বত্রই বাণ সমান কুশলতার নিদর্শন দেখিয়েছেন। অবশ্য এই রচনাটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, তাঁর পুত্র পুলিন্দ বা ভূষণভট্ট অবশিষ্টাংশ রচনা করেছিলেন এমন কথা বলা হয়।[২]

পরবর্তী যুগের গদ্যরচনার মধ্যে আনন্দের মাধবানলকামকন্দলাকথা উল্লেখযোগ্য। এতে ব্রাহ্মণ মাধবানল এবং নর্তকী কামকন্দলার প্রণয়োপাখ্যান, তাদের বিচ্ছেদ এবং পরিশেষে রাজা বিক্রমাদিত্যের মধ্যস্থতায় মিলনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লেখক আনন্দের তারিখ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। দশম শতকের ধনপাল বিরচিত তিলকমঞ্জরী বাণভট্টের কাদম্বরীর অনুকরণে রচিত।

২২॥ ব্যবহারিক সাহিত্য

উপসংহারে আমরা সংস্কৃত ব্যবহারিক সাহিত্যগ্রন্থগুলির একটি তালিকা পেশ করব। একটু ব্যাপক অর্থেই আমরা 'ব্যবহারিক সাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করছি। ব্যাকরণ, নাট্যতত্ত্ব, ছন্দ, অলংকার, রাজনীতিবিজ্ঞান, কামশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ সমস্ত কিছুকেই আমরা বর্তমানে

১। বাসবদত্তার ইংরাজী তর্জমা করেছেন L. H. Gray।

২। কাদম্বরী, সম্পাদনা : P. Peterson (১৯০০), K. P. Parab (১৮৯৬); ইংরাজী অনুবাদ : C. M. Ridding (১৮৯৬)।

ব্যবহারিক সাহিত্যের মধ্যে ফেলেছি। এগুলির মধ্যে কোন কোনটির পরিচয় আমরা পূর্বে দিয়েছি। অবশিষ্টগুলির নামের উল্লেখ নিম্নে করা হল।

ব্যাকরণ: পূর্বে আমরা পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির রচনার পরিচয় দিয়েছি। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে দুজন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদের জন্ম হয়েছিল, চন্দ্র বা চন্দ্রগোমী এবং জৈনেন্দ্র, পরবর্তী কালের ব্যাকরণবিদ্‌দের রচনায় যাঁরা উল্লিখিত হয়েছিলেন। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের ব্যাকরণকারদের মধ্যে বাক্যপদীয় রচয়িতা ভর্তৃহরি, কাশিকাবৃত্তি রচয়িতা জয়াদিত্য ও বামনের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী ব্যাকরণকারদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তন্ত্রপ্রদীপ ও ধাতুপ্রদীপের লেখক মৈত্রেয় রক্ষিত, অমোঘবৃত্তির লেখক শাকটায়ন, কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের টীকাকার দুর্গসিংহ, বালবোধিনীর লেখক ভট্ট জগদ্ধর এবং লঘুবৃত্তির লেখক ছিচ্ছুভট্ট।

কামশাস্ত্র: এই নামের প্রখ্যাত গ্রন্থের লেখক ছিলেন বাৎস্যায়ন মল্লনাগ। পূর্ববর্তী কামশাস্ত্রকারদের রচনা অবলম্বনে বাৎস্যায়নের কামসূত্র রচিত। কামকলা-বিষয়ক নানাবিধ পদ্ধতি এতে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া প্রাচীন যুগের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান্ আকরগ্রন্থ হিসাবে কামসূত্র একটি অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। বাৎস্যায়ন সম্ভবত খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন। কামসূত্রের টীকাকার ছিলেন যশোধর (ত্রয়োদশ শতক) এবং তাঁর রচিত টীকার নাম জয়মঙ্গলা। পরবর্তী কালে কোক্কোক কামশাস্ত্রের উপর রতিরহস্য নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞান: বৈদিক ও পরবর্তী সাহিত্যে চিকিৎসা-বিষয়ক বহু প্রসঙ্গ থাকলেও চরকসংহিতাই একমাত্র গ্রন্থ যা বিশুদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত। এই গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে, সম্ভবত কণিষ্কের যুগে তা রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির সংশোধন করেছিলেন নবম শতকের লেখক দৃঢ়বল। চিকিৎসাশাস্ত্রে পরম মূল্যবান্ এই গ্রন্থটি পার্শী ও আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এর পরই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুশ্রুতসংহিতা। এই গ্রন্থটিরও রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে। চতুর্থ শতকে রচিত অপর একটি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের নাম ভেলসংহিতা। কাশগড়ে আবিষ্কৃত 'বাওয়ার' পাণ্ডুলিপি-সমূহেও চিকিৎসা-বিষয়ক কিছু কিছু রচনা আছে। পরবর্তী যুগের চিকিৎসা-বিষয়ক রচনার মধ্যে বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গসংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা, অজ্ঞাতনামা জনৈক লেখক রচিত হস্ত্যায়ুর্বেদ, মাধব রচিত রুগ্‌বিনিশ্চয় বা

মাধবনিদান, বৃন্দবিরচিত সিদ্ধিযোগ বা বৃন্দমাধব, ধন্বন্তরি বিরচিত নিঘণ্টু, নাগার্জুন বিরচিত রসরত্নাকর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জ্যোতির্বিদ্যা : বরাহমিহিরের রচনায় তাঁর পূর্ববর্তী বহু দিকপাল জ্যোতির্বিদের নাম পাওয়া যায় যাঁদের মধ্যে আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রীঃ) ও তাঁর রচিত আর্যভটীয় দশগীতিকাসূত্রের নাম পাওয়া যায়। বরাহমিহির (ষষ্ঠ শতক) জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ লিখেছিলেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে তিনি তৎকালীন পাঁচটি প্রচলিত রচনার বা সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন, যথা পৈতামহ, রোমক, পৌলিশ, বাসিষ্ঠ এবং সূর্য। বরাহমিহিরের অপরাপর রচনার মধ্যে বৃহৎসংহিতা, বৃহদ্বিবাহপটল, স্বল্পবিবাহপটল, যোগযাত্রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদ্য ও ধ্যানগ্রহ এবং এগুলি ছাড়া বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পারাশরী, জৈমিনির জাতকসূত্র, ভৃগু-সংহিতা, নাড়ীগ্রন্থ, যবনজাতক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলির বিষয়বস্তু অবশ্য ফলিত জ্যোতিষ। এই প্রসঙ্গে বরাহমিহিরের বৃহজ্জাতক এবং তৎপুত্র পৃথুযশের ষট্পঞ্চাশিকা গ্রন্থদুটির নামও করা যেতে পারে। গণিত-বিষয়ক রচনার মধ্যে ভাস্করাচার্যের লীলাবতী, শ্রীধরের গণিতসার, মহাবীরের সারসংগ্রহ, মঞ্জুর বৃহন্মানস, মুঞ্জালের লঘুমানস এবং দ্বিতীয় আর্যভট্টের আর্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অলংকার, ছন্দ, সাহিত্যতত্ত্ব : ভট্টিকাব্যে অলংকারসমূহের অজস্র উদাহরণ দেওয়া আছে। ভামহের কাব্যালংকার, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে অলংকার, ছন্দ ও কাব্যতত্ত্বের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এগুলি সপ্তম শতকের রচনা। ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতা ও বৃহজ্জাতক গ্রন্থদ্বয়ে ছন্দের উপর সুন্দর আলোচনা করেছেন। ছন্দের উপর আরও একটি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে বৃত্তজাতিসমুচ্চয় যে গ্রন্থের লেখকের নাম বীরহাংক। পরবর্তী কালের রচনাবলীর মধ্যে উদ্ভটের অলংকার-সারসংগ্রহ বিখ্যাত। সম্ভবত পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে রুদ্রটের কাব্যালংকার। রুদ্রট নবম শতকের লোক ছিলেন। রুদ্রভট্টের শৃঙ্গারতিলক গ্রন্থটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলতে পারে। এছাড়া বামনের কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি, আনন্দ-বর্ধনের ধ্বন্যালোক, মহিমভট্টের ব্যক্তিবিবেক, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, অভিনবগুপ্তের লোচন, মুকুলভট্টের অভিধাবৃত্তিমাতৃকা, সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণ

রত্নকোশ, উৎপলের ছন্দঃসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের উপর মূল্যবান্ আলোকপাত করেছে। গ্রন্থগুলির রচনাকাল একাদশ শতকের মধ্যে।[১]

১। ব্যাকরণ: কাতন্ত্র, দুর্গসিংহের টীকা সহ সম্পাদনা, J. Eggeling (১৮৭৪-৭৮); শাকটায়নের শব্দানুশাসন (অভয় চন্দ্রের প্রক্রিয়াসংগ্রহ সহ) সম্পাদনা, জেঠারাম মুকুন্দজী (১৯০৭)। কামশাস্ত্র: বাৎস্যায়নের কামসূত্র (যশোধরের জয়মঙ্গলা টীকা সহ) সম্পাদনা, ডি. এল. গোস্বামী, ইংরাজী অনুবাদ, কে. আর. আয়েঙ্গার, এস. সি. উপাধ্যায় এবং আরও অনেকে. বঙ্গবাসী সংস্করণ, সম্পাদনা, পঞ্চানন তর্করত্ন। রাজনীতি: কামন্দকীয় নীতিসার, সম্পাদনা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৮৪), গণপতি শাস্ত্রী (১৯১২)। শুক্রনীতিসার, সম্পাদনা, G. Oppert (১৮৮২), ইংরাজী অনুবাদ, মন্মথনাথ দত্ত; সোমেশ্বরের নীতিবাক্যামৃত, সম্পাদনা ও প্রকাশ (১৮৮৭-৮৮)। অভিধান: অমরসিংহের অমরকোশ, সম্পাদনা, গণপতি শাস্ত্রী (১৯১৪-১৭); হলায়ুধের অভিধানরত্নমালা, সম্পাদনা, Th. Aufrecht (১৮৬১); কেশবের কল্পদ্রুকোশ, সম্পাদনা, রামাবতার শর্মা (১৯২৮)। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত: আর্যভট্টের আর্যভটীয়, সম্পাদনা, H. Kern (১৮৭৪), ইংরাজী অনুবাদ, পি. সি. সেনগুপ্ত (JDL, ১৬) সূর্যসিদ্ধান্ত, সম্পাদনা, F. E. Hall (১৮৫৯), সুধাকর দ্বিবেদী (১৯২৫), ইংরাজী অনুবাদ, E. Burgess (১৮৬০, ১৯৩৬); বরাহমিহিরের বৃহজ্জাতক, সম্পাদনা, সীতারাম ঝা (১৯৩৪), সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী (১৯২৩); বৃহৎসংহিতা, সম্পাদনা ও অনুবাদ, H. Kern (১৮৭০-৭২) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও রামকৃষ্ণ ভাট (১৯৪৭), হোরাশাস্ত্র, অনুবাদ, সি. আয়ার (১৮৮৫); পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, সম্পাদনা, G Thibaut (১৮৮৯); যোগযাত্রা, সম্পাদনা ও অনুবাদ, H. Kern। চিকিৎসা-বিজ্ঞান: চরকসংহিতা, সম্পাদনা, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৯৬), সুশ্রুতসংহিতা, সম্পাদনা, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৮৯); বাগভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়, সম্পাদনা, এ. এম. কুন্তে (১৮৯১); ইন্দুরচিত অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, সম্পাদনা, রুদ্র পরাশর (১৯১৩-২৪), মাধবের রুগ্‌বিনিশ্চয়, সম্পাদনা, কবিরাজ এস. সি. সেন (১৯৩২); বৃন্দের সিদ্ধিযোগ (আনন্দাশ্রম ২৭নং ১৮৯৪)। গণিত: মাধবাচার্যের গণিতসারসংগ্রহ, সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদ, এস. রঙ্গাচার্য (১৯১২); শ্রীধরের গণিতসার, সম্পাদনা, এম. রামানুজাচার্য (১৯১৩)। সাহিত্য তত্ত্ব: অভিনবগুপ্তের লোচন, সম্পাদনা, এস. কে. দে (১৯২৩), জার্মান অনুবাদ, H. Jacobi (ZDMG, ৫৬-৫৭); ধনঞ্জয়ের দশরূপ, সম্পাদনা, F. E. Hall (১৮৬৫), ইংরাজী অনুবাদ, G. C. O. Haas (১৯১২); মুকুলভট্টের অভিধাবৃত্তিমাতৃকা (নির্ণয়সাগর ১৯১৬); রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, সম্পাদনা, সি. ডি. দালাল (১৯৩৪); রুদ্রটের কাব্যালংকার, সম্পাদনা, দুর্গাপ্রসাদ ও পরব (১৯০৯); সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ, সম্পাদনা M. Dillon (১৯৩৭); উদ্ভটের অলংকারসংগ্রহ, সম্পাদনা এন. ডি বাণহাট্টি (১৯২৫); উৎপলের ছন্দশাস্ত্র, সম্পাদনা, এইচ. ডি. ভেলাংকর; বামনের কাব্যালংকার-সূত্র, সম্পাদনা দুর্গাপ্রসাদ ও পরব (১৯২৬), ইংরাজী অনুবাদ ও সম্পাদনা গঙ্গানাথ ঝা (১৯২৮), সম্পাদনা ও জার্মান অনুবাদ, C. Cappeller (১৮৭৫)।

ভারতীয় সাহিত্য : প্রাকৃত, পালি ও অপভ্রংশ

১ ॥ প্রাকৃত

সংস্কৃত ভাষার ভাবপ্রকাশাত্মক শক্তি যতই থাকুক না কেন তা কোনদিনই সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা ছিল না। যখন আমরা দেখি যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রবক্তাগণ নিজেদের বক্তব্য প্রচারের জন্য সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন তখন আমাদের মনে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটিই বদ্ধমূল হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের সংস্কৃত নাটকগুলির সংলাপের বহুলাংশ প্রাকৃতেই রচিত, নায়ক-নায়িকা বা উচ্চস্তরের লোকদের সংলাপসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হত, কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীদের ক্ষেত্রে তা হত প্রাকৃতে।

আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় নামে কথিত ভাষার প্রাচীন ভারতীয় পর্যায়টি প্রথমে বৈদিক ও পরে ধ্রুপদী সংস্কৃতের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রাকৃতের ব্যবহার ছিল। বুদ্ধের জন্মের বহু আগে থেকেই উত্তর ভারতে তিনটি পৃথক্ ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল—উদীচ্য, মধ্যদেশীয় এবং প্রাচ্য। কালক্রমে এই তিনটির ব্যবধান দুস্তর হয়ে ওঠে, এবং বিশেষ করে পূর্বভারতে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত প্রাচ্য ভাষারীতি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে।

আদি প্রাকৃতের প্রথম পরিচয় আমরা পাই বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের মধ্যে। তা ছাড়া অশোকের লিপিতেও তার পরিচয় আছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত অশ্বঘোষের নাটকগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি যে চারটি বিখ্যাত প্রাকৃত ভাষারীতির—অর্থাৎ অর্ধমাগধী, মাগধী, শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী—মধ্যে প্রথম তিনটির অস্তিত্ব তাঁর যুগে অবিদিত ছিল না। সম্ভবত গৌতম বুদ্ধ এবং মহাবীর প্রাচীন অর্ধমাগধী ভাষাতেই নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন, যদিও বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ সেই ভাষায় রচিত হয়নি। আদি জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ লুপ্ত হয়েছে, তবে শ্বেতাম্বর শাস্ত্রগ্রন্থ বলে যেগুলি প্রচলিত এবং যেগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী সেগুলিতে কিন্তু মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ঝোঁকটাই বেশি। আদি বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ, যা রক্ষিত রয়েছে হীনযানী বা থেরবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে, এবং যার বহুল প্রচলন সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে, পালি ভাষায় রচিত।

কিন্তু পালি নামক বিশেষ প্রাকৃত ভাষাটির উদ্ভব প্রসঙ্গ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে মগধদেশীয় কোন আঞ্চলিক ভাষা থেকে পালির উদ্ভব, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে পালির সঙ্গে কৌশাম্বী বা অবন্তীর যোগাযোগ ছিল অর্থাৎ ওই ভাষার উদ্ভব হয়েছে মধ্যদেশ থেকে। দ্বিতীয় মতটির সমর্থনে কয়েকটি কথা আছে। অশোকের ভাবরা অনুশাসনে যে বুদ্ধবচন উৎকীর্ণ আছে তা তাঁর যুগে প্রচলিত প্রাচ্য ভাষায় লিখিত, যার সঙ্গে মাগধী-প্রাকৃতের কিছু মিল আছে। এ থেকে বোঝা যায়, একটি বিশেষ ভাষা হিসাবে পালি তাঁর নিকট অজানা ছিল, এবং পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্ম তিনি একটি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষারই ব্যবহার করেছিলেন। মাগধী-প্রাকৃতধর্মী এই ভাষার সঙ্গে পালির সংযোগ সামান্য, বরং পালি শৌরসেনী-প্রাকৃত বা মধ্যদেশের ভাষার সঙ্গেই বিশেষ সম্পর্কযুক্ত।

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের আদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন স্থানীয় ভাষাগুলির মাধ্যমেই শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে। কমপক্ষে চারটি ভাষায় বুদ্ধবচনসমূহের সঙ্গে আমরা বর্তমানকালে পরিচিত হতে পারি—পূর্বদেশীয় প্রাকৃত (অশোকের লিপি), উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃত (মধ্য এশিয়া), বৌদ্ধ-সংস্কৃত (গিলগিট ও নেপাল) এবং পালি। এটা খুবই সম্ভব, বুদ্ধের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই তাঁর রচনাসমূহ তাঁর উজ্জয়িনী ও মথুরাবাসী ভক্তদের দ্বারা মধ্যদেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী কালে যেমন ঘটেছিল কবীরের ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন কাশীর বাসিন্দা এবং ভোজপুরীতে কথা বলতেন, কিন্তু তাঁর বচনসমূহ ভিন্নতর ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এ কথাও মনে রাখতে হবে, যে পালি ভাষার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল সিংহল যেখানে সম্ভবত এই ভাষাটি নিয়ে গিয়েছিলেন অশোকের পুত্র মহেন্দ্র যিনি উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করেছিলেন।

২ ॥ প্রাকৃতের জনপ্রিয়তা

একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাসমূহের শক্তিবৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে ছিল বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম। প্রাকৃত ভাষাসমূহের বিপুল বেগে সংস্কৃত বেশ কিছুকালের জন্য পিছু হটে গিয়েছিল। আমরা আগেই বলেছি যে অশোকের অনুশাসনগুলি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত প্রাপ্ত লেখমালাসমূহের অধিকাংশই প্রাকৃতে রচিত যা থেকে ভারতের সর্বত্র ওই

ভাষাগুলির জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিপুল বেগ নিয়ে প্রাকৃত ভাষাগুলি আবির্ভূত হয়েছিল সেই বেগ বেশিদিন তীব্র থাকে নি। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ও জৈন লেখকেরা প্রাকৃত ভাষাসমূহকে অবহেলা করে সংস্কৃতের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

তথাপি এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে বৌদ্ধ-পালি ও জৈন-মহারাষ্ট্রী দীর্ঘকাল ধরে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে খোটানে প্রাপ্ত প্রাকৃত ধর্মপদ, এবং চৈনিক তুর্কীস্থানে প্রাপ্ত খরোষ্ঠী লিপিতে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতে রচিত রচনাসমূহ খ্রীষ্ট-পরবর্তী শতকসমূহে প্রাকৃতের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে সংস্কৃত নাটকসমূহে প্রাকৃত ভাষার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে নারী ও অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্রগুলির সংলাপে। অশ্বঘোষ, ভাস ও শূদ্রক মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ও মাগধী থেকে উপজাত ভাষাসমূহ পর্যাপ্ত ব্যবহার করেছেন তাঁদের নাটকাবলীতে। সাধারণত পদ্য সংলাপে মহারাষ্ট্রী, গদ্য সংলাপে শৌরসেনী এবং সাধারণ লোকদের সংলাপে মাগধীর ব্যবহার হত। শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃতই পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিল, এবং ব্যাকরণবিদেরা ওইটিকেই আদর্শ প্রাকৃত বলে বর্ণনা করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত অনেক গীতিকবিতা প্রাকৃত এবং সেগুলি থেকে উদ্ভূত ভাষাসমূহের দ্বারা রচিত হয়েছিল। এইরকম একটি বিখ্যাত সংকলনের নাম গাথাসপ্তশতী যা সংগ্রহ করেছিলেন সাতবাহনবংশীয় রাজপুত্র হাল। কাব্যগ্রন্থটি আর্যা-ছন্দে রচিত, কিন্তু প্রাকৃতে অপরাপর ছন্দেরও ব্যবহার ছিল যেমন বর্ণ বৃত্ত। এই যুগের আরও একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে গুণাঢ্য রচিত বৃহৎকথা। পৈশাচী-প্রাকৃতে রচিত এই গ্রন্থটি রোমান্টিক গল্পসমূহের অফুরন্ত আকরবিশেষ, এবং পরবর্তী কালে ক্ষেমেন্দ্র এবং সোমদেব এই গ্রন্থ থেকে প্রচুর উপকরণ আহরণ করেছিলেন। গ্রন্থটি অবশ্য আবিষ্কৃত হয় নি, তবে অন্যান্য গ্রন্থে বৃহৎকথা-র উল্লেখ দেখে গ্রন্থটির অস্তিত্ব অনুমান করা যায় মাত্র।

৩॥ জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের মধ্যে গুজরাতের বলভী নামক স্থানে শ্বেতাম্বর জৈনেরা দেবর্ধির সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন আহ্বান করে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংকলনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। বিভিন্ন মৌখিক ঐতিহ্যপ্রাপ্ত সূত্রসমূহের

সাহায্যে এই সম্মেলনে যা কিছু প্রস্তুত করা হয়েছিল তা জৈন আগম বা জৈন সিদ্ধান্তরূপে বিখ্যাত। এইগুলিকে অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে ভাষায় শ্বেতাম্বর জৈন শাস্ত্রগুলি সংকলিত হয়েছে তা অবশ্য অর্ধমাগধী-প্রাকৃত, তবে তার ঝোঁকটা মহারাষ্ট্রীর দিকেই বেশি। অনেকে এই ভাষাকে জৈন-প্রাকৃত বা আর্ষ-প্রাকৃতও বলে থাকেন। মূলত ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব ও সাংঘিক আচরণবিধি জৈন শাস্ত্রগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। তবে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় যে সেখানে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়। দিগম্বর জৈনেরা অবশ্য এই সব শ্বেতাম্বর শাস্ত্রাদি মানেন না। তাঁদের মতে যেহেতু আদি জৈন শাস্ত্র লুপ্ত হয়েছে সেই হেতু সেগুলি পুনরুদ্ধারের নামে যা কিছু করা হবে আসলে তা সবই হবে জাল, কেন না মহাবীরের মৃত্যু আর শ্বেতাম্বরদের শাস্ত্র-সংকলনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় এক হাজার বছর।

৪ ॥ দ্বাদশ অঙ্গ

শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে বারোটি "অঙ্গ"-গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র-সংকলন। অবশ্য তাঁরা বিশ্বাস করেন যে এইগুলিরও আগে "পূর্ব" নামক চৌদ্দটি গ্রন্থ ছিল যা অবলুপ্ত হয়েছে। এখানে আমরা অঙ্গ-গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। এই নীরস তালিকাটি হয়ত অনেকেরই ভালো লাগবে না, কিন্তু কারো কারো প্রয়োজনে আসতে পারে। (১) আয়ার (সংস্কৃত আচার) —দুই খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে জৈন সন্ন্যাসীদের কর্তব্য ও আচরণের তালিকা দেওয়া আছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত। (২) সূয়গড় (সূত্রকৃত ?)—এই গ্রন্থটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত, এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত। এতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের ত্রুটিগুলি দেখিয়ে জৈনধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। (৩) ঠান (স্থান)—দশটি নিয়মের মধ্যে জৈনধর্মের সকল বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। (৪) সমবায়—এই গ্রন্থের প্রকৃতিও পূর্বোক্ত গ্রন্থের ন্যায়। রচনাকালের দিক থেকে গ্রন্থটিকে মোটেই প্রাচীন বলা যায় না। (৫) বিহায়-পন্নতি (ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি)—অন্য নাম ভগবতীসূত্র। এতে মহাবীরের জীবনকালের ঘটনা ও জৈনধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু কথা আছে। গ্রন্থটি বিভিন্ন যুগের রচনার সংমিশ্রণ। (৬) নায়াধম্মকহাও (জ্ঞাতাধর্মকথা)—দুই খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটি প্যারাবলধর্মী। গল্পের মাধ্যমে এখানে ধর্মের উপদেশসমূহ

পরিবেশন করা হয়েছে। (৭) উবাসগদসাও (উপাসকদশা)—গৃহী ভক্তদের আচার-আচরণ ও ব্রত-পার্বণের তালিকা এই গ্রন্থে দেওয়া আছে। (৮) অন্ত গড়দশাও (অন্তঃকৃদ্দশা) ও (৯) অনুত্তরোববাইয়দশাও (অনুত্তরোপপাদিক দশা)—এই দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে তপস্যার গৌরবকীর্তন, প্রায়শ্চিত্তবিধি ও অনশনমৃত্যুর সুফল প্রদর্শন। (১০) পণ্হাবাগরণাইম্ (প্রশ্নব্যাকরণানি)—এতে আছে অহিংসা ইত্যাদি ব্রতের সুফলসমূহের তালিকা, এবং সেগুলির অন্যথাকরণের প্রায়শ্চিত্তবিধি। (১১) বিবাগসুয় (বিপাকশ্রুত)—এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে পাপ-পুণ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। (১২) দিট্‌ঠিবায় (দৃষ্টিবাদ)—কথিত আছে, জৈনদের হারিয়ে-যাওয়া চোদ্দটি আদিগ্রন্থ, যেগুলি "পূর্ব" নামে বিখ্যাত সেইগুলির সারমর্ম এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু গ্রন্থটির কোন অস্তিত্ব নেই।

৫ ॥ দ্বাদশ উপাঙ্গ

বারোটি "অঙ্গ" গ্রন্থ ছাড়া শ্বেতাম্বর জৈনদের শাস্ত্রসংগ্রহের মধ্যে উপাঙ্গ নামে কথিত বারোটি গ্রন্থ আছে। সেগুলিরও পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। (১) উববাইয় (উপপাদিক)—দুই খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে স্বর্গ ও নরকের বিশেষ বিবরণ আছে, এবং কোন্ কোন্ কর্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি বা নরকভোগ ঘটে তারও বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। (২) রায়পসেণইজ্জ (রাজপ্রশ্নীয়)—এই গ্রন্থে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে গ্রন্থটি রচিত। প্রশ্নকর্তা হচ্ছেন পয়েস বা পয়েসি (প্রসেন, প্রসেনজিৎ ?) নামক জনৈক রাজা এবং উত্তরদাতা হচ্ছেন কেশী নামক জনৈক জৈন সন্ন্যাসী। (৩) জীবাভিগম—এই গ্রন্থে আছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের বর্ণনা এবং জৈন বিশ্ববৃত্তান্ত। (৪) পন্নবণা (প্রজ্ঞাপনা)—এই গ্রন্থটিরও বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী গ্রন্থের অনুরূপ। গ্রন্থটির লেখক হিসাবে আমরা জনৈক আর্য শ্যামের নাম পাই যিনি সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের লোক ছিলেন (৫) সূরপন্নত্তি (সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি), জম্বুদ্দীবপন্নত্তি (জম্বূদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি) ও (৭) চংদপন্নত্তি (চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি)—এই তিনটি গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু হল বিশ্বতত্ত্ব, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, কালবিভাগ ইত্যাদি। (৮) নিরয়াবলিয়াও (নিরয়াবল্য), (৯) কপ্প-বদিংসিয়াও (কল্পাবতংসিকা), (১০) পুপ্ফচুলাও (পুষ্পচুলা, পুষ্পচুলিকা),

(১১) পুপ্‌ফিয়াও (পুষ্পিকা) এবং (১২) বণ্‌হিদসাও (বৃষ্ণিদশা)—এই পাঁচটি গ্রন্থ একসঙ্গে নিরয়াবলীসূত্র নামে পরিচিত, বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্যের বর্ণনা।

৬ ॥ প্রকীর্ণ, ছেদসূত্র, মূলসূত্র, ইত্যাদি

প্রকীর্ণ (প্রাকৃত পইন্ন) কথাটির অর্থ ই হচ্ছে যা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। এই পর্যায়ের দশটি শাস্ত্রগ্রন্থের নাম যথাক্রমে চৌসরণ (চতুঃশরণ), বীরভদ্র রচিত যে গ্রন্থে অর্হংদের, সাধুদের, সিদ্ধদের ও ধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে; আউরপচ্চক্‌খান (আতুরপ্রত্যাখ্যান), ভত্তপরিন্না (ভক্তপরিজ্ঞা), সংস্থার (সংস্তার) ও মহাপচ্চক্‌খান (মহাপ্রত্যাখ্যান), যে গ্রন্থ চারটিতে অনশনে আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে; চংদাবিজ্জহ (চন্দ্রকবেধ্যকা), গণিবিজ্জা (গণিবিদ্যা), তংডুলবেয়ালিয় (তণ্ডুলবৈচারিক), দেবিংদথয় (দেবেন্দ্রস্তব) এবং বীরথয় (বীরস্তব), যে গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে যথাক্রমে সংঘজীবনের নিয়মাবলী, শুভাশুভনির্ণয়, খাদ্য ও শারীরতত্ত্ব, রাজা ও দেবতাদের শ্রেণীবিভাগ, এবং মহাবীরের বিভিন্ন নামের বর্ণনা।

এ ছাড়া শ্বেতাম্বর জৈনদের "ছেদসূত্র" পর্যায়ের ছয়টি গ্রন্থ আছে। প্রাকৃতে বলা হয় ছেয়সুত্ত। এই নামকরণের কারণ জানা যায় না। গ্রন্থগুলি হচ্ছে (১) নিসীহ (নিশীথ) যার বিষয়বস্তু হচ্ছে দৈনন্দিন নিয়মভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তবিধিসমূহ, (২) মহানিসীহ (মহানিশীথ) যার বিষয়বস্তু প্রথমটিরই অনুরূপ, (৩) ববহার (ব্যবহার), (৪) আয়ারদসাও (আচারদশা) ও (৫) কপ্প (কল্প)—এই তিনটি গ্রন্থকে একসঙ্গে শ্রুতস্কন্ধ বা দশাঃকল্পব্যবহার বলা হয়, যেগুলির বিষয়বস্তু সংঘজীবনের নিয়মাবলী। পঞ্চম গ্রন্থটির লেখক হিসাবে ভদ্রবাহুর নাম উল্লেখ করা হয় এবং ওই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়টি ভদ্রবাহু-কল্পসূত্র নামে খ্যাত, যা তিনভাগে বিভক্ত—জিনচরিত (মহাবীর সহ সকল তীর্থঙ্করদের জীবনকথা), স্থবিরাবলী (বিভিন্ন জৈন উপগোষ্ঠী ও সেগুলির শিক্ষকদের কথা) এবং সামায়ারী (সামাচারী, সাময়াচারিকা, যার বিষয়বস্তু জৈন সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন কর্তব্য); (৬) পঞ্চকপ্প (পঞ্চকল্প), জিনভদ্র রচিত ষষ্ঠ ছেদসূত্র, যা বর্তমানে পাওয়া যায় না।

ছয়টি ছেদসূত্র ছাড়া শ্বেতাম্বর জৈনদের চারটি "মূলসূত্র" গ্রন্থ আছে। (১) উত্তরজ্‌ঝায়া (উত্তরাধ্যয়ন), ছত্রিশটি অধ্যায়ে রচিত জৈনধর্মের একটি

প্রামাণ্য গ্রন্থ, যা খোদ মহাবীরের মুখনিঃসৃত বলে প্রকাশ, কিন্তু যা প্রকৃতপক্ষে অনেক পরের যুগের রচনা যার লেখকসংখ্যাও অনেক। (২) আবস্সয়-নিজ্জুত্তি (আবশ্যক-নির্যুক্তি) গ্রন্থে দীক্ষিতদের আবশ্যিক কর্তব্যসমূহ তালিকাবদ্ধ হয়েছে। (৩) জনৈক সেজ্জম্ভব রচিত দশবেয়ালিয় (দশবৈকালিক) গ্রন্থেও সন্ন্যাস-জীবনের মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৪) পিণ্ডনিজ্জুত্তি (পিণ্ড-নির্যুক্তি) গ্রন্থটি ভদ্রবাহু বিরচিত বলে মনে করা হয়, খাদ্যগ্রহণ, ভিক্ষানীতি প্রভৃতি যে গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এই চারটি মূলসূত্র ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রামাণ্য শ্বেতাম্বর শাস্ত্র আছে—(১) নন্দী, (২) অনুওগদারা (অনুযোগদ্বার), (৩) ইসিভাসিয়াইম্ (ঋষিভাষিতানি), (৪) অঙ্গচূলিয়া (অঙ্গচূলিকা), (৫) বগ্গচূলিয়া (বর্গচূলিকা), (৬) বিহারচূলিয়া (বিবাহচূলিকা) এবং (৭) অঙ্গবিজ্জা (অঙ্গবিদ্যা)।

৭। দিগম্বর শাস্ত্রগ্রন্থ

দিগম্বর জৈনগণ শ্বেতাম্বর শাস্ত্রসমূহকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন না এবং তাঁদের মতে আদি শাস্ত্রসমূহ অন্তর্হিত হয়েছে। তথাপি তাঁরা নিজেরা কিছু গ্রন্থ রচনা করে নিয়েছেন যেগুলি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রথমানুযোগ, করণানুযোগ, দ্রব্যানুযোগ এবং চরণানুযোগ। দিগম্বর জৈনদের প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি: (১) উমাস্বামী রচিত তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক), (২) বট্টকের রচিত মূলাচার এবং ত্রিবর্ণাচার (প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে); (৩) রবিষেণ রচিত পদ্মপুরাণ (সপ্তম শতক); (৪) সমন্তভদ্র বিরচিত আপ্তমীমাংসা ও রত্নকরণ্ড-শ্রাবকাচার (অষ্টম শতক); (৫) জিনসেন বিরচিত হরিবংশ পুরাণ (অষ্টম শতক); এবং (৬) অপর একজন জিনসেন ও তৎশিষ্য বিরচিত ত্রিষষ্টিলক্ষণ-মহাপুরাণ।

জৈন শাস্ত্রসমূহের টীকাভাষ্য ইত্যাদি রচনার জন্য যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন কুন্দকুন্দ, উমাস্বামী, বট্টকের, কার্তিকেয়স্বামী, পূজ্যপাদ, সিদ্ধসেন-দিবাকর, সমন্তভদ্র, বিদ্যানন্দ নেমিচন্দ্র, গোম্মট, অমৃতচন্দ্র, দেবসেন, শান্তিসূরী, হেমচন্দ্র, অমিতগতি, আশাধর, মল্লিসেন, দেবেন্দ্র, সকলকীর্তি, শ্রুতসাগর, ধর্ম-সাগর, বিনয়বিজয় ও যশোবিজয়।

৮॥ অপরাপর প্রাকৃত গ্রন্থ

প্রাকৃত ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত-ব্যাকরণ রচনারও প্রয়োজন দেখা যায়। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ এবং চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ সম্ভবত প্রাকৃত ভাষার আদি ব্যাকরণ, যদিও সেগুলি সংস্কৃতে রচিত। দুটি গ্রন্থই সপ্তম শতকের মধ্যে কোন সময় রচিত হয়েছিল।

প্রাকৃত কাব্যসাহিত্যের মধ্যে দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হচ্ছে প্রবরসেন রচিত সেতুবন্ধ। মহারাষ্ট্রী-প্রাকৃতে রচিত এই কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযান ও সীতার উদ্ধার। কাব্যটির লেখক প্রবরসেন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে, কেউ তাঁকে কাশ্মীরাধিপতি দ্বিতীয় প্রবরসেনের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, আবার কেউ তাঁকে বাকাটক-বংশীয় রাজা প্রবরসেন বলে মনে করেন।

দ্বিতীয় কাব্যটি হচ্ছে বাক্‌পতি বিরচিত গৌড়বহো। এটিকে ঐতিহাসিক কাব্যও বলা যেতে পারে। লেখক ভবভূতির শিষ্য এবং কনৌজরাজ যশোবর্মার সভাকবি ছিলেন। সমগ্র কাব্যটি ১২০০ স্তবকে লিখিত এবং এই কাব্যে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা যশোবর্মার দিগ্বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকলেও কাব্যগুণের অভাব নেই, বিশেষ করে কবি সেখানে পর্বত-নদী-প্রান্তরের যে চিত্রগুলি এঁকেছেন, এক কথায় সেগুলি অপূর্ব। বাক্‌পতির রচনাশৈলীর মধ্যেও কোন আড়ষ্টতা নেই।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পরে উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত সাহিত্যগ্রন্থ হিসাবে হরিভদ্রের সমরাইচ্চকহা (সমরাদিত্য-কথা) ও ধূর্তাখ্যান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি গদ্যে রচিত একটি ধর্মীয় উপাখ্যান এবং দ্বিতীয়টি ছন্দে রচিত একটি শ্লেষাত্মক কাব্য। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রাকৃত গ্রন্থ হচ্ছে উদ্দ্যোতনসূরি রচিত কুবলয়মালা, যা সংস্কৃত চম্পূকাব্য ধরনের গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত রচনা। এখানে আঠারো রকম প্রাকৃতের ব্যবহার করা হয়েছে এবং ছন্দের ক্ষেত্রে গাথা, দ্বিপদী, দোহা এবং দণ্ডক এই চার রকম ছন্দের ব্যবহার ঘটানো হয়েছে। রচনাকাল আনুমানিক ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। চতুর্দশ শতকে এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত সংস্করণ রচনা করেছিলেন রত্নপ্রভসূরি।

ধর্মদাসগণির উপদেশমালা একটি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ যা গাথা-ছন্দে ৫০০টি স্তবকে রচিত। রচনাকাল আনুমানিক ৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। এরপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহেশ্বরসূরির জ্ঞানপঞ্চমীকথা যা ২,০০০ স্তবকে লিখিত এবং যার

রচনাকাল দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি। আরও একটি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ, যা গাথা-ছন্দে ৯,০০০ স্তবকে রচিত, হচ্ছে সমুদ্রসূরির ভুবনসুন্দরীকথা, রচনাকাল ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই সম্পর্কে আরও একটি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থের নাম অজিত-শান্তি-স্তব, যার রচয়িতা ছিলেন জনৈক নন্দীষেণ।

খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে প্রাকৃত ভাষায় মূলত জৈন লেখকদের প্রচেষ্টায় অনেকগুলি চরিতগ্রন্থ লেখা হয়েছিল, যেমন মহাবীরচরিত, আদিনাথ-চরিত, পার্শ্বনাথচরিত ইত্যাদি। অবশ্য সকল চরিতগ্রন্থই যে জৈন মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে লিখিত হত তা' নয়, অনেকক্ষেত্রে রাজামহারাজাদের জীবনী অবলম্বনেও তা রচিত হ'ত, যেমন হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত। এই সকল গ্রন্থে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জৈন-মহারাষ্ট্রী ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য প্রাকৃতে বড় কম। ত্রয়োদশ শতকে রচিত মলয়সুন্দরীকথা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি একটি রোমান্স, নায়ক মহাবল ও নায়িকা মলয়সুন্দরীর প্রণয়োপাখ্যান। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণকার হিসাবে আমরা বররুচি ও চণ্ডের নাম ইতিপূর্বে করেছি। পরবর্তী কালে যাঁরা এই বিষয় আলোচনা করেন তাঁরা হচ্ছেন হেমচন্দ্র ও ক্রমদীশ্বর।

৯ ॥ হেমচন্দ্র ও অন্যান্য

পরবর্তী কালের প্রাকৃত সাহিত্যের চরিত্রের কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি, তবে আখ্যানধর্মী রচনাসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। একাদশ শতকের রচনা-সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ধনেশ্বরের সুরসুন্দরীচরিয়র উল্লেখ করা যায়, যা ১৬টি অধ্যায় ও ৪০০০ গাথায় রচিত একটি বৃহৎ প্রেমোপাখ্যান। প্রত্যক্ষ জৈন অনুপ্রেরণায় অনেকগুলি চরিতকাব্য একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল যেগুলির বিষয়বস্তু ছিল তীর্থংকর ও জৈন সাধুসন্তদের জীবনী। এই শ্রেণীর রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণচন্দ্রের মহাবীরচরিত (১০৮২), বর্ধমানের আদিনাথচরিত (১১০৩) ও মনোরমাচরিত, দেবচন্দ্রের শান্তিনাথচরিত (১১০৩), শান্তিসূরির পৃথ্বীচন্দ্রচরিত (১১০৮) দেবভদ্রের পার্শ্বনাথচরিত, সোমপ্রভের সুমতিনাথচরিত (দ্বাদশ শতক), হেমচন্দ্রের (মলধারিগচ্ছ) নেমিনাথচরিত, শ্রীচন্দ্রের মুনিসুব্রতস্বামীচরিত (১১৩৫), লক্ষ্মণগণির সুপাসনাহচরিয় (১১৪২), শ্রীচন্দ্রের (চন্দ্রগচ্ছ) সনৎকুমারচরিত (১১৫৭), হরিভদ্রের মল্লিনাথচরিত প্রভৃতি। সোমপ্রভের

কুমারপালপ্রতিবোধ রাজা কুমারপাল ও জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের কথোপকথন অবলম্বনে রচিত।

ছন্দে রচিত স্তোত্রসমূহের মধ্যে জিনবল্লভের উল্লাসিকস্ম-থয়, বীরগণির অজিয়শান্তি-থয়, ধর্মবর্ধনের ষড়্ভাষানির্মিত-পার্শ্বজিনস্তবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জয়কীর্তির সীলোবয়েসমালা ১১৬টি গাথায় রচিত উপদেশমূলক কাব্য। মুনিচন্দ্রের গাথাকোশ (দ্বাদশ শতক) একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ-সংকলন। জিনচন্দ্রগণির নবপয় (একাদশ শতক) একটি দর্শনগ্রন্থ যেখানে জৈনদের নয়টি তত্ত্ব—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরা ও মোক্ষ—আলোচিত হয়েছে। মলধারী হেমচন্দ্রের ভবভাবনা (দ্বাদশ শতক) এবং দেবেন্দ্রসূরির কর্মগ্রন্থ (ত্রয়োদশ শতক) জৈন দর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দ্বাদশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত জৈন লেখক ছিলেন হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২)। তাঁর উপাধি ছিল কলিকালসর্বজ্ঞ। তিনি বিখ্যাত সংস্কৃত লেখক ছিলেন, কিন্তু প্রাকৃতেও তাঁর অবদান বড় কম নয়। তাঁর কুমারপালচরিত একটি দ্ব্যর্থবোধক রচনা যেখানে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা কুমারপালের কীর্তি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাকৃত ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলিকে বুঝিয়েছেন। শেষ দুই অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধহেমচন্দ্রের অষ্টম অধ্যায়ে তিনি প্রাকৃত ব্যাকরণ আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া দেশীনামমালা নামক তাঁর প্রাকৃত অভিধান সুবিখ্যাত। প্রাকৃত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন সংক্ষিপ্তসার নামক গ্রন্থের লেখক ক্রমদীশ্বর, প্রাকৃত শব্দানুশাসনের লেখক ত্রিবিক্রম, ষড়্ভাষাচন্দ্রিকার লেখক লক্ষ্মীধর, প্রাকৃতরূপাবতারের লেখক সিংহরাজ প্রভৃতি।

১০ ॥ পরিশিষ্ট : হালের গাথাসপ্তশতী

সাতবাহন নরপতি হালের গাথাসপ্তশতীর কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। গাথাসপ্তশতী মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি কোশগ্রন্থ, রচনাকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক। কোশগ্রন্থের লক্ষণ সম্পর্কে আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেছেন, কোশঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ, অর্থাৎ কোশকাব্যের শ্লোকগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ। সপ্তশতীর সাতশো গাথাই শৃঙ্গাররসাত্মক, বক্তব্য বিষয় হিসাবে একটি গাথার সঙ্গে অন্য কোনটির বিশেষ

সম্পর্ক নেই। তাঁর স্বরচিত একটি শ্লোকে হাল বলেছেন যে তিনি অলঙ্কার-বিভূষিত কোটি কোটি গাথার মধ্য থেকে এই কোশগ্রন্থে কেবলমাত্র সাতশো গাথার সংকলন করেছেন। গাথাসপ্তশতী অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তী কালের কবি গোবর্ধনাচার্য হালের প্রাকৃত কাব্যের রীতি অনুসরণ করে তাঁর আর্যাসপ্তশতী রচনা করেন। আরও পরে বিহারের এক কবি হাল অনুসরণে বিহারী সতসঈ রচনা করেছিলেন। সপ্তশতীর গাথাগুলি অধিকাংশই আদিরসাত্মক ও জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করবার পথনির্দেশক। এই গ্রন্থে আমরা প্রাচীন ভারতের, বিশেষতঃ দক্ষিণাপথের গ্রাম, পথঘাট, গ্রামের দেবদেউল, গৃহস্থ-পরিবার এবং তাদের আত্মীয়-পরিজনদের কথা জানতে পারি। দুশ্চরিত্রা রমণীগণ কিভাবে প্রতিবেশিনীদের বিপথগামিনী হতে প্রলুব্ধ করত তার অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। গাথাসপ্তশতীতে আমরা রতিবিহ্বলা, কামবিদ্ধা, মানিনী, অনুরাগিণী, স্বাধীন-ভর্তৃকা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিরহিণী, অভিসারিকা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নায়িকার পরিচয় পাই। এখানে গ্রামবাসিনী যুবতীরাই স্বাভাবিক শৃঙ্গার-রসের নায়িকা। শৃঙ্গার-রস-সম্পৃক্ত বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব, শৃঙ্গারের সংযোগ ও বিরহ, এমনকি উচ্ছৃঙ্খল ও অবৈধ শৃঙ্গারের ভাবাদিও এখানে বিদ্যমান। হালের এই প্রাকৃত সপ্তশতীর প্রধান প্রাচীন সংস্কৃত টীকা গঙ্গাধরের রচিত, যাঁর প্রদত্ত নাম-তালিকা থেকে দেখা যায় যে এখানে হাল রচিত গাথার সংখ্যা ৪৪। তাঁর পূর্ববর্তী রচয়িতাদের নামসংখ্যা ২৬১, এবং এঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা কবিও আছেন। সর্বসমেত মোট ৩৯৮টি গাথার রচয়িতাদের নাম পাওয়া গেছে।[১]

১। জৈন গ্রন্থসমূহের ইংরাজী অনুবাদ *Sacred Books of the East* সিরিজের ২২ ও ৪৫তম খণ্ডে এবং *Sacred Books of the Jainas* সিরিজে পাওয়া যাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুটি জৈন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র এবং ভট্টাচার্য ও শ্যামসুখা কৃত উত্তরাধ্যয়ন সূত্র। যে সব সংস্থা জৈন শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশের কাজে ব্রতী আছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল Prakrit Text Society, দিগম্বর জৈন গ্রন্থভাণ্ডার, শেঠ দেবচন্দ লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার, মানিকচন্দ্র দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা, সনাতন জৈন গ্রন্থমালা, যশোবিজয় জৈন গ্রন্থমালা প্রভৃতি। সকল জৈনগ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক তালিকার জন্য এইচ. ডি. ভেলোনকরের জিনরত্নকোশ (১৯৪৪) দ্রষ্টব্য। জৈন সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাসের জন্য **V. D. Barodia**, ***History and Literature of Jainism*** (১৯০৯), **M. Winternitz**, ***History of Indian Literature*****, Vol. II, Part II** (১৯২১) এবং **H. R. Kapadia**

১১॥ পালি

বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছিল, তবে পালিভাষায় রচিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি আজও পর্যন্ত প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। পালিভাষার উদ্ভবের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। বৌদ্ধ পালি শাস্ত্রসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত—বিনয়, সুত্ত এবং অভিধম্ম। এই তিনটি শ্রেণীকে একত্রে বলা হয় তিপিটক (ত্রিপিটক)। আবার কেউ কেউ পালি শাস্ত্রসমূহকে নয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—সুত্ত, গেয্য, বেয্যাকরণ, গাথা, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, অব্ভুতধম্ম এবং বেদল্ল।

১২॥ বিনয়পিটক

পালি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বিনয়পিটকের স্থান সর্বোচ্চ। বিনয়পিটক চার ভাগে বিভক্ত—পাতিমোক্খ, সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধকা ও পরিবার। এইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে। (১) পাতিমোক্খ—এই গ্রন্থে বৌদ্ধভিক্ষুদের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে ২২৭টি নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। আদিতে অবশ্য এই নিয়মগুলির সংখ্যা ছিল ১৫২টি। (২) সুত্তবিভঙ্গ—পূর্ববর্তী গ্রন্থে বর্ণিত নিয়মগুলির ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে করা হয়েছে। গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত—মহাবিভঙ্গ এবং ভিকখুনি-বিভঙ্গ। (৩) খন্ধকা—দু'ভাগে বিভক্ত, মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ। মহাবগ্‌গ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত যার বিষয়বস্তু হচ্ছে সংঘ গঠনের ইতিহাস, সংঘে প্রবেশের নিয়মাবলী, উপোসথ উৎসব, বর্ষাবাস, ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের পদ্ধতি, নানা ধরনের অপরাধ ইত্যাদি। সেকালের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। চুল্লবগ্‌গ বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম নয়টি অধ্যায়ে ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা

History of the Canonical Literature of the Jainas (১৯৪১)। জৈন গ্রন্থসমূহের বিদেশী সম্পাদক ও অনুবাদকদের মধ্যে H. Jacobi (আয়ার, সূত্রকৃত, উত্তরাধ্যয়ন, কল্পসূত্র, ভদ্রবাহুচরিত, কল্পকিরণাবলী, পরিশিষ্টপর্ব), L. D. Barnett (অন্তগড়দসাও ও অনুত্তরোববাইয়দসাও), E. Leumann (ঔপপাতিক, দশবৈকালিক ও নিরয়াবলী), W. Schubring (মহানিশীথ, নিশীথ ও ব্যবহার), C. H. Tawny (কথাকোষ), S. Warren (নিরয়াবলিয়াও), H. Hertel (পরিশিষ্টপর্ব), J. F. Fleet (বাক্যবিবেক), A. E. R. Hoernle (উবাসগদসাও) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাণিনিপূর্বসূরীর প্রতি উৎসর্গ সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ করেছেন রাধাগোবিন্দ বসাক (১৯৫৯)।

পদ্ধতি, দশম অধ্যায়ে ভিক্ষুণীদের জন্ত নিয়মকানুন, একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে রাজগৃহ এবং বৈশালীর ধর্মসম্মেলনের বিবরণী দেওয়া আছে। (৪) পরিবার— বিনয়পিটকের শেষ গ্রন্থ, সম্ভবত কোন সিংহলী ভিক্ষুর রচনা। প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে বুদ্ধের উপদেশের সার কথাগুলি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

১৩।। সুত্তপিটক

বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের সর্বাধিকসংখ্যক রচনা সুত্তপিটকের অন্তর্গত। সুত্তপিটক মোট পাঁচটি সংকলনে বিভক্ত—দীঘ নিকায়, মজ্‌ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়। এই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে পঞ্চমটি, অর্থাৎ খুদ্দক নিকায়, প্রকৃতির দিক্ থেকে প্রথম চারটির থেকে একেবারে পৃথক্।

দীঘ নিকায় : দীঘ কথাটি দীর্ঘ থেকে এসেছে। বুদ্ধের ৩০টি দীর্ঘ উপদেশের সংকলন হচ্ছে এই গ্রন্থ। প্রতি উপদেশই হচ্ছে এক-একটি অধ্যায় বা সুত্ত। প্রথম সুত্তটির নাম ব্রহ্মজালসুত্ত যাতে সমসাময়িক ধর্মজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মকে বোঝানোর প্রচেষ্টা বর্তমান। দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম সামঞ্ঞফলসুত্ত যেখানে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদগুলি খণ্ডন করে বৌদ্ধধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাকি অধ্যায়গুলিরও বিষয়বস্তু এই ধরনের। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে মহাপরিনিব্বাণসুত্ত (১৬ সংখ্যক) যাতে বুদ্ধের জীবনের শেষ দিনগুলির কথা এবং তাঁর মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

মজ্‌ঝিম নিকায় : মজ্‌ঝিম কথাটির অর্থ মধ্যম, এতে আছে মোট ৫০টি সুত্ত, মাঝারি আকারের। এগুলিও বুদ্ধবচন। এই গ্রন্থেও অপরাপর ধর্মমতের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা আছে। তা ছাড়া সে যুগের অপরাধ ও দণ্ড, বুদ্ধের কথোপকথন ও অজস্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় মজ্‌ঝিম নিকায় পূর্ণ। বস্তুত দীঘ ও মজ্‌ঝিম নিকায় সবদিক থেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থ।

সংযুত্ত নিকায় : এই গ্রন্থটি ৫৬টি শ্রেণীতে বিভক্ত। মোট তিন ধরনের বক্তব্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক দিক্‌সমূহের সঙ্গে যুক্ত, যেগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর দেবতা, মানুষ ও দানবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যেগুলি কোন মহৎ বীর বা সাধুপুরুষের জীবনকথার সঙ্গে সম্পর্কিত। অপর একটি হিসাব অনুযায়ী সংযুত্ত নিকায় পাঁচটি বগ্‌গ বা

শ্রেণীতে বিভক্ত—সগাথ, নিদান, খন্ধ, সড়ায়তন এবং মহা। এগুলির মধ্যে প্রথম বগ্‌গটি কাব্যগুণে রীতিমত উৎকৃষ্ট। অজস্র কথা ও কাহিনীর পরিচয় সংযুক্ত-নিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অঙ্গুত্তর নিকায়ঃ এগারোটি খণ্ডে (নিপাত) এই গ্রন্থটি বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ড আবার কয়েকটি করে অধ্যায়ে বিভক্ত। যেখানে সংযুক্ত নিকায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক দিক্‌গুলি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান সেখানে অঙ্গুত্তর নিকায়ের উদ্দেশ্য আরও বাস্তব, যাতে লোকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজ-জীবনের, বিশেষ করে সামাজিক ও যৌন অপরাধ ও সেগুলির জন্য দণ্ডের কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১]

১৪। ক্ষুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহ

ক্ষুদ্দক নিকায় নামে ক্ষুদ্র হলেও পরিধির দিক্ থেকে সর্ববৃহৎ। মোট পনের ধরনের সাহিত্যকর্ম নিয়ে এই সিরিজটি গড়ে উঠেছে। (১) ক্ষুদ্দক পাঠ—যে সব বালকবালিকা বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিয়েছে তাদের জন্য রচিত প্রার্থনা পুস্তক যা নয়টি ছোট ছোট অধ্যায়ে বিভক্ত। (২) ধম্মপদ—অত্যন্ত জনপ্রিয় এই গ্রন্থটি ৪২৩টি বুদ্ধবচনের সমষ্টি এবং প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুণসম্পন্ন হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত। (৩) উদান—মোট আটটি অধ্যায় বা বগ্‌গের সমষ্টি, এবং প্রতিটি বগ্‌গে দশটি করে সুত্ত আছে। গল্পচ্ছলে এখানে ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া হয়েছে, খ্রীষ্টকথিত প্যারাব্‌ল্‌গুলির মত। (৪) ইতিবুত্তক—এই গ্রন্থটি বুদ্ধবচনের সংকলন, ১২০টি উপদেশের সংগ্রহ। বক্তা বুদ্ধের কাছ থেকে স্বকর্ণে শুনে তা ব্যাখ্যা করছেন (বুত্তম্-পি হেতং ভগবতা ইতি মে সুতন্তি) এই

১। বিনয়পিটকের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন T. W. Rhys Davids এবং H. Oldenberg, *SBE*, ১৮৮১-৮৫; দীঘ নিকায়ের ইংরাজী অনুবাদ T. W. Rhys Davids (তিনখণ্ড, ১৮৯৯, ১৯১০, ১৯২১), সংযুক্ত নিকায়: C. A. F. Rhys Davids এবং F. L. Woodward (১৯১৭-৩০); মজ্‌ঝিম নিকায়: R. Chalmers (দুই খণ্ড, ১৯২৬-২৭); অঙ্গুত্তর নিকায়: E. R. T. Gooneratne (১৯১৩), A. D. Jayasundara (১৯২৫) F. L. Woodward এবং E. M. Hare (১৯৩২-৩৬)। সবকটি গ্রন্থই Pali Text Society-র তত্ত্বাবধানে সুসম্পাদিত হয়ে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এছাড়া নালন্দা মহাবিহার কর্তৃক দেবনাগরী হরফে সম্প্রতি সমুদয় পালি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দীঘ নিকায়ের বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায়।

কথা প্রতিটি উপদেশের গোড়ায় আছে। (৫) সুত্ত নিপাত—বুদ্ধের কথাবার্তা অবলম্বনে রচিত, মোট পাঁচটি অধ্যায়ে গদ্যে ও পদ্যে বিবৃত—উরগ, চুল, মহা, অট্টক এবং পারায়ণ। তৎকালীন সমাজ-জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য এখানে আছে। (৬) বিমানবত্থু ও (৭) পেতবত্থু অত্যন্ত নীরস, যাকে ইংরাজীতে বলে মংকিশ পোয়ট্রি। এই গ্রন্থ দুটিতে দেবলোকের ও প্রেতলোকের বিশদ বর্ণনা আছে। (৮) থেরগাথা এবং (৯) থেরীগাথা—বৌদ্ধ সংঘে বসবাসকারী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা রচিত, বৌদ্ধ সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থের ভাণ্ডারের অপূর্ব সম্পদ। ধর্মীয় পটভূমিতে রচিত হলেও ধর্ম এখানে গৌণ ব্যাপার হয়ে গেছে। (১০) জাতক—গল্পসাহিত্যের সংকলন, উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার। প্রতিটি জাতক কাহিনীর পাঁচটি করে অংশ আছে। (ক) "পচ্চুপ্পন্নবত্থু"—অর্থাৎ যে উপলক্ষে বুদ্ধ কাহিনীটি বলছেন; (খ) "অতীতবত্থু", অর্থাৎ অতীতের কাহিনী যা সচরাচর গদ্যে লিখিত বুদ্ধের পূর্বজন্মের কোন ব্যাপার; (গ) "গাথা" অর্থাৎ ছন্দে রচিত একটি অংশ যা অতীতের ও বর্তমানের কাহিনী দুটির যোগসূত্র; (ঘ) "বেয্যাকরণ", অর্থাৎ পূর্বোক্ত গাথাটির ব্যাখ্যা এবং (ঙ) "সমোধান" অর্থাৎ অতীতের কাহিনীর কোন চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধের অভিন্নতা ঘোষণা। জাতকের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশী। (১১) নিদ্দেস—তেত্রিশটি সুত্ত বা অধ্যায়ে বিভক্ত সারিপুত্ত বিরচিত সুত্তনিপাত গ্রন্থের শেষ দুই অধ্যায়ের ভাষ্য এবং মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেস এই দুই ভাগে বিভক্ত। (১২) পটিসম্ভিদামগ্‌গ, অর্থাৎ 'বিশ্লেষণের পন্থা', প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে রচিত-তিনটি খণ্ডে বিভক্ত, মহাবগ্‌গ, যুগনন্ধবগ্‌গ এবং পঞ্ঞাবগ্‌গ। (১৩) অপদান বা বীরগাথা যেখানে ৫৫০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন নারীর জীবন কথা বর্ণিত হয়েছে। রচনার ভঙ্গী জাতকধর্মী, যা সংস্কৃত অবদান সাহিত্যের পূর্বসূরী। (১৪) বুদ্ধবংশ—গৌতম বুদ্ধের পূর্বসূরী বলে কথিত চব্বিশ জন বুদ্ধের ছন্দে রচিত জীবনকথা। (১৫) চরিয়াপিটক—কয়েকটি জাতক-কাহিনীর ছন্দোরূপায়ণ যা অশোক-পরবর্তী কালে রচিত।

১৫ ॥ অভিধম্মপিটক ও অপরাপর গ্রন্থাবলী

অভিধর্ম কথাটি দর্শনবাচক হলেও অভিধম্মপিটকে প্রকৃত কোন দার্শনিকতা চোখে পড়ে না। সুত্তপিটকে বর্ণিত বিষয়গুলিই মূলত অভিধম্মপিটকেরও বিষয়বস্তু, যা প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে রচিত। এই পিটক মোট সাতটি গ্রন্থের

সমষ্টি যে জন্য একে সত্তপকরণও বলা হয়। এই সাতটি গ্রন্থ হচ্ছে ধম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক, এবং পট্‌ঠান। এইগুলির মধ্যে কথাবত্থুই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির অপর নাম বিজ্ঞানপদ, রচয়িতা মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স, যিনি তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির সভাপতি ছিলেন।

এ ছাড়া কয়েকটি গ্রন্থ আছে যেগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ না হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধদের দ্বারা মূল্যবান্ বলে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু থের নাগসেনের সঙ্গে সাগলের গ্রীক রাজা মীনাণ্ডারের কথোপকথন অবলম্বনে রচিত মিলিন্দপঞ্হো এই শ্রেণীর গ্রন্থ। বর্তমানে গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত, কিন্তু আদিতে প্রথম অধ্যায়ের কিয়দংশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় নিয়েই মূল গ্রন্থটি রচিত ছিল। সমকালীন আরও দুটি গ্রন্থ নেত্তিপকরণ ও পেতকোপদেস। প্রথমটি যাস্কের নিরুক্তের মতই পালি শাস্ত্রসমূহের শব্দার্থবিচার, এবং দ্বিতীয়টি মর্মার্থবিচার।[১]

১৬। টীকাগ্রন্থসমূহ

এ পর্যন্ত আমরা যে সকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি খ্রীষ্টপূর্ব

১। খুদ্দকপাঠ: সম্পাদনা ও ইংরেজি অনুবাদ R. C. Childers (JRAS ১৮৭০)। ধম্মপদ: অনুবাদ ম্যাক্সমূলার (SBE ১৮৮১), C. A. F. Rhys Davids (১৯৩১); উদান: অনুবাদ D. M. Strong (১৯০২), F. L. Woodward (১৯৩৫); ইতিবুত্তক: অনুবাদ J. H. Moore (১৯০৮), F. L. Woodward (১৯৩৫); সুত্তনিপাত: অনুবাদ V. Fausboll (SBE, ১৮৮১), R. Chalmers (১৯৩২); বিমানবত্থু: সম্পাদনা E. R. Gooneratne (১৮৮৬); পেতবত্থু: সম্পাদনা J. Minayeff (১৮৮৮); থেরগাথা ও থেরীগাথা: অনুবাদ C. A. F. Rhys Davids (১৯০৯, ১৯১৩); জাতক: সম্পাদনা V. Fausboll (৭ খণ্ড, ১৮৭৭-৯৭); ইংরেজি অনুবাদ E. B. Cowell (১৮৯৫-১৯১৩); বঙ্গানুবাদ: ঈশানচন্দ্র ঘোষ; মহানিদ্দেস: সম্পাদনা L. de la Vallée Poussin ও E. J. Thomas (১৯১৬-১৭); চুল্লনিদ্দেস: সম্পাদনা W. Stede (১৯১৮); পটিসম্ভিদামগ্গ: সম্পাদনা A. C. Taylor (১৯০৫-৭); অপদান: সম্পাদনা Mary E. Lilley (১৯২৫-২৭); বুদ্ধবংশ: অনুবাদ বিমলাচরণ লাহা (১৯৩৮); চরিয়াপিটক: অনুবাদ বিমলাচরণ লাহা (১৯৩৮); ধম্মসঙ্গণি: অনুবাদ C. A. P. Rhys Davids (১৯০০); বিভঙ্গ: সম্পাদনা পূর্বোক্ত জন (১৯০৪); ধাতুকথা: সম্পাদনা E. R. Gooneratne (১৮৯২); পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি: অনুবাদ বিমলাচরণ লাহা (১৯২৪); কথাবত্থু: অনুবাদ S. J. Aung ও C. A. F. Rhys Davids (১৯১৫); যমক: সম্পাদনা C. A. F. Rhys Davids (১৯১১-১৩); পট্‌ঠান: সম্পাদনা পূর্বোক্ত জন (১৯২১-২৩); মিলিন্দপঞ্হো: অনুবাদ T. W. Rhys Davids (SBE, ১৮৯০-৯৪); নেত্তিপকরণ: সম্পাদনা E. Hardy (১৯০২); পেতকোপদেস: সম্পাদনা পূর্বোক্ত জন (১৯০১)।

তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টপরবর্তী চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে। পরবর্তী যুগ, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত, পালি সাহিত্যের গৌরবময় যুগ বলে পরিগণিত। অবশ্য এই যুগের বিপুলাকার পালি সাহিত্যের কিছুটা অংশ সিংহলে রচিত হয়েছে।

বুদ্ধের জীবনী নিয়ে এপিকধর্মী রচনার সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই দেখা যায়। এই জাতীয় রচনার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিদানকথা। বর্তমানে গ্রন্থটি জাতকট্ঠবন্ননা নামক বৃহত্তর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত যদিও ওই গ্রন্থের বাকি রচনাগুলি নিদানকথার পরবর্তী কালে রচিত। নিদানকথা তিন অংশে বিভক্ত—দূরেনিদান, অবিদূরেনিদান এবং সান্তিকেনিদান। প্রথম অংশটি গদ্যে রচিত পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের চরিতকথা, মাঝে মাঝে বুদ্ধবংশ এবং চরিয়া-পিটক থেকে পদ্যে রচিত উদ্ধৃতিও আছে। পরবর্তী দুটি অংশে বোধিসত্ত্ব ও অপরাপর পরবর্তী কালের নানা বৌদ্ধ ধারণার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। বুদ্ধ-সংক্রান্ত কাহিনীগুলির উদ্ভব ও বিবর্তনের আদি পর্যায়টি নিদানকথায় পাওয়া যায়।

এবারে প্রখ্যাত বৌদ্ধ টীকাকারদের কথায় আসা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বুদ্ধঘোষের নাম। কথিত আছে, তিনি বোধ-গয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং রেবত নামক এক ভিক্ষুর দ্বারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। রাজা মহানামনের (৪০৯-৩১ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকালে তিনি সিংহলে যান। এখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বিসুদ্ধিমগ্‌গ রচনা করেন এবং সিংহলী থেকে মাগধীতে বিখ্যাত অট্ঠকথা গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বুদ্ধঘোষের রচনাবলীর তালিকা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তিনি নিজে অবশ্য তাঁর রচনাবলীর তালিকা হিসাবে বিসুদ্ধিমগ্‌গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, সারত্থপ্পকাসিনী এবং মনোরথপূরণী এই পাঁচটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। অপর একটি পালি গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি কংখা-বিতরণী, পরমত্থকথা এই দুটি গ্রন্থ এবং জাতক, ধম্মপদ, খুদ্দকপাঠ, সুত্তনিপাত এবং অপদান গ্রন্থগুলির টীকা রচনা করেছেন।

বুদ্ধঘোষের পরেই বুদ্ধদত্তের নাম করা হয়। ইনি দক্ষিণ ভারতে কাবেরী নদীর তীরে একটি সংঘারামের আবাসিক ছিলেন। বুদ্ধঘোষ রচিত গ্রন্থাবলীর সারসংক্ষেপ করেছেন বুদ্ধদত্ত। বুদ্ধদত্তের রচনাবলীর মধ্যে বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার, রূপারূপবিভঙ্গ, মধুরত্থবিলাসিনী এবং জিনালংকার।

অপর একজন টীকাকার ছিলেন আনন্দ যিনি সম্ভবত বুদ্ধঘোষের সমকালীন ছিলেন। ইনি অভিধম্মপিটকের অট্‌ঠকথার যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন তা মূলটীকা বা অভিধম্মমূলটীকা নামে খ্যাত।

ধর্মপাল ছিলেন বুদ্ধঘোষের কিঞ্চিৎ পরবর্তী যুগের লোক যিনি বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহের উপর চোদ্দটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এইগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে পরমত্থদীপনী। খুদ্দক নিকায়ের যে সাতটী গ্রন্থের টীকা বুদ্ধঘোষ করেন নি, বর্তমান গ্রন্থটি সেগুলিরই টীকা। ধর্মপাল রচিত অপরাপর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নেত্তি নামক গ্রন্থের টীকা, বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্‌গের উপর রচিত ভাষ্যগ্রন্থ পরমত্থমঞ্জুষা, জাতকত্থকথার উপর রচিত ভাষ্যগ্রন্থ লীনত্থ-পকাসিনী ইত্যাদি। বুদ্ধঘোষের রচনার সঙ্গে ধর্মপালের এ হেন যোগাযোগ দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তিনি বুদ্ধঘোষের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন ছিলেন। এই ধর্মপালকে কেউ কেউ আবার হিউয়েন সাং-এর শিক্ষক নালন্দার ধর্মপালের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। তা কিন্তু ঠিক নয়।

উপরি-উক্ত টীকাকারগণ ছাড়াও আরও কয়েকজন টীকাকার খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় উপসেনের নাম যিনি মহানিদ্দেস গ্রন্থের উপর সদ্ধম্মপজ্জোতিকা নামক টীকাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কস্সপ নামক আরও একজন টীকাকার মোহবিচ্ছেদনী, বিমতিচ্ছেদনী এবং বোধিবংস নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থদুটি যথাক্রমে অভিধম্ম ও বিনয়পিটকের টীকা। কথিত আছে, এই লেখক অনাগতবংশ নামক কাব্যগ্রন্থও লিখেছিলেন। এঁদের রচনাবলী ছাড়াও ধম্মসিরির খুদ্দসিক্খা এবং মহাসামির মূলসিক্খা নামক গ্রন্থটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির বেশির ভাগই কবিতায় রচিত বিনয়-পিটকের অনুশাসনগুলির সারমর্ম।

১৭॥ অপরাপর গ্রন্থ

একদিকে যখন বুদ্ধঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা বুদ্ধ সংশ্লিষ্ট উপাখ্যান সংগ্রহ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের টীকা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে তখন জাগতিক বিষয় নিয়েও কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হচ্ছিল। সিংহলী অট্‌ঠকথায় ওই দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছিল, এ ছাড়া সিংহলের ইতিহাস সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য অন্যান্য বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির মধ্যেও বর্তমান ছিল।

এই সব খণ্ডিত তথ্যগুলিকে একত্র করে সিংহলের ইতিহাস লেখার প্রথম চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় দীপবংস নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের লেখকের নাম অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু পৌরাণিক ঘেঁসা, রচনাভঙ্গী অতি দুর্বল। সম্ভবত চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে রাজা মহাসেনের রাজত্বকালে এই গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল।

পক্ষান্তরে এক শতাব্দী পরে রচিত মহাবংস নামক গ্রন্থটি অনেকাংশে সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন জনৈক মহানাম। বিজয়সিংহের সিংহলে আগমন থেকে শুরু করে রাজা মহাসেনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাসমূহের একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। মোট ৩৭টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। মহাবংসের পরিশিষ্ট হিসাবে পরবর্তী কালে চুলবংস নামে আরও একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

পালি ভাষার একটি ভাল ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কচ্চায়ন যা কচ্চায়নগন্ধ নামে পরিচিত। একটি দোষ না থাকলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত। দোষটা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতের সঙ্গে পালির ঐতিহাসিক সম্পর্কের দিকটি লেখক একেবারে উপেক্ষা করেছেন। পালি ভাষায় আরও দুটি ব্যাকরণ গ্রন্থ আছে, মহানিরুত্তিগন্ধ ও চুল্লনিরুত্তিগন্ধ।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পর থেকেই পালি সাহিত্যের অবক্ষয় শুরু হয়। তার কারণ একটিই। পালি সাহিত্যের মূল উৎস ধর্মীয়। একটিও উপন্যাস বা একটি নাটকও পালি ভাষায় রচিত হয়নি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পালি ভাষায় কোন অবদান নেই। শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করেই সমগ্র পালি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সেই বৌদ্ধধর্মের মূলই যখন এদেশে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, শুধু দ্বিধাবিভক্ত হওয়াই নয়, হীনযান শাখাটি যখন এদেশ থেকে একেবারেই অন্তর্হিত হল, তখন থেকেই পালি সাহিত্যের পতন শুরু হল, কেননা মহাযানী বৌদ্ধরা সংস্কৃত ভাষাকেই নিজেদের আদর্শ প্রচারের বাহন করেছিল।

১। মহাবংস : সম্পাদনা ও অনুবাদ W. Geiger (১৯০৮, ১৯১২), দীপবংস : সম্পাদনা ও অনুবাদ H. Oldenberg (১৮৭৯), চুলবংস : সম্পাদনা Geiger (১৯২৫-২৭), সুমঙ্গলবিলাসিনী : সম্পাদনা T. W. Rhys Davids (১৮৮৬), বিসুদ্ধিমগ্গ : সম্পাদনা C. A. F. Rhys-Davids (১৯২০-২১), মনোরথপূরণী : সম্পাদনা M. Walleser (১৯২৪), পপঞ্চসূদনী : সম্পাদনা J. H. Woods ও D. Kosambi (১৯২২)।

১৮ ॥ সিংহলী পালি সাহিত্য

ভারতবর্ষ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও সিংহলে, এবং পরবর্তী কালে ব্রহ্মদেশ ও তাইল্যাণ্ডে, পালির প্রচলন ছিল। সিংহলে দশম ও একাদশ শতকে রচিত পালিগ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চুল্ল-ধম্মপালের সচ্চসংখেপ যেখানে রূপ, বেদনা, চিত্ত, খন্ধ ও নিব্বাণ এই পাঁচটি অধ্যায়ে মোট ৩৮৭টি স্তবকে অভিধম্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে, মহানাম বিরচিত সদ্ধম্মপকাসিনী যা পতিসম্ভিদামগ্‌গ নামক পূর্ববর্তী একটি রচনার ভাষ্য, খেম বিরচিত খেমপ্পকরণ বা নামরূপসমাস যেখানে বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যা সহ অভিধম্মের অন্তর্গত কুসলা ও অকুসলা ধম্মসমূহের বিবরণ আছে; উপতিস্সের বোধিবংস বা মহাবোধিবংস যেখানে গৌতমবুদ্ধ সহ পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তেলকটাহগাথা নামক নীতিমূলক কাব্যও এই সময় রচিত হয়েছিল। একাদশ শতকের পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে ধম্মকিত্তির দাঠাবংস বুদ্ধের পবিত্র দন্তের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত একটি কাব্য। বাচিস্সরের থূপবংস বুদ্ধের নিদর্শনবাহী স্তূপসমূহের উপর রচিত, রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক। অত্তনগলুবিহারবংস অত্তনল্ল নামক মন্দিরের ইতিহাস, রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক। কস্সপের অনাগতবংস ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের ইতিহাস, রচনাকাল দ্বাদশ শতক। চূলবংস, যা পূর্ববর্তী কালে রচিত মহাবংসের পরিশিষ্ট, সিংহলের রাজনৈতিক ইতিহাস, যেখানে সিরিমেঘবন্নের (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) সময় থেকে সিরিবিক্কমরাজসীহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৮১৫ খ্রীঃ) একশোরও বেশি রাজার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধরক্খিতের জিনালংকার (দ্বাদশ শতক), বনরতনের জিনচরিত ও বুদ্ধপ্রিয়ের পজ্জমধু (ত্রয়োদশ শতক) বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্য। ত্রয়োদশ শতকে রচিত রসবাহিনী ১০৩টি ধর্মীয় কাহিনীর সংকলন যা আদিতে সিংহলীতে রচিত হয়েছিল ও পরবর্তী কালে ভিক্ষু রট্‌ঠপাল কর্তৃক পালিতে অনূদিত হয়। সদ্ধম্মোপায়ন ৬২৯টি শ্লোকে রচিত একটি উপদেশমূলক কাব্যগ্রন্থ, রচনাকাল চতুর্দশ শতক।[১]

১ সামগ্রিকভাবে ও সুপরিকল্পিত উপায়ে পালি সাহিত্যের প্রতিটি গ্রন্থের সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে চলেন T. W. Rhys Davids প্রবর্তিত Pali Text Society। এই প্রতিষ্ঠান ১৮৮১ থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে অধিকতর আলোকপ্রাপ্তির জন্য বর্তমান লেখকের *A Survey of Researches on Buddhism* দ্রষ্টব্য।

অপরাপর রচনাসমূহের মধ্যে ধম্মসিরির খুদ্দকসিক্‌খা ও মহাসামির মূলসিক্‌খা বিনয়পিটকের সংক্ষিপ্তসার। এই দুটি গ্রন্থ ব্রহ্মদেশে খুবই জনপ্রিয়। দ্বাদশ শতকে রচিত অনুরুদ্ধের অভিধম্মত্থসংগহ অভিধম্মের ব্যাখ্যাপুস্তক হিসাবে বিশেষ আদৃত, এবং এই গ্রন্থটির উপর বহু টীকা রচিত হয়েছিল। পরমত্থবিনিচ্ছয় ও নামরূপপরিচ্ছেদ নামক দুটি দার্শনিক গ্রন্থের লেখকত্বও অনুরুদ্ধের উপর আরোপিত। দ্বাদশ শতকে সারিপুত্তবিরচিত সারত্থদীপনী সমন্তপাসাদিকা গ্রন্থের টীকা। এ ছাড়া সারিপুত্ত লীনত্থপকাসনা (পপঞ্চসূদনীর টীকা) ও বিনয়সংগহ নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে মহাবংসের উপর একটি টীকা রচিত হয়েছিল, নাম বংসত্থপকাসিনী, লেখক অজ্ঞাত।

পালি ব্যাকরণসমূহের মধ্যে বিমলবুদ্ধির ন্যাস, ব্রহ্মদেশীয় ছপডের সুত্তনিদ্দেস, সংঘরক্‌খিতের সম্বন্ধচিন্তা, বুদ্ধপ্রিয়ের রূপসিদ্ধি, মোগ্‌গলানের সুদ্ধলক্‌খণ ও মোগ্‌গল্লায়নপঞ্চিকা, পিয়দস্‌সির পদসাধন, বনরত্নের পয়োগসিদ্ধি ও ব্রহ্মদেশীয় অগ্‌গবংসের সদ্দনীতি। এইগুলির অধিকাংশই দ্বাদশ শতক ও পরবর্তী কালের রচনা। মোগ্‌গলানের অভিধানপ্পদীপিকা সংস্কৃত অমরকোষের অনুকরণে রচিত পালি অভিধান, যা দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে রচিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের সংঘরক্‌খিত অলংকার ও ছন্দের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন সুবোধালংকার, বুত্তোদয় ইত্যাদি। এই বিষয়ে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে, কামণ্ডকী ও ছন্দোবিচিতি। ব্রহ্মদেশীয় সর্বপ্রাচীন আইনগ্রন্থ ধম্মবিলাস-ধম্মসত্থ ত্রয়োদশ শতকে রচিত। জনৈক সারিপুত্ত এই গ্রন্থের লেখক যিনি ধম্মবিলাস নামেও পরিচিত ছিলেন।[১]

১৯॥ অপভ্রংশ

বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের শেষ পর্যায়টি সচরাচর অপভ্রংশ হিসাবে কথিত হয়। এই বিশেষ পর্যায়টি এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাসমূহের জননী। অপভ্রংশ কথাটির প্রথম পরিচয় আমরা পাই পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে

১। উল্লিখিত রচনাগুলির অধিকাংশই Pali Text Socity কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মোগ্‌গলানের অভিধানপ্পদীপিকা ও সদ্দলক্‌খণ সিংহল থেকে যথাক্রমে W. Subhuti ও H. Devamitta কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, ধম্মকিত্তির দাঠাবংসের সম্পাদনা ও ইংরাজী অনুবাদ করেছেন বিমলাচরণ লাহা (১৯২৫)। অপরাপর রচনাসমূহের ইংরাজী অনুবাদ : অভিধম্মত্থ সংগহ, S. Z. Aung ১৯১০ ; অত্তনগলুবিহারবংস J. d' Alwis ১৮৮৭ ; চূলবংস W. Geiger and R. Rickmers ১৯৩০।

যেখানে লেখক বলেছেন যে প্রতিটি শুদ্ধ শব্দেরই কয়েকটি বিকৃত ও আঞ্চলিক রূপ আছে। এগুলিই হচ্ছে অপভ্রংশ। অর্থাৎ এই যুক্তি মানতে গেলে, অপভ্রংশ কোন একটি বিশেষ ভাষা নয়, পক্ষান্তরে তা স্বাভাবিক সংস্কৃত শব্দসমূহেরই বিকৃত ও আঞ্চলিক রূপান্তর। সেদিক্ থেকে মূল চরিত্রের দিক্ দিয়ে পালি-প্রাকৃতের সঙ্গে অপভ্রংশের প্রভেদ সামান্যই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত ভাষার প্রকাশ তিন ধরনের—সমান, বিভ্রষ্ট এবং দেশী। দেশী ভাষাগুলিকে আবার সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে—মাগধী, আবন্তী, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা ও দাক্ষিণাত্যা। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই অপভ্রংশসমূহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারীতি গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ভামহ এবং দণ্ডী অপভ্রংশসমূহের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। দণ্ডী অবশ্য অপভ্রংশ বলতে আভীর জাতির লোকদের কথা-ভাষাকেই বুঝেছিলেন। এরা বাস করত উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের একটি তাম্রশাসন থেকে আমরা জানতে পারি যে, বলভীরাজ গুহসেন সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশে কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। নবম শতকে রুদ্রট তাঁর কাব্যালংকার গ্রন্থে কবিতা রচনার ছয়টি ভাষার মধ্যে অপভ্রংশকেও একটি বলে স্বীকার করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, বহু প্রকারের অপভ্রংশ তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল।

২০. সংস্কৃত নাটকে অপভ্রংশ

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত অশ্বঘোষের সারিপুত্রপ্রকরণ নাটকে ষষ্ঠী-বিভক্তিবাচক পদগুলিতে অপভ্রংশের সুস্পষ্ট ব্যবহার রয়েছে (যেমন মক্কড়হো; সংস্কৃত মর্কটস্য, হো অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য)। ভাস-বিরচিত পঞ্চরাত্র নাটকে ইতরজনের সংলাপ মাগধী-প্রাকৃতে রচিত হয়েছে, কিন্তু কর্তৃ ও কর্মকারকে অপভ্রংশের ব্যবহার বেশ প্রকট। মৃচ্ছকটিক নাটকে কতিপয় চরিত্রের মুখে যে ভাষা দেওয়া হয়েছে তাকে পণ্ডিতেরা মাগধী-অপভ্রংশ আখ্যা দিয়েছেন। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকে ষোলটি শ্লোক অপভ্রংশে রচিত এবং সেগুলি অপভ্রংশ-গীতিকবিতার নির্ভেজাল উদাহরণ। প্রাকৃত-ব্যাকরণকার হেমচন্দ্রের সময় অপভ্রংশ সাহিত্য রচনার মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

২১. আদি অপভ্রংশ কবিতা

কবিতাই অপভ্রংশ সাহিত্যের আদিরূপ। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অপভ্রংশ কবিতায় দোহা-ছন্দ ব্যবহৃত হত। বিষয়বস্তু অনুযায়ী অপভ্রংশ

কবিতা দু'রকম, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মসাপেক্ষ। প্রথম শ্রেণীর কবিতা মূলত প্রেম, প্রকৃতি, বীরত্ব ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত হত। এই জাতীয় কবিতার নিদর্শন হেমচন্দ্রের ব্যাকরণে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাসমূহের রচয়িতা ছিলেন জৈন ও বৌদ্ধ সাধক সম্প্রদায়। জৈন-অপভ্রংশ রচনার উদাহরণ হিসাবে জোইন্দু (ষষ্ঠ শতক) রচিত পরমপ্পপয়াসু এবং জোগসারু, রামসিংহ মুনি রচিত পাহুড়-দোহা, দেবসেন (দশম শতক) রচিত সাবয়ধম্ম দোহা, এবং সুপ্রভাচার্য রচিত বৈরাগ্যসার প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থে ধর্মসাধনের গুহ্যতত্ত্বসমূহ পরিবেশিত হয়েছে। কথিত আছে, দেবসেনের ন্যায়শাস্ত্রের উপর রচনা নয়চক্র প্রথমে অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এরূপ একটি গুরুতর বিষয়কে চটুল দোহা-ছন্দে রচিত হওয়া অসমীচীন মনে করে মাইল্ল-ধবল গ্রন্থটিকে প্রাকৃতে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন পণ্ডিতেরা অপভ্রংশ পছন্দ করতেন না।

যে সকল বৌদ্ধ সাধক দোহা-ছন্দে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে তিল্লোপাদ, সরহপাদ, কহ্নপাদ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনা দোহাকোশ-এ সংকলিত হয়েছে, সর্বপ্রথমে সংকলন করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং পরে নূতন করে সম্পাদনা করেছিলেন ডঃ শহীদুল্লাহ্ এবং ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। বৌদ্ধ দোহার আরো অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। এই সকল দোহায় এক বিচিত্র ধরনের বৌদ্ধ মরমিয়াবাদের পরিচয় মেলে। এই বৌদ্ধ দোহাগুলিকে কেউ কেউ চর্যাপদ বলে থাকেন, এবং বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ তাঁদের সাহিত্যের সূত্রপাত এখান থেকেই হয়েছে বলে মনে করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অপভ্রংশটি সন্ধ্যা-ভাষা নামে পরিচিত। একদিকে সংস্কৃত-প্রাকৃত ও অপর দিকে আধুনিক আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যরেখা হিসাবে এই নামকরণটি যথার্থ হয়েছে।

২২। মহাকাব্য

সংস্কৃত-প্রাকৃতের মত অপভ্রংশেও মহাকাব্য রচিত হয়েছে। অপভ্রংশ মহাকাব্য রচনার ধরনটি কিন্তু নানা দিক্ থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অলিল্লহ বা পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত আটটি করে স্তবক নিয়ে একটি করে কড়বক বা কবিতার সাধারণ একক গঠিত হয়। এই বিশেষ ধরনটি হিন্দী চৌপদী দোহার পূর্বসূরী ; জায়সির পদ্মাবত এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসে এই

বিশেষ ধরনটির পরিচয় পাওয়া যায়। দশ থেকে পনেরটি কড়বক নিয়ে এক-একটি সন্ধি বা সর্গ বা অধ্যায় রচিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অধ্যায়গুলির পূর্বে ধ্রুবক ছন্দে কিছুটা করে উপক্রমণিকা থাকে।

আদি অপভ্রংশ মহাকাব্যসমূহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় স্বয়ম্ভূদেবের পৌমচরিউ ও হরিবংশপুরাণ, যেগুলি যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের জৈন সংস্করণ। প্রথম গ্রন্থটিতে ৯০টি সন্ধি এবং ১৩০০ কড়বক অর্থাৎ মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২,০০০। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ১১২টি সন্ধি ও ২০০টি কড়বক নিয়ে গঠিত এবং সেই হিসাবে মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। অবশ্য স্বয়ম্ভূদেব মহাকাব্য দুটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। সেই কাজটা করেছিলেন তাঁর পুত্র ত্রিভুবন। এ ছাড়া স্বয়ম্ভূ অপভ্রংশ ছন্দ, ব্যাকরণ এবং অলংকার নিয়েও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

জৈন-অপভ্রংশ লেখকদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন পুষ্পদন্ত যিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাপুরাণ, জসহর-চরিউ এবং নায়কুমার-চরিউ রচনা করেছিলেন। পুষ্পদন্তের মহাপুরাণে ৬৩ জন সাধু-পুরুষের জীবনী বর্ণিত হয়েছে। পুষ্পদন্তের হাতে পড়েই জৈন-অপভ্রংশ যেন সাহিত্যরচনার মাধ্যম হতে পেরেছিল। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থ চরিতকাব্য ধরনের। জৈনধর্মের নাম-করা সাধকদের শলাকাপুরুষ বলা হত। প্রাকৃতেও এই রকম বহু শলাকা-পুরুষের জীবনী রচিত হয়েছে।

কনকমার রচিত করকণ্ড-চরিউ পুষ্পদন্তের রচনার আদর্শেই রচিত হয়েছে। দশম শতকে রচিত এই মহাকাব্যে করক নামক এক সাধকের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে যিনি জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সূচনায় লেখক আত্মপরিচয় দিয়েছেন দিগম্বর জৈনমতে বিশ্বাসী চন্দ্রঋষিগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান হিসাবে।

ভবিসহত্তকহা বাইশটি সন্ধি বা সর্গে রচিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য। এতে একটি বণিকের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে যে তার সৎ-ভাই-এর ঈর্ষার ফলে জীবনে বহু দুঃখ ভোগ করেছে। এটিও সম্ভবত দশম শতকের রচনা। লেখকের নাম ধনপাল।

হরিভদ্র বিরচিত নেমিনাহ-চরিউ অপভ্রংশ কাব্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সচরাচর অপভ্রংশ কবিতা পদ্ধড়িয়া (পদ্ধটিকা) ছন্দে রচিত হয়, কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে রড্ডা ছন্দ। এই গ্রন্থের সনকুমার-চরিউ নামক একটি

অংশই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটির শ্লোকসংখ্যা ৮,০০০। এই কাব্যের নায়ক জৈনধর্মের প্রখ্যাত বারোজন চক্রবর্তীর একজন।

দাহিল নামক অপর একজন কবির রচিত পৌমসিরি-চরিউ একজন নারী-ভক্তের জীবনকথা। রচনাকাল আনুমানিক দ্বাদশ শতক। বিদ্যাপতি রচিত কীর্তিলতা চতুর্দশ শতকে রচিত কীর্তি সিংহের জীবনী যিনি জৌনপুরের নবাব ইব্রাহিম শাহের সমকালীন ছিলেন। এই দিক্ থেকে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্যও বর্তমান। পদ্মকীর্তি (দশম শতক) রচিত পাশনাহ-চরিউ বা পাশপুরাণ্ ত্রয়োবিংশতিতম জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের জীবনী অবলম্বনে ৩,৩০০ শ্লোকে রচিত।

২৩॥ ছোটগল্প

অপভ্রংশ সাহিত্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোটগল্প। পালি এবং জৈন প্রাকৃতে ধর্মীয় নীতিসমূহ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। অবশ্য এগুলিকে আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ছোটগল্প বললে ঠিক বলা হবে না। এগুলি অনেকটা প্যারাবল-ফেবল্‌ধর্মী। অপভ্রংশ সাহিত্যের ছোটগল্পগুলির উদ্দেশ্যও বহুলাংশে ধর্মীয় নীতি শিক্ষাদান। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় হরিষেণের ধম্ম-পরিক্খার কথা। এই গ্রন্থের লেখক তাঁর পূর্বসূরী জয়রামের গুণগান করেছেন যিনি পূর্বে প্রাকৃতে ধর্মপরীক্ষা নামক সমজাতীয় গ্রন্থ রচনা ছিলেন। হরিষেণের জন্মভূমি চিতোর, কিন্তু সেখান থেকে তিনি অচলপুরে (বর্তমান ইলিচপুর) এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এগারোটি সন্ধি বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্যঙ্গমূলক গ্রন্থটি মোটমাট ২,০০০ শ্লোকে রচিত হয়েছে। রচনাকাল দশম শতাব্দী। এর পর উল্লেখ করতে হয় শ্রীচন্দ্র রচিত কথাকোশ গ্রন্থটির কথা। এই গ্রন্থটিও খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে রচিত হয়েছিল। মোট ৫৩টি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

২৪॥ অপরাপর অপভ্রংশ রচনা

খ্রীষ্টীয় একাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে অপভ্রংশে আরও কয়েকটি চরিত-কাব্য রচিত হয়েছিল। এইগুলি হচ্ছে সিংহ রচিত পজ্জুন্ন কহা, পদ্মকীর্তির পার্শ্বপুরাণ, সিরিহরের সুকুমাল-চরিউ, নয়নন্দীর সুদর্শন-চরিত, লখমদেবের নেমিনাহ-চরিউ ইত্যাদি।

দ্বাদশ শতকে সোমদেব জৈন তীর্থংকর পার্শ্বের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন। জিনদত্ত সূরি (১০৭৫—১১৫৪) বত্রিশটি স্তবকে কাল-স্বরূপকুলম নামক ভক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই জাতীয় রচনার আরও উদাহরণ হচ্ছে সুপ্রভাচার্য রচিত বৈরাগ্যসার ও যোগিচন্দ্রের দোহাসার।

দ্বাদশ শতকে রচিত অমরকীর্তিগণির ছক্কম্মোবয়েস (সং-ষট্‌কর্মোপদেশ) নীতিশাস্ত্রের ওপর রচিত গ্রন্থ। এই জাতীয় আরও দুটি রচনা অপভ্রংশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। একটি হচ্ছে লক্ষ্মণ রচিত অণুবয়-রয়ণ-পঈউ (সং-অনুব্রত-রত্নপ্রদীপ) এবং অপরটি হচ্ছে মহেসর সূরি বিরচিত সঞ্জমমঞ্জরী।

একটি মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ অপভ্রংশ সাহিত্যে বর্তমান। সেটি হচ্ছে আব্দুল রহমান বিরচিত সন্দেশরাসক। লেখক মুসলিম তন্তুবায় সম্প্রদায়ের, পিতার নাম মীরসেন। সংস্কৃত প্রাকৃত ও অপভ্রংশে তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। ২২৩টি স্তবকে রচিত দ্বাদশ শতকের এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে মেঘদূত ধরনের। নায়ক ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যাত্রা করেছে এবং তার উদ্দেশ্যে তার পত্নী একটি ব্যবসায়ীর মারফৎ পত্র পাঠাচ্ছে। এই পত্রে বিপ্রলব্ধা রমণীর বেদনা আশ্চর্য সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে।[১]

১ দেবসেনের সাবয়ধম্মদোহা, হিন্দী অনুবাদ ও সম্পাদনা H. L. Jain ১৯৩২, ধনপালের ভবিসয়ত্তকহা, সম্পাদনা H. Jacobi, ১৯১৮, C. D. Dalal এবং P. D. Gune ১৯২৩, জোইন্দুর পরমপ্পয়াস ও যোগসার, সংস্কৃত টীকা ও হিন্দী অনুবাদসহ সম্পাদনা A. N. Upadhye ১৯৩৭, হরিভদ্রের সনকুমারচরিউ, সম্পাদনা H. Jacobi ১৯২১, কনকামরের করকণ্ডচরিউ, সম্পাদনা ও অনুবাদ H. L. Jain ১৯৩৪, পুষ্পদন্তের জসহর-চরিউ, সম্পাদনা P. L. Vaidya ১৯৩১, পুষ্পদন্তের মহাপুরাণ, সম্পাদনা P. L. Vaidya ১৯৩৭-৪১; পুষ্পদন্তের ণায়কুমারচরিউ, সম্পাদনা H. L. Jain ১৯৩৩, রামসিংহ মুনির পাহুড়দোহা, সম্পাদনা H. L. Jain ১৯৩৩, সুপ্রভাচার্যের বৈরাগ্যসার সম্পাদনা H. D. Velankar ১৯২৮, স্বয়ম্ভুর পৌমচরিউ, সম্পাদনা H. C. Bhayani ১৯৫৩, জিনদত্ত সূরির কালস্বরূপকুলক, সম্পাদনা L. B. Gandhi ১৯২৭; আবদুল রহমানের সন্দেশরাসক, সম্পাদনা জিনবিজয় মুনি ১৯৪৫। অপভ্রংশ গ্রন্থসমূহের মুখ্য প্রকাশক হিসাবে সিংঘি জৈন সিরিজ, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ (বরোদা), ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মধ্য এশিয়া, চীন ও জাপান

১॥ সূচনা: সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিব্বত, মধ্য এশিয়া ও চীনে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রচলন ঘটে। মধ্য এশিয়ায় প্রধানত সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধমতের প্রাধান্য ঘটে। তিব্বতে ও চীনদেশে মুখ্যত মহাযান সম্প্রদায়-সমূহই প্রাধান্য অর্জন করে। অবশ্য চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশের আগে এবং পরেও কনফুসি এবং লাওৎ-সে প্রবর্তিত ধর্মমতসমূহ বর্তমান ছিল, যেগুলিকে অবলম্বন করে ধর্মীয় সাহিত্য বড় কম রচিত হয়নি।

এই সকল স্থানে যে সকল গ্রন্থের অবশেষ বা অনুবাদ পাওয়া গেছে তা, সর্বক্ষেত্রে না হলেও, মূলত সংস্কৃত ঐতিহ্য-অনুসারী। প্রায় সম্পূর্ণ বৌদ্ধ শাস্ত্র-সমূহের সংকলন পাওয়া যায় পালিভাষায়, সংস্কৃতে যা পাওয়া তা একান্তই বিক্ষিপ্ত ধরনের। যে কোন কারণেই হোক, সংস্কৃতে রচিত অধিকাংশ বৌদ্ধ পুঁথি বিলুপ্ত হয়েছে। সংস্কৃত-সংস্করণ পালির অনুবাদ নয়। বুদ্ধের মৃত্যু ও পালি ধর্মসাহিত্য রচিত হবার মধ্যে বেশ কয়েক শতাব্দীর ফারাক বর্তমান বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে পালি ও সংস্কৃত, উভয় ভাষারই শাস্ত্রসমূহ, কোন তৃতীয় ও বর্তমানে বিলুপ্ত স্থানীয় ভাষায় রচিত (সম্ভবত মাগধী) আদি সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছিল। সর্বাস্তিবাদীদের মধ্যে পালি নিকায় সমূহের অনুরূপ আগমশাস্ত্রসমূহের প্রচলন ছিল এবং তাদেরও সাতটি অভিধর্ম গ্রন্থ বর্তমান ছিল। মূলসর্বাস্তিবাদীদের বিনয়পিটকের অনেকটা অংশ গিলগিট পাণ্ডুলিপিসমূহে রক্ষিত হয়েছে, যার সঙ্গে পালি বিনয়পিটকের বৈসাদৃশ্য বহুক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

সংস্কৃতে বা মিশ্র সংস্কৃতে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকটির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই আসে মহাবস্তুর কথা যা বৌদ্ধ লোকোত্তরবাদী সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক হিসাবে কল্পিত, যদিও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এই গ্রন্থটিকে বৌদ্ধ-ধর্মের সকল দিকেরই সারমর্ম হিসাবে অভিহিত করা যায়। মিশ্র সংস্কৃতে রচিত ললিতবিস্তর বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে রচিত। এ ছাড়া আছে অশ্ব-ঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ, আর্যশূরের জাতকমালা, এবং বিশাল অবদান সাহিত্য। বৈপুল্য সূত্র নামে কথিত নয়টি গ্রন্থ মহাযানী বৌদ্ধদের মূল

ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত যেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর (পূর্বে উল্লিখিত), লঙ্কাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, গণ্ডব্যূহ, তথাগতগুহ্যক, সমাধিরাজ এবং দশভূমীশ্বর। এই সকল গ্রন্থেরই চৈনিক অনুবাদ বর্তমান।

তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের অনুবাদের একটি বিপুল সংগ্রহ বর্তমান। গ্রন্থগুলির সংখ্যা ৪,৫৬৬টিরও বেশি। এই সংগ্রহ দুভাগে বিভক্ত—কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর। প্রথম সংগ্রহে আছে ১,১০৮টি গ্রন্থ, বিষয়বস্তু অনুসারে যেগুলিকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বিনয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, বুদ্ধাবতংসক, রত্নকূট, সূত্র, নির্বাণ এবং তন্ত্র। দ্বিতীয় সংগ্রহে আছে ৩,৪৫৮টি গ্রন্থ, বিষয়বস্তু অনুযায়ী যেগুলি দুভাগে বিভক্ত—তন্ত্র ও সূত্র।[১]

তিব্বতে যে সকল বৌদ্ধ পুঁথি রক্ষিত আছে সেগুলির অধিকাংশ ভারতীয় সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের অনুবাদ। তিব্বতী পণ্ডিতদের স্বাধীন রচনাসমূহ—যেমন বু-তোন বা তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ইত্যাদি—পরবর্তী কালে রচিত। কিন্তু অনুবাদ হলেও সেগুলির মূল্য অসীম, কেননা যে সংস্কৃত রচনাসমূহের অনুবাদ হিসাবে সেগুলি পরিচিত, সেই মূল রচনাগুলি বহুদিন বিলুপ্ত হয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ বলতে আমরা যা বুঝি তার চোদ্দ আনাই সংস্কৃতে অনুপস্থিত, তা একমাত্র পাওয়া যায় তিব্বতী অথবা চৈনিক অনুবাদে। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধ শাস্ত্রের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে তিব্বতী গ্রন্থসমূহের মূল্য অসাধারণ।

চীনা ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধগ্রন্থের সংখ্যা অজস্র। বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত বুনইয়ু নানজিও তাঁর তালিকায় ১,৬৬২টি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে যেগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে: সূত্রপিটক, বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটক এবং বিবিধ। আরও একটি তালিকা, যা হোবোগিরিন (*Hobogirin*) নামে কথিত, ২,১৮৪টি গ্রন্থের উল্লেখ করে। এইগুলি ৫৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে (তাইশো সংস্করণ) এবং চীন ও জাপানে রচিত আরও বহু গ্রন্থ ২৫টি অতিরিক্ত খণ্ডে স্থান পেয়েছে। জাপানে সমগ্র চৈনিক

১। তিব্বতী-সংগ্রহের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করেন P. Cordier (1902-15), পরে তার একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত করেন Mr. Lalou (1933) *Repertoire du Tanjur d'apres le Catalogue de P. Cordier* এই শিরোনামায়। সম্প্রতি ডঃ অলকা চট্টোপাধ্যায় একটি নূতন তালিকা ইংরাজীতে প্রকাশ করেছেন: *Catalogue of Tanjur and Kanjur* (1971)

ত্রিপিটকের তিনটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বর্তমান, তাইশো সংস্করণের অতিরিক্ত ২৫ খণ্ড সহ। মাঞ্চুরীয় ভাষাতেও চৈনিক ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আছে। তিব্বতী তাঞ্জুরের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আছে মঙ্গোলীয় ভাষায়।[১]

২ ॥ মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য

মধ্য এশিয়ার খোটান থেকে মার্ক অরেল স্টাইন এবং তুরফান থেকে গ্রুনভেডেল এবং ফন লে কোগ অনেক বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে। সেগুলি পরবর্তী কালে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন লেভী ও ভ্যালে পুর্সাঁ। এখান থেকে প্রাপ্ত ২৬টি বৌদ্ধ পুঁথির অবশেষ এবং কবি মাতৃচেট রচিত দুটি স্তোত্রের সম্পাদনা ও অনুবাদ, ওই একই বিষয়ের উপর রচিত অন্যত্র প্রাপ্ত রচনাবলীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচার সহ, হোয়ার্নলে, লুডার্স, পার্জিটার ও টমাসের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। মধ্য এশিয়া থেকে প্রাপ্ত সংস্কৃত রচনাসমূহের মধ্যে অশ্বঘোষের সারিপুত্রপ্রকরণ এবং কুমারলাতের কল্পনামণ্ডিতিকার অবশেষ প্রকাশ করেন লুডার্স যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষুণীপ্রাতিমোক্ষের সম্পাদনা করেন ভাল্‌ড্‌স্মিড্‌ট (১৯২৬)। তাঁর সম্পাদিত বৌদ্ধ সূত্রসমূহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। ধর্মত্রাতের উদানবর্গের প্রাপ্ত অংশসমূহের সম্পাদনা ও প্রকাশ ঘটান যথাক্রমে পিশ্‌চেল (১৯০৮), লেভী ও পুর্সাঁ (১৯১০-১২)। পরবর্তী কালে হফমান এবং ভাল্‌ড্‌স্মিড্‌ট মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত সংস্কৃত পুঁথিসমূহের অবশেষগুলির উপর তুলনামূলক গবেষণা করেন।

কিন্তু সংস্কৃত ছাড়াও মধ্য এশিয়ার স্থানীয় ভাষাসমূহে বৌদ্ধধর্মের উপর অনেক কিছুই রচিত হয়েছিল। তদুপরি ওই সকল ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় কম ছিল না। যে সকল মধ্য-এশীয় ভাষায় এই সব রচনাবলী পাওয়া গেছে সেগুলি হচ্ছে কুচীয়, খোটানী, সোগডীয় এবং উইগুর। কুচীয় ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপিসমূহের যে সমস্ত অংশ পাওয়া গেছে সেগুলি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন সিলভাঁ লেভী।[২] অনুরূপভাবে খোটানী ভাষায়

১। Chou Hsing Kuang, *Indo-Chinese Relations : A History of Chinese Buddhism*, pp. 203-05.

২। *Journal Asiatique*, 1911, XVII, pp. 138 ff, 431 ff ; 1912, XIX, pp. 101 ff ; *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1913, pp. 109 ff ; এছাড়া দ্রঃ Hoernle সম্পাদিত *Manuscript Remains*, Vol. I, 1916 pp. 357 ff.

প্রাপ্ত রচনাসমূহের সম্পাদনা করেন স্টেন কোনো এবং হোয়ার্নলে।[১] খোটানী ভাষায় রচিত ধর্মপদের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন এইচ. ডব্লিউ বেইলী (১৯৪৫) যিনি পরে এক খণ্ডে খোটানী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত যা কিছু পাওয়া গেছে প্রায় তার সবটুকুই প্রকাশ করেন (১৯৫১)। বেস্সন্তর জাতকের একটি সোগডীয় সংস্করণের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেন আর. গওথিয়ো।[২] বৃটিশ মিউজিয়মে যে সকল সোগডীয় পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে সেগুলিকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন আর রাইখলেট, যার প্রথম খণ্ডটি (১৯২৮) বৌদ্ধ পুঁথি সংক্রান্ত। পরবর্তী কালে তুরফান-সংগ্রহের সোগডীয় পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকাশ করেন ডব্লিউ লেনৎস (১৯৩০)। বেনভেনিস্তাইট ২৩টি সোগডীয় পুঁথির সটীক অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। খোটানী ও সোগডীয় রচনাসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন করেন জার্মান পণ্ডিত ই. লয়মান তাঁর 'উত্তর আর্য ভাষা ও সাহিত্য' (১৯১২) এবং 'বৌদ্ধ সাহিত্য' (১৯১৯) নামক গ্রন্থদ্বয়ে। তাঁর গবেষণাসমূহকে অবলম্বন করে উত্তরকালে এম. লয়মান 'শক-বৌদ্ধ নীতিমূলক কবিতা' জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। উইগুর ভাষাতেও অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথির অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। উইগুর ভাষায় অনূদিত সুবর্ণপ্রভাস সূত্রের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন ডব্লিউ. রুডলোফ (১৯১৩-১৫, ১৯৩০)। এ ছাড়া এইচ. স্তোনের[৩] এবং এফ. ডব্লিউ. কে. মুয়েলার[৪] বহু উইগুরীয় পুঁথির অবশেষ উদ্ধার ও প্রকাশ করেন। *Uigurish Studies* এবং *Uigurica* সিরিজদ্বয়ে ডব্লিউ বাঙ্গ এবং এ. ফন গাবাইন যথাক্রমে বহু উইগুরীয় পুঁথির অবশেষ প্রকাশ করেছেন।

৩॥ বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ

ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে কিভাবে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল তার ইতিহাস এখানে আলোচনা করার কথা নয়। অবশ্য মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলা চলতে পারে। বৌদ্ধধর্মের দুটি ধারার নাম সকলেই জানেন—হীনযান ও মহাযান। মধ্য এশিয়ায় এই দুটি ধারারই বিকাশ ঘটেছিল। পক্ষান্তরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া এবং যবদ্বীপে প্রাধান্য ঘটেছিল, অন্যত্র

১। Hoernle, *op cit.*, pp 214 ff, 298 ff, 395 ff.
২। *Journal Asiatique*, 1912 XIX, pp. 163 ff, 130 ff.
৩। *Sitzungsberichte der Preussischen* **Akademie**, 1901, pp 1282 ff.
৪। Uigurica I and II in *Abhandlungen der Berliner Akademie* 1908-10

বিভিন্ন হীনযানী সম্প্রদায়সমূহের এবং তিব্বত, সিনকিয়াং, কোরিয়া, চীন ও জাপানে মূলত মহাযানী সম্প্রদায়সমূহের। বহুক্ষেত্রেই এই সব দেশের স্থানীয় ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ রচিত বা অনূদিত হয়েছিল।

সিংহলী গ্রন্থ মহাবংস এবং হিউয়েন সাং-এর বিবরণের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন, এবং তৎকালীন সম্রাট তিস্‌সের প্রচেষ্টায় তা সেখানে জনপ্রিয় হয়। সেই হিসাবে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে সেখানে বৌদ্ধধর্মের সূচনার যুগ একথা বলা যেতে পারে। ঠিক কবে থেকে বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত ব্রহ্মদেশে ঘটেছিল তা বলা যায় না, তবে বর্তমান প্রোম শহরের ছয় মাইল উত্তরে হামাওয়াজা গ্রামে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের কয়েকটি লেখমালায় পালি বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। থাইল্যাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হয়েছিল সম্ভবত আরও কিছুকাল আগে থেকে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতক থেকে। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং চৈনিক বিবরণসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাতের কাল আনুমানিক পঞ্চম শতক, যবদ্বীপ ও ইন্দোনেশীয় ভূখণ্ডের ক্ষেত্রেও তাই। ভিয়েতনাম (চম্পা) ও মালয়েশিয়ায় মূলত মহাযান শাখাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। ভিয়েতনামে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, মালয়েশিয়ায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে। কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল চৈনিক প্রচারকদের দ্বারা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে।

তিব্বতে মূলত নেপালী ও চৈনিক প্রভাবের ফলে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সপ্তম শতকের সম্রাট স্রন-সান-গাম্পোর প্রচেষ্টায় তা অচিরেই সেখানকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর পঞ্চম উত্তরাধিকারী খ্রী-স্রন-ল্দেংসান (৭৫৫-৭৯৭ খ্রীঃ) নালন্দার বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আহ্বান করে আনেন। শান্তরক্ষিত এবং তৎশিষ্য কমলশীলের প্রচেষ্টায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ ও তালিকা প্রণয়ন সম্ভব হয়েছিল। ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিখ্যাত সংস্কৃত-তিব্বতী অভিধান মহাব্যুৎপত্তি সংকলিত হয়। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অপরাপর কারণে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সঠিক অনুশীলন প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়। এরই ফলে বিক্রমশিলা মহাবিহারের আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানানো হয় একাদশ শতকে, যিনি সেখানে কার্যত নূতনভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন।

মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ সাহিত্যের অবশেষসমূহের কথা বলা হয়েছে। ঠিক

কবে থেকে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল তা সঠিক বলা যায় না। খোটানী কিংবদন্তী অনুযায়ী আনুমানিক ২৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোকের পুত্র কুস্তন সেখানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁর পৌত্র বিজয়সম্ভবের চেষ্টায় সেখানে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে। আর্য বৈরোচন ছিলেন তাঁর গুরু। প্রথম বৌদ্ধ মঠ সেখানে নির্মিত হয় ২১১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। খোটান থেকে বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে দক্ষিণের নিয়া, কালমাদনা (চেরচেন), ক্রোরাইনা (লৌলান) এবং চোকুকে (কাশগর) এবং উত্তরের ভারুক (অক্ষু), কুচা, অগ্নিদেশ (কারাশহর) এবং কাও-চাঙ্গ-এ (তুরফান)। এই সকল কেন্দ্রের মধ্যে পরবর্তী কালে কুচা অধিকতর প্রসিদ্ধ হয়েছিল, এবং চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের মূলে কুচার ভিক্ষুদের ব্যাপক ভূমিকা ছিল বলে অনুমান করা হয়।

চীন ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের কথা আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করব।

৪॥ চৈনিক বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য

চীনে বৌদ্ধধর্মের সূচনা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী ২১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কয়েকজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনের তৎকালীন রাজধানী সেন-শিতে উপস্থিত হন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। আর একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী আনুমানিক ১২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চীন সম্রাটের নিকট একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি আনীত হয়, আর তখন থেকেই বুদ্ধ উপাসনার সূচনা। তৃতীয় একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী আনুমানিক ৬১ খ্রীষ্টাব্দে হানবংশীয় চীন সম্রাট মিং-তি স্বপ্নে একজন সোনালী মানুষকে দেখেন যিনি গৌতম বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ নন। সম্রাটের আদেশে তখন চতুর্দিকে দূত প্রেরিত হয়, এবং তাঁরা বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক ধর্মরত্ন ও কশ্যপ মাতঙ্গকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করেন। তাঁরা বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, এবং সম্রাট কর্তৃক নির্মিত "শ্বেত অশ্ব" সংঘারামে সেগুলিকে চীনাভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই সংঘারামটি কালক্রমে বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুশীলন ও অনুবাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই মহাত্মা সে-কাও (লোকোত্তম) বৌদ্ধ শাস্ত্র সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। তৃতীয় শতকে সেং-হুদু (সংঘভদ্র) নানকিং-এ একটি সংঘারাম স্থাপন করেছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের অনুবাদে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। ফা-হু (ধর্মরক্ষ) সংস্কৃত মহাযানী গ্রন্থগুলিকে

চীনা ভাষায় অনূদিত করেছিলেন। শোনা যায় ইনি ছত্রিশটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনিও তৃতীয় শতকের লোক।

এই সকল পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকের চেষ্টায় অচিরেই চীনে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি শুধু দৃঢ়ই হয়নি, সেখানে কমপক্ষে আটটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল —চান বা ধ্যান, বিনয়, তন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, সুখাবতিব্যূহ, অবতংসক, মাধ্যমিক এবং তিয়েন-তাই। অষ্টম মতবাদটির উদ্ভব প্রথম সাতটির সংঘাত ও সমন্বয় থেকে, এবং বর্তমানে এইটিই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠিত রূপ। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই চীনে বৌদ্ধধর্মের পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। উত্তর চীনের দশ ভাগের নয় ভাগ মানুষই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম যে কি বিপুল বেগে চীনদেশকে প্লাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মৌ-ৎসু কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থে যেখানে কনফুসীয় ও তাও ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছিল।

এইভাবে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে দেখার জন্য চৈনিক ভক্ত ও সাধকেরা অনেকেই আগ্রহশীল হন। ২৬০ খ্রীষ্টাব্দে চু-সে হিং প্রথম ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, অবশ্য ভারতে আসার সুযোগ তাঁর হয়নি। পথিমধ্যে খোটানেই তাঁর দেহান্ত হয়। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফা-হিয়ান পাঁচজনের একটি দল সমেত ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু তিনি একাই শেষ পর্যন্ত ভারতে আসতে সক্ষম হন। ভারত সম্বন্ধে তিনি একটি বিশদ বিবরণী রচনা করে গেছেন, নাম ফো-কু-কি। তাঁকে অনুসরণ করে ভারতে এসেছিলেন পাও উন (৪০৪ খ্রীঃ), ফা-ওন্ধ (৪২০ খ্রীঃ) এবং আরও অনেকে। তাং-বংশের রাজত্বকালে বিখ্যাত হিউয়েন সাং ভারতে এসেছিলেন। তিনি যাত্রা করেছিলেন ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি চীনে ফিরে যান ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বিখ্যাত ভারত বৃত্তান্তের চৈনিক নাম সি-ইউ-কি। এ ছাড়াও তিনি ৭৪টি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ভারত থেকে বহু গ্রন্থও চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ৬০ জন চৈনিক পণ্ডিত ও ধর্মজ্ঞ ভারতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ই-সিং। ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রপথে তিনি তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবতরণ করেন। দশ বছর নালন্দায় বাস করার পর তিনি ৪০০ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি চীনে নিয়ে যান, এবং সেগুলি থেকে কয়েকটির অনুবাদও তিনি করেছিলেন। ভারত ও দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ায় আচরিত বৌদ্ধধর্মের উপর তিনি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া যে ৬০ জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন তাঁদের সকলের জীবনীও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে সংস্কৃত-চৈনিক অভিধান।

ভারত থেকে যে সকল পণ্ডিত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে চীন দেশে গিয়ে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন কুমারজীব, সংঘভূতি, গৌতম, সংঘদেব, পুণ্যত্রাত, বিমলাক্ষ, বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, ধর্মযশ, গুণবর্মা ইত্যাদি ; ষষ্ঠ শতকে জিনগুপ্ত, পরমার্থ, ধর্মগুপ্ত ও বোধিধর্ম ; সপ্তম ও অষ্টম শতকে প্রভাকরমিত্র, বোধিরুচি, বজ্রবোধি, অমোঘবজ্র ইত্যাদি। সত্য বলতে কি, এত ব্যাপক আকারে অনুবাদ-প্রচেষ্টা কোন যুগে কোন কালে দেখা যায়নি। মহাযানী বৌদ্ধদের বিপুলায়তন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের অস্তিত্বের কথা হয়ত আমরা জানতেই পারতাম না, যদি না সেগুলির চৈনিক অনুবাদ থাকত। চীনা ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের সর্বপ্রাচীন তালিকা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছিল। ওই তালিকায় ২,২১৩টি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। ওই শতকেই সম্রাটের আদেশে যে তালিকা রচিত হয়েছিল তাতে ৫,৪০০টি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তাং যুগে আরও একটি তালিকা প্রণীত হয়েছিল। কাঠের ব্লকে গ্রন্থগুলি ছাপা হতে শুরু করেছিল ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই।

ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অপরাপর ভারতীয় গ্রন্থও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র-সম্পর্কিত নবগ্রহসিদ্ধান্ত, শিশুচিকিৎসা-বিষয়ক রাবণ-কুমারচরিত, প্রভৃতি। বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত চৈনিক গ্রন্থসমূহের শতকরা নব্বই ভাগই সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।[১]

১। প্রবোধচন্দ্র বাগচী, *Le Canon Bouddhique in Chine* (1927, 1938), *India and China* (1944) ; J. Legge, *Fa-hien's Record of Buddhistic Kingdoms* (1886) ; H. A. Giles, *The Travels of Fa-hien* (1923) ; S. Beal, *Si-yu-ki ; Buddhist Records of the Western World* (1884) ; *Life of Hiuen Tsang by the Shaman Kwui Li* (1884) ; T. Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, 2 vols. (1904-05) ; হিউয়েন সাং-এর বিবরণীর প্রথম অনুবাদ করেছিলেন S. Julien (1857-58) ; E. Chavannes, *Me'moire compose' a l'epoque' de la grande dynastie T'ang sur les Religieux Eminents qui alle'rent chercher la loi dans les pays d' Occident, par I-tsing* (1894) ; J. Takakusu, *Record of Buddhist Religion as practised in India and the Malay Archipelago by I-tsing* (1896 B. Nanjio *Catalogue of the Chinese Tripitaka* (1883).

৫ ॥ কনফুসীয় সাহিত্য

চীনে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের আগে সেখানকার স্থানীয় ধর্মমতসমূহ মোটামুটি দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল, কনফুসি-পন্থা ও তাও (দও)-পন্থা, এবং এই দুটি ধারা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি বরাবরই সক্রিয়ভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। মহাত্মা কনফুসিয়াসের (চৈনিক উচ্চারণ কুঙ্গ-ফু-ৎস্থ যার অর্থ প্রভু কুঙ্গ) আদি জীবনীকার ছিলেন স্সু-মা-চিয়েন (১৪০-৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) যাঁর সি চি (Shih Chi) বা ঐতিহাসিক নথিপত্র নামক রচনা থেকে জানা যায় যে আনুমানিক ৫৫২-৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কনফুসিয়াস লু-রাষ্ট্রের চ্যাঙ্গ পিঙ্গ জেলার চৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সু-লিয়াং-হো এবং মাতার নাম ইয়েন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন, এবং দারিদ্র্যের কারণে অল্পবয়সেই একজন জমিদারের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। যখন তাঁর বয়স তিরিশ বছর, তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে লু রাষ্ট্রের বৃদ্ধ মন্ত্রী মেঙ্গ সি-ৎসে (Meng Hsi-tze) তাঁকে তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষক ও পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত করেন। এঁদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশের প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানসমূহ জানবার উদ্দেশ্যে হোনান প্রদেশের লোয়াঙ্গ শহরে যাত্রা করেন। ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে তাও-ধর্মের বিখ্যাত আচার্য লাও-ৎস্থর সাক্ষাৎ হয়েছিল এরকম জনশ্রুতি আছে। এই সময় তাঁর কিছু শিষ্য ও অনুগামী গড়ে ওঠে। চি প্রদেশের শাসক চিং কনফুসিয়াসের হাতে গুরুতর শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন, কিন্তু তাঁর জনকল্যাণমুখী কাযকলাপ চিং-এর পছন্দ না হওয়ায় তাঁকে তিনি বরখাস্ত করেন। অতঃপর কনফুসিয়াস নিজ রাষ্ট্র লু-তে ফিরে আসেন এবং সেখানকার প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এখানে তাঁর ছয় বছরের কর্মজীবনে (৫০১-৪৯৫ খ্রীঃপূঃ) তিনি লু-কে সর্বযুগের সর্বকালের আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে তাঁকে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তারই পরিণামে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায় নিতে হয়। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি লোকশিক্ষার কাজে ব্যয় করেন এবং তাঁর অনুগামী একটি বিরাট সম্প্রদায় তাঁর জীবনকালেই গড়ে ওঠে। ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।[১]

১। স্সু-মা-চিয়েন-রচিত সি চি-র অনুবাদ করেন E. Chavannes, *Les memoires historiques de Se-Ma-Tsien*, 5 vols. 1895-1905. এই গ্রন্থের ৪৭তম অধ্যায়ে কনফুসিয়াসের

কনফুসিয়াস ছিলেন মূলত নীতিবিদ্ ও দার্শনিক, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের উপরেই যিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রচলিত অর্থে ধর্মগুরু বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল, প্রাচীন প্রথা ও বিশ্বাসগুলিকে অবলম্বন করেই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর। রাষ্ট্রনীতি, অর্থব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্কসমূহের প্রশ্নে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল। কনফুসিয়াসের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যেও তাঁর মতামতসমূহকে অবলম্বন করে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়নি, তবে কিছু কিছু দার্শনিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং এঁরা যে সকলেই কনফুসিয়াসকে অনুসরণ করতেন তাও নয়। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন মো-ৎসু যিনি কনফুসিয়াসের অল্পপরবর্তী ছিলেন (৪৭৮-৩৮১ খ্রীঃ পূঃ)। মো-ৎসুর মতবাদে জনকল্যাণের বিষয়টি সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছিল, তদুপরি তিনি ছিলেন প্রচণ্ড যুদ্ধবিরোধী।[১]

কনফুসিয়াসের মতবাদসমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট আকার দেন মেঙ্গ-ৎসু (৩৭২-২৮৯ খ্রীঃ পূঃ) এবং হ্সুন-ৎসু (৩১৯-২৩৫ খ্রীঃ পূঃ)। মেঙ্গ-ৎসু বা মেনসিয়াসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি প্রচলিত চৈনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, এবং তাঁর শিষ্যবর্গের সহায়তায় কনফুসীয় দৃষ্টিকোণে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সাতখণ্ডে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন যা তাঁর নামানুসারে মেঙ্গ-ৎসু বা মেন-শি নামে পরিচিত। মেঙ্গ-ৎসুর উত্তরাধিকারী ছিলেন হ্সুন-ৎসু যিনি কনফুসিয়াসের তত্ত্বসমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন মেঙ্গ-ৎসুর তীব্র সমালোচক এবং তাঁর নিজস্ব মতবাদ ছিল এই যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মন্দ, তার ভালত্ব অর্জিত গুণ ছাড়া আর কিছু নয়। হ্সুন-ৎসুর রচনাবলীর অনেকটা অংশই পাওয়া গেছে যার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন হোমার ডুবস।[২]

জীবনী বর্ণিত হয়েছে, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩-২১১ । এ অংশটুকুর পুনরায় ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন Richard Wilhelm তাঁর *Confucius and Confucianism*, pp. 3-70, গ্রন্থে যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

১। Fung yu-lan, *History of Chinese Philosophy* (Eng. tr. D. Bodde) 9137, pp. 76-105; Yi-pao Mei, *The Ethical and Political Works of Motse* (1929), pp. 87 ff.

২। Homer H. Dubs, *The Works of Hsüntze, Translated from the Chinese with Notes* (Probsthain's Oriental Series) 1925.

চি'ন যুগে (২২১-২০৭ খ্রীঃ পূঃ) রাজা সি হুয়াং তির চেষ্টায় চীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিখ্যাত চীনের প্রাচীরের ইনিই ছিলেন নির্মাতা। সি হুয়াং তির প্রধান মন্ত্রী লি সৃসু ছিলেন হ্সুন-ৎস্যুর শিষ্য যিনি রাজার চরম ক্ষমতার প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তী হান রাজবংশের সময় (২০২ খ্রীঃ পূঃ-২২০ খ্রীঃ) সম্রাট উ-তির পৃষ্ঠপোষকতায় কনফুসিয়াসবাদের ব্যাপ্তি শুরু হয়। তাঁর আমলে প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ ঘটে। এই গ্রন্থগুলি হচ্ছে ই-চিং, স্যু-চিং, সি-চিং, লি-চি, চৌ-লি, ই-লি, চুন-চিউ, হ্সিয়াও-চিন, লিউন-ইউ, মেঙ্গ-ৎস্যু এবং এরহ্-ইয়া। গ্রন্থগুলির পরিচয় আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণনা করব।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে লিখিত বহু গ্রন্থের নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন অরেল স্টাইন তুন-হুয়াঙ্গ অঞ্চল থেকে। এইগুলির অধিকাংশ কাঠের ফলকের উপর রচিত। এগুলির মধ্যে আছে কিছু দলিলপত্র, চি-চিউ-চাং নামক একটি অভিধানের অংশবিশেষ এবং আরও নানা ধরনের সাহিত্যগত নিদর্শন।[১] হান যুগেই চীনে কাগজের ব্যবহার শুরু হয়। ফান-ই বিরচিত *Hou Han Shu* বা 'পরবর্তী হান বিবরণী' গ্রন্থ থেকে (রচনাকাল ৪৪৫ খ্রীঃ) জানা যায় যে প্রাচীন যুগে চীনে বাঁশের উপর অথবা সিল্কের উপর লেখা হত। কিন্তু বাঁশ অত্যন্ত ভারী হওয়ায় এবং সিল্ক বিশেষ মূল্যবান হওয়ায় সাই-লুন (Ts'ai Lun) গাছের ছাল, শণ প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত (১০৫ খ্রীঃ নাগাদ) কাগজ তৈরীর উপযোগী মণ্ড প্রস্তুত করতে সক্ষম হন।

৬॥ প্রাচীন চৈনিক সাহিত্য

কনফুসি-পন্থীরা আদি চৈনিক সাহিত্যকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—ধ্রুপদী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিবিধ। চীনা ভাষায় চিং বা কিং কথাটির দ্বারা ধর্মীয় মূল গ্রন্থসমূহকে, বিশেষ করে কনফুসি-পন্থীদের মূল গ্রন্থগুলিকে বোঝায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইংরাজী Ch এবং K চীনা ভাষায় সমধ্বনি-বাচক। কনফুসি-পন্থীদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে সেঙ-কিং (Sheng-King) নামেও অভিহিত করা হয়। তাং বংশের আমলের রাজকীয় সংস্করণের হিসাব অনুযায়ী কনফুসি-পন্থীদের মোট শাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা তেরটি, বর্তমানের হিসাবে

১। M. A. Stein, *Serindia*, Vol. II, pp. 644-651, 698-766.

নয়টি। এই নয়টি রচনার মধ্যে পাঁচটিকে বলা হয় কিং, বাকিগুলিকে বলা হয় স্থ। নিশ্চয়ই কনফুসিয়াস এই গ্রন্থগুলি লেখেন নি, কয়েকটি রচনা তাঁর পূর্ববর্তী এবং কয়েকটি তাঁর পরবর্তী। কথিত আছে, তিনি একটি কিং বা চিং লিখেছিলেন যার নাম চুন-সিউ (*Ch'un-ts'iu*)। আরও তিনটি কিং বা চিং অর্থাৎ সি বা সঙ্গীত, স্থ বা ইতিহাস এবং ই বা বিবর্তন তাঁর সংগৃহীত এবং সম্পাদিত বলে কথিত। পঞ্চম কিং যা লি-কি বা লি-চি নামে পরিচিত আসলে প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান, আইনকানুন প্রভৃতির সংকলন, যেগুলি পরবর্তী কালে কনফুসিয়াসের উপর আরোপ করা হয়েছিল।

কিং বা চিং পর্যায়ের পাঁচটি গ্রন্থকে একত্রে বলা হয় *Wu ching*। এ ছাড়া স্থ বা স্সু-স্থ (Ssu-shu) পর্যায়ের আরও চারটি বই আছে যেগুলি হল লুন-ইউ (*Lun-yu*), চুঙ্গ ইউঙ্গ (Chung-yung), তা-স্থয়ে বা তাই-হিও (Ta Hsueh, Tai-hioh) এবং মেঙ্গ-সে বা মেঙ্গ-ৎস্থ-স্থ (Meng-tsze, Meng-Tzu-Shu)। এই নয়টি গ্রন্থের অধিকাংশই রচিত হয়েছিল চৌ-যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব দশম থেকে তৃতীয় শতক), যদিও বর্তমান আকারে এগুলিকে যেভাবে পাওয়া যায় তা হান-যুগ (২০২ খ্রী: পূ:—২২০ খ্রী:) ও তার পরবর্তী কালের সৃষ্টি।

৭॥ আদি পঞ্চগ্রন্থ : কিং বা চিং

কিং পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থটির নাম ই-চিং বা ই-কিং (*I-Ching, Yi-King*) যার অর্থ পরিবর্তন বা বিবর্তনের গ্রন্থ। কিংবদন্তী অনুযায়ী আদিতে নাকি এই গ্রন্থটি হলুদ নদীর জলে ভেসে-ওঠা কোন জীবের পৃষ্ঠদেশে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। প্রথমে এই গ্রন্থের অধ্যায়-সংখ্যা ছিল আঠারো, পরে সেগুলির সঙ্গে আরও ছেচল্লিশটি অধ্যায় যুক্ত হয়। মোট চৌষট্টি অধ্যায়ের গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। কথিত আছে, গ্রন্থটি নকল করেছিলেন পৌরাণিক সম্রাট ফু-সি, নকশা দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন ওয়েন-ওয়াং, পরিশিষ্ট রচনা করেছিলেন চেন কিং এবং ভাষ্য রচনা করেছিলেন খোদ কনফুসিয়াস, দশটি অধ্যায়ে। গ্রন্থটির তারিখ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না, তবে তা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত। ই-চিং-এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করানোর জন্ম এখানে ব্যাপক জ্যামিতিক নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত বিভিন্ন আকারের অখণ্ড অথবা খণ্ড সমান্তরাল রেখা দিয়ে প্রতীকের সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

১। ইংরাজী অনুবাদ James Legge, *Sacred Books of the East*, Vol. XVI.

দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম স্যু-কিং বা স্যু-চিং (*Shu-King, Shu-Ching*) বা ঐতিহাসিক নথিপত্র। গ্রন্থটি পাঁচভাগে বিভক্ত—তাং, সিয়া, ইউ, সাং এবং চৌ। মুখবন্ধে গ্রন্থটির লেখকত্ব কনফুসিয়াসের উপর আরোপ করা হয়েছে। এখানে মোটামুটি ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পৌরাণিক ইতিহাসের উপাদান সংকলিত হয়েছে। এতে বহু নথিপত্রের সমাবেশ ঘটেছে যেগুলির মধ্যে তাং-সি, পান-কেঙ্গ, কাও-ৎস্যুং, ইয়ুং-জি, হ্সি-পো কান লি এবং উয়ে-ৎস্যুকে সাঙ্গ-যুগে (পৌরাণিক কালানুক্রম অনুযায়ী ১০৬৫-১১২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাষা পরীক্ষা করে, এবং সাঙ্গ-যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সঙ্গে তুলনা করে, পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে এগুলি অনেক পরবর্তী কালের মনগড়া জিনিস।[১] স্যু কিং-এর মাত্র চার ভাগের একভাগকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বে স্থান দেওয়া যায়। অবশিষ্টাংশ অনেক পরবর্তী কালে রচিত, এমনকি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকেরও পরে। এই গ্রন্থের প্রাচীনতর অংশগুলিতে বিভিন্ন শাসক ও সেনাপতিদের ভাষণ, ঘোষণা ও চিঠিপত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। লোয়াঙ্গ নামক একটি শহর তৈরীর নথিপত্রও খুব আকর্ষণীয়। এই গ্রন্থে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং রাজার দৈব অধিকার সমর্থন করা হয়েছে।[২]

তৃতীয় গ্রন্থটির সি-চিং বা সি-কিং (*Shi-Ching, Shi-King*), যার অর্থ কবিতার গ্রন্থ। এতে ৩১১টি কবিতা আছে, যদিও ৩০৪টির বেশি পাওয়া যায় না। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এগুলিও কনফুসিয়াস কর্তৃক সংকলিত, যেগুলি তিনি নির্বাচন করেছিলেন প্রচলিত তিন হাজার কবিতা থেকে। এই সংকলনের অনেকগুলি কবিতা কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে রচিত, এবং এটা অবশ্য খুবই সম্ভব যে কনফুসিয়াস এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা এগুলির থেকে কিছু কিছু কবিতা ব্যবহার করেছিলেন উপদেশ দেবার প্রয়োজনে। এই সংকলনের একটি অংশ সাঙ্গ-সুঙ্গ (*Shang-Sung*) সাঙ্গ-যুগে রচিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে, যদিও তা ঠিক নয়। অধিকাংশ কবিতাই লিরিকধর্মী এবং প্রেম, বিবাহ, যুদ্ধ, কৃষি, শিকার, ভোজ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি

১। H. G. Creel, *Studies in Early Chinese Culture* (1937), pp. 55-89.

২। ইংরাজী অনুবাদ James Legge, *Sacred Books of the East*, Vol. III. pp. 1-272; এছাড়া *The Chinese Classics* গ্রন্থেও (তৃতীয় খণ্ড ১৮৬১) তিনি স্যু-কিং-এর অনুবাদ করেছিলেন।

বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে সেগুলি রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি মোট ২৯ খণ্ডে বিভক্ত। ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য থেকে সংগৃহীত কবিতাগুলি ১৫টি খণ্ডে স্থান পেয়েছে, ১১টি খণ্ডে স্থান পেয়েছে চীন সম্রাটের খাস এলাকা থেকে সংগৃহীত বড় ও ছোট কবিতাগুলি, এবং বিভিন্ন মন্দির ও যজ্ঞস্থল থেকে সংগৃহীত কবিতাগুলি বাকি ৩ খণ্ডে স্থান পেয়েছে।[১]

চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে প্রাচীন যুগের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও আইনকানুনের সংকলন, নাম লি-চি বা লি-কি (*Li-Chi*, *Li-Ki*)। এই গ্রন্থের চরিত্র বৈদিক গৃহ্যসূত্রগুলির মত। এতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহের বিশদ বর্ণনা আছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত ছিল সেগুলির উপর রচিত অসংখ্য আইনকানুন এখানে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া বিবাহ, মৃত্যু, যাগযজ্ঞ, ভোজসভা, রাজদর্শন, যুদ্ধ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আচার-অনুষ্ঠান এখানে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালীন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও এখানে বহু কথা বলা হয়েছে। বইটির প্রথম লাইনটি হচ্ছে 'সর্বদা এবং সবকিছুতে যেন শ্রদ্ধা থাকে।' বর্তমানে যে আকারে আমরা বইটিকে পাই তা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের রচনা। এই ধরনের আরও দুটি গ্রন্থ বর্তমান। একটির নাম চৌ-লি (*Chou-Li*) বা চৌ-এর অনুষ্ঠানসমূহ যা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক বা তার পূর্ববর্তী। অপরটির নাম ই-লি (*I-li*) বা সৌজন্য ও অনুষ্ঠানের গ্রন্থ যা আরও পূর্ববর্তী, সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত।[২]

কিং বা চিং পর্যায়ের পঞ্চম গ্রন্থটির নাম চুন-চিউ বা চুন-সিউ (*Ch'un Ch'iu*, *Ch'un-ts'iu*)। বইটির নামের অর্থ হল বসন্ত ও শরৎ। এই গ্রন্থের লেখকত্ব প্রথা অনুযায়ী কনফুসিয়াসের উপর আরোপ করা হয়েছে। আসলে এটি একটি ইতিহাসধর্মী রচনা যার লেখক কনফুসিয়াস হলেও হতে পারেন, কেননা এটি তাঁর নিজের অঞ্চল লু প্রদেশের বিষয় নিয়েই রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ৭২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র

১। ইংরাজী অনুবাদ James Legge, *Sacred Books of the East*, Vol III, pp. 273-446, *The Chinese Classics* (চতুর্থ খণ্ড ১৮৭১), এছাড়া দ্রষ্টব্য Arthur Waley, *The Book of Songs, Translated from the Chinese* (১৯৩৭)।

২। লি-চির ইংরাজী অনুবাদ James Legge, *Sacred Books of the East*, Vols. XXVII-XXVIII; ই-লির ইংরাজী অনুবাদ John Steele, *The I-li or Book of Etiquette and Ceremonial*, 2 vols. (1917)।

সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া এতে ঋতুতত্ত্ব, বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যু, রাষ্ট্রনীতি এবং যুদ্ধ-বিষয়ক বক্তব্যও আছে। এই গ্রন্থের ভাষ্যের নাম সো-চুয়ান (*Tso-Chuan*)।[১]

৮ ॥ স্থ-পর্যায়ের চারটি গ্রন্থ

এরপর আমরা স্থ-পর্যায়ের চারটি গ্রন্থের কথা আলোচনা করব। প্রথমটির নাম লুন-ইউ (*Lun-yü*)। এটি কনফুসিয়াসের শিষ্যগণ কর্তৃক রচিত। তাঁর স্বমুখনিঃসৃত উপদেশাবলী এতে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বহু ও বিচিত্র, তবে শাসনযন্ত্র ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কনফুসিয়াস কথিত আদর্শ মানবের কল্পনাও (চুন-জু) এখানে স্থান পেয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে সেঙ্গ-ৎস্যর (*Tseng-tzu*) শেষ অসুস্থতার উল্লেখ আছে (যিনি মারা গিয়েছিলেন ৪৩৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে), এবং যেহেতু মেঙ্গ-ৎস্য (৩৭২-২৮৯ খ্রী: পূ:) এই গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন, অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে গ্রন্থটি ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটির দশম অধ্যায়ে কনফুসিয়াসের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও আচরণের বিশদ বর্ণনা আছে। উনিশতম অধ্যায়ে তাঁর প্রধান শিষ্যবর্গের উপদেশাবলীও সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির বর্তমান যে আকার আমরা পাই, তা একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে রচিত। এই পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গিয়েছিল লুক্কায়িত অবস্থায় ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অনুমান করা যায় যে আনুমানিক ২১৩-২১১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন সম্রাট সি-হুয়াং-তির প্রাচীন গ্রন্থসমূহ বিনষ্ট করার বাতিক জেগেছিল তখনই এই পাণ্ডুলিপিটিকে গোপন করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে লুক্কায়িত আরও একটি বই পাওয়া গেছে, নাম চিয়া-ইউ (*Chia-yü*)। এতেও কনফুসিয়াসের উপর আরোপিত অনেক কাহিনী ও সংলাপ আছে। তবে এটি পরবর্তী কালের ঐতিহ্যবাহী এবং খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের আগে রচিত নয়।[২]

১। James Legge কৃত চুন-চিউর অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য *The Chinese Classics* (পঞ্চম খণ্ড, ১৮৭২)। সো-চুয়ানের অনুবাদও এখানে পাওয়া যায়।

২। লুন-ইউর ইংরাজী অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য James Legge, *The Chinese Texts*, Vol. I, pp. 137-354; L. Giles, *The Sayings of Confucius, A New Translation of the Greater Part of the Confucian Analects* (Wisdom of the East, 1907); **Arthur Waley**; *The Analects of Confucius, Translated and Annotated*, (1938); L. A. Layall, *The Sayings of Confucius* (1925).

স্থ-পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম তা-স্থয়ে (*Ta-Hsueh*), অর্থ 'মহৎ শিক্ষা'। কথিত আছে যে এটি রচনা করেছিলেন পূর্বোল্লিখিত সেঙ-ৎস্থ (*Tseng-tzu*)। গ্রন্থের বক্তব্য ও রচনাভঙ্গী দেখে মনে হয় যে সর্বপ্রথম আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি কোন অজ্ঞাতনামা কনফুসি-পন্থী এটি রচনা করেছিলেন, এবং পরে বহুবার তার উপর কলম চালানো হয়। গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়নি। একটি সংস্করণে দেখা যায় যে আলোচ্য গ্রন্থটি পূর্বোক্ত লি-কি গ্রন্থেরই একটি অংশ। বর্তমানে রচনাটিকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তা হচ্ছে চু-সি (Chu-Hsi) কৃত সংস্করণ। চু-সির জীবনকাল ছিল ১১৩০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। নৈতিকতা ও প্রকৃতি বিজ্ঞান এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।[১]

তৃতীয় গ্রন্থটির নাম চুঙ-ইউঙ (*Chun'g yung*)। কথিত আছে, কনফুসিয়াসের পৌত্র ৎস্থ-স্থ (Tzu-Ssu) বা কুং-চি (Kung-Chi) এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এটা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়, তবে এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে রচিত। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'ভারসাম্য এবং সঙ্গতি' যাতে মানব-প্রকৃতির বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে; সম্ভবত এটিও তা-স্থয়ের মত লি-কি গ্রন্থের একটি অংশ ছিল।[২]

চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে মেঙ-ৎস্থ বা মেন সি, লেখক মেঙ-ৎস্থর (Meng-Tzu ৩৭২—২৮৯ খ্রী: পূ:) নামানুসারেই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। গ্রন্থটি সাতখণ্ডে বিভক্ত যেখানে দার্শনিক মেঙ-ৎস্থর বক্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। মেঙ-ৎস্থ নিজের মত করে কনফুসিয়াসের মতামত ব্যাখ্যা করেছেন এই গ্রন্থে। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতি। জীবনের অপরাপর দিক সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত এখানে স্থান পেয়েছে। প্রতিভা ও কর্মধারার বিচারে মেঙ-ৎস্থকে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই বিপুল গ্রন্থটি তিনি তাঁর শিষ্যবর্গের সহায়তায় রচনা করেছিলেন।[৩]

১। ইংরাজী অনুবাদ Legge, *The Chinese Classics*, Vol. I, pp. 355-381; E. R Hughes, *The Great Learning and the Mean-in-Action* (1943)।

২। ইংরাজী অনুবাদ Legge, *op.-cit.* vol. I, pp, 382-434; Hughes, *op.-cit.*; Ku-Hung Ming, *The Conduct of Life* (1906); L. A. Lyall and King Chien-kun, *The Chung Yung or the Centre, the Common* (1927)।

৩। ইংরাজী অনুবাদ Legge *op. cit.*, Vol. II. L. A. Lyall, *Mencius* (1922); L. Giles, *The Book of Mencius* (1942)।

৯। 'তাও' ধর্ম ও সাহিত্য

চীনদেশে তাও (সঠিক উচ্চারণ 'দও') ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লাও-ৎস্থ (Lao-tzu) যিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের লোক ছিলেন এবং সেই হিসাবে কনফুসিয়াসের সমকালীন ছিলেন। ঐতিহাসিক স্থ-মা চিয়েন তাঁর সি-চি নামক গ্রন্থে কনফুসিয়াসের সঙ্গে লাও-ৎস্থর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। কনফুসিয়াস প্রবর্তিত ধর্ম যেখানে বাস্তবতা-অনুসারী ও নীতিমূলক, লাও-ৎস্থ প্রবর্তিত ধর্ম অতীন্দ্রিয়বাদী। 'তাও' কথাটির সমতুল কোন প্রতিশব্দ কোন ভাষায় নেই। 'তাও' ঈশ্বর নয়, ব্রহ্ম বলতে আমরা যা বুঝি সে রকমও কিছু নয়। লাও-ৎস্থর মতে 'তাও'-কে বোঝার চেষ্টা বিড়ম্বনা, অথচ এই 'তাও'-তে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া মানুষমাত্রেরই কর্তব্য এবং তার জন্য কয়েকটি গুহ্য পদ্ধতি আছে। লাও-ৎস্থ তাঁর মতামতসমূহ যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার নাম তাও-তে-কিং বা তাও-তে-চিং (*Tao-Te-King*, *Tao-Te-Ching*)। মৃত্যুর কিছুকাল আগে জনৈক শিষ্যের অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রচলিত এবং কিছুটা সরলীকৃত অর্থে 'তাও' বলতে বোঝায় পথ এবং 'তে' বলতে বোঝায় শক্তি।

তাও-তে-কিং প্রকৃতই লাও-ৎস্থর রচনা কিনা সে বিষয়ে কিছু বলা যায় না। রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হলেও হতে পারে। তবে 'তাও' ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য এই গ্রন্থের গুরুত্ব অসীম। পাঁচ হাজার চীনা শব্দের দ্বারা গ্রন্থটি রচিত এবং তা দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড 'তাও' সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি 'তে' সংক্রান্ত। 'তাও' (পথ) এবং 'তে' (শক্তি) ছাড়াও এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের তাৎপর্য বোঝবার প্রয়োজন আছে, যেমন দুটি তত্ত্ব, 'ইয়াং' ও 'ইং', যা আমাদের সাংখ্য বা তন্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের অনুরূপ ধারণা। ইয়াং পুরুষ, ইং স্ত্রী, এবং এই উভয় শক্তির সাহচর্যেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়েছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য 'তাও' ধারণা হচ্ছে 'উ-উই' (*wu-wei*) যার অর্থ অক্রিয়া। তাও-তে-কিং গ্রন্থ থেকে আমরা কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 'তাও'-এর প্রকৃতি এবং কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে লাও-ৎস্থ বলছেন: 'যে পথের কথা বলা যায় তা পৃথক্‌ভাবিহীন নয়, যে নামগুলি উচ্চারণ করা যায় সেগুলিও তা নয়। এই রকম কিছু অব্যক্ত থেকেই স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে…যাদের সৃষ্টির পূর্বে এমন কিছু ছিল যা আকারহীন অথচ সম্পূর্ণ—শব্দহীন, বস্তুহীন, অনির্ভর, অপরিবর্তনীয়, সর্বব্যাপী, স্খলনহীন—যার সঠিক নাম আমরা জানি না,

যদিও তাকে সব কিছুর জননী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তাকেই আমরা পথ বলে জানি...মহৎ 'তাও' তরণীর মত চলমান ; যারা এতে আশ্রয় পেয়েছে তাদের পরিত্যাগ করে না, অথচ তাদের সে সৃষ্টি করেনি, তাদের সে প্রভু নয়, তাদের কাছে তার কোন দাবিও নেই, অথচ আরোহীরা তাকে মানতে বাধ্য, এবং সেই কারণেই সে মহৎ। 'তাও' কিছুই করে না, অথচ তারই মারফৎ সব কিছু ঘটে।' মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে লাও-ৎসু বলেন : 'যেমন বৃহৎ নদী বা সমুদ্র হাজার হাজার নদীকে নিজ বক্ষে স্থান দিয়ে সকলের প্রভু হয়, সে রকম প্রত্যেককেই হতে হবে উদার এবং নমনীয়, তবেই সে প্রভুত্ব করতে পারবে। ··রাজা বা ঋষি মানুষের উপরে থাকবে না, থাকবে পিছনে...নিজেকে কখনও বৃহৎ মনে করবে না ··কেননা যে করুণা প্রদর্শন করে সেই প্রকৃত সাহসী, যে নিস্পৃহ তার কাছেই আসে যাবতীয় সামগ্রী, যে প্রত্যাখ্যান করে তার কাছেই আসে রাজপদ।...না তাকিয়েই সে দেখতে পায়, না করেই সে সব কিছু অর্জন করে।' জীবনের আদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেন : 'যত নিষেধ ততই নিষেধ ভাঙার ঝোঁক, যত বেশি অস্ত্র তত বেশি লোকক্ষয়, যত সমৃদ্ধি তত অবক্ষয়, যত আইনকানুন তত চুরি-ডাকাতি···তাই যে তাওর দ্বারা রাজাকে সাহায্য করতে চায়, তার উচিত অস্ত্রের দ্বারা দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা থেকে রাজাকে নিরস্ত করা ...আমার কথা বুঝতে সহজ, কাজে পরিণত করা আরও সহজ, কিন্তু তবুও কেউ সেগুলি বোঝে না, কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করে না...খুব অল্প লোকেই আমাকে বুঝবে এবং তারই উপর নির্ভর করছে আমার মূল্য।'[১]

লাও-ৎসুর পর 'তাও' ধর্মের প্রবক্তা হিসাবে দেখা দেন ইয়াং-চু (Yang-Chu ৪৪০-৩৬৬ খ্রীঃ পূঃ)। কনফুসি-পন্থী মেঙ্গ-ৎসু (পূর্বে উল্লিখিত) তাঁর সমালোচনা করে লিখেছেন যে ইয়াং-চুর মতবাদে ব্যক্তির ভূমিকাকে বড় বেশি করে দেখানো হয়েছে। হুয়াই-নান-ৎসু (*Huai-nan-tzu*) নামক খ্রীষ্টপূর্ব

১। তাও-তে-কিং-এর প্রথম ফরাসী অনুবাদ করেন St. Julien (১৮৪১)। ইংরাজী অনুবাদ Legge, *Sacred Books of the East*, Vol. xxxix, pp. 45-124 ; L. Giles, *The Sayings of Lao-Tsu* (1905) ; A. Waley, *The Way and Its Power* (1934) ; W. Bynner, *The Way of Life according to Lao-Tsu* (1944)। কামরূপের রাজা ভাস্করের নির্দেশে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাও-তে-কিং-এর সংস্কৃত অনুবাদ হয়েছিল।

দ্বিতীয় শতকের একটি সংকলনে ইয়াং-চুর মতবাদের উল্লেখ আছে। 'তাও' ধর্মের তৃতীয় প্রবক্তা চুয়াঙ্গ-ৎস্থ (Chuang-tzu ; ৩৭০-৩০০ খ্রীঃ পূঃ) লাও-ৎস্থর মতবাদসমূহকে লিখিত আকার প্রদান করেন। তাঁর রচনাসমূহ তাঁর নামেই পরিচিত।[১] চিন (২২১-২০৭ খ্রীঃ পূঃ) এবং হান (২০২ খ্রীঃ পূঃ-২২০ খ্রীঃ) যুগে 'তাও' ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। এই যুগেই 'তাও' ধর্মের অনুরাগীদের মধ্যে গুহ্যসাধনার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় যার লক্ষ্য ছিল অমরত্ব অর্জন এবং সেই উদ্দেশ্যে রসায়নশাস্ত্রের চর্চা। সম্রাট সি-হুয়াং-তি এই সকল চর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রসায়ন ছাড়াও অতিলৌকিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে (ভারতীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় সিদ্ধি) নানাপ্রকার দৈহিক ক্রিয়া-কলাপেরও প্রবর্তন ঘটে (ভারতীয় পরিভাষায় কায়-সাধন)। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় লি-ৎস্থ (*Lieh-tzu*) নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটি তার লেখকের নামে পরিচিত যিনি কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের লোক হলেও রচনাটি আসলে হান-যুগের।[২]

পরবর্তী হান-যুগের বিখ্যাত তাও'পন্থী পণ্ডিত ছিলেন চাঙ্গ-তাও-লিঙ্গ (Chang-tao-ling) যিনি রসায়নশাস্ত্র ও যাদুবিদ্যার রীতিমত দক্ষ ছিলেন। ১৮৪ খ্রীষ্টাব্দের 'হলুদ পাগড়ীর বিদ্রোহের' তিনিই ছিলেন নায়ক যে বিদ্রোহের ফলে কার্যত হান-বংশের পতন ঘটে। পরবর্তী কালের ছয় রাজবংশের আমলে (২২০-৫৮১ খ্রীঃ) 'তাও' ধর্মের ব্যবহারিক দিক্‌গুলির বিশেষ বিকাশ ঘটে। প্রকৃতি (yin) ও পুরুষের (yang) প্রতীকরূপী জল ও বায়ুকে কেন্দ্র করে একধরনের নূতন বিজ্ঞানের চর্চা 'তাও'-পন্থীদের মধ্যে শুরু হয় (Feng Shui) যার প্রবক্তা ছিলেন কুয়ো-পো (Kuo-Po, ২৭৬-৩২৪ খ্রীঃ) যাঁর জীবনী সিন-বংশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের এই ধারাটিকে আরও পুষ্ট করেন কো-হুঙ্গ (Ko-hung) যিনি রসায়ন ও ধাতববিদ্যার উপর একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ

১। ইংরাজী অনুবাদ Legge, *Sacred Books of the East*, Vol. xxxix, pp. 125-392; Vol. xl. pp. 1-232; H. A. Giles, *Chuang-Tzu* (1926); Fung-yu-lan, *Chuang-Tzu. A New Selected Translation with an Exposition of the Philosophy of Kuo Hsiang* (1931)।

২। ইংরাজী অনুবাদ L. Giles, *Taoist Teachings from the Book of Lieh-Tzu* (1912)।

রচনা করেন।[১] তাঁর আরও একটি গ্রন্থ আছে, 'তাও' ধর্মের দেবদেবীদের নিয়ে। গ্রন্থটির নাম দেবতাদের জীবনী।

কো-হুঙের রচনা থেকে পাওয়া যায়—'তাও' ধর্মের দেবগোষ্ঠীর সবচেয়ে উপরে আছেন তিনটি সত্তা, উয়ান-সি-তিয়েন-সুন (Yuan-Shih-Tien-Tsun) যিনি বিশ্বচরাচরের প্রতীক, তাও চুন (Tao-Chun) যিনি মার্গের প্রতীক এবং প্রকৃতি-পুরুষের (Yin-Yang) সম্পর্কের নিয়ামক এবং লাও-ৎসু, সর্বব্যাপী 'তাও'-এর মানবিক প্রবক্তা যিনি দেবতার পর্যায়ে উন্নীত। স্পষ্টতই এই পরিকল্পনা বুদ্ধের ত্রিকায়ের ধারণা থেকে গড়ে উঠেছে—বুদ্ধের ধর্মকায় যা বিশ্বচরাচরের প্রতীক, সম্ভোগকায় যা তাঁর বিশ্বনিয়ামক শক্তির প্রতীক, এবং নির্মাণকায় যা তাঁর মানবীয় রূপ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের প্রতীক। মহাযান বৌদ্ধ দেবমণ্ডলী অবলম্বনে আরও অন্যত্র দেবদেবী 'তাও' ধর্মে স্থান পেয়েছেন। সকলের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এটা খুবই স্বাভাবিক যে বৌদ্ধধর্মের মত একটা বিরাট ও জমকালো ধর্ম পাশাপাশি বর্তমান অপরাপর ধর্মকেও প্রভাবিত করবে। এই প্রভাব কিভাবে এসেছিল এবং তার ফল কি রকম হয়েছিল সে বিষয়ে অনেক কথাই বলার আছে যা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বলব।

১০ ॥ 'তাও' ধর্ম এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্র

তাং-যুগেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে 'তাও' ধর্মের যোগাযোগ ঘটে যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাই-ই-চিন-হুয়া-সুং-চি (*T'ai-I-Chin-Hua-Tsung-Chih*) বা 'সোনালী ফুলের রহস্য' গ্রন্থে।[২] এই গ্রন্থে লু-ইয়েন (Lu-Yen, জন্ম ৭৫৫ খ্রীঃ) নামক 'তাও'-পন্থী ধর্মগুরুর শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেহ, মন ও বুদ্ধির যথার্থ সমন্বয়ের জন্য ধ্যানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই ধ্যান আসলে বৌদ্ধ প্রথা, এবং তার স্বপক্ষে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে লেঙ-য়েন (*Leng-Yen*) বা লংকাবতারসূত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'তাও' ধর্মের উপর

১। কুয়ো-পো এবং কো-হুঙ-এর বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার অনুবাদ পাওয়া যাবে জনসনের *A Study of Chinese Alchemy* (1928) গ্রন্থে।

২। ইংরাজী অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য Richard Wilhelm, *The Secret of the Golden Flower* (1931)।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নব্য কনফুসি-পন্থী চু-সির (Chu-Hsi ১১৩০-১২০০ খ্রীঃ) রচনা থেকে, যা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি :

"তাও ধর্ম গোড়ার দিকে শুদ্ধ জীবন ও অক্রিয়াবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দীর্ঘজীবন ও অমরত্বের ধারণা যা ওই ধর্মের মুখ্য উপজীব্য হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়েছে, তারা জাদুবিশ্বাস, মন্ত্রতন্ত্র, আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রার্থনার উপর নির্ভরশীল হয়েছে। এইভাবে দুটি মৌল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাও-পন্থীরা লাও-ৎসু এবং চুয়াং-ৎসুর রচনাবলীর অনুগামী। কিন্তু তারা এগুলিকে অবহেলা করেছে; এবং বৌদ্ধরা তার সুযোগ নিয়ে তাদের বিপথগামী করেছে, যার ফলে তাও-পন্থীরা বৌদ্ধধর্মের সূত্রসমূহকে অনুকরণ করছে।...বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ বুদ্ধ যা বলেছেন তাতেই পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে তাও-পন্থী গ্রন্থসমূহ তাও-র কথায় পরিপূর্ণ। এখন, বুদ্ধ মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাও কিভাবে কথা বলতে পারেন? এই বিশ্বাস কিন্তু বিগত আট নয় শতাব্দী ধরে বর্তমান রয়েছে। তাও ধর্মের সূত্রপাত লাও-ৎসু থেকে। বৌদ্ধদের ত্রিকায় হচ্ছে—(১) বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দেহ (ধর্মকায়), (২) তাঁর আনন্দপূর্ণ দেহ (সম্ভোগকায়) যা তাঁর গুণাবলী ব্যক্ত করে, এবং (৩) তাঁর বাস্তব দেহ (নির্মাণ বা রূপকায়) যা অবলম্বনে তিনি মানুষরূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আধুনিক সম্প্রদায়সমূহ এই ত্রিকায়কে তিনটি মূর্তিতে বিভক্ত করেছে এবং সেগুলিকে পাশাপাশি রেখেছে। তারা ত্রিতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্যই বুঝতে পারেনি যা আসলে একের মধ্যে তিনের বিকাশ। তাও-পন্থীরা এক্ষেত্রে বৌদ্ধদের অনুকরণ করে লাও-ৎসুকে তিনটি পৃথক্ সত্তা হিসাবে উপাসনা করে, (১) আদি এবং পূজ্য ঈশ্বর, (২) চূড়ান্ত নিয়ন্তা তাও এবং (৩) চূড়ান্ত শাসক লাও-ৎসু। পরম শক্তিমান্ ঈশ্বর (তিয়েন) এঁদের তলায় স্থান পেয়েছেন, এবং এটা একটা আক্রোশের বশে অধিকার ভঙ্গের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু প্রথম দুটি কল্পনা লাও-ৎসুর আধ্যাত্মিক ও আনন্দপূর্ণ দেহের প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং এই দুটি মূর্তি তাঁর সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করে না। তৃতীয়টির প্রবর্তন বৌদ্ধদের গভীর ভ্রান্তির অনুকরণ ভিন্ন কিছুই নয়, চুয়াং-ৎসু পরিষ্কার ভাষায় লাও-ৎসুর মৃত্যুর কথা বলেন। তিনি এখন আত্মা ভিন্ন আর কিছু নন। কি করে তিনি সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের স্থান বেদখল করতে

পারেন? বুদ্ধ এবং লাও-ৎসুর মতবাদসমূহ এই কারণেই উচ্ছেদ করা দরকার।"[১]

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের নব্য কনফুসি-পন্থীর এই যে বক্তব্য তা কতখানি ইতিহাস-সম্মত সে কথা আমাদের জানা দরকার। বৌদ্ধধর্ম শুধু 'তাও' ধর্মকে প্রভাবিত করেনি, তার বিপরীতটাও ঘটেছিল চূড়ান্তভাবে। বৌদ্ধ এবং হিন্দু তন্ত্রসাধনার কয়েকটি বিশেষ দিক্ প্রত্যক্ষভাবেই তাওপন্থার প্রভাবে গড়ে উঠেছে, যেমন বামাচার, যা চীনাচার নামেও পরিচিত। বিষয়টি একটু খুলেই বলা যাক।

মহাযানী বৌদ্ধদের কিছু দেবদেবী, বিশেষ করে অবলোকিতেশ্বর এবং তারা, হিন্দুধর্মেও স্থান করে নিয়েছিলেন, এবং শিব ও শক্তির সঙ্গে পরবর্তী কালে অভিন্নতা অর্জন করেছিলেন। তারাদেবী তিব্বতে ও চীনে তান্ত্রিক বামাচারী অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা পূজিতা হতেন, এবং এই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তান্ত্রিক পঞ্চমকার নামে যা পরিচিত—মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন—তা চীনদেশ থেকেই এসেছে। তারাতন্ত্র নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বিখ্যাত তারা ও বশিষ্ঠের যে কাহিনী তন্ত্রগ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায়, যা আমরা পরে দেখব, এই বিষয়ে আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারারহস্য, রুদ্রযামল এবং মহাচীনাচারক্রম নামক গ্রন্থত্রয়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে দেবী তারার সঙ্গে সম্পর্কিত বীরাচার বা বামাচার সোজাসুজি চীনদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন বশিষ্ঠ, যিনি খোদ বুদ্ধের কাছ থেকেই এবিষয়ে নির্দেশ পেয়েছিলেন এবং যিনি চীনদেশে এগুলির অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে দেখে জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

তন্ত্রের দেহতত্ত্ব, অনুযায়ী মানবদেহই হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, এবং সেই হিসাবে কায়সাধন এবং সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যৌনাচারসমূহ নারীরূপিণী প্রকৃতি বা শক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় করে বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে পৃথক্‌ভাবে শাক্তধর্মের বিকাশ ঘটলেও তার উৎস মহাযান বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নিহিত ছিল। বৌদ্ধ গুহ্যসমাজতন্ত্রে সাধনমার্গ হিসাবে যৌনাচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে এই কায়সাধন ও যৌনাচার সেই তত্ত্ব ইন এবং

১। Bruce, *Chu Hsi and His Masters*, pp. 237-39.

ইয়াং রূপে 'তাও' ধর্মেও উপস্থিত। 'তাও'বাদীদের মত তান্ত্রিকদের লক্ষ্য জীবন্মুক্তি, যার অপর নাম অমরত্ব অর্জন, এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁদের মত তান্ত্রিকেরাও রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, দ্রব্যগুণ প্রভৃতির চর্চা করেছিলেন। এই অমরত্ব (*Hsien*) অর্জনের জন্য 'তাও'পন্থীরা কয়েকটি পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যেগুলি হচ্ছে প্রাণায়াম, হঠযোগ, যৌন ব্যবহার, রসায়ন ও খাদ্যাখাদ্যবিচার। এই পদ্ধতিগুলি তান্ত্রিকদেরও। দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মৈথুনজাত বীর্যকে নির্গত হতে না দিয়ে উর্ধ্বগামী করার যে প্রচেষ্টা, তন্ত্রসাধনায় যা একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি, একটি বিশুদ্ধ 'তাও' পদ্ধতি যা *huan ching* নামে পরিচিত।

প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে তন্ত্র ভারত থেকে চীন দেশে রপ্তানী হয়েছিল, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে সমস্ত ব্যাপারটাই আসলে 'তাও'-পন্থী। 'তাও' ধর্মের বাইবেল, লাও-ৎস্ রচিত তাও তে-কিং (*Tao te-king*) গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ হয়েছিল ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপের রাজা ভাস্করের নির্দেশে। তাও-তে-কিং এর প্রতি ভারতীয় তান্ত্রিকদের আগ্রহ নিশ্চয়ই অহেতুক ছিল না। রাজা ভাস্কর লাও-ৎস্র একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রকাশ। আরও আগে, ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক সোঙ্-য়ুন (Song yun) উত্তর-পশ্চিম ভারতে উদ্যানদেশে (সোয়াট উপত্যকা) তাও-তে-কিং-এর উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রুদ্রযামল, মহাচীনাচারক্রম প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ঋষি বশিষ্ঠ সিদ্ধিলাভের জন্য কামরূপে প্রচণ্ড সাধনা করেও যখন ব্যর্থ হলেন, তখন স্বয়ং তারাদেবী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে চীনদেশে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। চীনদেশে গিয়ে তিনি দেখলেন যে বুদ্ধ অসংখ্য নগ্না নারী পরিবৃত হয়ে রক্ত ও মদ্যপান করেছেন। তাঁকে বিস্মিত হতে না বলে বুদ্ধ তাঁকে বামাচারে দীক্ষা দিলেন যার ফলে তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটল।

> এতচ্ছ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং স্মৃত্বা দেবীং সরস্বতীম্।
> মদিরা-সাধনং কর্তুম জগাম কুল-মণ্ডপে ॥
> মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনং এব চ।
> পুনঃ পুনঃ সাধয়িত্বা পূর্ণ-যোগী বভূব সঃ ॥

অতঃপর বুদ্ধ বশিষ্ঠকে এই বামাচার বা চীনাচার সর্বত্র প্রচারের আদেশ দিলেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে এই সকল বিষয়কে বিচার করলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে 'তাও'-পন্থী আচার-আচরণসমূহ, যেগুলির মূল ভিত্তি নরনারীর আনুষ্ঠানিক মৈথুনের অন্তরালে প্রকৃতি-(yin)-পুরুষ-(yang) তত্ত্বের উপলব্ধি, চৈনিক বৌদ্ধগণ কর্তৃক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ গৃহীত হয়েছিল। অন্যান্য সূত্র থেকে জানা গেছে যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে চীনদেশে শক্তিপূজার, বরং বলা যায় এক ধরনের তান্ত্রিক শাক্তসাধনার, চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল। এই সাধনার মূল প্রেরণা হিসাবে যে মহাদেবী গড়ে উঠেছিলেন, তিনি মূলত চারিটি ধারার সমন্বয়: (১) প্রাচীন চৈনিক মাতৃদেবী সি-উয়াঙ মু (Si-Wang-Mu), (২) 'তাও' ধর্মোক্ত প্রকৃতি বা শক্তি যা yin নামে পরিচিত, (৩) বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর যিনি চীনদেশের পুরাতন মাতৃকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে দেবতা থেকে দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে কুয়ান-ইন (Kuan yin) নামে পরিচিত হয়েছিলেন, এবং (৪) বৌদ্ধ দেবী তারা। এই মহাদেবীর পূজার্চনা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বামাচারী অনুষ্ঠানসমূহ চীন দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। সন্দেহ নেই যে ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে পৃথকভাবে শাক্তধর্ম গড়ে ওঠার মূল প্রেরণা এখানেই।[১]

১১ ॥ ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের বিকাশ

চীনদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাস চর্চার রীতি ছিল সেকথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। সু-কিং বা সু-চিং নামক গ্রন্থের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কনফুসিয়াসের নামে আরোপিত চুন চিউ বা চুন-সিউর

কথাও বলা হয়েছে যা তাঁর নিজ প্রদেশের ইতিবৃত্ত। এই গ্রন্থের টীকা সো-চুয়ানের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। সু-মা-চিয়েন রচিত সি-চি, যা অবলম্বনে আমরা কনফুসিয়াস ও অপরাপর চৈনিক ধর্মগুরুদের কথা বিবৃত করেছি, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রচিত সেই গ্রন্থে ব্যবহৃত ইতিহাস রচনার পদ্ধতি, পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের নিকট আদর্শস্বরূপ হয়েছিল। এই গ্রন্থটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত—রাজবৃত্ত, কালানুক্রম, খণ্ডিত বিবরণ, সামন্তরাজ-বৃত্তান্ত এবং জীবনীসমূহ।

অপরাপর প্রাচীন ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য পান-কু রচিত চিয়েন-হান-সু (*Chien-Han-Shu*) যার অর্থ 'পূর্বতন হান-বংশের ইতিহাস'। পান-কু মারা যান ৯২ খ্রীষ্টাব্দে, সেই হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে কোন সংশয় নেই।[১] আর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ হচ্ছে চু-সু-চি-নিয়েন (*Chu-Shu-Chi-Nien*)। এই গ্রন্থটি একটি সমাধির মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ২৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এটি সম্ভবত উই (Wei) অঞ্চলে রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। উভয় গ্রন্থেই চীনের আদি পর্যায়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, প্রাচীনতম হ্‌সিয়া (Hsia) রাজবংশের কথাও উল্লিখিত হয়েছে, তবে কতদূর নির্ভরযোগ্য তা বলা যায় না। আরও দুটি প্রাচীন যুগে রচিত ইতিহাসগ্রন্থ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সো-চুয়ান (*Tso-Chuan*) যা পূর্বোক্ত চুন চিউ গ্রন্থের টীকা হিসাবে কথিত। এতে ৭২২ থেকে ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।[২] দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম হচ্ছে চান-কুও সে (*Chan Kuo-Tse*) যার অর্থ যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির নথিপত্র। এই গ্রন্থে চৌ-যুগের শেষের দিকে চীনের রাজনৈতিক সংকটের বছরগুলির কথা বলা হয়েছে।

চীন দেশের আদি কবিতা লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে। সেগুলির প্রথম সংকলন সি চিং বা সি-কিং যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই সংকলনে সেই সকল কবিতাকেই গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলিকে ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করা চলে। বেশ কিছু কবিতাকে এই উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছিল। কনফুসি পন্থীরা কবিতার বড় একটা ধার ধারতেন না।

কিন্তু 'তাও'-পন্থীরা খুবই কাব্যানুরাগী ছিলেন, কেননা 'তাও' ধর্মে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাং-যুগের অধিকাংশ কবিই ছিলেন 'তাও'-পন্থী। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তাও-হান (Tao-Han) এবং চাঙ-চিয়েন (Chang-Chien)। এঁরা উভয়েই ছিলেন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মানুষ। এঁদের রচনায় প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। তাও-হানের একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। পার্বত্য অঞ্চলে একটি ধর্মস্থান দর্শন করে তিনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন। "নির্মল আকাশে একটি পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন তার উদ্ভবই হয়েছে শূন্যে ·····সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে যেন মেঘের ফাঁকে, খাড়া পাহাড়ের উপর যেন তাঁর শীর্ষদেশ বাতাস ভেদ করছে। রাত্রি নেমেছে, বানরেরা এবং পাখিরা নিস্তব্ধ হয়েছে। ঘণ্টার ধ্বনি আর সাধুদের স্তোত্রপাঠের শব্দ শীতল মেঘের স্তর ভেদ করে যাচ্ছে। আমি দেখছি নীল শিখরগুলির দিকে এবং চাঁদের দিকে যার প্রতিফলন ঘটেছে হ্রদের জলে। আমি ঝর্নার কলতান শুনছি এবং বাতাসের শব্দ যখন তা গাছের পাতাগুলির উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। যা দৃশ্যমান তাকে অতিক্রম করে আমার হৃদয় একই সঙ্গে ভ্রাম্যমান এবং বন্দী, এক আশ্চর্য অবস্থিতিতে। এভাবে প্রভাতও আমাকে চমকিত করবে। শীঘ্রই সব কিছুর চেহারা বদলে যাবে। ইতিমধ্যেই অন্ধকার পূর্বদিকের বিশাল পর্বতমালার অন্তরালে বিগলিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হ্রদের জলে নূতন ধরনের আলো জ্বলে উঠেছে, যা প্রভাতের বার্তাবহ। ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে চন্দ্রের পাণ্ডুর রশ্মিগুলির ঔজ্জ্বল্য কমে যাচ্ছে···।" এঁরা দুজন ছাড়া বৌদ্ধ কবি ওয়াং উইর (৬৯৯-৭৫৮ খ্রীঃ) কথাও উল্লেখযোগ্য। তাঁরও কবিপ্রকৃতি ছিল রোমান্টিক। পক্ষান্তরে ভিন্ন মেজাজের কবি ছিলেন লি-পো বা লি-তাই-পো (৭০৫-৭৬২ খ্রীঃ) যাঁর রচনায় একটি করুণ বিষাদের ছায়া সর্বদা বিরাজমান। তাং-যুগের অপরাপর কবিদের মধ্যে তু-ফু (৭১২-৭৭০ খ্রীঃ) এবং পো-চিন-ই (৭৭২-৮৪৬ খ্রীঃ) বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

চীনা নাটকের উদ্ভব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। চীনতত্ত্বে বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার বল লিখেছেন যে চীনা নাটকের সবটাই বহিরাগত এবং তা গড়ে উঠেছে গ্রীক নাটকের প্রভাবে। চীনা নাটকের বিবর্তনকে তিনটি বিশেষ যুগে ভাগ করা যায়—তাং-বংশের যুগ, সুং-বংশের যুগ, এবং য়ুয়ান-

বংশের যুগ। তাং-বংশের যুগের কোন নাটক এখন পাওয়া যায় না। তবে কথিত আছে যে এই যুগে রচিত নাটকসমূহের বেশির ভাগই ছিল ঐতিহাসিক। সুং-বংশের যুগে সকল নাটকই ছন্দে রচিত হত, এবং কোন নাটকেই পাঁচজনের বেশি অভিনেতা থাকত না। প্রকৃতপক্ষে য়ুয়ান-বংশের যুগই (১১২৬-১৩৬৭ খ্রীঃ) চীনা নাটকের স্বর্ণযুগ। চৈনিক সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গাইলসের মতে এই যুগে রচিত নাটকাবলী প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সকল চাহিদাকেই পূরণ করে। এ যুগের মোট ৮৫ জন নাট্যকারের নাম পাওয়া গেছে, যাঁদের মধ্যে আবার চারজন মহিলা। প্রাপ্ত নাটকের সংখ্যা ৫৬১টি। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল বহু ও বিচিত্র। ট্র্যাজেডি ও কমেডির কোন নির্দিষ্ট ধারা ছিল না। নাটকে সবরকমের চরিত্রই থাকত এবং সংলাপের ভাষা হিসাবে চলিত ভাষাই ব্যবহৃত হত। নাটকগুলি সচরাচর চারটি অথবা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত থাকত। প্রতিটি নাটকেই কোন না-কোন নৈতিক বক্তব্য থাকত। নাটকের প্লটে বিশেষ কোন জটিলতা থাকত না। য়ুয়ান-যুগে রচিত নাটকাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পি-পা-কি বা বাঁশীর গল্প। নাটকটিতে মোট ২৪টি দৃশ্য আছে। পণ্ডিতদের মতে এই বিয়োগান্ত নাটকটি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সঙ্গে একাসনে স্থান পাবার যোগ্য। তবে চীন দেশে ঐতিহাসিক নাটকের চাহিদা ছিল বেশি। য়ুয়ান-যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের নাম হানের দুঃখ। চীনা মঞ্চ ছিল খুবই সরল ধরনের, কয়েকটি রং করা মাদুর দিয়েই দৃশ্যপট রচনা করা হত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা খুব জমকালো ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন। বেশির ভাগ থিয়েটারই ছিল ভ্রাম্যমান, তবে শহরসমূহে সর্বকালের ব্যবহারের উপযোগী মঞ্চ ছিল। তিনদিনের কমে কোন নাটক শেষ হত না। তার অর্থ এই নয় যে নাটকগুলি খুব দীর্ঘ, আসলে নাটকের এক একটি অংশ এক-এক দিনে দেখানো হত, এবং এটাই ছিল চীন দেশের প্রচলিত রীতি।

১২॥ জাপান : কোজিকি ও নিহোঙ্গী

চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল কোরিয়ার মধ্য দিয়ে। কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে। কোরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পেক্‌চে অঞ্চলটি ছিল সেখানকার বৌদ্ধধর্মের প্রধান

কেন্দ্র। পেক্‌চের রাজা সুঙ-ওয়াঙ ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান যাঁরা সেখানে একটি বুদ্ধমূর্তি এবং কিছু বৌদ্ধ পুঁথি নিয়ে যান এবং সম্রাট কিম্মেইকে সেগুলি উপহার দেন। বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে জাপানী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। প্রভাবশালী সোগা পরিবার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু মোনোনোবে এবং নাকাতোমি পরিবারদ্বয় বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত ৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম জাপানে স্বীকৃত হয়। ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিখ্যাত হোরিয়ুজি মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে অজস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ রক্ষিত আছে। অধিকাংশই চীনাভাষায়। দীর্ঘকাল কোরিয়া এবং জাপান সাংস্কৃতিক দিক্ থেকে চীনের প্রভাবাধীন ছিল। এমনকি মধ্যযুগ পর্যন্ত জাপানী শাসক ও অভিজাত শ্রেণী চীনাভাষায় কথাবার্তা বলতেন এবং লেখালেখির কাজ করতেন। জাপানী ভাষা ও সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে চীনা প্রভাবে গড়ে উঠেছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের আগে জাপানে কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মমতের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দুধর্মের মতই অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় কিছু দেবদেবীর পূজা ইত্যাদি বর্তমান ছিল, কিন্তু তা কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মমতের আকারে দেখা দেয়নি। জাপানের পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, দেবদেবী, ইত্যাদি পরবর্তী কালে শিণ্টো নামে পরিচিত হয়। শিন্ শব্দটি চৈনিক শেন থেকে এসেছে যার অর্থ 'দেবতাগণ', টো শব্দটি এসেছে চৈনিক 'তাও' থেকে যার অর্থ পথ। কাজেই শিণ্টো শব্দটির অর্থ দেবতাদের পথ। শিণ্টো নামটি চীনা। এর জাপানী প্রতিশব্দ কামি-নো-মিচি। শিণ্টোর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় নিহোঙ্গী গ্রন্থে যেখানে বলা হয়েছে রাজা ইয়োমেই তেন্নো (৫৮৬ খ্রী:) 'বুদ্ধের পথে' বিশ্বাস করতেন এবং 'দেবতাদের পথে' শ্রদ্ধা করতেন। এ থেকে বোঝা যায় যে শিণ্টো বলতে কোন বিশেষ ধর্মব্যবস্থা বোঝায় না। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হবার পর পুরাতন যুগের ধর্মীয় ধরনের যা কিছু বর্তমান ছিল সেগুলিকে বোঝাবার জন্য শিণ্টো কথাটির ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

জাপানে প্রত্নাশ্মীয় যুগের কোন সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তবে নবাশ্মীয় যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নবাশ্মীয় সংস্কৃতির ধারকেরা বাইরে থেকে জাপানে এসেছিল। হক্কাইডো দ্বীপে বর্তমানে যে আইনু ট্রাইব বাস করে তারাই সম্ভবত ওই আদি নবাশ্মীয় সংস্কৃতির অধিকারীদের

বংশধর। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে অপরাপর মানবগোষ্ঠী জাপানে আসতে শুরু করে কোরিয়ার মধ্য দিয়ে। কালক্রমে এরাই আইনুদের হটিয়ে গোটা জাপান দখল করে নেয় এবং সেখানে একটি মিশ্র সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই বহিরাগতদের বাস্তব সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে জানা গেলেও জাপানের আদি ইতিহাস সাহিত্যগত প্রমাণের উপর আজও নির্ভরশীল। সাহিত্যগত প্রমাণ বলতে আমাদের হাতে যা আছে তা হচ্ছে কিংবদন্তীর দুটি সংকলন। একটির নাম কোজিকি, অপরটির নাম নিহোঙ্গী। কোজিকি শব্দের অর্থ 'পুরাতন বিষয়সমূহের নথিপত্র', নিহোঙ্গী শব্দটির অর্থ 'জাপানের বিবরণীসমূহ'। গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে ৭১২ ও ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়েছিল।

কোজিকির ভূমিকায় বলা হয়েছে যে রাজা তেম্মু (৬৭৩-৬৮৬ খ্রী:) প্রচলিত সরকারী নথিপত্রসমূহের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা দর্শনে নিম্নোক্ত আদেশ দিয়েছিলেন: "আমি শুনেছি যে সম্রাটদের বিবরণীসমূহ এবং বাক্যাবলী যা বিভিন্ন পরিবারের অধিকারে রক্ষিত আছে, মূলত সত্যবর্জিত এবং অর্থহীন মিথ্যার দ্বারা অহেতুক স্ফীত। এই সকল অসম্পূর্ণতা যদি এখনই দূর করা না যায় তাহলে পরবর্তী কালে, বহু বছর অতিক্রান্ত হবার পর, এর মূল উদ্দেশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে, রাজতন্ত্রের মহৎ ভিত্তি সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ থাকবে। এই কারণেই আমার ইচ্ছা যে সম্রাটদের রক্ষিত বিবরণীসমূহ পুন: পরীক্ষা করার দরকার এবং সেগুলির অন্তর্গত মিথ্যা অংশসমূহ বর্জন করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন " আরও বলা হয়েছে যে এই কাজ করার জন্য হিয়েদা-নো-আর নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় যিনি ছিলেন শ্রুতিধর। তাঁকে দিয়ে পুরাতন যুগের বংশাবলীসমূহ মুখস্থ করানো হয়। ইতিমধ্যে রাজা তেম্মু মারা যান এবং সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী কালে সম্রাজ্ঞী জেম্মাইও (৭০৮-৭২১ খ্রী:) এই বিষয়ে আগ্রহী হন এবং তাঁর নির্দেশে যাশুমারো নামক একজন রাজকর্মচারী হিয়েদা-নো-আর কর্তৃক মুখস্থ করা বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করেন।

পাঁচমাসের কিছু বেশি সময় কাজ করে যাশুমারো তিন খণ্ডে রচিত কোজিকি সম্রাজ্ঞীর হাতে অর্পণ করেন। এতে জগৎসৃষ্টির সময় থেকে সম্রাজ্ঞী সুইকোর (৫৯৩-৮২৮ খ্রী:) সময় পর্যন্ত বিবরণী রক্ষিত আছে। ভূমিকায় যাশুমারো লিখেছেন, "যা কিছু এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার

সূত্রপাত আকাশ ও পৃথিবীর বিচ্ছেদের ঘটনা থেকে এবং শেষ ওহারিদার পুণ্য প্রাসাদে। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু দেবতা স্বর্গের-পবিত্র-কেন্দ্রের-প্রভু থেকে মহৎ রাজকুমার তরঙ্গ-সীমা পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু স্বর্গীয় সম্রাট কামু-যামাতো-ইহারে-বিকো থেকে রাজা হোমুদার পুণ্য শাসন পর্যন্ত। সম্রাট ওকো-সাজাকির কাল থেকে ওহারিদা প্রাসাদের ঘটনা পর্যন্ত তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোজিকির সূত্রপাত সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে। বলা হয়েছে যে সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেন দেবতা আমে-নো-মি-নাকা-মুসি-নো কামি বা স্বর্গের পুণ্যকেন্দ্রস্থ প্রভু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেবতা, যাঁরা তার কিছু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, হচ্ছেন পুণ্যসৃষ্টির কারক দেবতা এবং দিব্যভাব সৃষ্টির কারক দেবতা। এঁদের সকলেরই উদ্ভবের স্থান স্বর্গ, যা বলতে বোঝায় আকাশ অথবা কোন পৌরাণিক স্থান। আবির্ভূত হবার পর এঁরা নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রেখেছিলেন। প্রথমজন কখনও এবং কোন অবস্থাতেই নিজেকে প্রকাশ করেন না। এরপর অপরাপর দেবতারা জন্মগ্রহণ করলেন। পৃথিবীরও সৃষ্টি হল। নূতন দেবতাদের মধ্যে দুজন আদি, নাম জ্যেষ্ঠদেবতা এবং চিরদণ্ডায়মান দেবতা, যাঁদের পরে জন্মালেন পৃথিবীদেবতা, ভয়ংকরী দেবী, দেবতা-যিনি-আমন্ত্রণ-জানান, দেবী-যিনি-আমন্ত্রণ-জানান, ইত্যাদি। শেষোক্ত দুজন সুনির্দিষ্ট জাপানী নাম পেয়েছেন—ইজানাগিনোকামি এবং ইজানামিনোকামি, সংক্ষেপে ইজানাগি ও ইজানামি। বাকি সকলে নিছক গুণাবলীর দ্বারা পরিচিত, সুনির্দিষ্ট নামহীন, যা আমরা আগে দেখেছি।

এরপর কোজিকিতে বলা হয়েছে কিভাবে দেবতা ইজানাগি ও দেবী ইজানামির মাধ্যমে জাপান দ্বীপপুঞ্জের এবং মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হল। সমস্ত দেবতারা এই দুজনকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা সমুদ্র তোলপাড় করে ভূমি-সমূহকে একজায়গায় কেন্দ্রীভূত করেন। ওই কর্ম সমাধা হবার পর ইজানাগির পরিচ্ছদ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন এক দেবী যাঁর নাম আমাতেরাসু। ইজানাগি তাঁকে নিজ রত্নসমূহ দিয়ে অভিষিক্ত করলেন যার ফলে আমাতেরাসু হলেন সূর্যদেবী। এর কিছু পরে আমাতেরাসুর ভাই তাকে-হায়া-সুসা নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করতে শুরু করল, যার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাতে-রাসু স্বর্গের গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন এবং বিশ্বচরাচর অন্ধকারে নিমগ্ন হল।

অতঃপর আটশো দেবতা বহু কৌশলে তাঁর মানভঞ্জন করে তাঁকে আবার বাইরে নিয়ে এলেন। আমাতেরাসুর কুবুদ্ধিযুক্ত ভাই স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হল এবং ইজুমো নামক স্থানে সে অবতীর্ণ হল। এখানে আটমুখো একটি মহাসর্প সকলের ভীতি উৎপাদন করত। তাকে নিহত করে আমাতেরাসুর ভাই ওই দ্বীপে পাকাপাকি বসতি স্থাপন করল।

এদিকে জাপানের দ্বীপসমূহে অসংখ্য পার্থিব দেবতা ঝগড়া-বিবাদে মত্ত হওয়ায় সূর্যদেবী আমাতেরাসু তাদের দমন করার জন্য নিজ পুত্র মাসাকা-আকাৎসুকে প্রেরণ করলেন যিনি অনেক কৌশলে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন এবং নিজ পুত্রকে সেখানকার শাসক করে পাঠালেন। তাঁর বংশধরগণ হলেন জাপানের শাসককুল। কোজিকির দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হচ্ছে ওই দেববংশের দুই ভাই কামু-ইয়ামাতো এবং ইকস্থ-সে-নো-মিকোতোর রাজত্বকাল দিয়ে। তাঁরা পূর্বদিকে সামরিক অভিযান করেছিলেন, কিউস্থ থেকে হোনস্থ অভিমুখে। কামু-ইয়ামাতো প্রথম জাপানের সার্বভৌম সম্রাট। যদিও কোজিকির বিবরণসমূহ পুরোদস্তুর কাল্পনিক, তথাপি শেষের দিকে তা অনেকটা বাস্তবানুগ। দেবতাদের উদ্ভব এবং রাজবৃত্ত ছাড়াও কোজিকিতে আরও অনেক আকর্ষণীয় বিষয় আছে, যেগুলির কথা আমরা একটু পরে উল্লেখ করব।[১]

নিহোঙ্গী জাপানের দ্বিতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোজিকির অনুরূপ হলেও তা অনেক বেশি বাস্তবানুগ। এখানে রাজবংশাবলী বর্ণিত হয়েছে অনেকটা বিচক্ষণতা সহকারে। কোজিকির মত নিহোঙ্গীতে কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। লেখক সম্পর্কেও কোন কথা বলা নেই। নিহোঙ্গীর উপর অনেক ভাষ্য রচনা করা হয়েছে, এবং সেগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্যক্তিগত টীকা হিসাবে ত্রয়োদশ শতকের সংকলনগ্রন্থ সাকু-নিহোঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। এই সকল টীকার মধ্যে একটির নাম কোনিন সিকি যাতে বলা হয়েছে যে নিহোঙ্গী রাজকুমার তোনেরি এবং পূর্বোক্ত যাসুমারো কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল এবং তা রাণী জেম্মাইওর কাছে অর্পিত

১। কোজিকির ইংরাজী অনুবাদ: Basil H. Chamberlain, *Ko-ji-ki or Records of Ancient Matters* (Transactions of the Asiatic Society of Japan, Supplement to Vol. X, 1882)। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে W. G. Aston উক্ত অনুবাদের একটি উন্নততর সংস্করণ প্রকাশ করেন পর্যাপ্ত টীকাটিপ্পনীসহ।

হয়েছিল ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে। নিহোঙ্গী গ্রন্থে কোজিকির কোন উল্লেখ নেই। নিহোঙ্গী তিরিশ খণ্ডে বিভক্ত, তা ছাড়া এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত একটি পৃথক্‌ বংশাবলীও বর্তমান ছিল, যা অবশ্য আর টিঁকে নেই। আয়তনের দিক্‌ থেকে নিহোঙ্গী কোজিকির দ্বিগুণ। এতে ৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক অংশে অবশ্য কোজিকির সঙ্গে বহু জায়গায় বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। নিহোঙ্গীতে জাপানী রাজবংশের একটি পূর্ণাঙ্গ কালানুক্রম দেওয়া আছে যা শুরু করা হয়েছে সম্রাট জিম্মু-তেন্নোর রাজত্বকাল থেকে যার তারিখ ফেলা হয়েছে ৬৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তবে নিহোঙ্গীতে অনুসৃত কালানুক্রম বহুলাংশে কাল্পনিক, যে কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।[১]

কোজিকি এবং নিহোঙ্গী গ্রন্থদ্বয়ে অপরাপর কিছু কিছু বিষয়েরও উল্লেখ আছে। যেমন নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে কোজিকিতে বলা হয়েছে যে যখন সূর্যদেবী আমাতেরাসু তাঁর ভাই-এর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতগুহায় আত্মগোপন করেন, তখন তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য অমংসু-উজুমে নামক একজন যুবক দেবতা একটি নাটুকে দল গঠন করেন, এবং সূর্যদেবী যে গুহায় লুকিয়েছিলেন তার সামনে নাটকের অভিনয় শুরু করে দেন। দেবী তখন কৌতূহলী হয়ে গুহার বাইরে আসেন, ফলে আবার সূর্যের আলো পৃথিবীতে দেখা যায়। যে নাটকটি সেখানে অভিনীত হয়েছিল তার নাম আমেনো ইওয়াদো নো কাগুরে। নিহোঙ্গী গ্রন্থে তামাই নামক একজাতীয় গ্রাম্য নাটকের উল্লেখ আছে, যেগুলির বিষয়বস্তু শস্যসংক্রান্ত দেবদেবীর কাহিনী এবং যেগুলির অভিনয় হত ফসল কাটার সময়ে। ফুদোকি নামক সংকলনে পাঁচশোর অধিক লোকসঙ্গীত আছে যেগুলির সঙ্গে উক্ত গ্রাম্য নাটকগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ প্রভাবে একটি বিশেষ ধরনের নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয় যা 'নো' নামে পরিচিত। এজাতীয় নাটকের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এগুলিকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়—উচি এবং সোটো। প্রথমোক্ত ধরনটিই বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বিষয়বস্তু অনুযায়ী নো নাটকগুলিকে চারভাগে ভাগ করা

১। ইংরাজী অনুবাদ: W. G. Aston, *Nihongi, Chronicles of Japan from the Earliest Times to A. D. 697. Translated from the Original Chinese and Japanese* (Transactions and Proceedings of the Japan Society, London, Supplement I), 2 vols. 1896.

হয়েছে : (১) কামিনো বা শিনজিনো, দেবতাদের কীর্তিকলাপ অবলম্বনে যেগুলি রচিত হত ; (২) সুগেন নো বা সদিচ্ছার নাটক, সৎ এবং অসতের সংগ্রামের কাহিনী এবং পরিণামে সৎ-এর জয়লাভ যেগুলির বিষয়বস্তু ছিল ; (৩) ইউরেইনো বা সেইরেইনো, যেগুলির চরিত্র হত সাধারণত ভূত-প্রেত অপদেবতারা ; এবং (৪) গেনজাইনো বা সমস্যামূলক নাটক। নো-নাটকের পাশাপাশি বৌদ্ধ-প্রভাবিত আরও এক ধরনের নাটক প্রচলিত ছিল যেগুলি ছিল প্রহসনধর্মী। একই মঞ্চে উভয় নাটকেরই অভিনয় হত, তবে নো-অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করতেন।

প্রথম জাপানী গদ্য গ্রন্থ নরিটোর বিষয়বস্তু শিন্টোধর্ম-অনুমোদিত প্রার্থনা-সমূহ। মূল গ্রন্থটি অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে ওই গ্রন্থের অনেকটা অংশই পরবর্তী কালে ৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঙ্গিসিকি নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রাচীন জাপানী গদ্যসাহিত্যের দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে সেম্মো যার বিষয়বস্তু অষ্টম শতকের সম্রাটদের অনুশাসনাবলী। জাপানী গদ্যসাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল জার্নাল বা ডায়েরী রচনা। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা এই রকম ডায়েরী রাখতেন। একজন অভিজাত মহিলার রচিত প্রকৃতই বিশেষ সাহিত্যগুণসম্পন্ন এই রকম একটি ডায়েরীর নাম কাগেরো-নিক্কি, রচনাকাল ৯৭৪ ৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। অপরাপর ডায়েরী-লেখিকাদের মধ্যে ইজুমি সিকিবু এবং মারাসাকি সিকিবুর নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এই ডায়েরী-সাহিত্যের সবাপেক্ষা বিস্ময়কর ও মনোগ্রাহী নিদর্শন হচ্ছে সেই-সোনাগন রচিত মকাউরা-নো-সিসি, রচনাকাল ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম বিখ্যাত জাপানী উপন্যাসের নাম গেঞ্জি মনোগাতারি (১০১০ খ্রীঃ), লেখিকা মারাসাকি সিকিবু, যা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম। লিখিত আকারে প্রাচীন জাপানী কবিতার সংখ্যা খুবই কম। প্রাচীনতম জাপানী কাব্যগ্রন্থের নাম মান্যোসু। এটি আসলে ৪৫০ জন কবির ৪৫০০টি কবিতার সংকলন। এই সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়েছিল ৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। যাঁদের কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে কাকিনামোতো-নো-হিতোমারো (৬৫৫ ৭১০ খ্রীঃ), ইয়ামবে-নো-আকাহিতো (মৃত্যু ৭৩০ খ্রীঃ), ওতোমো-নো-তাবিতি (৬৫৫-৭৩১ খ্রীঃ), ডামানোই-নো-ওকুরা (৬৫৯-৭৩৩ খ্রীঃ), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনা ছিল লিরিকধর্মী, এবং এঁরা প্রত্যেকেই ওয়াকো নামক ছন্দ ব্যবহার করতেন। পরবর্তী সহস্র বছরে এই একই ছন্দ জাপানী

কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। পরে অবশ্য তঙ্কা এবং চোকা নামক দুটি ছন্দের প্রচলন হয়। দশম শতকে আরও একটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়, নাম কোকিলসু। যাঁরা এই সংকলনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন কি-নো-ৎসুরাই, চি-নো-মিৎসুনে, মিবুলো-তাদামিনে এবং কি-নো-তোমোনারি। স্বয়ং সম্রাটের আদেশে এই কবিতাবলীর সংকলন হয়েছিল।[১]

১। মান্যোসুর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তারও পূর্বে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে কোকিলসুর অনুবাদ। গেঞ্জি মনোগাতারির ইংরাজী অনুবাদ করেন আর্থার ওয়ালি, ছয় খণ্ডে। নো-নাটকগুলির নামের একটি প্রামাণ্য তালিকা প্রকাশিত করেছেন পেরি, দূরপ্রাচ্য-সংক্রান্ত ফরাসী চর্চাকেন্দ্রের বুলেটিনের নবম খণ্ডে। এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য E. O. Reischauer and J. K. Yamagiwa, *Translations from Early Japanese Literature*, ১৯৫১

ঈরাণ, পশ্চিম এশিয়া ও মিশর

১॥ বৈদিক ভাষা ও আদি ঈরাণীয় ভাষা

ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের আগে ও পরে, ভারতবর্ষের কতিপয় মানবগোষ্ঠী, যাদের পরিচয় পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে, যে ভাষায় কথা বলত, তার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী দেশ ঈরাণের কতিপয় মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষার সাদৃশ্য এত বেশি, যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই দুই দেশের দুটি বিশেষ ভাষা একই ভাষা-পরিবারের দুই সন্তান। এমন কি আরও পরবর্তী কালের ঈরাণীয় ভাষা—যেমন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন ঈরাণীয় লেখমালার ভাষা—বৈদিক ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্যযুক্ত। এখানে আমরা সম্রাট জারেকসেসের (খ্‌ষয়র্ষ) একটি অনুশাসনের মূল ভাষা এবং তার সংস্কৃত প্রতিরূপ (ডঃ সুকুমার সেন কৃত) উদ্ধৃত করছি: তুবম্ (ত্বম্) কা-হ্য (কঃ-স্য) অপর (অপরঃ) যদি মনিয়াহইয় (যদি মন্যাসে) শিয়াত অহনি (চ্যাতঃ অসানি) জীব উতা মৃত (জীবঃ উত মৃতঃ) ঋতবা অহনি (ঋতবা অসানি) অবনা দাতা (অনেন হিতা) পরীদিয়্ ত্য (পরীহি ত্যৎ) অহুর মজদা (অসুর মেধাঃ) নিয়শ্ তায় (স্তুস্থাপয়ৎ) অহুর মজদাম্ (অসুর মেধাম্) যদইশা (যজেঃ) ঋতা চা (ঋতা চ) ব্রজ্ মনিয়্ (ব্রহ্মাণি)। অথবা দারায়ুসের বেহিস্তান লিপি: অদম্ দারয়বোষ (অহং ধারয়দ্বসু) খ্ষায়থিয় খ্ষায়থিয়ানাম্ (ক্ষয়থ ক্ষায়থানাম, সংস্কৃতে অবশ্য ক্ষয়থ বলে কোন শব্দ নেই, কিন্তু এখানে ষষ্ঠীর বহুবচনে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মই অনুসৃত হয়েছে, শব্দটির অর্থ 'রাজা রাজাদের') অর্ষমহ্য নপা (ঋষামস্য নপ্তা) বিষতসপহ্য পুস্স (বিস্তম্পস্য পুত্রঃ) হখামনীসীয় (শাখামনীদঃ)।[১]

ভাষার এই বিস্ময়কর সাদৃশ্য অনেক কিছুই প্রমাণ করে। প্রাচীন ঈরাণীয়-গণ তাদের প্রধান দেবতা বরুণকে অসুর আখ্যায় ভূষিত করেছিল, যিনি ছিলেন

১। দ্রঃ S. Sen, *Old Persian Inscriptions*, pp. 2-6, 92-98, 114 ff.; Herzfeld *Archaeologische Mitteilungen aus Iran*, VIII, pp. 56-77; King and Thompson, *The Inscription of Darius the Great at Behistun* (1907); H. C. Tolman, *Ancient Persian Lexicon and Texts*, pp. 1 ff., 44 ff.; D. C. Sircar, *Select Inscriptions* pp. 1-14.

অসুর মেধাঃ (অহুর মজদা)। ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষের মতে সম্ভবত বৈদিক ও ঈরাণীয় ট্রাইবদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক কোন মতভেদ ঘটেছিল যে কারণে, পরস্পর জ্ঞাতি হওয়া সত্ত্বেও, তারা একে অপরের দিকে পিছন ফিরিয়ে ছিল। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম 'দৈব' হিসাবে পরিগণিত হত। দেবতাবাচক 'দেব' শব্দটি অতি প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল—সংস্কৃতে দেব, ল্যাটিনে দিউস, কেল্টিকে দেবোস, লিথুয়ানীয়ে দিবোস, স্ক্যাণ্ডিনেভীয়ে তিবর। সম্ভবত পশ্চিমে উন্নততর অসুর সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঈরাণীয়গণ অসুরান্বিত হয়েছিল যার পরিণামে প্রাচীন দৈব মতে বিশ্বাসী বৈদিকগোষ্ঠীদের সঙ্গে তাদের সংঘাত শুরু হয়েছিল। অন্তত ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও দেবাসুরের হাঁড়ি আলাদা হয়নি, কেননা ওই সময়কার বোঘাজ-কোই শিলালিপিতে দৈবদেবতা ইন্দ্র ও নাসত্য অসুরদেবতা বরুণ ও মিত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করেছিলেন।[১] কিন্তু পরবর্তী কালে ব্যাপারটা অন্তরকম ঘটেছিল। যেহেতু অসুর-কুলচূড়ামণি বরুণ বোঘাজ-কোই লিপিতে দেবরাজ ইন্দ্রের সুসঙ্গে ছিলেন, সেই হেতু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ঈরাণীয় ধর্মগুরু জরথুষ্ট্র (সংস্কৃত = জরদ্-উষ্ট্র) ইন্দ্রকে তো অপদেবতা আখ্যায় ভূষিত করে জাহান্নমে পাঠালেনই, উপরন্তু বরুণের নামটাকেই বদলে করে দিলেন অসুর (অহুর)। বিষয়টিকে সুকুমার সেন বেশ গুছিয়ে লিখেছেন : "জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করিবার পূর্বে ঈরাণীয় আর্যরা ভারতীয় আর্যদের মতই যজ্ঞপরায়ণ ও দেবোপাসক ছিল। অবেস্তার মধ্যে এই প্রাচীন ধর্মের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। জরথুষ্ট্রীয় ধর্মগ্রহণের ফলে ঈরাণীয়গণ দেববিদ্বেষী হইয়া পড়িল, এবং দেব শব্দের অর্থ দাঁড়াইল অপদেবতা। ফলে আর্যদের অনেক প্রাচীন দেবতা (যেমন, নাসত্য, ইন্দ্র ইত্যাদি) অপদেবতা হইয়া গেলেন। তবে দু'একটি দেবতা (যেমন—মিত্র, অর্যমা এবং সোম) তাঁদের আসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবেস্তায় 'দেব' শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয় সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক অনুরূপভাবে 'অসুর' শব্দের অর্থবিপর্যয় ঘটিয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে আমরা অসুর শব্দ পাইতেছি বরুণ প্রভৃতি দেবতার বিশেষণ হিসাবে। অবেস্তাতেও

১। দ্রষ্টব্য Jenson in *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften.* 1919, pp. 367 ff. ; Forrer in *Zeitschrift der Deutschen Morgenlandische Gesellschaft,* 1922, pp. 254 ff ; *Cambridge Ancient History* Vol. II, p. 13 ; *Cambridge History of India,* Vol. I. p. 72

আমরা দেখিতেছি ঈশ্বরের নাম হইয়াছে অহুর মজদা অর্থাৎ অসুর মেধা, 'মহৎ জ্ঞানস্বরূপ।' কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে 'অসুর' শব্দের অর্থ হইল 'দেববিরোধী', 'ব্রাহ্মণদ্বেষী'। সম্ভবত 'দেব' ও 'অসুর' শব্দের এই অর্থ-বিপর্যয়ের মধ্যে ঈরাণীয় ও ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ধর্মবিরোধের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে।"[১]

২॥ অসুর-সভ্যতা

যদিও ভারতীয় সাহিত্যে অসুর বলতে বৈদিক সংস্কৃতি বিরোধী যে কোন জাতিকেই বোঝায়, পুরাণসমূহে যাদের ভয়াবহ অমানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতর অংশে আমরা তাদের ভিন্ন চিত্র পাই।[২] বাস্তবিকই অসুর নামে সুপ্রাচীনকালে একটি দেশ ও সভ্যতা ছিল, যাদের নামানুসারে বর্তমান মেসোপটেমিয়া অঞ্চলটি, অর্থাৎ ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদী অঞ্চল, আসিরিয়া নামে পরিচিত হয়েছিল। আমরা পরে দেখব এই অঞ্চলে পর পর কয়েকটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল—সুমেরে, ব্যাবিলনে এবং আসিরিয়ায় যেগুলি সামগ্রিকভাবে অসুর সভ্যতা নামে পরিচিত। পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য গিলগামেশ এই সভ্যতারই সৃষ্টি যা উৎকীর্ণ করা হয়েছিল মাটির টালির উপর বাণমুখো লিপিতে। ভারতীয় বৈদিক মানুষের কাছে অসুর বলতে শুধু আদি ঈরাণীয় বা মেসোপটেমীয়দেরই বোঝায় না, আরও পশ্চিমের মিশরীয় সভ্যতাও তাদের কাছে অসুর সভ্যতা হিসাবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ তাদের কাছে পশ্চিমের যাবতীয় দেশ, যেগুলি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, সবই ছিল অসুর।

ছান্দোগ্য উপনিষদের (৮।৭-৮) প্রজাপতি ও ইন্দ্রবিরোচনের আখ্যান থেকে উপরি-উক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অসুররাজ বিরোচন এবং দেবরাজ ইন্দ্র উভয়েই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়ে প্রজাপতির নিকট শিক্ষালাভ করতে গিয়েছিলেন। কাহিনী অনুযায়ী, বিরোচন প্রজাপতির শিক্ষার ভুল অর্থ করেন, এবং দেহই যে ব্রহ্ম এই রকম ধারণা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান এবং

১। ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৬৩।

২। অসুর নামক একটি ট্রাইব আজও মধ্যভারতে ও বিহারে বর্তমান, যদিও তাদের সঙ্গে প্রাচীন অসুর সভ্যতার সম্পর্কের বিষয়ে কিছু বলা যায় না।

সকলের কাছে সেইরকমই ব্যাখ্যা করেন। এরপর ওই উপনিষদেই মন্তব্য করা হয়েছে যে ওই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে, অর্থাৎ দেহই যে ব্রহ্ম এই ধারণায় বিশ্বাস করে, অসুরেরা মৃতদেহকে দাহ বা সমাধিস্থ না করে, ঔষধ প্রয়োগে ও নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলিকে সংরক্ষিত করে রাখে। স্পষ্টতই এই মন্তব্যের দ্বারা মৃতদেহ সংরক্ষণ করে রাখা বা মমী করার মিশরীয় প্রথার ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে অসুর সভ্যতা বলতে বৈদিক মানুষেরা ইরাণ থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার নানা ধরনের সভ্যতাকে বুঝত যদিও সে সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট।

আমরা আগেই বলেছি যে ইরাণীয়গণ অসুর সভ্যতার দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত হয়েছিল যে বৈদিক মানুষদের চোখে তারা অসুর ভিন্ন আর কিছু ছিল না। কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে প্রভাবিত হবার আগে ইরাণীয় সংস্কৃতি বৈদিক ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বড় একটা পৃথক্ ছিল না, যে কথার প্রমাণস্বরূপ, ভাষার সাদৃশ্য ছাড়াও, আরও কিছু তথ্যের অবতারণা করা চলতে পারে। বৈদিক ভারতীয়রা এবং ইরাণীয়রা একটি প্রাচীনতর অগ্নিপূজার শরিক ছিল, এবং অগ্নি-উপাসনা ছাড়াও উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই সোম-উপাসনা বা সোম-যাগের প্রবর্তন ঘটেছিল। বৈদিক এবং ইরাণীয় যাগযজ্ঞের ব্যাপারটা ছিল একই রকম, এবং উভয় ক্ষেত্রেই একই পরিভাষার ব্যবহার ছিল যেমন, হওম=সোম, জওতর=হোতা, অথ্রবন= অথর্বন, মন্থ্র=মন্ত্র, যজত=যজত, যস্ন=যজ্ঞ, আজুইতি=আহুতি, ইত্যাদি। বেদ এবং অবেস্তায় একই ধরনের উপনয়ন-প্রথার অস্তিত্ব দেখা যায়, এবং উভয় ক্ষেত্রেই দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ। মিত্র (মিথ্র) এবং বরুণ (অহুর) বিশ্বচরাচরের নিয়মরক্ষক, বৈদিক ঋত ও অবেস্তীয় অশ ওই নিয়মশৃংখলার প্রতীক। বৈদিক ইন্দ্র অবেস্তাতেও বর্তমান, যদিও সেখানে তাঁর মর্যাদা-হানি করা হয়েছে। নাসত্য বেদ এবং অবেস্তা উভয় স্থানেই বর্তমান। অপাং নপাতের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। বৈদিক গন্ধর্ব, অবেস্তার গন্দরেওয়া, বৈদিক কৃশানু অবেস্তার কৃশনি, বৈদিক যম অবেস্তার যিম। উদাহরণ অনায়াসেই আরও বাড়ানো যায়।

ইরাণীয় ধর্মসংস্কারক জরথুস্ত্র আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ইরাণীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির এই প্রাচীন দিক্‌গুলিকে, যেগুলি বৈদিক ভারতীয়দের সঙ্গে প্রায়

অভিন্ন দিক্‌গুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে, এবং তার জায়গায় পশ্চিমী অসুর ভাবধারার ব্যাপক প্রচলন করতে, এবং তিনি বহুলাংশে সাফল্য লাভও করেছিলেন। তথাপি প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির অবশেষসমূহকে লোপ করা একেবারে সম্ভবপর হয়নি। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের সম্রাট জারেকসেসের একটি লেখমালা থেকে জানা যায় যে আইন করে প্রাচীন দৈব ধ্যানধারণাসমূহকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও বহুসংখ্যক দৈব উপাসক ঈরানে বর্তমান ছিল। ভারতীয় সাহিত্যে অসুরদের মুণ্ডপাত করা হলেও অসুর সভ্যতার কিছু কিছু অনুগামী এখানেও ছিল যাদের দৈহিকভাবে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। অধ্যাপক বেনভেনিস্তে দেখিয়েছেন যে এমনকি আকিমিনীয় যুগেও ঈরানীয় ধর্ম, যার বর্ণনা গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস করেছেন, বৈদিক ধর্মের সঙ্গেই অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত ছিল।[১]

৩॥ অসুর সাহিত্য

প্রাচীন ঈরানীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঠিক অবস্থান বুঝতে গেলে, পশ্চিমের অসুর সভ্যতার অন্তর্গত দেশগুলির ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। শুধু ঈরানীয় সাহিত্যই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেরও একটা সঠিক বোঝাপড়ার পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক। ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস অববাহিকায় সুপ্রাচীনকালে যথাক্রমে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই তিনটি সভ্যতার মধ্যে সুমেরীয় সভ্যতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং পরবর্তী দুটি সভ্যতা নিজেদের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির মূল উৎস যে সুমেরীয় সভ্যতা সেকথা অস্বীকার করা যায় না। ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার ভাষা সুমেরের ভাষার থেকে পৃথক্, কিন্তু লিপির ক্ষেত্রে এই তিনের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য নেই। আনুমানিক দুই সহস্র খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট হামুরাবির সমগ্র মেসোপটেমীয় ভূখণ্ড অধিকার করে নেবার পর থেকেই সুমেরীয় সভ্যতা ব্যাবিলনীয় এবং পরবর্তী কালে আসিরীয় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়, তথাপি আজ আমরা যে চোখে সংস্কৃতকে দেখি, রোমান ক্যাথলিক গীর্জা যে চোখে ল্যাটিনকে দেখে, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় পণ্ডিত ও পুরোহিতবর্গ ঠিক সেইভাবেই সুমেরীয় ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন, বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে।

১। *The Persian Religion*, Paris 1929. pp. 32 ff.

অসুর সাহিত্যের আদি পর্যায়সমূহের জন্য আমাদের প্রত্নতত্ত্ব-নির্ভর না হয়ে উপায় নেই। আকিমিনীয় রাজগণের (ইরানীয় রাজবংশ) কিছু লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি দুই ভাষায় রচিত। এই লেখমালাগুলিই প্রাচীন মেসোপটেমীয় অঞ্চলের ভাষাসমূহের পাঠোদ্ধারের সূত্র জুগিয়েছে। ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় পুরোহিতবর্গ রচিত হাজার হাজার টালি-লিপি পাওয়া গেছে। কাঁচা মাটি দিয়ে টালি প্রস্তুত করে সেগুলির উপর লেখা হত এবং পরে পুড়িয়ে নেওয়া হত, এই কারণেই বলা হয় টালি-লিপি। এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজরাজড়াদের ইতিবৃত্ত। এক একটি টালিতে নেহাৎ কম লেখা আঁটত না। ৭১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের একটি টালি-লিপির মোট রচনার পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে তা লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় পাঁচ কলামের বিষয়বস্তুর সমান।

ব্যাবিলনীয় সাহিত্যের সূত্রপাত ধরা যায় সম্রাট হামুরাবির অনুশাসনাবলী থেকে। ইনি সুশাসনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং সারা দেশে একই ধরনের আইন-কানুনের প্রবর্তন করেছিলেন। একটি প্রস্তরগাত্রে সূর্যদেবতা শামাশের মূর্তির নীচে তিনি তাঁর অনুশাসনাবলী উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর তৎস্থলে আসিরীয় সাম্রাজ্যের উত্থান হয়, তারপর নব্য-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা ভাষায় যে তফাৎ তার চেয়ে বেশী নয়।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সম্রাট অসুরবানিপালের (৬৬৮-৬২৬ খ্রীঃ পূঃ) বিখ্যাত গ্রন্থাগার থেকে। এই গ্রন্থাগারটি আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী নিনেভে বর্তমান ছিল। এখানে পাওয়া গেছে অজস্র টালি-লিপি যেগুলির পাঠোদ্ধার করেছিলেন সার হেনরী রলিনসন। এই গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত টালি-লিপির সংগ্রহের নাম Kouyunjik Collection। পরবর্তী কালে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আরও নানাস্থান থেকে অজস্র টালি-লিপি সংগ্রহ করেছিলেন যেগুলির বিষয়বস্তুকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রার্থনা ও স্তোত্র, শুভাশুভ লক্ষণ, চিকিৎসা ও ঔষধ এবং জ্যোতিষ।

৪॥ গিলগামেশ মহাকাব্য

প্রাচীন অসুর সাহিত্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর নিদর্শন হচ্ছে গিলগামেশ মহাকাব্য। এই মহাকাব্য মেসোপটেমিয়ার জাতীয় সাহিত্য বা সুমেরীয়,

ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় এই তিনটি সভ্যতার প্রচ্ছদপটে গড়ে উঠেছে। যে আকারে আমরা বর্তমানে মহাকাব্যটিকে পেয়েছি সেটি হচ্ছে আসিরীয় সংস্করণ। সম্রাট অসুর বানিপালের গ্রন্থাগারে বারোটি বৃহদায়তন ট্যাবলেটে কিউনিফর্ম লিপিতে এই মহাকাব্য ক্ষোদিত রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের কয়েকটি ট্যাবলেটে সুমেরীয় ভাষায় গিলগামেশের কাহিনীর অংশবিশেষ পাওয়া গেছে যা পাঁচভাগে বিভক্ত: (১) জীবিতের রাজ্যে গিলগামেশ, (২) গিলগামেশ ও স্বর্গের বৃষ, (৩) গিলগামেশ ও কিশ-এর আগ্গা, (৪) গিলগামেশ, এন কিদু এবং প্রেতলোক এবং (৫) গিলগামেশের মৃত্যু। ৩নং ও ৫ নং বিষয়বস্তু আসিরীয় সংস্করণে অনুপস্থিত। ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত ব্যাবিলনের সিপ্পার নামক স্থান থেকে একটি ট্যাবলেটে গিলগামেশ মহাকাব্যের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। এখানে আসিরীয় সংস্করণের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দশম অংশগুলি উদ্ধৃত রয়েছে। ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত কয়েকটি বোগাজ কোই লিপিতে হিট্টাইট, আক্কাদীয় ও হুর্রীয় ভাষায় গিলগামেশ মহাকাব্যের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কবি সিন-লেগ-উন্নীনি আসিরীয় সংস্করণ অবলম্বনে নতুন করে গিলগামেশ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। সপ্তম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পুনরায় রচিত গিলগামেশ মহাকাব্যের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে উরু (ইরেখ), অসুর (আসিরিয়ার অন্যতম রাজধানী) এবং সুলতানটেপে (মেসোপটেমিয়ার হাররানের নিকট)। বাইবেলের পুরাতন অংশের কোন কোন কাহিনীর উপর এবং বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন আখ্যানের উপর (যেমন শতপথব্রাহ্মণ ও পরবর্তী রচনাসমূহে বর্ণিত বন্যাকাহিনী) গিলগামেশ মহাকাব্যের প্রভাব আছে। হোমারের অডিসি মহাকাব্যকেও গিলগামেশ প্রভাবিত করেছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। এই মহাকাব্যের নায়ক গিলগামেশ কোন কাল্পনিক চরিত্র নয়, অন্তত ওই নামের একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি ইরেখে রাজত্ব করেছিলেন।

গিলগামেশ মহাকাব্য শুরু হয়েছে একজন অর্ধমানব ও অর্ধপশুকে দিয়ে যার নাম এন্‌-কিদু বা ইয়া বানি। রামায়ণ বর্ণিত হনুমানের সঙ্গে এই এন্‌-কিদুর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সিন্ধু সভ্যতার একটি সীলে এই রকম একটি অর্ধমানব অর্ধপশুর চিত্র আছে যা ওই এন্‌-কিদুকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋগ্বেদে বৃষাকপি নামক একটি জীবের উল্লেখ আছে (১০।৮৬)। এন্‌-কিদুর সঙ্গে

সাদৃশ্যযুক্ত বানরজাতীয় এই জীবটি সম্ভবত কোন অবৈদিক ট্রাইবের উপাস্য দেবতা ছিল। পরবর্তী কালে অবৈদিক মানুষদের যে হনুমান-পূজা বৈদিক মানুষেরা গ্রহণ করেছিল তার উৎস মনে হয় ওই বৃষাকপি যে ঋগ্বেদেও নিজের একটু স্থান করে নিতে পেরেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত হনুমৎ শব্দটির উৎস দ্রবিড় অণ-মন্তি।

অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারের যে বারোটি ট্যাবলেটে গিলগামেশ মহাকাব্য উৎকীর্ণ রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে এন্-কিতুর শক্তির কাহিনী ছিল ইরেখ শহরের আতঙ্কের বস্তু, কিন্তু একজন অসমসাহসী শিকারী একটি পরমা সুন্দরী রমণীর টোপ ফেলে তাকে ইরেখ শহরে নিয়ে আসে যা ছিল মহাবীর গিলগামেশের রাজধানী। তাকে শহরে নিয়ে আসার কাহিনী রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবতা শামাশের উপদেশে এন-কিতু গিলগামেশের সঙ্গে বন্ধুভাবেই বাস করতে থাকে।

প্রথম ট্যাবলেটের লিপিগুলি এরপর থেকে কিছুটা অস্পষ্ট। আবার যেখান থেকে তা স্পষ্টতর হচ্ছে সেখানে দেখা যায় যে এলামরাজ হুম্বাবার ইরেখ আক্রমণ এন্-কিতু এবং গিলগামেশ উভয়ে মিলে প্রতিহত করছে। তারা একটি ঘন সিডার বৃক্ষের দীর্ঘ অরণ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এইখানে ট্যাবলেটের লিপিগুলি ভেঙেচুরে গেছে, তবে অনুমান করা যেতে পারে যে এই যুদ্ধে গিলগামেশ ও এন-কিতু জয়লাভ করেছিল।

এদিকে দেবী ইস্তার গিলগামেশের বীরত্ব ও দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করে বসলেন। কিন্তু গিলগামেশ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল কেননা ওই দেবী তাঁর পূর্ববর্তী প্রেমিকদের—যারা সংখ্যায় অল্প নয়—সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন। এতে কুপিতা হয়ে দেবী ইস্তার গিলগামেশকে হত্যা করার জন্য একটি ভয়াল বৃষকে প্রেরণ করলেন কিন্তু সে গিলগামেশ এবং এন্-কিতু কর্তৃক নিহত হল। তখন দেবী গিলগামেশকে অভিশাপ দিলেন যে সে রোগগ্রস্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে। এন্ কিতু দেবীকে হত্যা করবে বলে শাসাস, ফলে সে-ও অভিশপ্ত হল। এখানে থেকে আবার লিপিগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

পরবর্তী ট্যাবলেটে যে কাহিনী পাওয়া যাচ্ছে তাতে জানা যায় যে এন্-কিতু মারা গেছে, এবং রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত গিলগামেশ তার বংশের আদিপুরুষ পীর-নাপিশ্‌তিমের সন্ধানে যাত্রা করেছে, উদ্দেশ্য কোন

মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধানলাভ। সে পথ অতি দুর্গম, ভয়াবহ সিংহেরা সেখানে প্রহরারত। গিলগামেশ তখন চন্দ্রদেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল এবং তাঁরই সাহায্যে শেষ পর্যন্ত সূর্যাস্তের পাহাড় অতিক্রম করল। এখানেই পৃথিবীর সীমানা শেষ, স্বর্গের সীমানা শুরু। উভয়ের যোগসূত্র একটি সরু সুড়ঙ্গ যার মধ্যে গিলগামেশ প্রবেশ করল।

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে সে আতঙ্কে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল। বৃশ্চিকাকৃতি অথচ বিশালকায় একটি দানব ও দানবী সেই সুড়ঙ্গপথ পাহারা দিচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তারা তার ক্ষতি করেনি। সুড়ঙ্গের শেষে বারো মাইল ব্যাপী সুতীব্র অন্ধকার, এবং তারপর মৃত্যুর সমুদ্র। কোন জীবিত মানুষ সেখানে যেতে পারে না। তবু গিলগামেশ সাহসে ভর করে মৃত্যুর সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হল। এই সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন দেবী সবিতু (সবিতৃ)। গিলগামেশের অনুনয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে সাহায্য করলেন। তাঁর আদেশে আরদ-ইয়া নামক একজন নাবিক তাকে সাগরপারের সেই বাঞ্ছিত দ্বীপে পৌঁছে দিল যেখানে বাস করেন গিলগামেশের আদি পূর্বপুরুষ পীর-নাপিশ্‌তিম ও তাঁর স্ত্রী। এখানে আবার কাহিনীটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

গিলগামেশের অভিপ্রায় জেনে পীর-নাপিশ্‌তিম তাঁকে বললেন যে প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যু অবধারিত, এবং তা রোধ করার মত কোন মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধান তাঁর জানা নেই। কিন্তু তিনি তাকে জাদুশক্তিসম্পন্ন একটি গাছ দিলেন যা মানুষের লুপ্ত যৌবন ও স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারে। সেই গাছের স্পর্শে গিলগামেশের রোগমুক্তি ঘটল, রোগে কালো হয়ে যাওয়া চামড়া তার দেহ থেকে অপসৃত হল। সেই অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন গাছটি নিয়ে গিলগামেশ যাত্রা করল পৃথিবীর দিকে।

কিন্তু এ সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না। পথিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে গিলগামেশ জলপানের জন্য গাছটিকে পাশে রেখেছিল। সেই অবসরে সিংহরূপী এক দানব এসে গাছটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। গাছটিকে হারিয়ে গিলগামেশ শিশুর মত ক্রন্দন করতে লাগল। সেটিকে ফিরে পাবার জন্য সে উন্মাদের মত নানাস্থানে বিচরণ করল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

অবশেষে ক্লান্তদেহে ভগ্নহৃদয়ে গিলগামেশ ইরেখে ফিরে এল। তার নিঃসঙ্গ নিরুত্তাপ দিনগুলিতে শুধু একজনের কথাই তার বিশেষ করে মনে পড়ত। সে হচ্ছে এন্‌-কিদু। গিলগামেশ আকুলভাবে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করত

যেন এন্‌-কিডুকে তাঁরা আবার তার কাছে ফিরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত দেবতা নগন্‌ এন্‌-কিডুর আত্মাকে গিলগামেশের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

গিলগামেশের মৃত্যুভয় তখনও বিদূরিত হয়নি। এন্‌-কিডুর প্রেতাত্মাকে সে পরলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এন্‌-কিডু জানালো যে তা শুনলে গিলগামেশকে আরও দুঃখ পেতে হবে। তা সত্ত্বেও গিলগামেশ তা শুনতে চাইলে এন্‌-কিডু পরলোক সম্পর্কে বলতে রাজী হল। কিন্তু এন্‌-কিডু গিলগামেশকে কি বলেছিল তা বলা সম্ভব নয়, কেননা গিলগামেশ মহাকাব্যের অবশিষ্ট অংশটি বর্তমান নেই।[1]

৫ ॥ বন্যাকাহিনী

যে বারোটি ট্যাবলেটে গিলগামেশ মহাকাব্য উৎকীর্ণ আছে সেগুলির মধ্যে একাদশতম ট্যাবলেটটিতে বিখ্যাত বন্যাকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। পৌরাণিক যুগে জগৎ জোড়া একটি বন্যা হয়েছিল এবং সেই মহাবন্যায় খুব অল্পসংখ্যক লোকই জীবিত ছিল এইরকম কাহিনী পৃথিবীর বহুস্থানেই প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে বাইবেলোক্ত নোয়ার কাহিনী, শতপথব্রাহ্মণ বর্ণিত মনু ও মৎস্যের কাহিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বহুস্থানেই একই ধরনের বন্যাকাহিনী দেখে অনেকেই মনে করেন যে বাস্তবে কোন এক সময়ে একটি মহাবন্যা জগৎ জুড়ে হয়েছিল। তবে এ ঘটনার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

এই বন্যাকাহিনী গিলগামেশকে বলেছিলেন তাঁর বংশের আদিপুরুষ পীর-নাপিশতিম। জ্ঞানাধিপতি দেবতা ঈয়া পীর-নাপিশতিমকে এই বন্যার উদ্দেশ্য জানিয়ে তাঁকে একটি নৌকা তৈরী করে প্রাণের বীজগুলি সেখানে সঞ্চয় করার নির্দেশ দিলেন। পীর-নাপিশতিম ১২০ হাত উঁচু ছয়তলা নৌকা নির্মাণ করলেন, এবং মালপত্র সন্তানসন্ততি সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তারপর শুরু হল মহাবন্যা। দেবতা রিম্মোন শুরু করলেন বজ্রপাত। নেবো এবং মেরোডাখ সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। নিনিব ধ্বংস ছড়াতে লাগলেন।

১। গিলগামেশ মহাকাব্যের ইংরাজী অনুবাদ: R. C. Thompson, *The Epic of Gilgamesh* (১৯৩০); N. K. Sanders, *Gilgamesh* (Pelican); জার্মান অনুবাদ: **Albert Schott, *Das Gilgamesch Epos* (১৯৫৫). এ ছাড়া দ্রষ্টব্য A. Heidel, *The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels* (১৯৪৬) এবং Speiser and Pritchard, *Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament* (১৯৫৫)।**

দেবতারা ভীত হয়ে আনুর স্বর্গে আশ্রয় নিলেন। তাঁরা ঠাণ্ডায় কুকুরদের মত জড়াজড়ি করে স্বর্গের দেওয়াল ঘেঁসে শুয়েছিলেন। দেবী ইস্তার প্রসববেদনাকাতর মহিলার মত গোঙাচ্ছিলেন।

পরপর ছয়দিন ধরে অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি চলল। মরা মাছের মত অসংখ্য মৃত মানুষকে ভাসমান দেখে পীর-নাপিশ্‌তিম কাঁদতে লাগলেন। দীর্ঘকাল পরে বন্যার প্রকোপ কমলে তিনি একটি ঘুঘু পাখিকে বাইরে ছেড়ে দিলেন। সে কোন বসার স্থান না পেয়ে ফিরে এল। তারপর তিনি পাঠালেন একটি সোয়ালো পাখিকে, সে-ও ফিরে এল। অবশেষে তিনি পাঠালেন একটি বাদুড়কে, কিন্তু সে ফিরে এল না। জল কমেছে বুঝতে পেরে পীর-নাপিশ্‌তিম একটি পাহাড়ের মাথায় অবতরণ করে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র নিবেদন করলেন। দেবতারা প্রসন্ন হয়ে পীর-নাপিশ্‌তিম ও তাঁর পত্নীকে আশীর্বাদ করলেন।[১]

৬॥ সৃষ্টিকাহিনী

গিলগামেশ মহাকাব্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে সৃষ্টিকাহিনী। জলকেই সৃষ্টির মূল উপাদান হিসাবে এখানে ধরা হয়েছে। জলের শান্ত স্থির রূপের প্রতীক দেবতা অপ্সু এবং অশান্ত অস্থির রূপের প্রতীক দেবী বা দানবী টিয়ামাৎ। মূল কাহিনী অনুযায়ী দেবতা মেরোডাখ্ (বাইবেল ও কোরানের মাড়ুক) এই টিয়ামাৎ-কে পরাস্ত করে অশান্ত জলরাশিকে শান্ত করেন। এই টিয়ামাৎ কি অথর্ববেদোক্ত তৈমাত?

গ্রীক দার্শনিক থালেস জলকেই সৃষ্টির উপাদান বলেছিলেন। এইরূপ ধারণার প্রতিফলন ঋগ্বেদেও (১০।১২৯) আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পিঞ্চেস (Pinches) এই অঞ্চলের একটি সৃষ্টিকাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন যা ছিল সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় উভয় ভাষাতেই রচিত একই ট্যাবলেটের উপর। এই সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী আদিতে জল ছাড়া আর কিছুই বর্তমান ছিল না যা থেকে দেবতা ইয়া সব কিছুর সৃষ্টি করেছিলেন।

আরও পরবর্তী কালে অনুরূপভাবে মেরোডাখ্‌কে সব কিছুর স্রষ্টা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। দুরন্ত ও শান্ত জল টিয়ামাৎ ও অপ্সুকে পরিপূরক

১। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বন্যাকাহিনীর জন্য R. Andree বিরচিত *Das Flutsagen* দ্রষ্টব্য।

আদর্শে পরিণত করা হয়েছে, এবং তারা স্বামি-স্ত্রীরূপে কল্পিত হয়েছে যা থেকে জগৎ সংসারের সৃষ্টি হয়েছিল। আরও একটি কাহিনী অনুযায়ী আদিতে একা টিয়ামাং (অশান্ত জলরাশি) বর্তমান ছিল এবং তা ভেদ করে পৃথিবী গড়ে উঠেছিল পর্বতের আকারে। এই কাহিনীটি উত্তর ব্যাবিলনের নিপ্পুর (বর্তমান নিফের) অঞ্চলের। এছাড়া ছোট বড আরও কয়েকটি সৃষ্টিকাহিনীর পরিচয় বিভিন্ন টালি-লিপি থেকে পাওয়া যায়।[১]

৭ ॥ ইস্তারের অবতরণ

গিলগামেশ মহাকাব্যের মতই মাটির ট্যাবলেট বা টালির উপর রচিত আরও একটি বিখ্যাত আসিরীয় কাহিনী পাওয়া গেছে যার নাম ইস্তারের অবতরণ। এই কাহিনীর ব্যাবিলনীয় ও সুমেরীয় সংস্করণও আছে।

ইস্তার ছিলেন শস্যের দেবতা তম্মুজের প্রণয়িনী। তম্মুজ আকস্মিকভাবে অকালে নিহত হবার পর দেবী শোকে উন্মাদ হয়ে যান এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে মৃত্যুর রাজ্য থেকে তিনি তম্মুজকে পুনরায় উদ্ধার করে আনবেন। তম্মুজকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর রাজ্যে ইস্তারের অবতরণ কাহিনী রচিত হয়েছে পুরোদস্তর গিলগামেশ মহাকাব্যের অনুকরণে।

মৃত্যুর রাজ্যের দেবী আল্লাতু ছিলেন ইস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিনী যিনি ইস্তারের দুর্ভাগ্যের সুযোগ পুরোপুরি নিয়েছিলেন তাঁর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য। তাঁর নির্দেশে মৃত্যুর রাজ্যে প্রবেশের পথেই প্রথম দুয়ারে ইস্তারের মাথার মুকুট খুলে নেওয়া হল, দ্বিতীয় দুয়ারে খুলে নেওয়া হল তাঁর কর্ণভূষণ, তৃতীয় দুয়ারে গলার হার, চতুর্থ দুয়ারে অপরাপর অলংকার, পঞ্চম দুয়ারে কটিবন্ধন, ষষ্ঠ দুয়ারে হাতের অলংকার এবং সপ্তম দুয়ারে সমগ্র পরিধেয় বসন।

ক্ষোভে, দুঃখে এবং ক্রোধে উন্মত্তা হয়ে দেবী ইস্তার সম্পূর্ণ নগ্নদেহে মৃত্যুর রাজ্যে হেঁটে চললেন। আল্লাতুর পুরুষ অনুচরেরা তাঁর প্রতি অশ্লীল বাক্যসমূহ প্রয়োগ করতে লাগল। এই অবস্থায় ইস্তার আল্লাতুর সামনে হাজির হলেন।

১। L. W. King, *Seven Tablets of Creation* (1902) ; A. H. Sayce, *Religion of Ancient Egypt and Babylonia* (1902) ; H. Gunkel, *Schöpfung und Chaos* (1895) ; Pinches in *JRAS* (1891) ; N. N. Bhattacharyya, *History of Indian Cosmogonical Ideas*, New Delhi 1971, pp. 114-123.

কিন্তু ইস্তারকে এতখানি অপমানিত করেও আল্লাতু শাস্তি পেলেন না। তার কারণ ইস্তারের অনন্ত যৌবন এবং দৈহিক সম্পদ্ যা থেকে আল্লাতু ছিলেন বঞ্চিত। তিনি তখন দেবতা নামতারকে আদেশ করলেন ইস্তারের দেহকে যেন রোগজীর্ণ করে দেওয়া হয়।

এদিকে মৃত্যুর রাজ্যে ইস্তারকে চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে এই সংবাদ প্যাপ-মুকুল নামক একজন দেবদূত স্বর্গে পৌঁছে দিল। তখন দেবতারা সূর্যদেবতা থামাশের নেতৃত্বে ইস্তারকে উদ্ধার করার একটি পরিকল্পনা করলেন। তাঁরা একটি বিশালাকার সিংহ পাঠিয়ে দিলেন মৃত্যুর রাজ্যে, সে সেখান থেকে ইস্তারকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। এইখানে টালি-লিপি শেষ হয়েছে।

কিন্তু ইস্তার কি তাঁর প্রণয়ী তম্মুজকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন? এ বিষয়ে ইস্তারের অবতরণ কাব্যে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। পরবর্তী ট্যাবলেটগুলিতে অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কোন উত্তর ইতিবাচক, কোন উত্তর নেতিবাচক। সুমেরীয় কাহিনী অনুযায়ী মৃত্যুর দেবী মোটা মুক্তিপণ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তম্মুজকে পৃথিবীতে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

৮॥ তাইগ্রিস থেকে নাইল

অসুরবানিপালের গ্রন্থাগারের অজস্র টালি-লিপির মধ্যে যা কিছু সাহিত্য-মূলক সেগুলির নিদর্শন আমরা হাজির করলাম। পরবর্তীকালে সমগ্র মেসো-পটেমীয় ভূখণ্ড প্রথমে পারসিকদের, পরে গ্রীকদের এবং সবশেষে আরবদের পদানত হয়। এর ফলে সেখানকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই এই প্রাচীন অসুর সাহিত্য নানাভাবে ভারতীয়, পারসিক, হিব্রু, আরবীয় এমন কি গ্রীক সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবের গুরুত্ব আমরা অবশ্যই অপরাপর সাহিত্য আলোচনার সময় উপলব্ধি করতে পারব।

আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতীয় চেতনায় অসুর সভ্যতার এলাকা সুদূর

১। ইস্তারের অবতরণ যে ট্যাবলেটগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এগুলির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন প্রথমে ল্যাঙন এবং পরে জন স্মিথ। এই প্রসঙ্গে *Transactions of the Society of Biblical Archaeology*-র তৃতীয় খণ্ড বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একদা বলা হত যে সভ্যতার আদি উন্মেষ মিশর দেশেই হয়েছিল। কতদূর সত্য বলা যায় না, তবে একথা বলা যায় যে মিশরের অতীত ইতিহাসের প্রাচীনত্বকে অন্যান্য দেশের তুলনায় আরও বেশি করে উপলব্ধি করার মত তথ্যাবলী আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কবি হোমার তাঁর ইলিয়াড মহাকাব্যে মিশরের অন্তর্গত শতদ্বারবিশিষ্ট থিবস নগরীর প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। জেরেমিয়া ও এজেকিয়েল মিশরের সম্বন্ধে ও প্রাচীনত্বের কথা বলেছেন। বাইবেলের পুরাতন অংশের অর্ধেকই মিশরের কাহিনী। মোট তিরিশটি রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করেছে। প্রথম বংশের রাজত্বকাল খ্রীষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বেকার বলে অনুমিত হয়েছে। শেষ রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে ৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে টলেমি বংশ মিশরে রাজত্ব করতে শুরু করে, এবং রোমকগণ মিশর অধিকার করে নেয় ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। প্রাচীন গ্রীসের ক্ষেত্রে যেমন আমরা অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের পরিচয় পাই, মিশরের ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ কোন সুযোগ নেই। তা সত্ত্বেও প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যকে পণ্ডিতেরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: (১) পিরামিড রচনাবলী (Pyramid Texts), (২) মৃতের পুস্তক (Book of the Duat) বা আম দুয়াত (Am Duat) প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের সংকলন, এবং (৩) বিবিধ রচনা যা আবার কয়েকটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত: (ক) ওসিরিস, রা, হাপি, আমেন ইত্যাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলী, (খ) শোকগাথাসমূহ, (গ) আইসিস ও নেপথাইসিসের উৎসব সঙ্গীত, (ঘ) কথা ও কাহিনী, (ঙ) সেকেরের প্রার্থনাসমূহ (Litanies of Seker) ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া আরও রচনা আছে ধর্মমূলক এবং ধর্মনিরপেক্ষ, যেগুলিকে বলা হয় প্যাপিরাস রচনাবলী (Papyrus Texts)।

১॥ পিরামিড রচনাবলী

মিশরের চতুর্থ রাজবংশের আমলের বিরাট পিরামিডগুলির ভিতরে কোন লেখমালা না পাওয়ায় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মিশরীয় সাহিত্যের উৎস পিরামিডগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে না। এই ধারণার

অবসান ঘটল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ষষ্ঠ রাজবংশের দুজন সম্রাট, প্রথম পেপী ও মেরেনরার উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ দুটি লেখমালা পিরামিডের ভিতর থেকে পাওয়া গেল। এই লেখমালাদ্বয় ঈষৎ সবুজ রং-এর প্রস্তরের উপর হিয়েরোগ্লাইফিক লিপিতে উৎকীর্ণ। তারপর আরও পাঁচটি পিরামিডের অভ্যন্তর থেকে অজস্র লেখমালা আবিষ্কৃত হল যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে পঞ্চম রাজবংশের রাজা ইউনাসের, এবং বাকিগুলি ষষ্ঠ রাজবংশের টেটা, প্রথম ও দ্বিতীয় পেপী এবং মেরেনরার। আরও পাওয়া গেল চতুর্থ রাজবংশের আমলে রচিত বিখ্যাত পালের্মো বিবরণী (Palermo Annals)। মোটামুটি দেড়শো বছরে রচিত (২৬২৫-২৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এই পিরামিড লিপিগুলির সম্পাদনা করলেন ফরাসী পণ্ডিত মেসপেরো (Mespero) এবং জার্মান পণ্ডিত সেটে (Sethe)। সেঠে (Sethe) সম্পাদিত পিরামিড রচনাবলীর সংখ্যা মোটেই কম নয়, কোয়ার্টো সাইজের দুই খণ্ডের গ্রন্থে একহাজারেরও বেশী পৃষ্ঠা এগুলি সংকলন করতে লেগেছে। এই পিরামিড রচনাবলীই সম্ভবত পৃথিবীর আদিমতম ধর্মীয় সাহিত্যের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত নজির। বেশিরভাগ রচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত রাজার পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা। এইগুলি থেকে প্রাচীন মিশরের পরলোক সংক্রান্ত দুটি বিশেষ চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে—মৃত রাজার আত্মা সূর্যদেবতা, রা-এর সঙ্গে মিশে যায়। এটি অধিকতর প্রাচীন ধারণা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে দেবতা ওসিরিস সংক্রান্ত বিশ্বাস, যিনি মৃত্যু ও নবজীবনের দেবতা, একমাত্র যার করুণাতেই আত্মার সদ্গতি হতে পারে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী পিরামিড রচনাবলীকে ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—অন্ত্যেষ্টিকালীন অনুষ্ঠানসমূহের বিবরণ, যাদুবিশ্বাসমূলক মন্ত্রাদি, পূজাপদ্ধতি, স্তোত্রাবলী, প্রাচীন কথা ও কাহিনীর অংশবিশেষ এবং মৃত রাজার তরফে প্রার্থনাসমূহ। একালের পণ্ডিতদের কাছে সবচেয়ে অস্বস্তিকর হচ্ছে রচনাগুলির মূল সুরটি ধরতে না পারার অসুবিধা। অপরিচিত বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার অপরিচিত প্রবাদ এবং অপরিচিত রূপকসমূহ ব্যবহৃত হবার দরুন অনেক সময় রচনাগুলি বুঝে ওঠা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেগুলির অনুবাদের বড় বেশী অসুবিধা হয় এবং অনূদিত অংশগুলির অর্থও বহু ক্ষেত্রে অবোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। মিশরীয় কবিগণ শব্দ নিয়ে খেলা করতে ভালবাসতেন, বিশেষ করে যমকের ব্যবহারে তাঁদের বড় বাড়াবাড়ি ছিল। এখানে একটি শোকসূচক কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে, তাহলেই অসুবিধাটা কোথায় তা বোঝা যাবে।

"একটি মেষপালক মাছের সঙ্গে জলে রয়েছে, সে একটি সীট মাছের সঙ্গে কথা বলছে, সে বল্লমটিকে প্রণাম করছে পশ্চিমদিক থেকে—মেষপালক এসেছে পশ্চিম দিক থেকে।" এই কবিতার মর্মার্থ বা শোকসূচক তাৎপর্য বুঝে ওঠা এক কথায় অসম্ভব। তবে সব রচনাই এই রকম দুর্বোধ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রাজা ইউনাসের একটি পিরামিডলিপির অনুবাদ এখানে দিচ্ছি।

"মেঘেরা আকাশ অন্ধকার করেছে
তারাগুলি বর্ষণ ঘটাচ্ছে
বো-নক্ষত্র থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠছে
নরকের কুকুরের হাড়গুলি কাঁপছে
দ্বাররক্ষীরা নিঃস্তব্ধ
যখন তারা দেখছে রাজা ইউনাসের আত্মাকে
প্রভাতের মত বিকশিত হতে।"[১]

১০। মৃতের পুস্তক

মিশরের প্রাচীন সাহিত্যের আরও এক ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায় তথাকথিত Book of the Dead বা মৃতের পুস্তকগুলিতে। 'মৃতের পুস্তক' নামটি অবশ্য কিছুটা বিভ্রান্তিকর, প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় এগুলির নাম ছিল Pert em Hru, অর্থাৎ 'দিনে দিনে আসা'। এগুলি সচরাচর কফিনের গায় উৎকীর্ণ করা হত, বিষয়বস্তু ছিল পরলোক, পরলোক যাত্রার পথ, স্বর্গ বা নরকের দ্বারসমূহ, পাপপুণ্য ইত্যাদি। কফিনের গায়ে লিখিত একটি রচনার নিদর্শন দিলে প্রাচীন মিশরীয়দের পরলোক সংক্রান্ত ধ্যানধারণার তথা বুক অফ দি ডেডের কিছুটা পরিচয় মিলবে এই আশায় এখানে তা উদ্ধৃত করছি: "আমি আছি, আমি বেঁচে আছি, আমি বাড়ছি, আমি শান্তিতে জেগে উঠব, আমার দেহে জড়ানো কাপড়ে আমি ধ্বংস হব না। আমি তৃষ্ণামুক্ত হব, আমার চোখ দৃষ্টিশক্তি হারাবে না,

১। পিরামিড রচনাবলীর সংকলনের জন্য G. Mespero-র *Les Inscriptions des Pyramides de Sqqarah* (১৮৯৪) এবং K. Sethe এর *Die Altägyptischen Pyramidentexte* (১৯০৮-১০) দ্রষ্টব্য। ওইগুলি বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত হয়েছে E. A. W. Budge-এর *Egyptian Religion* (১৯০৮) এবং *Literature of the Egyptians* (১৯১৪) গ্রন্থদ্বয়ে। সর্বোৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্তসারের জন্য দ্রষ্টব্য J. H. Breasted-এর *Development of Religion and Thought in Egypt* (১৯১২) নামক গ্রন্থটি।

আমার চামড়া অদৃশ্য হবে না। আমার কর্ণ বধির হবে না, আমার স্কন্ধ থেকে মস্তক বিচ্যুত হবে না, আমার জিহ্বা কর্তিত হবে না। আমার চুল ও চোখের ভুরু একই রকম থাকবে, আমার দেহ শক্ত থাকবে, আমি চিরকালের জন্য পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হব না।" এই জাতীয় মানসিকতার অধিকারী ছিল বলেই হয়ত মিশরীয়দের মৃতদেহ পোড়ান হত না বা সমাধিস্থ করা হত না, মমি করে রেখে দেওয়া হত।

বহুধরনের মৃতের পুস্তক নিশ্চয়ই তখন চালু ছিল, কিন্তু কফিনের গায়ে যেগুলি পাওয়া গেছে সেই লেখাগুলির মধ্যে কোন বাঁধুনি নেই। ভাবসমূহও সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার কারণ, ভাড়াটে লোক দিয়ে কফিনগাত্রে ওগুলি লেখান হত, এবং যেহেতু ওইগুলি পিরামিডের অন্ধকারে চলে যাবে, এবং কেউ তা পড়েও দেখবে না সেই হেতু এই লেখা বা টোকার কাজটি অত্যন্ত দায়সারা-ভাবে করা হত। এই মৃতের পুস্তকগুলির আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ষষ্ঠ থেকে একাদশ রাজবংশের আমলের কোন মৃতের পুস্তক পাওয়া যায়নি। দ্বাদশ রাজবংশের সময় থেকেই এগুলির নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতকের পর থেকে মৃতের পুস্তকের প্রাবল্য দেখা দেয়, অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনবিংশ রাজবংশের সময় থেকে। একবিংশ রাজবংশের আমলে দেখা যায় যে কফিনের গাত্রে উৎকীর্ণ করার পরিবর্তে প্যাপিরাসের উপর লেখা এই রচনাগুলি কফিনের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে। সাইট অধিকারের আমলে প্রাচীন মৃতের পুস্তকগুলি সংকলন করা হয়। পরবর্তী কালে টলেমি রাজবংশের আমলে লিখিত মৃতের পুস্তকগুলি তুরিন প্যাপিরাস নামে বিখ্যাত।

'মৃতের পুস্তক' সিরিজে তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। প্রথমটি হচ্ছে আম ডুয়াট (Book of Am Duat) যার বিষয়বস্তু হচ্ছে পাতালের বিবরণ। এখানে বারোটি পাতালরাজ্যের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় রচনাটির নাম Shaien-Sinsen বা প্রশ্বাসের গ্রন্থ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে আপেপি (Apepi) যা পনেরটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং যার বিষয়বস্তু হচ্ছে পরলোকে শত্রুদমন পদ্ধতি। এই ধরনের রচনা আরও আছে যেমন Book of Gates। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে তথাকথিত বুক অফ দি ডেড সমূহে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় একেবারে অনুপস্থিত। এমন কি বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতার নিদর্শনও সেখানে আছে। তথাপি একথা বলতে বাধা নেই যে মিশরীয় সাহিত্যের আদি পর্যায়গুলি

ধর্ম ও পরলোক সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এগুলিকে বাদ দিলে বড় কিছু একটা অবশিষ্ট থাকে না।[১]

১১ ॥ মিশরীয় পুরাণ : দেবতা 'রা'

মিশরের প্রাচীন কথা ও কাহিনীসমূহের কিছু কিছু অংশ পিরামিড রচনাবলী ও মৃতের পুস্তকগুলিতে রক্ষিত আছে, অধিকাংশ আছে প্যাপিরাসের পাতায়। আমরা এখানে যে কাহিনীটির কথা উল্লেখ করব সেটি সৃষ্টিতত্ত্বের উপর রচিত। কোন্ সুদূর অতীতে এ কাহিনী রচিত হয়েছিল তা বলা যায় না, তবে মিশরে ঊনবিংশতি ও বিংশতিতম রাজবংশের রাজত্বকালে এই কাহিনী প্যাপিরাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

বর্তমান কাহিনী অনুযায়ী আদিতে বিশ্বচরাচর ছিল অসীম জলরাশি যা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেবতা রা। তিনি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন যার ফলে জন্মগ্রহণ করল বায়ুদেবতা সু এবং তার প্রণয়িনী টেফনাট, পৃথিবীরূপী দেবতা সেব এবং আকাশরূপিণী দেবী নাট। সেব ও নাটের ঔরসে জন্মাল ওসিরিস ও তার প্রণয়িনী আইসিস, সেট ও তার প্রণয়িনী নেপথাই সস। দেবী দিদের রা এরপর ক্রমাগত সৃষ্টি করেই চললেন। তার শক্তির উৎস ছিল একটি গোপন নাম। এই নামের অধিকারী যে হবে দেবতা রা-এর শক্তি তার দেহে সঞ্চারিত হবে।

দেবীদের মধ্যে আইসিস ছিল কুটিল ও কুচক্রী। তদুপরি সে ছিল যাদুকরী। দেবগোষ্ঠির মধ্যে রা-এর প্রতিপত্তি তার কাছে অসহ্য ছিল। সে চাইত রা-এর সকল শক্তি করায়ত্ত করতে। এই উদ্দেশ্যে সে একটি চক্রান্ত করল। তার যাদুশক্তির দ্বারা সে তৈরী করল একটি বিষধর সর্প এবং সেটি সে রা-এর গমনাগমনের পথে রেখে দিল। একদিন প্রভাতে রা যখন অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে পদচারণা করছিলেন, নিয়তিস্বরূপ সেই সর্প তাঁর পদতলে দংশন করল।

১। কফিন রচনাবলী সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে R. Lepsius রচিত *Aelteste Texte des Todtenbuchs* (১৮৬৭) নামক গ্রন্থে। এছাড়া দ্রষ্টব্য S. Birch-এর *Egyptian Texts of the Earliest Period from the Coffin of Amamn* (১৮৮৬) এবং Wallis Budge-এর *Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in the British Museum* (১৯১১)। তুরিন প্যাপিরাসের সম্পাদনা করেছিলেন পূর্বোল্লিখিত লেপসিয়াস এবং ইংরাজী অনুবাদ করেছেন বার্চ। ইংরাজীতে এই বিষয়ে আরও একটি ভাল গ্রন্থ আছে। সেটি হচ্ছে ওয়ালিস বাজের *Book of the Dead* (১৮৯৮)।

রা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন রা-কে উদ্দেশ করে আইসিস বলল, "হে পরম পিতা, কিসে আপনাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে তা আমি জানি। আমি আমার যাদুশক্তির দ্বারা আপনার যন্ত্রণা দূর করতে পারি। কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে যা আপনাকে পূরণ করতে হবে। আপনার শক্তির উৎস যে গোপন নামটি আপনি হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন তা আমাকে জানাতে হবে।"

আইসিসের এই কথায় ক্রোধে রা-এর মুখমণ্ডল শাদা হয়ে গেল। সর্পদংশনের নিদারুণ যন্ত্রণাকে ছাপিয়েও তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে গ্লানি ও ক্রোধ উপচে পড়তে লাগল। তারপরে তিনি বলে উঠলেন, "আমি এই জগৎ ও আকাশ সৃষ্টি করেছি, আমি নিজ হাতে পর্বতসমূহ সৃষ্টি করেছি, সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছি, আমিই মিশরের নীলনদের বন্যার স্রষ্টা। আমিই দেবগণকে সৃষ্টি করেছি। আমার গোপন নাম দেবগণ জানে না। আমি সকালে খেপরা, দুপুরে রা এবং সন্ধ্যায় তুম।"

তথাপি রা-এর যন্ত্রণা দূর হল না। কুটিল হাসি হেসে আইসিস বলল, "হে পরম পিতা, আপনি মিথ্যাচরণ করেছেন, যন্ত্রণায় নীল হয়ে আপনাকে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে, যদি না এখনো আপনার গোপন নাম আপনি আমায় দেন।"

দেবতা রা-এর মুখে তখন ফুটে উঠেছে বিষণ্ণ বেদনা। রা বহুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর কোনক্রমে ধীরে ধীরে এই কটি কথা উচ্চারণ করলেন, "হে সমবেত দেবগণ, আজ থেকে আইসিস আমার গোপন নামের অধিকারী হবে।"

বলতে বলতে রা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর দেহ থেকে নির্গত একটি জ্যোতি ধীরে ধীরে আইসিসের দেহে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে আইসিস বলে উঠল, "আমি সেই গোপন নামের অধিকারী হয়েছি। রা সুস্থ হয়ে উঠুন, তাঁর দেহ থেকে সমুদয় বিষ নির্গত হয়ে যাক, তাঁর যন্ত্রণার উপশম হোক।"

উপরিউক্ত কাহিনীটি আসলে দুটি ধর্মবিশ্বাসের সংঘাতের দ্যোতক। কথা প্রসঙ্গে আমরা আগে বলেছি যে মিশরীয় সম্রাটগণের ধর্মবিশ্বাসে সূর্যই প্রধান দেবতা এবং রা এই সূর্যেরই প্রতীক। পক্ষান্তরে ওসিরিস ও আইসিস শস্যদেবতা ও শস্যদেবী যাদের পূজা জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর ব্যাপক ছিল। কালক্রমে মিশরে ওসিরীয় ধর্মেরই প্রাবল্য দেখা দেয়, এমনকি সম্রাটগণও ক্রমশ ওসিরীয় ধর্মের অনুগামী হয়ে পড়েন। সূর্যপূজাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট চতুর্থ আমেনহোটেপ। ইনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। ওসিরীয় পুরোহিত-

তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় একরকম বিদ্রোহ করেই তিনি তাঁর উপাস্য সূর্যদেবতা অ্যাটনের পূজার প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন সূর্যদেবতা রা-এর ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকেই নূতন সূর্যদেবতা অ্যাটন গড়ে ওঠেন। রাজা চতুর্থ আমেনহোটেপ আখেনআটন বা 'অ্যাটনের প্রিয়' এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। দেবতা অ্যাটনের উদ্দেশে তিনি যে স্তোত্রগুলি লিখেছিলেন সেগুলি মিশরীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

১২ ॥ মিশরীয় পুরাণ: ওসিরিসের ট্রাজেডি

আক্ষরিক অর্থে ওসিরিসের ট্রাজেডি নামক কোন নাটকের অভিনয় কোনদিনই হয়নি, যদিও বহু যুগ ধরে প্রচলিত এই কাহিনীটি মিশরের শস্য-উৎসবের দিনগুলিতে বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হত।

ওসিরিসের ট্রাজেডিকে গ্রন্থাকারে রূপ দেন প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লুটার্ক। প্লুটার্ক কথিত সে কাহিনী আমরা অন্যত্র উল্লেখ করব। এখানে আমরা মূল মিশরীয় কাহিনীটিই বলব যা সংগ্রহ করা হয়েছে প্যাপিরাসের পাতায় লেখা থেকে। এগুলি সংগ্রহ ও অনুবাদ করেছিলেন জে. টি. ডেনিস॥

ওসিরিস ছিলেন পৃথিবীরূপী দেবতা সেব ও আকাশরূপিণী দেবী নাটের পুত্র, পূর্বোল্লিখিত দেবী আইসিসের ভ্রাতা তথা স্বামী। দেবতা রা-এর মৃত্যুর পর ওসিরিসই হন মিশরের শাসক। রা-এর আমলে মিশরের লোকেরা ছিল শিকারজীবী। ওসিরিসের পত্নী আইসিস আবিষ্কার করল যব, আর ওসিরিস দেশবাসীকে শেখালেন কৃষিকাজ। তারপর তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই বিদ্যা জগতের কল্যাণে লাগা উচিত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ওসিরিস জগৎ পরিভ্রমণে বার হলেন।

ওসিরিসের অবর্তমানে আইসিস হল মিশরের শাসক। ওসিরিসের জনপ্রিয়তায় একজন দেবতা ক্ষুব্ধ ছিল। সে হচ্ছে তার ছোট ভাই সেট। ওসিরিসের অবর্তমানে সে মিশরে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওসিরিস-পত্নী আইসিস সেটের তুলনায় শক্তিশালী ছিল, কাজেই সেটের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

তারপর ওসিরিস ফিরে এলেন। সারা দেশে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। একটি রাজকীয় ভোজসভা তাঁর সম্মানার্থে দেওয়া হল। সেই সভায় ওসিরিসের ভাই সেটও এল বন্ধুভাবে। তার সঙ্গে ছিল একটি সিন্দুক যা

ওসিরিসের দেহের মাপে তৈরী। সিন্দুকটি এত সুন্দর যে অনেকেই সেটা নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। তাদের আগ্রহের উত্তরে সেট জানাল যে একমাত্র সেই লোককেই সে সিন্দুকটি উপহার দেবে যার দেহ সিন্দুকের মধ্যে নিখুঁতভাবে প্রবিষ্ট হবে।

কারো দেহ যখন সিন্দুকের মাপে হল না, তখন ওসিরিস এগিয়ে গেলেন। তাঁর দেহটি সিন্দুকের মধ্যে আশ্চর্যভাবে ফিট করল। কিন্তু ওসিরিস সিন্দুক থেকে উঠে পড়ার আগেই সেট ডালাটি বন্ধ করে দিয়ে পেরেক এঁটে দিল এবং তার অনুচরেরা ভোজসভায় রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু করল। নিমেষের মধ্যেই সমগ্র ব্যাপারটি ঘটে গেল, সেই সিন্দুকটিই হল ওসিরিসের কফিন, সেটিকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হল নীলনদের গভীর জলে। আর তা ভাসতে ভাসতে চলে গেল মহাসমুদ্রে।

ওসিরিসের নিধনের এই বার্তায় তাঁর পত্নী দেবী আইসিস শোকে ভেঙে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত করল যে সে ওসিরিসের দেহ খুঁজে বার করবে। এদিকে ওসিরিসের ভাই সেট সিংহাসনে বসেছে। মিশর আইসিসের পক্ষেও নিরাপদ নয়।

সারাদিন আইসিস বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করত। রাত্রে সে ওসিরিসের দেহের সন্ধানে বার হত। অবশেষে সে একজন দরিদ্র স্ত্রীলোকের ঘরে আশ্রয় পেল এবং সেখানে জন্মাল তার পুত্র হোরাস। কিন্তু কুচক্রী সেট আইসিসের গোপন বাসস্থানের সন্ধান পেয়ে গেল এবং মাতা পুত্র দুজনকেই সে বন্দী করল। কিন্তু কৌশলী আইসিস পুত্রকে নিয়েই বন্দীশালা থেকে পলায়ন করল এবং বুটো নামক এক রাজ্যে উপস্থিত হল। সেখানকার নগররক্ষিণী দেবী উয়জিতের হাতে হোরাসকে সমর্পণ করে সে পুনরায় ওসিরিসের দেহের সন্ধানে যাত্রা করল।

এদিকে ওসিরিসের কফিনটি ভাসতে ভাসতে সিরিয়ার অন্তর্গত বিবলাস নামক স্থানে উপস্থিত হল। সেখানকার রাজা সেই কফিনটিকে একটি স্তম্ভের নীচে সমাধিস্থ করলেন। ঘটনাচক্রে ঘুরতে ঘুরতে আইসিস বিবলাসে এসে উপস্থিত হল। সেও সেখানে রাজার গৃহে আশ্রয় পেল। রাণী তার নিজ শিশু-পুত্রকে দেখাশুনার ভার আইসিসের উপর দিল। শত হলেও আইসিস একজন দেবী এবং তার ইচ্ছা হল শিশুটিকে সে অমর করবে। সে স্তন্যদানের পরিবর্তে শিশুটিকে নিজের আঙুল চুষতে দিত এবং প্রত্যহ রাত্রে তাকে জলন্ত চুল্লীর উপর শায়িত করে তার মধ্যে দেবত্বের শক্তিসঞ্চার করত। ঘটনাচক্রে একদিন

শিশুটির আসল মা ব্যাপারটি দেখে ফেলে এবং তাড়াতাড়ি এসে শিশুটিকে আগুনের উপর থেকে সরিয়ে নেয়। ফলে শিশুটির কপালে দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটল না, এবং আইসিসের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হল। আইসিস নিজ পরিচয় ও উদ্দেশ্য বলার পর বিবলাসের রাজা স্তম্ভ ভেঙে ওসিরিসের শবদেহবাহী সিন্দুকটি আইসিসের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন।

সেই সিন্দুক নিয়ে জাহাজে করে আইসিস বুটো শহরে নিজ পুত্র হোরাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এল। কিন্তু তাকে আবার দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়তে হল। ঘটনাচক্রে ওসিরিসের কুচক্রী ভ্রাতা সেট সেখানে শূকর শিকার করতে এসেছিল। সে হঠাৎ একটি ঝোপের আড়াল থেকে ওসিরিসের দেহসহ সিন্দুকটি আবিষ্কার করে। তখন সে ওসিরিসের মৃতদেহ চোদ্দ ভাগে ভাগ করে এক একটি টুকরো নীলনদের এক একটি জায়গায় ফেলে দেয়।

সেটের এই অপকর্ম যখন আইসিস জানতে পারল তখন সে পুনরায় শোকে ও দুঃখে উন্মত্ত হয়ে উঠল। সে একটি প্যাপিরাসের নৌকায় করে ভাসমান দেহ-খণ্ডগুলি খুঁজতে বার হল। কুমীরেরা আইসিসের অনুগত ছিল, তাই তারা ওসিরিসের দেহখণ্ডগুলি ভক্ষণ করেনি। আইসিস এক এক সেগুলি উদ্ধার করল এবং যেখানে যেখানে সেগুলি পাওয়া গেল সেখানে সেখানে একটি করে মন্দির নির্মিত হল।

অত্যাচারী শাসক হিসাবে সেট জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওসিরিসের পুত্র হোরাস সাবালক হয়ে সেটকে প্রকাশ্য যুদ্ধে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল। ওসিরিসের কাহিনীর এখানেই শেষ।

ওসিরিস ও আইসিস উভয়েই শস্যের দেবদেবী, এবং পণ্ডিতদের মতে ওসিরিস-কাহিনী আসলে একটি শস্য-রূপক ছাড়া আর কিছু নয়। আইসিসের ওসিরিসের মৃতদেহ সন্ধানে যাত্রার কাহিনীর সঙ্গে গ্রীক দেবী ডিমিটারের কাহিনীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া অনুরূপ কাহিনী ব্যাবিলনীয় তম্মুজ ও ইস্তার, ফ্রিজীয় অ্যাটিস ও সিবিলী প্রভৃতি প্রাচ্য দেবদেবীর ক্ষেত্রেও বর্তমান।

১৩॥ একটি ইতিহাসধর্মী উপন্যাস

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশর থেকে হাইনরিখ শ্যাকার একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। প্যাপিরাসের মোট ছয়টি পৃষ্ঠা। এই তথাকথিত উপন্যাসটি

রক্ষিত আছে বার্লিন মিউজিয়ামে। পারস্যের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসটি রচিত। সেই হিসাবে মিশরীয় সভ্যতার শেষ পর্যায়ে এই কাহিনী রচিত হয়েছে। লেখকের নাম, বলা বাহুল্য, অজ্ঞাত।

মোট ছয় পৃষ্ঠার উপন্যাসের মূল্যবিচার কখনোই সার্থক হতে পারে না, তদুপরি তা সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, উপন্যাসের ছেঁড়া পাতা। বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক হলেও লেখকের ইতিহাস জ্ঞানের শোচনীয় অভাব ছিল। উপন্যাসের প্রতিনায়ক ক্যাম্বাইসেসকে লেখক ব্যাবিলনের নেবসাডনেজারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

কাহিনীর শুরু হচ্ছে মিশররাজ অ্যাপ্রাইয়েসের (অ্যামেসিস?) রাজত্বকাল থেকে। পারস্যরাজ ক্যাম্বাইসেসের মিশরজয়ের ইচ্ছা বহুদিনের। সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি মিশররাজ অ্যাপ্রাইয়েসের বশ্যতা দাবি করে একদল দূত পাঠালেন। তাদের দেখে মিশরবাসীরা এতই উত্তেজিত হয়ে উঠল যে সব কটা দূতকে তারা মেরে ফেলতে চাইল, এবং রাজা অ্যাপ্রাইয়েসও তা অনুমোদন করলেন। কিন্তু বোথর নামে জনৈক ভূয়োদর্শী সভাসদ্ রাজাকে উপদেশ দিলেন যে এই দূতদের হত্যা না করে, বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রস্তাব গৃহীত হল। দূতদের রীতিমত অপমান করার পর তাদের জানিয়ে দেওয়া হল যে প্রতিটি মিশরীয়কে শৈশবকাল থেকেই যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। মিশরের নারীরাও জানে কি করে তীর ছুঁড়তে হয়। মিশরের প্রতিটি লোকই রাজভক্ত। এ পর্যন্ত কোন বাইরের শক্তি এসে মিশর জয় করতে পারেনি। অতএব যে বা যারা মিশর জয়ের স্বপ্ন দেখছে রণক্ষেত্রেই তাদের সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হবে।

ক্যাম্বাইসেসের দূতেরা এই বার্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেল। দূতগণের মুখে এই সব কথা অবগত হয়ে সম্রাট ক্যাম্বাইসেস উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন যে সোজাসুজি মিশর আক্রমণ করবেন। কিন্তু তাঁর এক প্রাচীন সভাসদ্ তাঁকে অন্য উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন যে, যেখানে একটি জাতি আত্মরক্ষায় দৃঢ়সংকল্প সেখানে যুদ্ধের দ্বারা কোন লাভ হবে না, সেখানে আক্রমণ চালাতে গেলে পরাজিত হবার সম্ভাবনাই বেশি। এর চেয়ে বরং কোন কৌশলের দ্বারা কার্যসিদ্ধি করতে হবে। মিশরে বিভেদের বীজ বুনতে হবে। সেই কূটবুদ্ধি সভাসদ্ আরও পরামর্শ দিলেন যে পারস্য থেকে একদল দূত মিশরীয় সেজে মিশরের সর্বত্র ফারাও ও দেবতা অ্যাপিসের নামে একটি বিশেষ

স্থানে আমন্ত্রণ জানিয়ে মিশরীয়দের সমবেত করবে। সেখানে এক প্রতিদ্বন্দ্বী ফারাও খাড়া করে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটাতে হবে।

ঐ পরামর্শ ক্যাম্বাইসেসের মনঃপূত হল। সেই হিসাবে দূত পাঠানো হল অজস্র, এবং তারা মিশরীয় জনপদসমূহে এই আমন্ত্রণবার্তা পৌছে দিতে লাগল। এই সভায় যোগদানের আগে প্রতিটি মিশরীয় রীতি অনুযায়ী দৈবজ্ঞদের কাছে পরামর্শ নিতে গেল এবং দৈবজ্ঞরা গণনা করে দেখল যে এই আমন্ত্রণ জাল, তার সঙ্গে প্রকৃত মিশরের ফারাও এবং দেবতা অ্যাপিসের কোন সম্পর্ক নেই।

ছয় পৃষ্ঠার উপন্যাসের মাত্র এইটুকুই পাওয়া গেছে। আগেই বলেছি, লেখকের স্বদেশপ্রেম প্রশংসনীয় হলেও তাঁর ইতিহাসচেতনার কিছুটা অভাব ছিল। ক্যাম্বাইসেস মিশর আক্রমণ করেন ৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, তখন মিশরের সম্রাট অ্যামেসিস রাজত্ব করেছেন। ওই বছরেই তিনি মারা যান এবং তৃতীয় সামটেক মিশরের সম্রাট হন। পেলুসিয়ামের যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হয়ে মেমফিসে পালিয়ে যান এবং সেখানে ক্যাম্বাইসেস আবার তাঁকে পরাজিত করে মিশর দখল করে নেন।

১৪ ॥ মিশরীয় কবিতা

প্রাচীন মিশরের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিতার নাম লে অফ দি হার্পার। এই কবিতাটি ধনীদের ভোজসভায় বিশেষ করে গাওয়া হত এবং সেই সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে রাখা হত ছোট একটি মমির নকল। এই কবিতাটির কথা বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কবিতাটির আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হল :

এ ভালই হয়েছে রাজকুমারের পক্ষে, তাঁর দিন গেছে
সৌভাগ্যের পূর্ণমাত্রায় ···সকলেই চলে যায়
আরও অনেককে রেখে, সনাতন এ রীতির ব্যতিক্রম নেই।
বৃদ্ধ রাজারা ঘুমান পিরামিডের তলায়
ধনী এবং পণ্ডিতেরাও তাই। কিন্তু কেউ কেউ,
যাঁরা একদা সমাধিমন্দির গড়েছিলেন,
তাঁদের বিশ্রামের স্থান নেই।
যদিও তাঁদের কীর্তি ছিল মহৎ···ওগো আমি শুনেছি
যে কথা বলেছেন ইমহোটেপ আর হোরডাডফ
তাঁদের কথা লোকে আজও বলে···তাঁদের সমাধি কোথায়?

সেগুলি গুঁড়িয়ে গেছে…ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়েছে
মনে হয় কেউই যেন ছিলেন না কোনদিন।

কোন আত্মা কখনোই ফিরে এসে তার কোন কথা বলে না—
আমাদের যাবার আগে কোন সান্ত্বনার বাণী সে শোনায় না,
একা সে কোথায় গেছে সে সন্ধান বৃথা—অতএব
যতটুকু পারো জীবনের পানপাত্র পূর্ণ করে নাও।
মুকুটে বসাও তবে পদ্মরাগমণি, দেহ কর সুসজ্জিত
শ্বেতশুভ্র কোমল রেশমে। দেবতার মত অভিষিক্ত হও।
ক্লান্তিহীন দুঃসহ আগ্রহে হৃদয়ের সব তৃষ্ণা যতটা সম্ভব
মিটিয়ে নাও…চূড়ান্ত শোকের দিন সমাগত হলে
সে বিলাপে কর্ণপাত একান্তই অসার হবে জেনো।
তার কোন অর্থ নেই শান্ত স্থির মৃতের নিকটে।
সম্ভোগের এ মুহূর্ত অহেতুক ব্যর্থ কেন হবে?
কেউই পারে না তার সম্পদ্ কবরে নিয়ে যেতে—
আর একবার গেলে সে আর কখনোই ফেরে না।

কোন কোন কবিতায় তৎকালীন সামাজিক জীবন, বিশেষ করে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-যন্ত্রণা আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। একটি কবিতায় একজন কাঠের মিস্ত্রীর দুঃখময় জীবনের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে:

যে লোক সারাদিন মাঠে চাষ করে
তার চেয়েও একজন ছুতোর মিস্ত্রীকে
বেশী ক্লান্ত হতে হয়;
কেননা তার ফসলের মাঠ হচ্ছে কাঠ
যার উপর তার র‍্যাদা লাঙল দেয়।
সে কোন বিশ্রাম নিতে পারে না
যেহেতু তাকে আলো জ্বেলেও কাজ করতে হয়।
ততক্ষণ তাকে কাজ করতে হয়
যতক্ষণ না তার দুটি হাত ক্লান্তিতে ঝুলে পড়ে।

আর একটি কবিতায় একজন কামারের জীবনযাত্রা আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছে:

কামার কোন রাজদূত নয়
তার কাজকে লোকে কৃপার চক্ষেই দেখে,
আমি এ পর্যন্ত কোন স্বর্ণকারকে দেখিনি
যার খবর এখানে দিতে পারি।
হায়, আমি দেখেছি কামারকে কাজ করতে—
তার সামনের আগুন ফুল্কি দিয়ে উড়ছে হাপরের হাওয়ায়,
তার নখগুলি হয়ে গেছে কুমীরের নখের মত
তার গা দিয়ে বেরুচ্ছে মাছের আঁশের গন্ধ ॥

প্রেমের কবিতা রচনাতেও প্রাচীন মিশরীয়রা পিছিয়ে ছিল না। প্যাপিরাসের পাতায় লেখা কয়েকটি সম্পূর্ণ কবিতা পাওয়া গেছে যেগুলি প্রায় আজ থেকে তিন হাজার বছর পূর্বের রচনা। আমরা নিম্নে একটির তর্জমা উদ্ধৃত করছি:

একটি ডুমুর গাছ গেয়েছিল কোন এক সুন্দরীর কাছে—
সে স্বরে মাধুরী ছিল মধুর ফোঁটার মতন।
"এখন হয়েছে লাল পদ্মরাগ এ ফল আমার,
আমার নিকুঞ্জ আজ অবারিত প্রতীক্ষামুখর।

"প্যাপিরি সবুজ আজ এ দেহের পাতা
শাখাগুলি সর্বাঙ্গ যৌবনে হিরণ
এ শীতল প্রচ্ছায়া তোমারই আবাস—
তোমার স্বপ্নের স্বপ্ন তোমারি হৃদয়।

"একটি প্রেমের চিঠি লিখো তুমি প্রিয়,
তোমার যে জন আছে মনের মুকুরে,
বল তাকে, যেন আসে তোমার উদ্যানে
বসে যেন এ কুঞ্জের নিভৃত ছায়ায়।

"তোমার উল্লাসে আমি দিয়ে যাব ফল,
আমি নেব রুটি আর আসবের ভার
ফুলের সুরভি আর স্বর্গের কিরণ
তোমাদের আকাঙ্ক্ষার দায়িত্ব আমার।

"আশ্চর্য নতুন হবে তুমি আর তোমার প্রেমিক
কণ্ঠ তার মধুক্ষরা ভাষায় কোমল
আমি রব নির্বিকার নিশ্চুপ নীরব
তোমাদের লীলারঙ্গে নির্বাক দর্শক ॥"

১৫ ॥ অপরাপর মিশরীয় রচনা

এ পর্যন্ত আমরা যা উল্লেখ করলাম সেগুলি ছাড়া প্রাচীন মিশরের আরও কয়েকটি সাহিত্যকর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলিকে আধা-ধর্মীয় বলা যেতে পারে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ইপুউয়েরের হুঁশিয়ারি (*Admonitions of Ipuwer*) যে গ্রন্থে প্রাচীন মিশরের সামাজিক দুর্নীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, এবং কিভাবে সেগুলি দূর করা যায় তার পন্থা বাতলানো হয়েছে, এ ছাড়া কয়েকটি অনুশাসনমূলক গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন *Ptah-hetep, Gemnikai, Ani, Khensu-hetep* ইত্যাদি। গ্রন্থগুলির নাম লেখকদের নামানুসারেই হয়েছে, আমাদের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতির মত।[১]

১৬ ॥ মিশরের শেষ অধ্যায়

ম্যাসিডনীয় বীর আলেকজাণ্ডার মিশর জয় করেন ৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। মিশরীয় সংস্কৃতির উপর এই বিজয় বেশ বড় একটা আঘাত হেনেছিল। আলেকজাণ্ডার মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নগরের পত্তন করেন। কালক্রমে এই আলেকজান্দ্রিয়া গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মিশরে টলেমিবংশ রাজত্ব শুরু করে ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। টলেমিবংশীয় রাজাদের অনুপ্রেরণায় আলেকজান্দ্রিয়া বিজ্ঞানচর্চায়, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর নির্মাণে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পর থেকে মিশরীয় সাহিত্যের ইতিহাস আসলে গ্রীক সাহিত্যেরই ইতিহাস। আলেকজান্দ্রীয় ভাবধারার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন ক্যালিমাকাস। আনুমানিক ২৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি টলেমি ফিলাডেলফস কর্তৃক আলেকজান্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সর্বাধ্যক্ষ হন এবং প্রভূত পরিশ্রম করে তিনি সেই গ্রন্থাগারের একটি বর্ণনামূলক ক্যাটালগ ১২০ খণ্ডে রচনা করেন।

১। মিশরীয় পুরাণের জন্য M. A. Murray রচিত *Ancient Egyptian Legends* (১৯১৩) দ্রষ্টব্য। ইপুউয়েরের হুঁশিয়ারির ইংরাজী অনুবাদের জন্য A. H. Gardiner বিরচিত *The Admonitions of an Egyptian Sage* (১৯০৯) গ্রন্থটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর নিজস্ব রচনাবলীর মধ্যে আছে কিছু কবিতা যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে কোমা বেরিসিনেস। এ ছাড়া তিনি হেকাটি নামক একটি জনপ্রিয় মহাকাব্যও রচনা করেছিলেন। তাঁর শিষ্য অ্যাপোলোনিয়াসও আলেকজাণ্ড্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত একটি মহাকাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, নাম আর্গোনটিকা। অপরাপর মিশরীয় গ্রীক লেখকদের মধ্যে ওরিজেন, আরিওস, আথানাসিওস এবং সাইনেসিওসের নাম উল্লেখযোগ্য।

৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশর রোমকগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়, এবং স্বাভাবিক নিয়মেই মিশরে গ্রীকচর্চার চেয়ে ল্যাটিনচর্চার প্রাধান্য ঘটে। মূল রোমক ভূখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রাধান্য লাভ করলে তার প্রতিক্রিয়া মিশরেও এসে পড়েছিল, এবং মিশর কমপক্ষে এমন চারজন ল্যাটিন খ্রীষ্টীয় সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছে যাঁদের নাম চিরস্মরণীয়। এঁরা হচ্ছেন টারটুলিয়ান (বিখ্যাত রচনা *Apologia*) ও তাঁর শিষ্য সাইপ্রিয়ান, ল্যাকটানসিউস (বিখ্যাত রচনা *Divinae Institutionae*) এবং সেণ্ট অগাস্টাইন।

৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশর আরবগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরবর্তী কালের মিশরীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে আরবীয় সাহিত্যেরই ইতিহাস।

১৭ ॥ ঈরানীয় অবেস্তা

ভারত ও ঈরানের পশ্চিমে যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অস্পষ্টভাবে অসুর সভ্যতার ক্ষেত্র হিসাবে প্রাচীন যুগে প্রতিভাত হয়েছিল, সেখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলি থেকে গ্রহণ করে আমরা আবার ঈরানীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করছি।

প্রাচীনতম ঈরানীয় সাহিত্য অবেস্তা নামে পরিচিত। লেখমালাসমূহে উৎকীর্ণ প্রাচীন পারসিক ভাষার সঙ্গে অবেস্তার ভাষার পার্থক্য আছে। মূল অবেস্তা রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে, কিন্তু বর্তমানে যে অবেস্তা পাওয়া যায় তাতে মূলের খুব সামান্য অংশই রক্ষিত আছে। অবেস্তার বর্তমান যে রূপ আমরা দেখি তা সংকলিত হয়েছিল সাসানীয় আমলে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। অর্থাৎ মূল গ্রন্থের রচনাকাল ও তার সংকলনকালের মধ্যে সর্বনিম্ন সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৮০০ বছর। কাজেই এই অবস্থায় আসল অবেস্তার সামান্য অংশকেই ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। জরথুষ্ট্রের গাথাসমূহ মূল অবেস্তা গ্রন্থের সবচেয়ে অর্বাচীন অংশ, কিন্তু সংকলিত

অবেস্তায় সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন। পহ্লবী ভাষায় সংকলিত অবেস্তার নাম আপিস্তক উ-জেন্দ। 'আপিস্তক' শব্দটির অর্থ 'মূল গ্রন্থ' এবং 'জেন্দ' শব্দটির অর্থ 'টীকা'। সংকলিত অবেস্তা চারভাগে বিভক্ত—য়শ্ন, বিস্পরদ, য়শৎ এবং বেন্দিদাদ।

য়শ্ন-এর (য়-জন, অজ-ন, যজ্ঞ) বিষয়বস্তু যাগযজ্ঞ-সম্পর্কিত। এই গ্রন্থটি ৭২টি অধ্যায়ে (হস্) বিভক্ত। প্রথম সাতাশটি অধ্যায় ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত। নবম থেকে একাদশ অধ্যায়ে হওম ইয়স্ত বা সোম যজ্ঞের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে জরথুষ্ট্রীয় মতবাদের শপথবাক্যসমূহ। য়শ্ন-এর জরথুষ্ট্রীয় গাথাসমূহ (২৮-৫৪ অধ্যায়) পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ৩৪ থেকে ৪৩তম অধ্যায়গুলির মধ্যে গদ্যে লিখিত কয়েকটি ছোট নিবন্ধ আছে যেগুলির নাম হপ্তংঘাইতি। জরথুষ্ট্র হচ্ছেন আমাদের বুদ্ধের মত, উভয়ে একই যুগে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, উভয়েই যজ্ঞ ও পশুবলিমূলক প্রাচীন ধর্মকে অস্বীকার করেছিলেন এবং নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। জরথুষ্ট্র তেত্রিশ দেবতাকে বরবাদ করে একমাত্র বরুণকেই (অহুর-মজদা) পরমেশ্বরের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। অবশ্য অহুর-মজদাই জরথুষ্ট্রীয় ধর্মে একমাত্র সত্তা নন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে আহিমন, অন্ধকার, পাপ ও অসুন্দরের প্রতীক। এই দুই দেবতার সংঘাত অনন্তকাল ধরে চলছে, আহিমনকে পরাজিত করে অহুর-মজদাকে, অর্থাৎ সত্য-শিব-সুন্দরকে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। য়শ্নের ৫৫ থেকে ৭২তম অধ্যায়গুলি অপরো য়শ্ন বা পরবর্তী য়শ্ন নামে পরিচিত। এগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বন্দনা। ৫৭ অধ্যায়ের স্রাওসা, ৬২ অধ্যায়ের অগ্নিহোত্র, এবং ৬৩-৬৮ অধ্যায়ের জলরূপী বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ, য়শ্ন গ্রন্থের এই অংশের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

বিস্পরদ অংশটি ২২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে অহুর-মজদা এবং সংশ্লিষ্ট সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে। 'বিস্পরদ' শব্দটির অর্থ 'সকল দেবতার উদ্দেশ্যে' (বিশ্বে-রতবো)। আগেই বলেছি, বৈদিক ধর্ম ও আদি ঈরানীয় ধর্ম জরথুষ্ট্রের পুর্ব পর্যন্ত চারত্রের দিক থেকে একই ছিল। আদি ঈরানীয় ধর্মের প্রধান দেবতা বরুণ, যেমন বৈদিক ধর্মের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। এই বরুণ বা অহুরের (অসুর) সহায়কারী ছিলেন মিথ্র, যিনি বেদে মিত্র নামে পরিচিত। এখানে ইন্দ্রও আছেন কিন্তু তিনি অপদেবতায় রূপান্তরিত, এবং একই দুর্ভাগ্য ঘটেছে নাসত্যের কপালে। বৈদিক দেবতা অপাম্-নপাৎ ওই

একই নামে এখানে আছেন, বেদের গন্ধর্ব এখানে হয়েছেন গন্ধরেওয়া, কৃশাশ্ব হয়েছেন কেরেশানি বেদে বিবস্বতের পুত্র যম পরলোকের অধিপতি, এখানে বিবনহন্তের পুত্র যিম স্বর্গের রাজা। জরথুষ্ট্র কাঁচি চালিয়ে সকল দেবতাকে বরবাদ করতে পারেননি।

য়শং অবেস্তার অতি উল্লেখযোগ্য অংশ। জরথুষ্ট্র রচিত গাথাগুলিই এতাবৎকাল বর্তমান অবেস্তার প্রাচীনতম অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছিল, কিন্তু একালের কোন কোন পণ্ডিতের মতে অবেস্তার য়শং (সংস্কৃত : যজত) খণ্ডের কোন কোন অংশ জরথুষ্ট্রের গাথাগুলির চেয়ে বেশী প্রাচীন। য়শং-এর বিষয়বস্তুর বেশ কিছুটা অংশই প্রাক্-জরথুষ্ট্রীয় ঈরানীয় ধর্মমতের পরিচায়ক, এবং সেই ধর্ম ঋগ্বেদের ধর্মের সঙ্গে একান্তই সাদৃশ্যযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রথমেই হওম-যজ্ঞের কথা উল্লেখ করতে পারি যা বৈদিক সোম যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন। ধর্মসংক্রান্ত পরিভাষাগুলি উভয় ক্ষেত্রেই এক, যার পরিচয় বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। য়শং গ্রন্থে দশটি বৃহৎ কবিতা আছে যেগুলি প্রার্থনামূলক। অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বীরগাথা।

বেন্দিদাদ-এ সংগৃহীত হয়েছে প্রাচীন ঈরানীয় আইনকানুনসমূহ। 'বেন্দিদাদ' শব্দটি বি-দয়েব-দাত (সংস্কৃত : বি-দেব-হিত) শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ হচ্ছে 'দৈবদের প্রতিকূলে রচিত আইনসমূহ'। অবেস্তার চারটি খণ্ডের মধ্যে বেন্দিদাদের বাস্তব গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কেননা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড এবং অন্যান্য ধর্মীয় তথা সামাজিক আইনকানুন, রীতিনীতি ও বিধিনিষেধের সংগ্রহ হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য আছে। সমগ্র বেন্দিদাদ ২২টি অধ্যায়ে বিভক্ত, অধ্যায়গুলিকে বলা হয় ফারগার্দ। প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছে সৃষ্টিরহস্য দিয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যিম (যম) ও স্বর্ণযুগের কাহিনী। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে স্বর্গের আনন্দ ও নরকের যন্ত্রণা। এর পর আইনকানুন, ক্রিয়াকর্ম ও নানাপ্রকার বিধিনিষেধ। একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে চিকিৎসা ও ঔষধের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই চারটি প্রধান গ্রন্থ ছাড়াও অবেস্তা গ্রন্থমালায় আরও কয়েকটি ছোট রচনা আছে। এগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য খোরদহ্ অবেস্তা বা ক্ষুদ্র অবেস্তা যা কয়েকটি ছোট ছোট প্রার্থনামন্ত্রের সমষ্টি। নিরংগিস্তান হচ্ছে নির্ঘণ্ট যার কয়েকটি খণ্ড খণ্ড অংশ পাওয়া গেছে। কথিত আছে, আদিতে অবেস্তা একুশটি গ্রন্থে বিভক্ত ছিল যেগুলিকে বলা হত নাস্ক। বেন্দিদাদ ছিল

ঊনবিংশতিম নাস্ক। অবশিষ্টগুলির সারাংশ পহ্লবী দিনকরৎ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়। আগেই বলেছি, বর্তমানে অবেস্তা যে অবস্থায় আমাদের নিকট উপস্থাপিত হয়েছে তার রচনাকাল সাসানীয় যুগ। অবেস্তার সর্বপ্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা হচ্ছে এক কপি বিস্পরদ, প্রাপ্তিকাল ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই পাণ্ডুলিপিটি কোপেনহেগেন যাদুঘরে রক্ষিত আছে।[১]

১৮ ॥ পহ্লবী বা মধ্য-ঈরানীয় ভাষা

প্রাচীন পারসিক ভাষা আকিমিনিদ বা হখামনীসীয় বা শাখামনী রাজাদের রাষ্ট্রভাষা ছিল এবং সেই ভাষাতেই দরায়ুস (দারয়বৌষ বা ধারয়দ্বস্থ), জারেকসেস (খ্‌ষয়র্ষ) প্রভৃতি সম্রাটগণ তাঁদের নাম, গোষ্ঠী, কার্যকলাপ, রাজত্বের নিয়ম-কানুন প্রভৃতির লেখমালা প্রস্তুত করাতেন। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এই সব লেখমালা কিউনিফর্ম বা বাণমুখ হরফে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে হখামনীসীয় বংশের পতন হয়। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে বিখ্যাত পার্সিপোলিশ নগর (স্থানীয় নাম ইস্তখর) পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয় হখামনীসীয় যুগের সমুদয় সাহিত্যসৃষ্টি। কাজেই প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ এই লেখমালাগুলি ভিন্ন প্রাচীন পারসিক ভাষার সাহিত্যকীর্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতিরা তার বিশাল সাম্রাজ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন। ঈরান পড়েছিল তার অন্যতম সেনাপতি সেলুকসের ভাগ্যে। খ্রীষ্টপূঃ ১৪০ অব্দে আশকানী বা আর্সেকিদ বংশের রাজা মিথ্রিদাতেস সেলুকসের বংশধরদের পরাস্ত করে প্রথমে পার্থিয়া এবং পরে সমগ্র ঈরানই দখল করে নেন। এই নতুন রাজবংশের আমলে পুরাতন হখামনীসীয় সম্রাটদের ভাষার নতুন করে প্রচার শুরু হয়। অবশ্য নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভাষার অনেক দিকের পরিবর্তনও ঘটেছিল। কালক্রমে এই ভাষাই পহ্লবী বা মধ্য-ঈরানীয় ভাষারূপে পরিচিত হয়েছিল।

আর্সেকিদ আমলের বিশেষ কিছু সাহিত্যগত নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে সাসানীয় বংশের

১। অবেস্তার সম্পাদনা করেন N. L. Westergaard (১৮৫২-৫৪) ও K. Geldner (১৮৮৬-৯৬)। ফরাসী অনুবাদ Anquetel du Perron (১৭৭১); ইংরাজী অনুবাদ J. Darmesteter এবং H. Mills ; *Sacred Books of the East* গ্রন্থমালা দ্রষ্টব্য।

আর্তাক্সারেকসেস (অতথ্ষত্র, অর্তক্ষত্র) সমগ্র ঈরানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সাসানীয় সম্রাটদের আমলে পহ্লবী ভাষা ও সাহিত্যের চরম উন্নতি হয়। পহ্লবী ভাষার কোন নির্দিষ্ট হরফ ছিল না। সাসানীয় আমলের প্রথম যুগে প্রাচীন সেমিটিক হরফেই তা লেখা হত, কিন্তু পড়া হত পহ্লবী উচ্চারণে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় পারসিক সাহিত্যের একমাত্র ইতিহাসকার শ্রীহরেন্দ্র পাল একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। লেখবার সময় লেখা হল 'মল্কান মল্কা' কিন্তু পড়বার সময় তার উচ্চারণ হল 'শাহান্শাহ্'। অবশ্য সাসানীয় আমলের শেষ দিকে সেমিটিক লিপির ব্যবহার উঠে যায়।

তবে পহ্লবী ভাষা মধ্য-ঈরানীয় ভাষার একমাত্র প্রতিনিধি নয়। পহ্লবী ছাড়া পূর্ব ঈরানে আরও একটি উপভাষা ছিল। এ-ছাড়া সোগ্দীয়, কুষাণ, শক এবং প্রাচীন খোটানী ভাষাও মধ্য-ঈরানীয় ভাষার আওতায় পড়ে। খলচা, কূর্দী, বলোচী, ওস্সেতী প্রভৃতি উপভাষাগুলিও মধ্য ঈরান থেকে উদ্ভূত। পূর্ব-ঈরানীয় ভাষা থেকে সৃষ্ট হয়েছে পশতো। নব্য পারসিক বা ফারসী (যাকে ইংরাজীতে বলে ক্লাসিকাল পার্সিয়ান, যা ৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল) উদ্ভূত হয়েছিল পহ্লবী ভাষা থেকে।

১৯ ॥ পহ্লবী সাহিত্য

অবেস্তার পহ্লবী সংস্করণের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জরথুষ্ট্রীয় ধর্মমতের উপর পহ্লবী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য দিনকরৎ। ওল্ড টেস্টামেন্টের যেমন তালমুদ ও মিদ্রাস, কোরানের যেমন হাদিস, অবেস্তার তেমনি দিনকরৎ। এতে আছে সামগ্রিকভাবে জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের ব্যাখ্যা, সেই ধর্মের বিধিনিষেধ, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, উপদেশাবলী এবং জরথুষ্ট্র সংক্রান্ত নানান কাহিনী। দিনকরৎ রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় নবম শতকে। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ড বিলুপ্ত হয়েছে এবং নবম খণ্ডটি আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে। এরপর যে গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সেটির নাম বুন্দহীশন। এই গ্রন্থটিতে জরথুষ্ট্রের মত অনুযায়ী সৃষ্টিরহস্য বর্ণিত হয়েছে, বিশেষ করে অহুর-মজদা ও আহ্রিমনের বিরোধ। বিশ্বতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্বও এই গ্রন্থের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। এ দুটি গ্রন্থ ছাড়াও ধর্মসংক্রান্ত আরও অনেক পহ্লবী পুস্তক পাওয়া গেছে যেমন মইনিও খরদ বা জ্ঞানের জীবনীশক্তি, শায়াস্ত-লা-শায়াস্ত বা পহ্লবী রিবায়ৎ (সামাজিক ধর্মসংক্রান্ত কিংবদন্তী) আর্ট-ই-বীরফ-নামক (দার্শনিক-তত্ত্ব), বহ্মন ইয়স্ত্

(জরথুষ্ট্রের নিকট অহুর-মজদার আত্মপ্রকাশ), মটন ই-সাহ্-বাহ্রাম-ই-বরজাবন্দ (আরবদের পারস্য থেকে বিতাড়ন) ইত্যাদি।[১]

এগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ পহ্লবী সাহিত্যে বর্তমান যেগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করছি। মাটীগান্-ই-হফ্ৎ অংশস্পন্দ (সাতটি অংশস্পন্দের বিবরণ), স্থায়িশ্ন-সিহ্-রোচাক (তিরিশ দিনের প্রশংসা), স্থায়িশ্ন দ্রোন (দ্বিতীয় পিষ্টক), হকিকৎ-ই-রোজহা (দিনসমূহের বিবরণ), মাটীগান-ই-মাহ্ ফ্রবর্তিন রোজ ক্ষুর্দাৎ (প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টির বিস্ময়), মাটীগান-ই-সিহ্-রোজ (নিকট সম্বন্ধের বিবাহ) দারুক-ই-ক্ষুর্সান্দি (সন্তোষ), চীম-ই দ্রোন (দ্বিতীয় পিষ্টকের অর্থ) পাতেৎ-ই-ক্ষুৎ (স্বীকৃতি), আশীর্বাদ (আশীর্বাদ, সংস্কৃত ও পহ্লবী অভিন্ন) নমাজ-ই-অহুর-মজদা (অহুর-মজদার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা) ইত্যাদি।

এর পরে সেই গ্রন্থগুলির কথা আসে যেগুলি ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কারনামকী অর্তশীর পাপকান যাতে সম্রাট আতাজারেকসেস ও শাহ্পুরের জীবনের নানারকম কাহিনীর বর্ণনা আছে। ইয়াৎকারী জরীয়ান নামক গ্রন্থে জরথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বী গোসতাস্প ও জরথুষ্ট্রবিরোধী অরজাস্পের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উল্লেখ ফেরদৌসী তাঁর শাহনামা কাব্যে করেছেন। অপর একটি গ্রন্থের নাম খসরু-গাবাতান-ব-খোলামস। এতে আছে গবাদের পুত্র নৌশীরবান ও তাঁর ভৃত্যের কথোপকথন।

সাসানীয় আমলে কাব্যসাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সাসানীয় রাজসভার বিখ্যাত কবি ছিলেন বারবুদ। হাজী আবাদ নামক স্থানে প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত কয়েকটি পহ্লবী কবিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তী কালে ফারসী ও আরবী গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক পহ্লবী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, সম্ভবত সেগুলি সম্রাট খসরু-অনিশিরবানের সময় লিখিত হয়েছিল। গ্রীক ও

১। দিনকরৎ, বুন্দ হীশন, শায়াস্ত-লা-শায়াস্ত প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের জন্য *Sacred Books of the East* গ্রন্থমালার ৫, ৮-১১, ৩৭, ৪৭ সংখ্যক গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য। অনুবাদ করেছেন E. W. West। এ-ছাড়া D. M. Madan ইংরাজী ও গুজরাতী টীকা সহ দিনকরতের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। আর্ট-ই-বীরফ-নামক গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন হোসঙ্গজী এবং হগ (১৮৭২-৭৪); বহ্মন ইয়স্তের সম্পাদনা করেছেন নোশেরবান (১৮৯৯), অনুবাদ করেন West (*SBE* পঞ্চম), মটন-ই-সাহ্-বাহ্রাম-ই-বরজাবন্দ-এর সম্পাদনা করেছেন জামাস্পজী মোচেহেরজী (১৮৯৭-১৯১৩)।

সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও অনেক গ্রন্থ পহ্‌লবীতে অনূদিত হয়েছিল। ৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে সাসানীয় বংশের রাজা তৃতীয় ইয়জ্‌দগিরদ্‌ আরবদের হাতে নহাবন্দের যুদ্ধে পরাজিত হবার পর ঈরান ক্রমশ আরবদের অধিকারে চলে আসে, এবং সেই সঙ্গে পহ্‌লবী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের অবসান হয়।[১]

২০॥ হিব্রু ভাষা ও সংস্কৃতি

পশ্চিম এশিয়ার আরও একটি প্রাচীন ভাষা হিব্রু, সাহিত্য সম্পদের বিচারে যা গ্রীক, ল্যাটিন বা সংস্কৃতের সমতুল্যতা দাবি করতে পারে, তবে সেই সম্পদে বৈচিত্র্যের একান্তই অভাব, তার সবকিছুই মূলত ধর্মাশ্রয়ী। হিব্রু সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কয়েকটি লেখমালায়। আদি হিব্রু লিপি সেমিটিক সাধারণ লিপিরই প্রকারভেদ মাত্র, তবে পরবর্তী কালে আরামায়িক লিপিতেও হিব্রু সাহিত্যের কিছু কিছু অংশ রচিত হয়েছে।

আদি হিব্রু সাহিত্যের চারটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। (১) চূড়ান্ত একেশ্বরবাদী প্রবণতা, (২) শিল্পকলার সঙ্গে এক আশ্চর্য বিরোধ (মোজায়িক আইন অনুযায়ী এমনকি প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও ছবি আঁকা চলবে না বা ভাস্কর্যে তার উপস্থাপনা চলবে না, কেননা তা করলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করা হবে), (৩) পিতৃতান্ত্রিক নীতিবোধ এবং (৪) মিশ্র সংস্কৃতির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, য়িহুদিরা আধা-মিশরীয় অবস্থায় প্যালেস্টাইনে এসেছিল, কিন্তু মিশরের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাদের বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি। হিব্রু সাহিত্যের উপর একদিকে গ্রীক অপরদিকে মিশর, পারসিক, ব্যাবিলনীয় ও ভারতীয় প্রভাব আছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে। হিব্রু চিন্তাধারা সর্বত্রই স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। সেখানে অপরাপর চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ যেটুকু ঘটেছে তা অতি নগণ্য। দীর্ঘ কাল মাতৃভূমির সঙ্গে সংশ্রবহীনতা, পরদেশে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন ভোগ, য়িহুদি রক্ষণশীলতার একটি বড় কারণ।

১। বাংলা ভাষায় পারসিক সাহিত্যের যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয়েছিল এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এই গ্রন্থটি হচ্ছে শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল রচিত 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস,' প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৯৫৪।

২১ ॥ পুরাতন বিধি

হিব্রু সাহিত্যের যে বিশেষ নিদর্শনটির সঙ্গে আমরা অনেকেই কিছুটা পরিচিত তা হচ্ছে পুরাতন বিধি (*Old Testament*)।[১] এর অন্তর্গত গ্রন্থগুলি একই সময় এবং একহাতে রচিত হয়নি। প্রথম পাঁচটি গ্রন্থকে একসঙ্গে বলা হয় পেণ্টাটয়েখ (*Pentateuch*) যেগুলি প্রাচীনতর রচনা। এগুলির নাম যথাক্রমে আদিপুস্তক (*Genesis*), যাত্রাপুস্তক (*Exodus*), লেবীয় পুস্তক (*Leviticus*), গণনাপুস্তক (*Numbers*) এবং দ্বিতীয় বিবরণ (*Deuteronomy*)।

আদিপুস্তক পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত যা শুরু হয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ ও জীবন সৃষ্টির কাহিনী দিয়ে। এতে সৃষ্টিরহস্য, মানুষের আদি পাপ ও ঈশ্বরের অভিশাপ, আদি মানব-মানবীর বংশাবলী, পাপের বিস্তার, মহাপ্লাবন ও নোহ, নোহের বংশাবলী, আব্রাহাম থেকে জোসেফ পর্যন্ত, স্থান পেয়েছে। চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত যাত্রাপুস্তকে যিহুদিদের বৃদ্ধি ও অত্যাচার ভোগ, মোশির জন্মবিবরণ ও ঈশ্বরোপলব্ধি, মিশরের উপর ঈশ্বরের দশটি আঘাত, মিশর থেকে যিহুদিদের দেশান্তর গমন, মোশি কর্তৃক স্থাপিত নিয়মাদি এবং মোশির লৌকিক ও অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত লেবীয় পুস্তকের বিষয়বস্তু হচ্ছে মোশির অনুশাসনসমূহ, যথা বলিদানবিধি, ভক্ষ্য-নৈবেদ্যের নিয়ম, পাপ ও দণ্ড, রজস্বলা ও প্রসূতির শুচি হবার বিধান, কুষ্ঠরোগ, শৌচাশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত, পবিত্র আচরণ, মানত, ইত্যাদি। ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত গণনাপুস্তকের বিষয়বস্তু হচ্ছে যিহুদিদের গোষ্ঠীগণনা, শিবিরবাসের নিয়ম, লেবীয়দের উপর অর্পিত ভার, নাসতীয় ব্রত, দীপবৃক্ষ, নিস্তারপর্ব পালন, সীনয় পাহাড় থেকে যিহুদিদের যাত্রা, তাদের দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ ও শাস্তি, দেবপূজা ও ব্যভিচার, ইত্যাদি। চৌত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে স্থানান্তরগামী যিহুদিদের ইতিহাস, দশ আজ্ঞা বিষয়ক মোশির বক্তৃতা, যিহুদির অবাধ্যতা, ঈশ্বরোপাসনার বিধি এবং বিচারক ও রাজগণের কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

১। সমগ্র বাইবেলেরই বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়, যা বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ের বোধ হয় সার্থকতম রচনা। বাংলা বাইবেল ইংলণ্ডের সম্রাট প্রথম জেমসের আমলে অনূদিত ইংরাজী বাইবেলের অনুবাদ। ইংরাজী বাইবেলের পুরাতন বিধি অংশটি হিব্রু থেকে অনূদিত, পক্ষান্তরে নূতন বিধি গ্রীক থেকে।

পুরাতন বিধির অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশে আছে চৌত্রিশটি গ্রন্থ। এগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য যিহোশূয়ের পুস্তক (*Joshua*)। যিহোশূয় ছিলেন মোশির পরবর্তী যিহুদিদের নেতা এবং তাঁর সময়কার ঘটনাবলীই হচ্ছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (*Judges*) নামক গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে যিহুদিদের সঙ্গে আরামীয় ও মোয়াবীয়দের সংঘর্ষ, তাদের উপর মিদীয়দের পরাজয়। বিখ্যাত শিম্‌শোন ও দলীলার (Samson and Delaila) কাহিনী এই গ্রন্থের অন্তর্গত। রূতের বিবরণ (*Ruth*) একটি পতিপুত্রহীনা বিধবা ও তার পুত্রবধূর কাহিনী, যাদের বংশধর ছিলেন দায়ূদ। দুই খণ্ডে রচিত শমূয়েলের পুস্তকের (*Samuel*) বিষয়বস্তু হচ্ছে যিহুদিদের মধ্যে রাজতন্ত্রের প্রচলন, রাজা শৌল ও দায়ূদের জীবনেতিহাস। দুইখণ্ডে রচিত রাজাবলী (*Kings*) এবং দুইখণ্ডে রচিত বংশাবলী (*Chronicles*) যিহুদিদের প্রাচীন ইতিহাসের মূল্যবান আকর।

অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে ইয্রায় (*Ezra*) যিহুদিদের সঙ্গে ঈরানীদের রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা, রাজা কাইরাস ও দরায়ুসের নিকট তাদের অধীনতা এবং যিহুদিগণ কৃত অপরাধসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে। নহিমিয়ের পুস্তকে (*Nehemiah*) হখলিয়ের পুত্র নহিমিয়ের দুঃখ ও প্রার্থনা, যিরূশালেম নগরের পুনঃনির্মাণ, যিহুদিদের উপবাস, পাপস্বীকার ও নিয়মস্থাপন, যাজকবর্গের তালিকা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। ইষ্টেরের গ্রন্থে (*Esther*) ঈরানরাজ্যের অন্তঃপুরের ঘটনাসমূহ, সম্রাট কর্তৃক যিহুদিদের নিগ্রহ, সেই নিগ্রহ দূর করার জন্য রানী ইষ্টেরের প্রচেষ্টা, পরিশেষে যিহুদিদের রক্ষা, ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। ইয়োবের বিবরণ (*Job*) একজন প্রকৃত ঈশ্বরভক্তের কাহিনী যে বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও শয়তানের প্রলোভনে পা দেয়নি। গীতিসংহিতা (*Psalms*) ধর্মসঙ্গীতের সংকলন, হিতোপদেশ (*Proverbs*) ছন্দে রচিত উপদেশমালা, এবং উপদেশক (*Ecclesiastes*) দায়ূদের পুত্র বিরচিত নীতিবাক্যের সংকলন। শলোমনের পরমগীত (*Songs*) কয়েকটি সংগীতের সংকলন যেগুলির কাব্যমূল্য অসাধারণ।

পুরাতন বিধির পরবর্তী অংশের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি ভাববাদীদের পুস্তক হিসাবে পরিচিত। ভাববাদী বলতে বোঝায় ঈশ্বরের অনুগৃহীত বিশেষ প্রেরিত পুরুষগণ যাঁরা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দ্রষ্টা। এঁদের বক্তব্যের সঙ্গে ভারতীয় পুরাণসমূহ বর্ণিত ভবিষ্যকথনের সাদৃশ্য আছে। যে সকল ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী

এই সকল গ্রন্থে করা হয়েছে গ্রন্থগুলি যে সেই সকল ঘটনার পরে রচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে হচ্ছে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক (*Isaiah*) যেখানে ইস্রায়েলের ভবিষ্যৎ, আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন. ব্যাবিলন, প্যালেস্টাইন, মোয়াব, প্রভৃতি দেশের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যিরমীয় ভাববাদীর পুস্তকে (*Jeremiah*) যিহুদিদের অনাচার এবং সেই কারণে তাদের ব্যাবিলনের অধিকারে থাকার কথা বলা হয়েছে। যিহুদিদের একাংশের মিশরে পলায়ন. ব্যাবিলনরাজ নবূখদ্‌নিৎসর (নেবুসাডনেজার) কর্তৃক মিশর অধিকার প্রভৃতি ঘটনাও এখানে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট হচ্ছে একটি গীতি-সংকলন যার নাম যিরমিয়ের বিলাপ. যা এই ভাববাদী করেছিলেন যিরূশালেমের অপমান ও যিহুদিদের পাপ ও শাস্তি দর্শনে। যিহিষ্কেল (*Ezekiel*) ভাববাদীর গ্রন্থে যিহুদিদের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা বর্ষিত হয়েছে। মিশর সম্পর্কেও এখানে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। দানিয়েলের পুস্তকে (*Daniel*) নেবুসাডনেজার ও তাঁর পুত্র বেলশাজারের (বেল্‌শৎসর) অধার্মিকতা. এবং তার ফলে পারসিক ও মিদীয়দের হাতে শেষোক্তের পরাজয় ও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা. যা দানিয়েল করেছিলেন. বর্ণিত হয়েছে। হোশেয় (*Hosea*), যোয়েল (*Joel*), আমোষ (*Amos*), ওবদীয় (*Obadiah*), যোনা (*Jonah*) মীখা (*Micah*), নহূম (*Nahum*), হবক্‌কূক (*Habakkuk*), সফনীয় (*Zephaniah*), হগ্‌গয় (*Haggai*), সখরীয় (*Zechariah*) এবং মালাখি (*Malachi*) ভাববাদীদের পুস্তকসমূহে অনুরূপ বক্তব্য স্থান পেয়েছে।[১]

১২॥ পুরাতন বিধি ও হিব্রু ইতিহাস

বাইবেলবর্ণিত যিহুদিদের ইতিহাস শুরু হয়েছে কাল্‌ডিয়ার উর অঞ্চলের আব্রাহাম থেকে। মিশরে ইস্রায়েলীয়দের বসতি স্থাপন. তাদের বংশধরদের অত্যাচার ভোগ. মোশির নেতৃত্বে তাদের মিশর থেকে চলে আসা. সীনয় পর্বতের

১। পুরাতন বিধির অন্তর্গত গ্রন্থাবলীর নামের উচ্চারণগুলি কলিকাতাস্থ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীগণকৃত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে, যদিও পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজি নামগুলি দেওয়া আছে। মূল হিব্রু নামগুলি অন্যপ্রকার, যেমন আদিপুস্তক—*Bereshith* (ইং Genesis), যাত্রাপুস্তক—*Semoth* (ইং Exodus), গণনাপুস্তক—*Bamidbar* (ইং Numbers), দ্বিতীয় বিবরণ—*Debarim* (ইং Deuteronomy) ইত্যাদি।

উপর থেকে মোশি কর্তৃক সদাপ্রভুর[১] বিধিব্যবস্থা আনয়ন এবং বাঞ্ছিত ভূমির উদ্দেশ্যে তাদের গমনের ঘটনাবলী প্রাচীনতর গ্রন্থগুলিতে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় যে যিহুদিরা গোষ্ঠীনেতাদের অথবা বিচারকর্তাদের অধীনে বাস করা শুরু করেছিল কিন্তু শৌলের (Saul) আমল থেকেই তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়, এবং তাঁর উত্তরাধিকারী দায়ূদ (David) এবং সলোমনের (Solomon) আমলে ওই রাজতন্ত্রের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটে। শেষোক্তের মৃত্যুর পর উত্তরাঞ্চলের ট্রাইবগুলি জেরোবোয়ামের নেতৃত্বে পৃথক্ হয়ে যায় এবং কালক্রমে দুটি যিহুদি রাষ্ট্রের পত্তন হয়—উত্তরে ইস্রায়েল এবং দক্ষিণে জুডা। ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইস্রায়েল অসুর বা আসিরীয়দের আক্রমণে ধ্বংস হয়। ওই একই পরিণতি জুডা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ঘটে ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন ব্যাবিলনীয়রা যিরুশালেমের মন্দির ধ্বংস করে। ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন ইরানীয়গণ কর্তৃক ধ্বংস হবার পর যিহুদিরা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা পায়, এবং যিরুশালেমের মন্দির বহুকষ্টে পুনর্নির্মিত হয়। ওই শহরের দেওয়ালগুলিকে সারানো হয় নহিমিয়ের (Nehemiah) আমলে, ৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। পরবর্তী কালে যিহুদিরা গ্রীক অধিকারে আসে এবং তাদের দুটি রাষ্ট্রই সেলুকস-বংশীয় রাজাদের অধীন হয়ে পড়ে। ওই বংশের রাজা চতুর্থ আন্তিওকস তাঁর সমগ্র রাজ্যে গ্রীক জীবনধারা ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে যিহুদিদের ধর্মের উপর প্রবল উৎপীড়ন চলে। অবশেষে [illegible] খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাক্কাবী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহী যিহুদিরা একটি স্বাধীন রাজ্য পুনরায় স্থাপন করতে সমর্থ হয়, কিন্তু ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তা আবার রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। রোমক আমলে হেরডবংশ নামে খ্যাত একটি স্থানীয় বংশ রোম সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে যিহুদিদের শাসক হয়। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার ফলে যিরুশালেম শহর ও সেখানকার বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস হয়। পরে আরও একবার বার-কোখ্‌বার নেতৃত্বে যিহুদিরা বিদ্রোহ করে, কিন্তু সে বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়।

২৩॥ তালমুদ ও মিদ্রাস

যিহুদিদের আদি সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়মসমূহের কিছুটা সংশোধন ও পরিবর্তন ঘটেছিল ইয্‌রার (Ezra) আমলে আনুমানিক ৩৯৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই পরিবর্তিত

১। হিব্রুতে লেখা হয় *Yahweh* অথবা *Jehovah* কিন্তু উচ্চারণের ক্ষেত্রে তা *Adonai* যার অর্থ 'আমার প্রভু'।

বিধিসমূহকে বলা হয় তোরহ্ (Torah)। তৎসত্ত্বেও য়িহুদিদের অধিকাংশ তাদের নিজস্ব এলাকার বাইরে বসবাস করার জন্য (এদের বলা হত Diaspora) বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার-আচরণে সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। দীর্ঘকাল ধরেই অনুশাসনগুলির অধিকাংশই ছিল মৌখিক (সেগুলিকে বলা হত Mishnah) যেগুলি পরে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে লিখিত আকারে তালমুদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

তালমুদ ও মিদ্রাস, এই দুই সিরিজের গ্রন্থমালা হচ্ছে পুরাতন বিধির ভাষ্য। বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই উভয় সিরিজই হালাচা ও হাগ্গাদ এই দুটি ভাগে বিভক্ত। হালাচা অতিশয় নীরস ও গদ্যময় যেখানে পুরাতন বিধি বর্ণিত আইনকানুন এবং আচার-অনুষ্ঠানের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা আছে। পক্ষান্তরে, হাগ্গাদে অজস্র কথা ও কাহিনীর সাহায্যে পুরাতন বিধির মূল বক্তব্যগুলিকে সরস করে বোঝানো হয়েছে। জার্মান কবি হাইনে হাগ্গাদকে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক ও ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত মোট ৭১টি গ্রন্থের সমষ্টি তালমুদের দুটি সংস্করণ আছে য়িরুশালেমীয় (Talmud Jerushalmi) এবং ব্যাবিলনীয় (Talmud Babli)। তালমুদ গ্রন্থাবলীর নাম এবং বন্ধনীর মধ্যে সেগুলির অর্থ নিম্নে উল্লিখিত হল :

(১) *Seder Zeraim* (বীজ)—Berachoth (আশীর্বাদ), Peah (কোণ, Corner), Demai (সন্দেহ), Kilaiyim (বিবিধ), Shebiith (বিশ্রাম দিন), Terumot (নিবেদন), Maaserot (করসমূহ), Hallah (পিষ্টক), Orlah (বৃক্ষের লিঙ্গত্বক্), Bikkurim (প্রথম ফল)।

(২) *Seder Moed* (উৎসব)—Shabbat (বিশ্রামবার), Erubin (মিশ্রণ), Pesachim (উপেক্ষিত উৎসব), Bezah (অণ্ড), Hagigah (ভোজন), Mood Katar (অর্ধভোজন), Rosh-na-Shanah (নববর্ষ), Taanit (উপবাস), Yoma (দিন), Succah (অস্থায়ী আবাস), Shekalim (ওজন ও মুদ্রা), Megillah (ইষ্টের-নির্ঘণ্ট)।

(৩) *Seder Nashim* (নারী)—Yebamot (বিধবা ও নিয়োগ প্রথা), Ketubot (বিবাহ), Kiddushim (বাক্‌দান), Gittin (নথিপত্র), Nedarim (শপথ), Nazir (নিষ্ঠা), Sotah (ব্যভিচারিণী)।

(৪) *Seder Nezikin* (ক্ষতসমূহ)—Baba Kamma (প্রথম দ্বার),

Baba Mezia (মধ্যদ্বার), Baba Batra (শেষ দ্বার), Abodah Zarah (পৌত্তলিকতা), Sanhedrin (বিচারালয়), Makkot (আঘাত), Shebuot (শপথ), Horayot (সিদ্ধান্ত), Eduyot (সাক্ষ্য), Abot (পূর্বপুরুষদের রচনা)।

(৫) *Seder Kodashin* (পবিত্র বস্তু)—Zebahim (যজ্ঞ), Menahot (মাংস-উৎসর্গ), Bekorot (নবজাতক), Hullin (অসংস্কৃত পশুবলি), Arakin (হিসাবপত্র), Temurah (বিনিময়), Koritot (স্খলন), Meilah (অনধিকারপ্রবেশ), Kinnim (পাখির বাসা), Tamid (পক্ক নৈবেদ্য), Middot (মাপ ও ওজন)।

(৬) *Seder Taharot* (পবিত্রকরণ)—Niddah (রজস্বলা), Kelim (তৈজসপত্র), Oholot (তাঁবু), Negaim (কুষ্ঠরোগ), Parah (লাল ঘোড়া), Taharot (পবিত্র বিষয়), Mikvaot (আনুষ্ঠানিক স্নান), Makshirin (পূর্ব প্রবৃত্তি), Zabim (বীর্যপাত), Tabulyom (দৈনন্দিন উৎসর্গ), Yadayim (হস্তদ্বয়), Okatzim (বৃন্তসমূহ)।

(৭) বিবিধ—Sopherim (লিপিকর), Ebel Rabbati (বৃহৎ শোক), Semakbot (আনন্দ), Kallah (বধূ), Derekh Eretz (জগতের পথ), Perek Hashalom (শান্তির উপায়), Kuthim (কুথীয়গণ), Abadim (ক্রীতদাস)।

তালমুদ যেমন পুরাতন বিধির নিয়মসমূহ অনুযায়ী ব্যাখ্যা, মিদ্রাস কিন্তু পুরাতন বিধির অন্তর্গত গ্রন্থগুলির সামগ্রিক ব্যাখ্যা। আদিপুস্তকের মিদ্রাসের নাম বেরেশিথ রাব্বা। অনুরূপভাবে যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ, অর্থাৎ পুরাতন বিধির প্রাচীন অংশের সব কটি গ্রন্থেরই মিদ্রাস আছে। প্রধান পঞ্চগ্রন্থ (Pentateuch) ছাড়াও পুরাতন বিধির আরও কয়েকটি গ্রন্থের মিদ্রাস বর্তমান, যেমন উপদেশকের (Ecclesiastes) মিদ্রাস Koheleth Rabba, গীতসংহিতার (Psalms) মিদ্রাস Shir Hashirim, শমুয়েলের মিদ্রাস Midrash Shemuel ইত্যাদি। এ ছাড়া হাগাদীয় বা কাহিনীমূলক অংশগুলি পৃথক্‌ভাবে মিদ্রাস পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে, যেমন Midrash Agada, Midrash Haggadol, Midrash Tenchuma, ইত্যাদি।[1]

১। দ্রষ্টব্য P. I. Hershon, *Talmudic Miscellany* (1880), *Treasure of the Talmud* (1882); S. C. Malan, *The Book of Adam and Eve* (1882).

২৪ ॥ অ্যাপোকালিপ্‌সী ও অ্যাপোক্রাইফা

তালমুদ ও মিদ্রাসের পাশাপাশি আরও এক শ্রেণীর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থমালা প্রচলিত ছিল যা অ্যাপোকালিপ্‌সী ও অ্যাপোক্রাইফা নামে পরিচিত। এই দুই সিরিজের পার্থক্য বোধ হয় নামেই। এই রচনাগুলির চরিত্র গুহ্যতত্ত্বমূলক, লেথকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেনামী (যে কারণে এগুলিকে Pseudoepigraphic বলা হয় অনেক সময়)। রচনাভঙ্গী কিছুটা দুর্বোধ্য এবং ভাষা ক্ষেত্রবিশেষে সাংকেতিক। প্রথম সিরিজে ষোলটি গ্রন্থ আছে, দ্বিতীয় সিরিজে বারোটি। আসলে তালমুদ ও মিদ্রাস গ্রন্থমালা পুরাতন বিধির প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের (Pentateuch) ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, অ্যাপোকালিপ্‌সী ও অ্যাপোক্রাইফা পুরাতন বিধির অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রে সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। এই দুই পর্যায়ের সব কটি গ্রন্থই হিব্রু নয়, কিছু কিছু গ্রীকও আছে।

অ্যাপোকালিপ্‌সী পর্যায়ের গ্রন্থমালার প্রথম তিনটি সিবিলাইন ওরাকল্‌স নামে পরিচিত। এগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক, বিষয়বস্তু আমাদের পুরাণসমূহের কলিকালকথন অধ্যায়গুলির অনুরূপ। এ ছাড়া আছে দুই খণ্ডে রচিত ইনোখ, দানিয়েল (১৬৫ খ্রীঃ পূঃ), শলোমনের সঙ্গীত (৫০ খ্রীঃ পূঃ), মোশির অনুমান (৪ খ্রীঃ পূঃ), যিশাইয়র শহীদত্ব (১-৫০ খ্রীঃ), আদম-ইভের জীবনী (৭০ খ্রীঃ), দুই খণ্ডে আব্রাহামের গ্রন্থ (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক), দ্বিতীয় এস্‌দ্রাস (৯০ খ্রী.), দ্বিতীয় বারুচ (১০০-১৩০ খ্রীঃ) ইত্যাদি। অ্যাপোক্রাইফা পর্যায়ে বারোটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম দুটির নাম এসদ্রাস যা পুরাতন বিধির ইষ। গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক রচনা। শেষ দুটি গ্রন্থ হচ্ছে মাক্কাবি যা ওই নামের ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে যিহুদিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। এ ছাড়া পুরাতন বিধির জুডিথ, ইস্টের, শলোমন, উপদেশক প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক রচনাবলী অ্যাপোক্রাইফায় স্থান পেয়েছে।[১]

২৫ ॥ ডেড্‌-সী-স্ক্রোল্‌স

ডেড্‌-সী বা মরুসাগরের উত্তর পশ্চিম ভূখণ্ডের কয়েকটি স্থানে সম্প্রতি অত্যন্ত

১। R. H. Charles, *The Apocrypha and Pseudoepigraphia of the Old Testament* (1913), *Book of Enoch* (1893), *Book of Jubilus* (1897), *Testaments of Twelve Patriarchs* (1908); M. Jastrow, *Dictionary of the Targumim* (1895), M. Burrows, *The Dead Sea Scrolls* (1955).

গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহের ফলে প্রাচীন হিব্রু পুঁথিপত্র চর্চার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই আবিষ্কার যিহুদিদের ধর্মব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রচুর আলোকপাত করেছে। বিশেষ করে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের সময় ওই ধর্মের অবস্থা কিরকম ছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। অন্তত একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে যিহুদিদের প্রাচীন ধর্মের প্রভূত রূপান্তর ঘটেছিল, এবং যে আদর্শগুলি খ্রীষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্যসূচক, সেই আদর্শগুলির প্রকৃত সূচনা হিব্রুধর্মের অভ্যন্তরেই হতে আরম্ভ করেছিল।

ডেড্-সী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সাহিত্যমূলক নিদর্শনসমূহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হিব্রু ও আরামায়িক লিপিতে লিখিত, কিছু কিছু গ্রীকও আছে। প্লিনি মরুসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন যিহুদি গোষ্ঠীর বসতির কথা উল্লেখ করেছিলেন বহুকাল আগে, এবং এই আবিষ্কার তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছে। ওখানে যে ফরিশী, সাদুচি, জিয়ালো এবং খ্রীষ্টানদের পৃথক পৃথক বসতি গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অন্যান্য জায়গার মত এখানকার আবিষ্কারসমূহের ঘটনা একান্তই আকস্মিক। প্রথম আবিষ্কার ঘটে ১৯৪৫ সালে। একজন বেদুইন হঠাৎ একটি গুহা থেকে কিছু পুঁথিপত্র আবিষ্কার করে ফেলে। সেগুলির কিছুটা সে বিক্রয় করে যিরুশালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিব্রু বিভাগের অধ্যক্ষ E. L. Sukenik-এর নিকট। অবশিষ্টাংশ সে বিক্রয় করে সিরীয় অর্থোডক্স গীর্জার আর্কবিশপ A. Y Samuel এর নিকট। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪র মধ্যে পূর্বোক্ত সুকেনিক-সংগ্রহ (Sukenik Collection) সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় যিরুশালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ কর্তৃক। শ্যামুয়েল-সংগ্রহের (Samuel Collection) সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন American School of Oriental Research, এবং তা প্রকাশিত হয় ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৪৯ সাল থেকে মরুসাগর অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চলে জর্ডানের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং যিরুশালেমে অবস্থানকারী একটি ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক দলের যৌথ উদ্যোগে। ১৯৫২ সালে বাদি-কুমরান, বাদি-মুরবেৎ এবং খিবৎ মির্দ থেকে প্রচুর পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হয়। এগুলি প্যালেষ্টাইনের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়। এগুলি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন J. T. Malik (১৯৫২-৫৬ খ্রীঃ) এবং R. D. Vaux (১৯৬০ খ্রীঃ)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তিসমূহ ঘটে কুমরানে।

যে সকল পুঁথিপত্র এই অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে পুরাতন বিধি গ্রন্থমালা। যদিও তা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি তাহলেও পুরাতন বিধির যতগুলি প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে পণ্ডিতদের পরিচয় আছে এটি হচ্ছে সেগুলির সকলের চেয়ে প্রাচীন। এছাড়া পৃথক্‌ভাবে পাওয়া গেছে যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের দুটি পাণ্ডুলিপি। আরও পাওয়া গেছে অ্যাপোক্রাইফা পর্যায়ের বহু পুঁথি, যেগুলি ওই পর্যায়ের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সমুদয় পুঁথির চেয়ে অনেক প্রাচীন। স্পষ্টতই এই আবিষ্কার হিব্রুচর্চার ক্ষেত্রে নূতন একটি দিগন্তের উন্মোচন করেছে। এই অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপ এখনও শেষ হয়ে যায়নি।[১]

২৬॥ হিব্রু সাহিত্যের প্রভাবের ক্ষেত্র

হিব্রু সাহিত্যের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়: (১) দ্বিতীয় মন্দিরের যুগ (৫১৬-৭০ খ্রীঃ পূঃ), (২) তান্নাইতি যুগ (৭০-২০০ খ্রীঃ) (৩) আমোরীয় যুগ (২০০-৫০০ খ্রীঃ) এবং (৪) গায়োনীয় যুগ (৫০০-১০০০ খ্রীঃ)। ইহুদিরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসতি স্থাপন করার ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যের উপর হিব্রু সাহিত্যের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। প্রথম যিনি হিব্রু ঐতিহ্যকে ইউরোপের মাটিতে স্থাপন করেন তিনি হচ্ছেন সেন্ট পল। মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ইহুদি পেত্রাস আলফোনসাস হিব্রু সূত্র অবলম্বনে লাটিনে রচনা করেছিলেন ডিসিপ্লিনা ক্লেরিকালিস। কাপুয়ার জন রাব্বি জোয়েল রচিত কাহিনীসমূহের লাটিন অনুবাদ করেছিলেন *Calila et Dimna* নামক গ্রন্থে। জোয়েল এই কাহিনীগুলি পেয়েছিলেন পহ্লবী কলিলগ-দমনগ থেকে, যা সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্গত করটক-দমনক গল্পের আখ্যানগুলির অনুবাদ। আরবীয় ভাষাতেও এই কাহিনীগুলি কলিলহ্ ও দিমনহ্ নামে অনূদিত হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক কাহিনী হিব্রু সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে মূলত ইহুদিদের প্রেরণায় এবং ক্রুসেডারদের মারফৎ।

১। M. Burrows, *The Dead Sea Scrolls* (1955), *More Light on the Dead Sea Scrolls* (1958), R. D. Vaux, *Archaeology and the Dead Sea Scrolls* (1961); F. M. Cross, *The Ancient Library of Kumran and Modern Biblical Studies* (1958); N. Avigad and Y. Yadin, *A Genesis Apocryphon* (1956); P. Benoit, J. T. Malik and R. D. Vaux, *Discoveries in Judean Desert*, 2 vols (1955, 1961): এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপের জন্য ধারাবাহিক প্রকাশিত *Revue de Qumran* পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

আরবীয় সাহিত্যের উপরও হিব্রু সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট। কোরানের ভাষ্যকারেরা বহু ক্ষেত্রেই হিব্রু সাহিত্যের উপর নির্ভর করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তালমুদে বর্ণিত সেমহাজাই ও আজায়েলের উপাখ্যান, যা সরাসরি ভারতীয় সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, আরবীয় সাহিত্যে হারুত-মারুতের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। পুরাতন বিধির বহু কাহিনীই কিছুটা পরিবর্তিত আকারে ইসলামী পুরাণে বর্তমান।

২৭॥ প্রাক্‌-ইসলাম আরবীয় সাহিত্য

আরবীয় সাহিত্যের কিছুটা পরিচয় না দিলে বর্তমান অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছরেরও আগে আরব সভ্যতার উদয় হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আরবে কমপক্ষে চারটি শক্তিমান রাজ্য গড়ে উঠেছিল—মাইন (বাইবেল বর্ণিত মাওন), সাবা, হাদ্রামৎ এবং কাতা-বানু—কিন্তু এত পুরাতন দেশ হওয়া সত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোন আরবীয় সাহিত্যকর্মের নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি।

কোরান-পূর্ববর্তী আরবীয় সাহিত্য শুধুমাত্র কবিতা ও প্রবচনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশ কবিতারই বিষয়বস্তু ছিল নিজ গোষ্ঠীর প্রশংসা ও শত্রুগোষ্ঠীর নিন্দা, লেখা হত তিন থেকে কুড়ি লাইনের মধ্যে, লেখকদের বলা হত শা'হর। এছাড়া ছিল গীতিকবিতা ও বর্ণনামূলক কবিতা (কাশিদা), যেগুলিতে একটি করে ভূমিকাংশ (নাসিব) থাকত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের একজন মহিলা কবির রচনা পাওয়া গেছে যাঁর নাম খান-সা। যে সব পেশাদার গায়ক কবিতা গেয়ে বেড়াতেন তাঁদের বলা হত রাউই। কবিদের ব্যক্তিগত কবিতাসংগ্রহের নাম ছিল দিওয়ান।

প্রাক্‌-ইসলামী তিনটি আরবীয় কাব্য-সংকলন পাওয়া গেছে। প্রথমটি হচ্ছে আল্‌-মু'আল্লাকাৎ যাতে সাতজন কবির রচনা আছে যাঁরা হচ্ছেন আমরু-উল-কাইশ, তারফা, জুহাইর, লাবিদ, আন্তারা-ইব্‌ন-শাদ্দাদ, আমর্‌-ইব্‌ন-কলথুম এবং হারিথ-ইব্‌ন-হিল্লিজা। এ ছাড়া পরিশিষ্ট হিসাবে আরও তিনজন কবির তিনটি কবিতা আছে যাঁরা হলেন নাবিঘা, আ'শাহা এবং আবিদ-ইব্‌ন-আব্রাস। এই সকল কবির মধ্যে আমরু-উল-কাইশ সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন কিন্দা উপজাতির সর্দার। তাঁর শত্রুগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন আবিদ-ইব্‌ন-আব্রাস যাঁর রচনার উদ্দেশ্য ছিল বিপক্ষ গোষ্ঠীর বলহানি করা। কবি আ'শাহার রচনায়

ধুকারের যুদ্ধে পারসিকদের বিরুদ্ধে আরবীয় বাকর উপজাতির বিজয়লাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে লাবিদই একমাত্র কবি যিনি ইসলাম-ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, যদিও মু'আল্লাকাৎ-এ সংকলিত তাঁর কবিতাটি পৌত্তলিকতার গুণগানে ভরপুর। তারফা-রচিত কবিতাটি শুরু হয়েছে তাঁর উটের এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে এবং তারই মধ্যে মরুভূমির পরিবেশকে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আমর এবং হারিথের কবিতায় আছে নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রশংসা। একমাত্র জুহাইরের কবিতাটিই ভাবসমৃদ্ধ, তবে চরিত্রের দিক থেকে তা উপদেশধর্মী।[1]

দ্বিতীয় সংকলনটির নাম আল্-হমাশা যা ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আবু তামাম কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল, এতে মোট কবিতার সংখ্যা ৮৮৪। সর্বযুগেরই আরবীয় কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে, তবে বিশেষভাবে প্রথম হিজ্রিরা শতকের (৬২২-৭১৯) কবিতাই এতে স্থান পেয়েছে। আল্-হমাশার দশটি অধ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টির নাম 'বীরত্ব' (২৬১টি কবিতা), দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'শোকগীতি' (১৬৯টি কবিতা)। ৫৭টি কবিতা নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'ব্যবহার'। চতুর্থ অধ্যায়টি নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম নিয়ে লিখিত ১৩৯ টি কবিতার সংকলন। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ৮০টি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু 'সৌজন্য', এতে স্থান পেয়েছে ১৪৩টি কবিতা। বাকি অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে 'বিবিধ বর্ণনা' 'ভ্রমণ' 'আমোদ' এবং 'নারীজাতির নিন্দা' এবং কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ৩, ৯, ৩৮ এবং ১৮। এই বিশাল সংকলনটি নিঃসন্দেহে আরবীয় কবিতাসমূহের প্রতিনিধিস্থানীয়।

তৃতীয় সংকলনটির নাম আল্-মুফদ্দলিয়াৎ, সংকলকের নাম মুফদ্দল-ইব্ন-ইয়ালা। মূলত প্রাচীনতর কবিদের রচনাবলী সংকলন করাই ছিল মুফদ্দলের উদ্দেশ্য। সেই দিক থেকে হমাশা-র সঙ্গে এই গ্রন্থের পার্থক্য মৌলিক। তদুপরি সংগ্রাহক হিসাবে মুফদ্দল হাম্মাদ ও খালাফের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের ছিলেন। মোট ১২৬টি কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে যা ৬৮ জন কবির রচনা। প্রাক্-ইসলামীয় কবিতার এটাই হচ্ছে নিখুঁত সংকলন এবং এই গ্রন্থটির বিশেষ সম্পদ হচ্ছে পঞ্চম শতাব্দীর আরবীয় কবি মুরাকিশের দশটি কবিতা যা মুফদ্দল বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[2]

১। মু'আল্লাকাৎ-এর ইংরাজী অনুবাদ: A. J. Arbary, *The Seven Odes* (1957)।

২। মুফদ্দলিয়াৎ ও হমাশার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন Sir Charles Layall (1885, 1919-21)।

২৮। কোরান শরীফ

আরবীয় ভাষায় উচ্চারণ কুর-আন, অর্থ আবৃত্তি। ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের নিকট কোরানের কয়েকটি অংশ বাদ দিয়ে বাকি সবটুকুই ঈশ্বরের বাণী। যে অংশগুলিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা আছে, অথবা যে সকল স্থানে মোহম্মদ নিজেই বক্তা সেই সমস্ত অংশকে পৃথক্‌ভাবেই দেখা হয়। কথিত আছে, আসল যে কোরান তা স্বর্গে রক্ষিত ছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিল (২৫।৩৪) মোহম্মদের নিকট এক পবিত্র আত্মার দ্বারা (১৬।১৬৪), যিনি কালক্রমে গ্যাব্রিয়েল নামে খ্যাত হয়েছিলেন (২।৯১)। কোরানের অধ্যায়গুলি সুরা নামে খ্যাত।

কোরানের বিষয়বস্তুর পরিধি বিশাল। ধর্মীয় অংশসমূহে ঈশ্বরের একত্ব, সর্বকর্তৃত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পৌত্তলিকতা ও মানবের উপর দেবত্ব আরোপণের বিশেষ নিন্দা করা হয়েছে। স্বর্গের আনন্দ এবং নরকের যন্ত্রণা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের অবহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া কোরানে আছে অজস্র নৈতিক অনুশাসন ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের, বিশেষ করে প্রার্থনা, উপবাস, ভিক্ষাদান, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুশাসন। তদুপরি আছে সামাজিক আইন-কানুন।

মদিনায় থাকাকালীন মোহম্মদ হিব্রু সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই হিসাবে কোরানের উপর হিব্রু পুরাতন বিধি তথা তালমুদ ও মিদ্রাসের হাগ্‌গাদীয় অংশগুলির প্রভাব পড়েছে। কোরানের বহুস্থলেই পুরাতন বিধি বর্ণিত কাহিনীগুলিকে অনুসরণ করা হয়েছে, যদিও উভয় ক্ষেত্রে কাহিনীগুলি হুবহু এক নয়। খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে মোহম্মদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং কোরানের অন্তত দুটি স্থানে (৭।৪৮ এবং ৪৬।১৯) লুক বর্ণিত সুসমাচারের প্রভাব বর্তমান। বাইবেল বর্ণিত কয়েকজন প্রেরিত পুরুষও কোরানে স্থান পেয়েছেন। এ ছাড়া দুজন প্রাচীন আরবীয় ধর্মপ্রচারক সালিহ্ এবং হুদ-এর উল্লেখও কোরানে আছে (৭।৬৩, ৭।৭১, ১১।৫২)।

কোরানের যে বর্তমান সংস্করণ আমরা দেখতে পাই তাতে ১১৪টি অধ্যায় আছে, প্রারম্ভিক অধ্যায়টির নাম ফতীহ্। প্রতিটি অধ্যায়েরই (সুরা) একটি করে নাম আছে এবং সেটির রচনাস্থল (মক্কা অথবা মদীনা) ও শ্লোকসংখ্যা (আয়াৎ) দেওয়া আছে। ধর্মীয় প্রয়োজনে সমগ্র কোরানকে ৬০ খণ্ডে

(আহ্‌জব) অথবা ৩০টি বিভাগে (অজ্‌জা) ভাগ করা হয়েছে, প্রতিটি খণ্ড বা বিভাগের আবার কয়েকটি করে উপবিভাগ (রুকা বা সজদা) আছে। সমগ্র কো'রানের মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও আছে, যেগুলির সংখ্যা, পণ্ডিতদের মতে, ৫ থেকে ১০০।

লিখিত আকারে কোরানকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন মোহম্মদের অনুরক্ত সেবক জাইদ ইব্‌ন থাবিট, এবং আবুবকর যখন আরবের খলিফা তখন খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে একটি গ্রন্থে রূপ দেওয়া হয়। আবুবকরের মৃত্যুর পর গ্রন্থটি খলিফা ওমরের কন্যা, মহম্মদের অন্যতম পত্নী, হাফজার অধিকারে আসে। ইতিমধ্যে কোরানের বহু জাল সংস্করণ বেরিয়ে যায়, ফলে ওসমানের রাজত্বকালে জাইদকে সভাপতি করে কোরেশ বংশের তিনজন লোক নিয়ে একটি কমিশন বসানো হয় মূল কোরানের অনুলিপি প্রস্তুত করার জন্য। খলিফার আদেশে একমাত্র হাফজার কাছে রক্ষিত মূলগ্রন্থটি ছাড়া, বাজারে প্রচলিত সমস্ত জাল কোরান পুড়িয়ে ফেলা হয়। বর্তমানে আমরা যে কোরান দেখি তা খলিফা ওসমানের আমলের সংস্করণ, যা রচিত হয়েছে হাফজার কাছে রক্ষিত মূল গ্রন্থ থেকে।

কোরানের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের সংখ্যা অজস্র, যেগুলির মধ্যে সবাপেক্ষা বিখ্যাত হচ্ছে হাদিস।

এবার কোরানের বিষয়বস্তুর কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক। কোরানের প্রায় অর্ধাংশই আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তনে নিয়োজিত। আল্লাহ্ শব্দটির ঠিক কোন প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোরান অনুযায়ী সকল পূর্ণ গুণের আধার, সকল ত্রুটিবর্জিত, স্বয়ম্ভু ও নিশ্চিত অস্তিত্ববান যে সত্তা, তাঁরই নাম আল্লাহ্। রামানুজ প্রমুখ ঈশ্বরবাদী বৈদান্তিকদের কল্পিত ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে আল্লাহ্‌র ভাবগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কোরানে আল্লাহ্‌র ৯৮টি গুণবাচক নাম আছে।

কোরানের দ্বিতীয় সুরা বকরা নামে খ্যাত। এই সুরা বা অধ্যায়ে যিহুদি জাতির পতনের কারণ বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই দিক থেকে এই অধ্যায়টির রীতিমত ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। আদি মানবমানবী হিসাবে আদম ও ইভের (ইভের ইসলামী নাম হবা) স্বীকৃতি কোরানেও আছে, নিষিদ্ধ ফলের উল্লেখ না থাকলেও নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা আছে এবং শয়তান (ইবলিশ) কর্তৃক উভয়ের পদস্খলনের কথা কোরানে উল্লিখিত। তবে বাইবেলের কাহিনীর

সঙ্গে কোরান বর্ণিত কাহিনীর পার্থক্য এই যে, বাইবেলের আদি মানব-মানবীকে যেখানে নিষিদ্ধ ফলভক্ষণরূপ আদিম পাপের ঋণ বংশপরম্পরায় স্বীকার করে যেতে হয়েছে চরম দুঃখ ও দণ্ডভোগের ভিতর দিয়ে, কোরান কথিত আদম কিন্তু অল্পেই আল্লাহ্‌র ক্ষমা পেয়েছিলেন, কেন না আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল।

কোরানের বাণী অনুযায়ী আল্লাহে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের অভাবেই য়িহুদিদের পতন হয়েছিল, এবং কোরানে এ কথাও বারবার বলা হয়েছে যে, য়িহুদিরা যদি মোশির অনুশাসনগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত তাহলে ঈশ্বরের রুদ্ররোষ তাদের উপর নেমে আসত না। কোরানে খ্রীষ্টেরও উল্লেখ রয়েছে মরিয়ম-তনয় ইশা এই নামে। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্মসংক্রান্ত অলৌকিক কাহিনীগুলি কোরান স্বীকার করে না।

এ ছাড়া কোরানে আছে অজস্র সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসন, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য-বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধানসমূহ। একটি সমগ্র রুকু সুদগ্রহণের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়েও কোরানের বিবিধ নির্দেশ আছে। জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য কোরানে বর্ণিত হয়েছে। কোরানে মানবসমাজকে যে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়েছে, সেগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে: (১) তত্ত্বজ্ঞান বা মারফাতে এলাহী (২) পরলোক-তত্ত্ব বা এলমুল মা'আদ এবং (৩) অদৃষ্টবাদ ও কর্মবাদ।

কোরানের মারফাতে এলাহী বা তত্ত্বজ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌কে পেতে হলে প্রথমেই তাঁর নাম জপ করতে হবে, কোরানীয় পরিভাষায় এই জপ করার নাম জেকের। নামের মধ্যে নিহিত ভাবের যথাসাধ্য ধারণা করার সঙ্গে মুখে সেই নামের উচ্চারণ, মোটামুটিভাবে এরই নাম জেকের। সুরা বকর-এ বলা হয়েছে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অভিভাবক, তাদের তিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসেন। এই জ্যোতি বা আলোককে কোরানে 'নূর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নিশ্চিত সত্তা, সকল গুণের আকর, সকল ত্রুটিবর্জিত, মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকট বন্ধু যে আল্লাহ্ তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণার জন্য সাধকের প্রথম যে অবলম্বন তা হচ্ছে 'নাম-জপ' বা জেকের। আল্লা স্বভাবতই প্রেমময়। সুরা মরয়মের একটি আয়াতে (শ্লোক) বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসবান ও সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের অবিলম্বে প্রেম প্রদান করেন।

কোরানের এলমুল মা'আদ বা পরলোক-তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে যে দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না। মানুষ ইহজীবনে সৎ বা অসৎ যা কর্ম করে পরজীবনে তার অনুরূপ সুফল বা কুফল তাকে ভোগ করতে হবে। জন্মান্তরবাদ কোরানে স্বীকৃত নয়, কিন্তু সেখানে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লার আদেশে মানুষকে নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে আল্লার প্রতি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি, এবং নিজের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে, তা সম্পাদনা করার নাম আমল বা এবাদত। এই এবাদত বা দাসরূপেই আল্লাহের নিকট আত্মসমর্পণ মানুষের কর্মজীবনের প্রধান সাধনা।

কোরানে বলা হয়েছে যে, মানুষ ইচ্ছা ও শক্তিশূন্য অচল জড় পদার্থের ন্যায় সম্পূর্ণ অক্ষম নয়, পক্ষান্তরে সে সর্বশক্তিমান ও সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়। তার শক্তি আছে কিন্তু তা সীমাবদ্ধ, জ্ঞান আছে কিন্তু তা মায়াপ্রপঞ্চে আচ্ছাদিত, ইচ্ছা আছে কিন্তু তা রিপু ও প্রবৃত্তির প্রভাবে আবিষ্ট। তাই তার জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছার সার্থকতার জন্য সে একান্তভাবেই আল্লাহের উপর নির্ভরশীল।[১]

২৯॥ মহম্মদোত্তর যুগের আরবীয় কাব্যসাহিত্য

মহম্মদের মৃত্যুর পরবর্তী শতকে, অর্থাৎ ওম্মীয় যুগে আমরা, চারজন কবির উল্লেখ পাই। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে আখতাল, ফরাজদক, জরীর এবং ধুর রুম্মা। এঁদের কবিতায় সেই পুরাতন আমলের আরব কবিদের মতই গোষ্ঠিসচেতনতা আছে, কিন্তু কোন জাতীয় সাহিত্যের প্রতিফলন তাঁরা ঘটাতে পারেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে ইসলামধর্মের অনুপ্রেরণায় আরবে জাতীয়তাবাদের বিকাশ তথা জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। মক্কার ওমর-ইবন-আবি-রবিয়া এবং তাঁর শিষ্য জামিল দেহাতিতে প্রেমকেই তাঁদের কবিতার উপজীব্য বিষয় করেছিলেন। এঁদের রচনাসমূহ গোষ্ঠিকেন্দ্রিক প্রবণতাসমূহকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিল। এঁদের অনুসরণ করে একটি কবিগোষ্ঠী গড়ে

১। কোরানের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন রডওয়েল। বাংলায় গিরীশচন্দ্র সেন, মোহম্মদ আকরাম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ। কোরানের বৃহত্তম ও একটি দুর্লভ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে রোমের জুম্মা মসজিদে। ৭৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৪১ ইঞ্চি চওড়া এই গ্রন্থটি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পৃথিবীর বৃহত্তম কোরান যার মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২০০। প্রতিটি পৃষ্ঠা দুটি করে কলামে এবং গড়পড়তা ১৫টি করে অনুচ্ছেদে বিভক্ত। মূল আরবীয়ের পাশাপাশি তার একটি পারসিক অনুবাদও এখানে বর্তমান। অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত সাধক এবং পারসিক পণ্ডিত মহম্মদ গৌশ।

উঠেছিল যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মজহুন বনি আমীর এবং লাইলা। খলিফা প্রথম ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩) এবং খলিফা ওয়ালিদ (৭৪৩-৪৪) নাম-করা কবি ছিলেন।

আব্বাসীয় যুগে আরবীয় সংস্কৃতি পারসিক বা পহ্‌লবী সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই প্রভাব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। এই নূতন সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রতীক ছিলেন কবি আবু নুওয়াস। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি প্রগতিশীল রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এই নূতন গোষ্ঠী আরবীয় কবিতার আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য প্রাচীনপন্থী কবিরাও সংখ্যায় বড় কম ছিলেন না। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইব্‌ন ওয়ালিদ, আবু তাম্মান ও মুতান্নবী। অবশ্য এই সব কবির রচনাবলীর নিদর্শন নেই বললেই চলে। আব্বাসীয় যুগের শেষ দিকের কয়েকজন কবির রচনা অবশ্য পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আবুল আতাহিয়া যিনি নীতিমূলক কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক কাব্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ইব্‌ন আল মুতাজ। রোমান্টিক কবি আবুল আলাউল মা'আরি রচিত লুজুমিয়াৎ আরবীয় কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আব্বাসীয় যুগের অপরাপর কবিদের মধ্যে ছিলেন অতীন্দ্রিয় কবি ইব্‌ন আরাবা এবং ইব্‌ন ফরিদ।

আরবীয় কবিতা পরবর্তী কালে ইউরোপ মহাদেশেও একটি বিশিষ্ট স্থান-লাভে সক্ষম হয়েছিল। স্পেনে সেভিলের ইব্‌ন হানি আরবীয় কবিতা জনপ্রিয় করেছিলেন। স্পেনে আরবীয় কবিতার একটি নূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়েছিল যা মুওয়াশ্‌শাহ নামে বিখ্যাত। মূল আরব ভূখণ্ডের বাইরে যাঁরা আরবীয় কবিতাকে জনপ্রিয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাইরাওয়ানের ইব্‌ন রসিক, কর্ডোভার ইব্‌ন জাইদুন, সেভিলের রাজা মুতামিদ এবং তাঁর মন্ত্রী ইব্‌ন আম্মর। এ ছাড়া ছিলেন সিসিলির বিখ্যাত আরব কবি ইব্‌ন হামদিস।

৩০ ॥ আরবীয় গদ্যসাহিত্য

খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতক থেকেই আরবীয় গদ্যসাহিত্যের বিকাশ আরম্ভ হয়। আরবীয় গদ্যসাহিত্য চরিত্রের দিক্‌ থেকে খুব মৌলিক নয়। আরবীয় গদ্য-

সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন হিসাবে প্রথমেই যে গ্রন্থটির কথা মনে উদিত হয় তা হচ্ছে কালিলা-ওয়া-দিমনা। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের এই অংশ প্রথমে অনূদিত হয়েছিল পহ্‌লবীতে, সেখান থেকে আরবীয় ভাষায়। এই গ্রন্থটির হিব্রু সংস্করণের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাহিনীমূলক গদ্যসাহিত্য হিসাবে তানুখী রচিত ফরজ্‌বাদ-আশ-সিদ্দা এবং নিশ্‌ওয়ার-আল্‌-মুহাওরা এই দুটি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য, দুটি গ্রন্থই নবম শতকে রচিত।

রসরচনার ক্ষেত্রে আরবীয় সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন হামাধানি। তাঁর রচিত মাকামাৎ একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই রচনার নায়ক একটি ভ্যাগাবণ্ড যার কাজ বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তার দ্বারা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও নামকরা ব্যক্তিদের খোশামোদ করা। পরবর্তী কালে এই শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন হারিরি। এইগুলি ছাড়াও ঈশপের গল্পগুলির আরবীয় অনুবাদ এবং বিখ্যাত এক সহস্র এক রজনী-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

১। বিখ্যাত 'এক সহস্র এক রজনী'র, বা আরব-রজনী বা অ্যারাবিয়ান নাইট্‌স নামেও পরিচিত, আরবীয় নাম আল্‌ফ লায়্‌লা ওয়া লায়্‌লা। এই গ্রন্থটির রচনাকাল ও রচনাস্থান সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। বিখ্যাত আরব গ্রন্থতালিকাকার ইব্‌ন আল্‌ নদীম তাঁর আল্‌-ফিহ্‌রিস্ত্‌ গ্রন্থে আরবা-রজনীর কাহিনীগুলিকে বাজে এবং অকেজো আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত লেখক যহ্‌শিয়ারী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতকে আরবা-রজনী রীতিমত জনপ্রিয় ছিল এবং সেই হিসাবে মূল গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকের মধ্যেই ধরা উচিত। কাহিনীগুলি নিশ্চয়ই একই সময়ে এবং একই হাতে রচিত হয়নি। অনেক কাহিনীই পরবর্তী কালে মূল কাঠামোটির মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং কাহিনীগুলি সংগৃহীত হয়েছে নানা দেশের প্রচলিত কাহিনী থেকে। মূল কাঠামোটি হচ্ছে—জনৈক রাজা ঘটনাচক্রে প্রচণ্ড রকমের নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। তিনি প্রত্যহ একটি করে বিবাহ করতেন এবং পরদিন প্রভাতে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে হত্যার নির্দেশ দিতেন। এই বিকারের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্য জনৈক মন্ত্রিকন্যা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তাঁকে বিবাহ করেন, এবং প্রতি রাত্রে একটি করে গল্প শুনিয়ে তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন। আরবা রজনীর প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদ হয় ফরাসী ভাষায় ১৭০৪ থেকে ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অনুবাদক ছিলেন Antoine Galland। চারটি সিরীয় পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে রচিত এই অনুবাদটির নাম *Les Mille et une Nuits*। আরবীয় হরফে আরবা-রজনীর সর্বপ্রথম মুদ্রণ হয়েছিল কলকাতায়, ১৮১৪ থেকে ১৮১৮-র মধ্যে। চারখণ্ডে মুদ্রিত এই গ্রন্থটি কিন্তু ছিল অসম্পূর্ণ ও ভুলে ভরা। এরপর একটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য আরবীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বুলাক (কায়রো) থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, এবং এই মিশরীয় সংস্করণটিই কালক্রমে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভরসাস্থল হয়ে ওঠে। অপর একটি প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে ব্রেসলো থেকে মাক্সিমিলিয়ান হাবিখ্‌টের সম্পাদনায় প্রকাশিত **usend**

মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনকথা অনেক লেখকেরই রচনার উপজীব্য বিষয় হয়েছিল। মোহম্মদের প্রথম জীবনীকার ছিলেন ইব্‌ন ইসাক। পরবর্তী জীবনীকারদের মধ্যে ইব্‌ন ওকবা এবং ওয়াকিদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মক্কার ইতিহাস প্রথম লেখেন আজরাকি, এবং ইব্‌ন মোকাফা পারসিক রাজন্যবর্গের কাহিনী আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবীয় ঐতিহাসিকদের রচনা প্রচুর, কিন্তু অন্য ভাষা থেকে অনূদিত। ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত ও অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবীয় অবদান যথেষ্ট। কিন্তু আগেই বলেছি, একমাত্র কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর ক্ষেত্রে রচিত আরবীয় গ্রন্থাবলী অপরাপর দেশে রচিত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতীয় চরক ও সুশ্রুতসংহিতা এবং গণিতবিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে কিছু ভারতীয় পণ্ডিতকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

অবশ্য এই অনুবাদপ্রবণতার জন্য আরবীয়দের দোষ দেওয়া যায় না। মোহম্মদের পূর্বে আরবজাতি বলে কিছুই ছিল না। ইসলামধর্মকে অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যে আরবীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়, তার ফলে জগৎ ও জীবনকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করার যে মনোভাব আরবীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তার চাহিদা মেটানোর জন্য অতীতকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলিকে অনুবাদ করে নেওয়া ভিন্ন তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। ভারতীয়, গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থের আরবীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়ায় তাদের জীবনে যে নূতনতর প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। আব্বাসীয় খলিফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খলিফা মামুন নিজের চারপাশে অনেক পণ্ডিতকে

---

und eine Nacht: Arabisch ১৮২৫ থেকে ১৮৪০-এর মধ্যে। ই. ডব্লিউ. লেনের অসম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৩৮-৪০-এ। এরপর জন পাইনের অনুবাদ নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৮২-৮৪-তে, পরে অতিরিক্ত আরও আরও তিনটি খণ্ড তিনি প্রকাশ করেন ১৮৮৯-তে। বস্তুত আরব্য-রজনীর সবচেয়ে ভাল এবং প্রামাণ্য যে অনুবাদ তা করেছিলেন রিচার্ড বার্টন যা প্রকাশিত হয়েছিল ১০ খণ্ডে ১৮৮৫-তে, এবং পরে যার সঙ্গে অতিরিক্ত আরও ছয়টি খণ্ড যোগ হয়েছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত স্মিথারকৃত বারো খণ্ডও বেশ নির্ভরযোগ্য। ই. লিটমান-কৃত ছয় খণ্ডের জার্মান অনুবাদও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২১ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে। এই অনুবাদটির দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৩-৫৪-তে।

সমবেত করেছিলেন এবং আলোচনা, অনুবাদ ও সঙ্কলন কার্যের জন্য একটি জ্ঞানসভা (বায়তুল হীকমাৎ) স্থাপন করেছিলেন।

গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদকারীদের মধ্যে ছিলেন আরিস্টটল ও প্লেটোর রচনার আরবীয় অনুবাদক হুনাইন (৮০৯-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাঁর পুত্র ইশাক (৮৭০-৯১০ খ্রীষ্টাব্দ)। অন্যান্য অনূদিত গ্রন্থগুলি ছিল আলেকজাণ্ডার, আফ্রোদিসিয়াস ও পরফিয়াসের টীকাসমূহ, এবং প্লটিয়াসের এন্নিয়াদের কিছু কিছু অংশ। অপরাপর অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন. আল্ কিন্দী (মৃত্যু ৮৭৩), ফারাবী (মৃত্যু ৯৫০), ইখবান-আল্-সফা (মৃত্যু ৯৭০, এঁরা একটি গোষ্ঠী ছিলেন), ইব্‌ন মসকোয়াইব (মৃত্যু ১০৩০) এবং ইব্‌ন সিনা (মৃত্যু ১০৩৭)। এঁরা ছিলেন প্রাচ্য দেশে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে খ্যাতনামা পুরুষ।

আরবীয়দের অনুবাদ-প্রবণতার ফলাফল জগৎবাসীর নিকট মঙ্গলদায়ক হয়েছে —একথা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূলে আরব মনীষার যথেষ্ট অবদান ছিল। হারিয়ে-যাওয়া গ্রীক দার্শনিকদের রচনার আরবীয় অনুবাদ আরব বণিকেরাই ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই মারফৎ ইউরোপবাসী নূতন করে তাঁদের পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। যদিও আরব মনীষায় মৌলিকতার কিছুটা অভাব ছিল. তথাপি অনুবাদের মধ্যে তারা যা করেছিলেন তার তুলনা নেই।[১]

১। দ্রঃ H. A. R. Gibb, *Arabic Literature, An Introduction* (১৯২৬)।

গ্রীক সাহিত্য

১॥ সূচনা

যে দেশটিকে আমরা বর্তমানে গ্রীস বলে জানি, আদিতে তার নাম ছিল হেলাস (Hellas); আধুনিক গ্রীকভাষায় বলা হয় Ellas বা Elladha। গ্রীস (ল্যাটিন Graecia) নামটি রোমকদের দেওয়া।

মূলত হেলেনীয় ভাষাকে অবলম্বন করে উত্তরকালে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই ভাষাটি সংস্কৃত বা প্রাচীন ঈরানীয়ের মত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সদস্য। অ্যাটিক (Attic), এওলীয় (Aeolic), আইওনীয় (Ionic), ডোরীয় (Doric) এবং সাইপ্রীয় (Cyprian)—এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হেলেনীয় ভাষার অ্যাটিক শাখাটিই কালক্রমে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সমগ্র বল্কান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল, দক্ষিণ ইটালী ও সিসিলি এবং আইওনিয়ান ও ঈজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। কালক্রমে এই ভাষা থেকেই সার্বজনীন গ্রীক ভাষা বা *Koine*-এর উৎপত্তি হয়। এ থেকেই আবার নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক গ্রীক ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

কিন্তু এই হেলেনীয় ভাষারও একটি প্রাক্-হেলেনীয় অতীত ছিল যার নিদর্শন পাওয়া যায় পাইলোস, মাইসেনি ও ক্রীটে প্রাপ্ত লেখমালাসমূহে। এগুলিতে ব্যবহৃত লিপি গ্রীক নয় এবং তার পাঠোদ্ধার আজও হয়নি। খননকার্যের ফলে ক্রীট থেকে প্রাপ্ত প্রাক্-হেলেনীয় সংস্কৃতিসমূহের অবশেষের ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা বলেন যে দেবতা জিউস ও ডাওনিসোস, দেবী ডিমিটার ও তৎকন্যা পার্সিফোনি, রাজা মিনোস প্রভৃতি কাহিনীসমূহের উদ্ভব সম্ভবত ক্রীট থেকেই হয়েছিল। হিসারলিক, টিরাইনস ও মাইসেনিতে হাইনরিখ সেলিগ্‌মানের খননকার্য, নোসস টিলায় আর্থার ইভান্সের আবিষ্কারসমূহ, এবং পরবর্তী কালের ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপ প্রাক্-হেলেনীয় সংস্কৃতিসমূহের উপর প্রচুর আলোকপাত করেছে।[১]

১। প্রাক্-হেলেনীয় সংস্কৃতিসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য: G. Glotz, *Aegean Civilization* (1925), V. G. Childe, *Dawn of European Civilization* (1927), G. Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, Vol. I (1949)।

হেলেনীয় ভাষাসমূহের প্রকাশের মাধ্যম যে গ্রীক লিপি তার ব্যবহার খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে নিশ্চিতভাবে শুরু হয়েছিল। এই লিপি মূল গ্রীক ভূখণ্ডের বাইরেও জনপ্রিয় ছিল, এমনকি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও, বোধ করি সেখানকার গ্রীক বাসিন্দাদের জন্য। অশোকের অনুশাসনও গ্রীক লিপিতে পাওয়া গেছে। গ্রীক লিপিকে অবলম্বন করে পরবর্তী কালের বহু লিপির উদ্ভব হয়েছে, যেমন সিরিলীয় লিপি, যাতে রুশ এবং পূর্ব-ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষা লিখিত হয়।[১]

২ ॥ হোমারের যুগ[২]

আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকেই গ্রীক আদিকবি হোমারের কাল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। হোমার নামে আদৌ কোন কবি ছিলেন কিনা এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অবশ্য বিতর্ক আছে। হোমারের জন্মভূমি হিসাবে সাতটি স্থানকে দাবি করা হয়—এথেন্স, স্মার্না, রোডস, কলোফোন, সালামিস, চিওস এবং আর্গোস। হোমারের মহাকাব্যদ্বয় যে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে রচিত হয়েছিল, এবং তাঁর জন্মস্থান যে স্মার্না এই মতবাদ একদা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে হোমার আসলে ছিলেন আইওনীয়, ভাগ্যের সন্ধানে তিনি দেশান্তরে গিয়েছিলেন। কথিত আছে, হোমারের পিতার নাম মেলেস, তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু হয়েছিল আইওস দ্বীপে, যেখানে তাঁর নামে একটি সমাধি আছে।

১। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক সময় গ্রীক নাম লাটিন উচ্চারণ অনুসরণে লিখে থাকেন যার ফলে এই ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বড় অসুবিধা হয়, এবং এই রচনাতেও তা রাখা যায়নি। সেইজন্য মনে রাখা ভাল যে সচরাচর গ্রীকে *c* (স)-এর জায়গায় *k* (ক), *y* (ই, আই)-এর জায়গায় *u* (উ), *u* (উ)-এর জায়গায় *o* (ও, অ) এইরকম উচ্চারণ হয়, যেমন *Cyrus* (সাইরস), গ্রীকে হবে *Kuros* (কুরোস)। আবার ইংরাজী উচ্চারণের পাল্লায় পড়ে *us* (উস) *as* (আস)-এ পরিণত হয়, যেমন *Cyrus*=সাইরাস। এখানে যেগুলি খুবই পরিচিত নাম সেগুলির প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণই বজায় রাখা হয়েছে, যেমন এস্কাইলাস (Aeskhulos=Aeschylus), হেরোডোটাস, ইত্যাদি। গ্রীকে ট বর্গের কোন উচ্চারণ নেই।

২। আধুনিক দৃষ্টিকোণে হোমারের মহাকাব্য দুটির সম্পাদনা সর্বপ্রথম করেছিলেন ডিমিট্রিয়াস চালকনডাইলাস ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর আলডাইনস ইলিয়াড সম্পাদনা করেন ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং অডিসি ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। উনিশ শতকে মহাকাব্য দুটি আবার নূতন করে

হোমারের ইলিয়াড ও অডিসি উভয় মহাকাব্যই চব্বিশটি করে অধ্যায়ে বিভক্ত। ইলিয়াড মহাকাব্যটি দশ বছরব্যাপী ট্রয়যুদ্ধের শেষের দিকের একান্ন দিনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অ্যাকিলিসের ক্রোধ থেকে কাহিনীর শুরু, এবং হেক্টর বধেই সমাপ্তি, মূল কাহিনীটি কিন্তু এরই মধ্যে সংক্ষেপে বলা আছে। অডিসির কাহিনী ইলিয়াডেরই পরিশিষ্ট, ট্রয়যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে দলছাড়া বীর অডিসিউসের কাহিনী।

ট্রয়যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বন করেই হোমারের মহাকাব্যদ্বয় গড়ে উঠেছিল, কিন্তু যুগে যুগে এই যুদ্ধের কাহিনী বিভিন্ন রচয়িতার হাতে পড়ে বিভিন্ন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যে ঘটনাগুলি আমাদের আলোচ্য মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি পরবর্তী লেখকগণ কর্তৃক অপরাপর লৌকিক জনশ্রুতির সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল, অথবা তাঁরা স্বকপোলকল্পিত অনেক কাহিনী মূল বিষয়ের উপর আরোপ করেছিলেন। যেমন হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী হেলেনের অপহরণই হচ্ছে ট্রয়যুদ্ধের মূল কারণ, এবং এই অপকর্মটি ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস করেছিলেন নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায়, সেখানে পরবর্তী লেখকগণ প্যারিসের কাজের সমর্থনে একটি আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছেন যে, একদা তিনজন বিখ্যাত দেবী—হেরা, আথেনী ও আফ্রোদিতি—নিজেদের মধ্যে সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় প্যারিসকে বিচারক খাড়া করেন এবং প্যারিস আফ্রোদিতিকে বিজয়মাল্য দিলে আফ্রোদিতির করুণাতেই সে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেনের উপর অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়, যার ফলে হেরা ও আথেনা প্রতিহিংসাবশত প্যারিসের সর্বনাশ সাধনের যে চক্রান্ত করেন তারই পরিণতি হয় ট্রয়যুদ্ধ। হোমারের বর্ণনা অনুযায়ী হেলেনের অপহরণের পর তার স্বামী মেনেলাউস ও ভ্রাতা আগামেম্নন অন্যান্য গ্রীক রাজাদের নিকট হেলেনকে উদ্ধারের জন্য সাহায্যের আবেদন করেন এবং সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়। পরবর্তী কালে এই রকম কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে যে, হেলেনের বিবাহের পূর্বে যারা তার প্রেমের প্রার্থী ছিল তারা ঘটনাচক্রে

সম্পাদিত হয়, সম্পাদনা করেন লা রোচে, লুডভিগ প্রভৃতি। এই সকল কাজকে ভিত্তি করে অ্যালেন পাঁচ খণ্ড হোমারের মহাকাব্যদ্বয়ের যে সম্পাদনা করেছেন (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) তাই বর্তমানে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। হোমার ও তাঁর যুগ সম্বন্ধে বিশদভাবে জ্ঞাত হবার জন্য জ্রাউনের *Hanlbook of Homeric Studies* (১৯০৮), ইওয়েলের *Homer and the Iliad* (১৯০৯), টমসনের *Studies in the Odyssey* (১৯১৪), গিলবার্ট মারের *Rise of the Greek Epic* (১৯০৭, ১৯২৫) এবং চাডউইকের *The Heroic Age* (১৯১২) দ্রষ্টব্য।

হেলেনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে হেলেনের বিপদে তারা এগিয়ে আসবে। হোমার লিখেছেন যে গ্রীকবাহিনী সোজাসুজি ট্রয়ে গিয়ে পৌছেছিল। এই ব্যাপারটিকে পরবর্তী কাহিনীকারেরা সহজে ঘটতে দেননি। তাঁরা গ্রীক-বাহিনীকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে একেবারে মাইসিয়া দ্বীপে হাজির করেছিলেন এবং অনেক ঝামেলার পর, আগামেম্‌ননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দিয়ে দেবী আর্টেমিসের করুণায় শেষ পর্যন্ত তারা ট্রয়ে গিয়ে হাজির হয়। ট্রয়-ভরসা হেক্টরের মৃত্যুর পর আমাজোনদের এক নারীবাহিনী ট্রোজানদের সাহায্যার্থে রণক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তারা অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হয়। এ কাহিনী হোমার বলেননি। এইরকম ব্যাপার অডিসি মহাকাব্যেও প্রচুর আছে। পরবর্তী লেখকগণ অডিসিউসকে হেলেনের অন্যতম প্রাক্তন প্রেমিক বানিয়ে ছেড়েছেন, কিন্তু এ বিষয়ে হোমার নীরব। অডিসিউসের সঙ্গে তাঁর পুত্র টেলেগোনাসের যুদ্ধের কাহিনীও হোমারে উল্লিখিত নেই। অডিসিউসের আরও দুই পুত্র আগ্রিয়োস ও লাটিনোস সম্বন্ধেও হোমার নীরব, কিন্তু পরবর্তী কবিগণ তাঁদের নিয়ে অনেক কথা বলেছেন।[১]

চব্বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত ইলিয়াডের প্রতিটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার আমরা এখানে পরিবেশন করছি। (১) ট্রয়যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আগামেম্‌নন কোন কারণে অ্যাপোলোদেবের পুরোহিতের কন্যাকে আটকে রেখেছিলেন। সেই পুরোহিত নিজ কন্যাকে ফিরিয়ে দেবার দাবি জানিয়ে আগামেম্‌নন কর্তৃক রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হন। তখন দেবতা অ্যাপোলো ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রীকবাহিনীর মধ্যে মহামারী প্রেরণ করেন এবং সকলের চাপে পড়ে আগামেম্‌নন মেয়েটিকে ফেরত দিতে বাধ্য হন, কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি গ্রীক বীর আকিলিসের প্রিয় ক্রীতদাসী ব্রিসেইসকে গ্রহণ করেন। এতে অ্যাকিলিস ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা

১। যাঁরা হোমারবর্ণিত কাহিনীগুলিকে নিজস্ব ভঙ্গীতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রূপদান করেছিলেন তাঁদের একটি তালিকা দিয়েছেন ব্যাকরণবিদ্ প্রোক্লুস যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দের লোক ছিলেন। এই তালিকা অনুযায়ী আমরা অন্তত ছয়টি রচনার উল্লেখ পাই। প্রথমটি হচ্ছে ট্রোয়েজেনের এজিয়াস রচিত নোস্তেই (*Nostoi*) বা প্রত্যাবর্তনের কাহিনী; দ্বিতীয়টি সাইরেনের অয়গাম্মন রচিত টেলেগোনাস গাথা (*Telegonia*); তৃতীয়টি সালামিসের হেগেসিয়াস রচিত সাইপ্রীয় গাথা (*Cypria*) যা প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াডের ভূমিকা; চতুর্থ ও পঞ্চম রচনাদুটি যথাক্রমে এথিওপিস (*Aethiopis*) ও ট্রয়ধ্বংস, লেখক মিলেসাসের আর্কতিনোস: ষষ্ঠ রচনাটি মাইটিলিনের লেসচেস রচিত ছোট ইলিয়াড। এগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, তবে সবগুলিই যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ববর্তী তা প্রোক্লুসের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়।

করেন যে তিনি ট্রয়যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না, যতদিন পর্যন্ত না আগামেম্‌নন তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। (২) এদিকে দেবরাজ জিউস অ্যাকিলিসের মাতা দেবী থেটিসের প্ররোচনায় আগামেম্‌ননকে মিথ্যা স্বপ্নের দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে গ্রীকরা যুদ্ধে জয়লাভ করবে, এবং এতে উৎসাহিত হয়ে আগামেম্‌নন পরদিনই যুদ্ধারম্ভের সিদ্ধান্ত করলেন। (৩) ওদিকে ট্রোজানরা প্রস্তুত হয়েই ছিল, কিন্তু একটা চুক্তি হল যে রূপবতী হেলেনের স্বামিত্ব প্যারিস ও মেনেলাউসের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে যাবে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্যারিস পরাজিত হতে চলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবী আফ্রোদিতির হস্তক্ষেপে সে সে যাত্রা রক্ষা পেল। (৪) ইত্যবসরে ট্রোজান পক্ষের পান্দারাস মেনেলাউসের প্রতি শরবর্ষণ করে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করল পূর্ব-চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে এবং (৫) প্রত্যুত্তরে গ্রীক বীর ডাওমিডি ট্রয়-বাহিনীকে এমন প্রবলভাবে আক্রমণ করলেন যে দেবী আফ্রোদিতি এবং দেবতা আরেস পর্যন্ত তাতে আহত হলেন। (৬) অতঃপর ট্রয় ভরসা হেক্টর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন এবং (৭) গ্রীকবীর আজাক্‌সের সঙ্গে একটানা যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং গ্রীকবাহিনী ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু করল। (৮) এদিকে দেবরাজ জিউস এই যুদ্ধে দেবতাদের অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত গ্রীকদেরই অনুকূলে যাবে। (৯) রণক্ষেত্রে গ্রীকবাহিনী পিছু হটছে দেখে আগামেম্‌নন পালিয়ে যাবার মতলব করলেন, কিন্তু নেস্টর তাঁকে উপদেশ দিলেন অ্যাকিলিসের সঙ্গে মিটমাট করে নেবার জন্য। (১০) অডিসউস ও ডাওমিডি ইত্যবসরে ডোলোন নামক একজন ট্রোজান গুপ্তচরকে হত্যা করলেন এবং (১১) অপরদিকে আগামেম্‌নন নিজে প্রচণ্ড রকম আহত না হওয়া পর্যন্ত ট্রোজানদের ঠেকিয়ে রাখলেন, কিন্তু একে একে যখন নাম-করা গ্রীক বীরেরা আহত হয়ে ধরাশায়ী হলেন তখন নেস্টর পাত্রোক্লাসকে পাঠালেন অ্যাকিলিসকে কোনরকমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সম্মত করানোর জন্য। (১২) এদিকে ট্রোজানবাহিনী হেক্টরের নেতৃত্বে গ্রীক রক্ষণ-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে মূল ঘাঁটির ভিতর ঢুকে পড়ল এবং (১৩) সেই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে দেবতা পসেইডনের প্রেরণায় আজাক্‌স্‌-দ্বয় এবং ইদোমেনেয়াস প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন। (১৪) অপরদিকে জিউসপত্নী দেবী হেরা জিউসকে মায়াঘুমে আচ্ছন্ন রেখে পসেইডনকে গ্রীকবাহিনীকে সাহায্য করার সুযোগ করে দিলেন। (১৫) পক্ষান্তরে দেবতা অ্যাপোলো হেক্টরের মধ্যে নূতন

শক্তির সঞ্চার করলেন এবং ট্রোজানরা গ্রীকদের তাড়া করে সমুদ্রের তীরে নিয়ে গেল। (১৬) গ্রীকদের জাহাজগুলিতে ট্রোজানরা যখন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল সেই সময় পাত্রোক্লাসের অনুরোধে অ্যাকিলিস নিজে রণক্ষেত্রে না এসে নিজ বর্মচর্মে পাত্রোক্লাসকেই সাজিয়ে দিলেন। তাঁকে অ্যাকিলিস ভেবে ভুল করে ট্রোজানরা রণে ভঙ্গ দিল, কিন্তু বীর হেক্টর শেষ পর্যন্ত পাত্রোক্লাসকে নিহত করলেন। (১৭) হেক্টর পাত্রোক্লাসের মৃতদেহ থেকে অ্যাকিলিসের অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিলেন এবং মেনেলাউস বহু চেষ্টা করে পাত্রোক্লাসের মৃতদেহ উদ্ধার করলেন। (১৮) প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে স্থির থাকতে না পেরে অ্যাকিলিস রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন (১৯) নতুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে হেক্টরকে নিহত না করা পর্যন্ত তিনি জলগ্রহণ করবেন না। (২০) অতঃপর ঘোরতর যে যুদ্ধ শুরু হল তাতে দেবতারাও হয় গ্রীক পক্ষে না হয় ট্রয়ের পক্ষে অবতীর্ণ হলেন। অ্যাকিলিসের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ শুরু হল ঈনিয়াসের, তারপর পলিদোরাসের। (২১) কিন্তু তাঁর দুর্বার গতিকে বাধা দিতে কেউ পারল না। ট্রয়ের রক্ষণ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। (২২) সর্বশেষে অ্যাকিলিসের সঙ্গে হেক্টরের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ট্রয়-ভরসা হেক্টর নিহত হলেন। নিহত হেক্টরকে রথের পিছনে বেঁধে অ্যাকিলিস উন্মত্তের মত ট্রয়ের প্রাচীরের চারদিক পরিভ্রমণ করলেন। (২৩) মৃত পাত্রোক্লাসের শেষকৃত্য অতঃপর করা হল এবং (২৪) নিজ মাতা দেবী থেটিসের অনুরোধে অ্যাকিলিস ট্রয়ের সম্রাট বৃদ্ধ প্রায়ামের হস্তে হেক্টরের মৃতদেহ সমর্পণ করলেন। ইলিয়াডের এখানেই শেষ।

অডিসিও ইলিয়াডের মত চব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তবে বিন্যাসে কিছুটা জটিলতা আছে। এই কারণে আমরা এখানে পর পর অধ্যায়গুলির সার সংক্ষেপ না করে কাহিনীটির ধারাবাহিক বিবরণ দিচ্ছি। (১) ট্রয়যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে নিরুদ্দিষ্ট ইথাকার সম্রাট অডিসিউসের পত্নী পেনিলোপী একদল পাণিপ্রার্থীর দ্বারা সর্বদাই বিব্রত এবং (২) এই অসহনীয় পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে তাঁর পুত্র টেলেমাকাস তার পিতার সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা করেছিল। (৩-৪) পিতার সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে করতে দেবী আথেনীর কৃপায় সে জানতে পারল যে তার মাতার পাণিপ্রার্থীরা তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছে। (১৫) তাই সে লুকিয়ে স্বদেশে আবার ফিরে এল এবং তার পিতার একান্ত বিশ্বাসভাজন ইউমেউসের গৃহে আশ্রয় নিল। (১) ক্যালিপ্‌সো নামক

একটি পরীর দ্বীপে অডিসিউস দেবতা পসেইডনের কোপে কার্যত আবদ্ধ ছিলেন। (৫) কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবতা হার্মেসের চেষ্টায় তিনি ক্যালিপ্‌সোর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করতে সক্ষম হলেন। পথে পসেইডনের চক্রান্তে তাঁর জাহাজডুবি হল এবং অর্ধমৃত অবস্থায় তিনি কোনক্রমে রাজা আলসিনাসের রাজ্যে পৌছাতে পারলেন, এবং সেখানে (৬) রাজকন্যা নাউসিক্‌কার চেষ্টায় তাঁর জীবনরক্ষা হল। (৭) দেবী আথেনীর কৃপায় তিনি সেখানকার রাজা ও রাণীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। (৮) সেই সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত একটি ভোজসভায় যখন ট্রয়যুদ্ধের গান গাওয়া হচ্ছিল তখন অডিসিউসকে নিঃশব্দে ক্রন্দনরত দেখে রাজা আলসিনাস তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। (৯-১২) তখন অডিসিউস তার পরিচয় দিলেন এবং রাজার অনুরোধে তিনি ক্যালিপ্‌সোর দ্বীপে পৌছানো পর্যন্ত তার অ্যাডভেঞ্চারসমূহের বর্ণনা দিলেন, কিভাবে সিসেনাসে দস্যদের হাতে তার বাহাত্তরজন লোক মারা যায়, কিভাবে তাঁরা পদ্মভক্ষকদের দ্বীপে উপস্থিত হন, সেখান থেকে কিভাবে সাইক্লোপ্‌সদের দ্বীপে হাজির হন এবং একচক্ষু দানবকে কিভাবে অন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন, কিভাবে মায়াবিনী সার্সির দ্বীপ থেকে প্রেতের রাজ্যে উপস্থিত হন, এই রকম অজস্র কাহিনী অডিসিউস একের পর এক বলে যান। (১৩-১৬) এখান থেকে বিদায় নিয়ে নানা বিপদ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত অডিসিউস তাঁর স্বদেশ ইথাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ইউমেউসের গৃহে তার সঙ্গে তাঁর পুত্র টেলেমাকাসের সাক্ষাৎ হয়। কিভাবে পেনিলোপীকে পাণিপ্রার্থীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে তা নিয়ে পিতাপুত্রের পরামর্শ চলে। (১৭-২৪) এর পরের ঘটনাবলী হচ্ছে পেনিলোপীর সঙ্গে অডিসিউসের ভিক্ষুক-বেশে সাক্ষাৎকার, পাণিপ্রার্থিগণ কর্তৃক অডিসিউসকে অপমান, বিবাহের জন্য পেনিলোপীর শর্ত (যে অডিসিউসের একটি পুরাতন ধনুকে জ্যা রোপণ করতে পারবে তাকেই তিনি মাল্যদান করবেন), জ্যা-রোপণে পাণিপ্রার্থীদের ব্যর্থতা এবং ভিক্ষুকবেশী অডিসিউসের সাফল্য, পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে অডিসিউসের যুদ্ধ এবং পাণিপ্রার্থীদের মৃত্যু, অডিসিউস ও পেনিলোপীর মিলন।

সেকালের পেশাদার গায়কদের বলা হত রাপসোদোই, পথে প্রান্তরে, লোকালয়ে বীরগাথা গেয়ে বেড়ানোই যাদের পেশা ছিল। এদেরই প্রচেষ্টায় হোমারের কাহিনীগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্পার্টায় লাইকার্গাস হোমারের

মহাকাব্য আমদানী করেন, এবং ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, অলিম্পিক ক্রীড়ার সূত্রপাতের ২৩ বছরের মধ্যে, হোমারের কাব্য সমগ্র গ্রীসের জাতীয় সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে বহু স্থানে গীত ও কথিত হবার জন্য হোমারের কাব্যের বিশুদ্ধি নষ্ট হতে থাকে এবং তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু হয়। এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হন সোলোন, এবং তারপর পিসিস্ট্রেটাস (৫৩৫ খ্রীঃ পূঃ) যিনি কবি অনোমাক্রিটাসকে সভাপতি করে হোমারের কাব্যসংকলনে একটি বোর্ড গঠন করেন।

ইলিয়াড ও অডিসি ছাড়াও আরও কয়েকটি রচনা হোমারের নামে চলে। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, স্তোত্রমালা যা মোট চৌত্রিশটি কবিতার সঙ্কলন। এই চৌত্রিশটির মধ্যে যে পাঁচটি আয়তনে দীর্ঘ সেগুলি পাইথীয় ও ডেলীয় অ্যাপোলো, হার্মেস, আফ্রোদিতি ও ডিমিটারের উদ্দেশ্যে রচিত। বাকি উনত্রিশটি কবিতা অপরাপর দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত। সম্ভবত এই কবিতাগুলি মহাকাব্য শ্রোতাদের পরিবেশন করার আগে চারণগণ কর্তৃক পঠিত বা গীত হত যে কারণে এগুলিকে *prooemia* বলা হয়। মনে হয়, এই চারণ বা র‍্যাপসোডিস্টরাই ছিলেন এগুলির রচয়িতা এবং এগুলি হোমারের রচনা বলে চালানো হত। যে সকল চারণ বিশেষ করে হোমারের কাব্যই গাইতেন তাঁদের বলা হত Homeridae.

এগুলি ছাড়া আরও ষোলটি ছোট কবিতা হোমারের রচনা হিসাবে পরিচিত। এগুলির সামগ্রিক নাম এপিগ্রামাতা (*Epigrammata*)। এই ষোলটি কবিতার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির নাম কামিনোস (*Kaminos*) বা 'কুম্ভকারের চুল্লী' যা আসলে দেবী আথেনীর উদ্দেশ্যে রচিত। দ্বিতীয় কবিতাটির নাম ইরেসিওনে (*Eiresione*) অর্থাৎ 'শস্যের মালা'। মনে হয় এগুলি Ritual Poetry-র পর্যায়ভুক্ত। আরও দুটি রচনা হোমারের নামের সঙ্গে সংযুক্ত। একটির নাম মার্গিতেস (*Margites*), সম্ভবত যা একটি ব্যঙ্গকাব্য। কিন্তু রচনাটির কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। আর্কিলোকোস (৬৭৬ খ্রীঃ পূঃ) এই রচনাটির উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হচ্ছে বাত্রাকোমুমাকিয়া (*Batrachomyomachia*), অর্থাৎ ব্যাং ও ইঁদুরের যুদ্ধ। আসলে এই রচনাটি ইলিয়াডের একটি প্যারোডি। হোমারের নামে চললেও এই গ্রন্থের লেখক সম্ভবত পিগ্রেস (Pigres), যিনি ছিলেন পারস্য-যুদ্ধখ্যাত কারিয়ার রাণী

আর্টেমিসার ভ্রাতা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হোমার নামক আরও একজন কবি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১]

৩॥ হেসিওড

পাতারকুলোস মন্তব্য করেছিলেন যে "হোমার যে ভুল করেছিলেন হেসিওড তা করেননি, অর্থাৎ তিনি তাঁর স্বদেশ এবং পিতামাতার নাম উল্লেখ করেছেন"। হোমারের পর প্রাচীনত্বের দিক থেকে একমাত্র হেসিওডের (Hesiodos) নামই করা যায়। প্রাচীনকালের কোন কোন পণ্ডিত হেসিওডকে হোমারের পূর্ববর্তী বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আনুমানিক ৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দকেই হেসিওডের কাল বলে মনে করা যেতে পারে।

হেসিওড সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তা হচ্ছে যে, তাঁর পিতার নাম দিওস এবং তার জন্মস্থান বিওসিয়া। তার পিতা ইওলিয়ার অন্তর্গত কুমা থেকে

১। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মতই ইলিয়াড ও অডিসির পর প্রকৃত অর্থে আর কোন মহাকাব্য রচিত হয়নি। তার কারণ, হোমার বা বেদব্যাসের মত ব্যক্তিবিশেষের নামে চললেও, এগুলির পিছনে বিভিন্ন যুগের বহু লেখকের হাতের স্পর্শ আছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে মহাকাব্য লেখার প্রচেষ্টা ভারতের মত গ্রীসেও কম হয়নি। পৌরাণিক বীর হেরাক্লেসের বিচিত্র জীবনকথা অবলম্বনে অনেকেই মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পেইসান্দার ও পানিয়াসেস, এঁদের উভয়েরই রচনার নাম হেরাক্লিয়া। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের আরও একজন কবি, যাঁর নাম আন্তিমাকোস, থেবাসিস (*Thebasis*) নামক একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, যার কোন নিদর্শন অবশ্য বর্তমানে নেই। ওই একই যুগে কিরিলোস (জন্ম ৪৭০ খ্রীঃ পূঃ) পারসিক যুদ্ধ অবলম্বনে পের্সেইস (*Perseis*) নামক মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এরপর আর দেড়শো বছর কোন গ্রীক মহাকাব্য রচিত হয়নি। আনুমানিক ২৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কালিমাকোস একটি জনপ্রিয় মহাকাব্য রচনা করেছিলেন, নাম হেকাতি (*Hekate*)। তাঁর শিষ্য রোডসের আপোলোনিয়াস জেসনের অ্যাডভেঞ্চারসমূহের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছিলেন আর্গোনটিকা (*Argonautica*)। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষের দিকে ক্রীট দেশীয় কবি রিহাসুন মেসেনীয় যুদ্ধ অবলম্বনে মেসেনিয়াকা (*Messeniaca*) নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এর পরে মহাকাব্যের সন্ধান আবার পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে। এই সময় স্মার্নার কুইন্তোস ইলিয়াডের পরিশিষ্ট হিসাবে চতুর্দশ খণ্ডে পোস্তহোমেরিকা (*Posthomerica*) নামক একটি মহাকাব্য রচনা করেন যার বিষয়বস্তু হচ্ছে হেক্টরের মৃত্যুর পর একীয়দের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে নোন্নোস নামক এক কবি দেবতা ডাওনিসোসের কাহিনীসমূহ অবলম্বনে আটচল্লিশ খণ্ডে রচনা করেছিলেন ডাওনিসিয়াকা (*Dionysiaca*)। এরপর আর কোন মহাকাব্য রচিত হয়নি।

বিওসিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। কোন কারণে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার ফলে তিনি নাওপাকটোস-এ চলে আসেন। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় হেসিওডের মৃত্যু হয়। তিনি ও একজন মিলেশীয় পথিক একত্রে একটি বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই মিলেশীয় লোকটি কোন কারণে গৃহকর্তার মেয়েকে অপমান করায় গৃহকর্তা দুজনকেই নিহত করে।

এ পর্যন্ত হেসিওডে রচিত তিনটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম গ্রন্থটি হচ্ছে থিওগোনি (*Theogony*)। এই গ্রন্থটি প্রাচীন গ্রীক ধর্মবিশ্বাস ও দেবতাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাবলীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পজেনিয়াস এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এই গ্রন্থটি থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। থিওগোনি হচ্ছে দেবগণের জন্মবৃত্তান্ত। গ্রন্থের শুরু হয়েছে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের বন্দনা দিয়ে। তারপর কবি জগৎ সৃষ্টির কাহিনী বলেছেন। আকাশরূপী ইউরেনাস ও পৃথিবীরূপী গেইয়ার দ্বন্দ্ব, গেইয়া ও তাঁর পুত্র ক্রোনাসের চক্রান্ত এবং ইউরেনাসের নির্বীর্যকরণ, শিশু জিউসের স্থানান্তরকরণ, প্রমিথিউসের শাস্তিভোগ, দেবতা ও টাইটানদের যুদ্ধ, জিউসের সঙ্গে দৈত্য টাইফোসের যুদ্ধ এইগুলি হচ্ছে থিওগোনির বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১২৬০।

পরবর্তী কালের গ্রীক সাহিত্যে যা ট্রিলজি নামে পরিচিত হয়েছিল, তার সূত্রপাত হেসিওডের থিওগোনি থেকেই পাওয়া যায়। এখানে তিনটি সমচরিত্রের কাহিনী বর্তমান, প্রথমটির নায়ক ইউরেনাস, দ্বিতীয়টির নায়ক তৎপুত্র ক্রোনাস এবং তৃতীয়টির নায়ক তৎপুত্র জিউস। প্রতিটি কাহিনীরই বিষয়বস্তু এক, একদিকে পিতা অপরদিকে মাতা-পুত্র, এই দুই শক্তির সংঘাত এবং পরিণামে দ্বিতীয় শক্তিটির জয়লাভ। আকাশরূপী ইউরেনাস এবং পৃথিবীরূপী গেইয়ার গর্ভে জন্মেছিল তিনশ্রেণীর জীব—টাইটান, সাইক্লোপ এবং হেকাটনচেরি। গেইয়ার সঙ্গে ইউরেনাসের বনিবনা ছিল না এবং সেই কারণে গেইয়া তার পুত্রদের ইউরেনাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার প্রয়াস পেয়েছিল। সর্বকনিষ্ঠ টাইটান ক্রোনাস তার মাতার অনুরোধ রক্ষা করেছিল একটি ধারালো কাস্তে দিয়ে ইউরেনাসকে নির্বীর্য করে। পরবর্তী স্তরের কাহিনীতে আমরা দেখি যে এই ক্রোনাসের সঙ্গে তার পত্নী রীহার বনিবনা হয়নি, এবং রীহার প্ররোচনায় তার পুত্র জিউস পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে জিউসের ক্ষেত্রেও।

হেসিওডের দ্বিতীয় বিখ্যাত রচনা হচ্ছে 'কাজ ও দিন'। এটি তাঁর ছোট ভাই পেরসেসকে (Perses) উদ্দেশ্য করে লেখা যে তাঁকে ঠকিয়ে পিতৃসম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল। উপদেশাত্মক এই গ্রন্থটির মূল বক্তব্য মানুষ তার কর্মের দ্বারাই নিজ ভাগ্য গঠন করে। মানুষের বেশির ভাগ দুঃখই তার নিজের সৃষ্ট, একথাটা বোঝানোর জন্য তিনি প্যাণ্ডোরা ও মানুষের অধঃপতনের দুটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। 'কাজ'-এর শ্লোকসংখ্যা ৪১০টি, এবং 'দিন'-এর মাত্র ৭৫টি। এখানে আছে প্রবাদ বাক্যের সঙ্কলন, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং নৌবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক উপদেশ। হেসিওডের এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন, কেননা পজেনিয়াস লিখেছেন যে তিনি হেসিওডের 'কাজ' নামক রচনাটিকে একটি সীসার ফলকে উৎকীর্ণ দেখেছেন। হেসিওড সম্বন্ধে প্লিনি লিখেছেন যে তিনিই প্রথম কৃষিকার্যের মূল নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

হেসিওডের তৃতীয় রচনা হচ্ছে 'হেরাক্লেসের ঢাল'। অনেকের মনে হয়, এঁর মূল রচনাটি লুপ্ত হয়ে গেছে, তার জায়গায় পরবর্তী কালে কোন অলৌকিকসম্পন্ন কবি নূতন করে এই কাহিনীটি লিখেছিলেন। আসলে এটি ইলিয়াডে বর্ণিত 'অ্যাকিলিসের ঢালের' অক্ষম অনুকরণ। এখানে হেরাক্লেসের বিখ্যাত ঢালের বর্ণনা আছে যা হিফেস্টাস তাঁকে তৈরী করে দিয়েছিলেন আরেসের পুত্র সাইকনাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। সমগ্র কাহিনীটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আছে থিবসে তার নির্বাসিত স্বামীর সঙ্গিনী হিসাবে আলকমেনার আগমন, টেলিবোয়ানদের বিরুদ্ধে আমফিট্রায়োনের অভিযান, জিউসের রণকৌশল ও হেরাক্লেসের জন্ম। দ্বিতীয় পর্বে আছে হেরাক্লেস ও সাইকনাসের সাক্ষাৎকার এবং হেরাক্লেসের ঢালের বর্ণনা। এবং তৃতীয় পর্বে আছে উভয়ের যুদ্ধ, সাইকনাসের মৃত্যু ও সমাধি। এই তিনটি রচনা ছাড়াও হেসিওডের নামে আরও কয়েকটি রচনা প্রচলিত আছে।

হেসিওড নিশ্চয়ই প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকারী হতে পেরেছিলেন এবং অনেকেই তাঁকে হোমারের তুল্য জ্ঞান করতেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে 'হোমার ও হেসিওডের মধ্যে প্রতিযোগিতা' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয় যা থেকে বোঝা যায় যে দীর্ঘকাল ধরেই হেসিওডের জনপ্রিয়তা ছিল। কুইন্টালিয়ান লিখেছেন, "হেসিওডের উত্থান কদাচিৎ, তাঁর অনেকটা অংশ কেবল নামেই বর্তমান, তথাপি তিনি প্রয়োজনীয় অনুশাসন রচনার জন্য বিশিষ্টতায় মণ্ডিত; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসনীয় মাধুর্য, সাবলীল রচনাভঙ্গী

তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে।" কিকেরো হেসিওডকে নীতিবাদী বলেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, মানুষ যেন হেসিওডের নিকট থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করে যে, "দেবতারা পুণ্যের পূর্বে মাথার ঘাম রেখে দিয়েছেন"। ভলটেয়ার তাঁর দার্শনিক অভিধানে যথার্থই বলেছেন যে হেসিওড রচিত অনেক বাক্যই আজ প্রবচনমূলক স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে।[১]

৪॥ গ্রীক কাব্যসাহিত্য

একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রাচীনতম গ্রীক কাব্যসমূহ পেশাদার পুরোহিতদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল এবং সেগুলি ছিল মূলত দেবদেবী ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত। আসলে Ritual বা যাদুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানসমূহ থেকে তৈরী হয় Myth, যা থেকে গড়ে ওঠে দেবদেবী সংক্রান্ত কাহিনী। এ বিষয়ে রবার্টসন স্মিথ, জেন হারিসন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, উৎসাহী পাঠকবর্গ সেগুলি পড়তে পারেন। যাই হোক, গ্রীক দেবদেবী বিষয়ক কাহিনীগুলি এবং পরবর্তী কালে সেগুলিরই অনুকরণে রচিত বীরগাথাসমূহ, চারণ কবিরা সর্বত্র গেয়ে বেড়াতেন এবং এই কারণেই সেগুলি রচিত হত সঙ্গীতের আঙ্গিকে। আখ্যানমূলক এই সঙ্গীতসমূহ অবলম্বনেই ইলিয়াড ও ওডিসির ন্যায় জাতীয় মহাকাব্য রচিত হয়েছিল, আবার সেগুলিকে অনুসরণ করে ক্ষুদ্রতর অসংখ্য মহাকাব্য পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে যেগুলির পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে দুটি পাদটীকায় দিয়েছি।

মহাকাব্য থেকে বিশুদ্ধ লিরিক বা গীতিকবিতার (Lyric বা Lyre বা বীণাযোগে গান করার উপযুক্ত) বিবর্তনের পথে আইওনীয় কবিরা এলেজিয়াক (Elegiac) ও আয়াম্বিক (Iambic) এই দুটি বিশেষ ধরনের কবিতার অজস্র নিদর্শন রেখেছেন। কিন্তু প্রকৃত গীতিকবিতার যথার্থ বিকাশ ঘটেছিল এওলীয় ও ডোরীয় কবিদের হাতে। এই গীতিকবিতাগুলিকে বলা হত

১। হেসিওডের রচনাবলীর প্রথম মুদ্রণ মিলান শহর থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, ইংরাজী অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে, অনুবাদক ছিলেন কুক (Cooke)। পরবর্তী কালে হেসিওডের রচনাবলীর পুনরায় অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে এলটন (Elton) ১৮১৫; ব্যাঙ্কস (Banks) ১৮২৩; এবং মেয়ার (Mair) ১৯০৮। শেষোক্ত অনুবাদকের কাজই সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। এ ছাড়া Loeb Classical Series-এ প্রকাশিত (১৯১৪) এভেলিন হোয়াইটের অনুবাদও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

Melic poetry (*melos* শব্দটির অর্থ সঙ্গীত)। গ্রীক গীতিকবিতা নিয়ে বিশেষ আলোচনার পূর্বে এলেজিয়াক ও আইয়াম্বিক কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

ইংরাজীতে *Elegy* কথাটির দ্বারা শোকসূচক কবিতা বোঝায়, কিন্তু আদিতে এই শব্দটি এতটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হত না। এলেজিয়াক ছন্দে, অর্থাৎ dactylic সপ্তমাত্রিক বা পঞ্চমাত্রিক ছন্দে, যা কিছু রচনা করা হত তাকেই বলা হত Elegy। এলেজি লিডীয় শব্দ *Elegos* থেকে উৎপন্ন যার অর্থ বীণা বা অনুরূপ কোন বাদ্যযন্ত্রের স্বরলহরী। কিভাবে এবং কেমন করে Elegy দুঃখবাচক বিষয়সমূহের দ্যোতক হল সেকথা বলা খুবই কঠিন। পণ্ডিতদের মতে গ্রীক Elegy-এর স্রষ্টা ছিলেন এশিয়া মাইনরের আইওনীয়গণ। এই ধরনের কবিতার প্রথম সার্থক রচয়িতা ছিলেন এফিসাসের কাল্লিনোস (Callinus, ৭০০ খ্রী পূঃ)। পরবর্তী কালে অ্যাটিকার তুরতিওস (Tyrtaeus, ৬০০ খ্রী পূঃ) এবং সোলেন (৬৪০-৫৫৯খ্রীঃ পূঃ) এলেজির বিষয়বস্তুর মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক আদর্শসমূহের আমদানী করেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে মেগারার থিওগেনিস (৫৪০ খ্রীঃ পূঃ) ব্যঙ্গমূলক, কামমূলক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে এলেজি রচনা করেছিলেন। কোলোফোনের মিমনেরমোস কামমূলক এলেজিসমূহের রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত। শোকসূচক এবং দুঃখবাচক বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রথম এলেজি লেখেন সিওসের সিমোনিদেস (মৃত্যু ৪৬৯ খ্রীঃপূঃ)। কোলোফোনের আন্তিমাকোসের এলেজিসমূহে পাণ্ডিত্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের পর থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় এলেজি বিশেষ জনপ্রিয় হয় এবং এজন্য কবি কানোকেস বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। এ ছাড়া প্রাচীন এলেজি রচয়িতাদের মধ্যে কসের ফিলেতেস (Philetes), কোলোফোনের হারমেসিয়ানাক্স (Hermesianax) এবং সাইরেনের কাল্লিমাকোসের (Callimachus) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জন বোধ হয় প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ এলেজি রচয়িতা।[১]

আইয়াম্বিক কবিতারও সৃষ্টি হয়েছে এশিয়া মাইনরের আইওনীয়দের হাতে।

১। কাল্লিনোসের একটি মাত্র কবিতা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যে কবিতায় তিনি লিডীয়দের বিরুদ্ধে স্বদেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন। এই কবিতাটি সম্পাদনা করেছেন এন. বাখ (N. Bach) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। কবি তুরতিওসের পিতার নাম আর্কেমব্রোতোস, জন্মস্থান আথেন্স। দ্বিতীয় মেসেনীয় যুদ্ধের ব্যর্থতার পর স্পার্টার মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য এই

এলেজির মত আইয়াম্বিক কবিতাও মহাকাব্য ও বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের মধ্যবর্তী একটি পর্যায় সূচিত করে। কোন ঘটনা অথবা কোন দেবতা বা বীরের কীর্তিকলাপ বর্ণনার পরিবর্তে আইয়াম্বিক কবিতাসমূহে মানব-মনের বিভিন্ন ভাবসমূহকে ফুটিয়ে তোলা হয়। আইয়াম্বিক ছন্দে রচিত হত বলে এই জাতীয় কবিতাকে আইয়াম্বিক কবিতা বলা হত। আইয়াম্বিক ছন্দের নামকরণ হয়েছে গ্রীক দেবী Iambe-র (প্যান ও ইকোর কন্যা) নামানুসারে। কথিত আছে নিজ কন্যা পার্সিফোনি প্লুটো কর্তৃক অপহৃতা হবার পর দেবী ডিমিটার যখন শোকে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন তখন এক থ্রেসীয় কুমারী আইয়াম্বির সাহচর্যে তিনি কিছুটা শান্তি পান এবং পুনরায় অন্নজল গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করেই প্রাচীন গ্রীসে 'ডিমিটারের ভোজ' নামক উৎসব প্রতি বছর করা হত। সেই উৎসবে দলবদ্ধভাবে যে গান গাওয়া হত সেগুলি রচিত হত এই আইয়াম্বিক ছন্দে। পরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে পারোসের আর্কিলোকোস (৭০০ খ্রীঃ পূঃ) আইয়াম্বিক কবিতা রচনায় বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইনি ছিলেন কালিনোসের সমসাময়িক. পিতার নাম তেলিসিক্লেস। আর্কিলোকোসের কবিতাকে পরবর্তী কালে হোরেস আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আইয়াম্বিক কবিতার পরবর্তী লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আমোরগোসের সিমোনিদেস (Simonides of Amorgus)

আইওনীয় কবকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর যে কটি কবিতার অবশেষ এখনো আছে সেগুলির নাম যথাক্রমে অভিযান (March), ইউনোমিয়া (Eunomia) এবং হাইপোথেকাই (Hypothekai)। এই কবিতাগুলির ইংরাজী অনুবাদ সর্বপ্রথম করেছিলেন যথাক্রমে পোলহোয়েল (১৭৯২) এবং পাই (১৭৯৫) এবং পরবর্তী কালে কবি টমাস ক্যাম্পবেল। কবি থিওগেনিস মেগারার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হন। তাঁর বেশির ভাগ কবিতাই সাইর্নাস নামক একজন যুবককে উদ্দেশ্য করে লেখা। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হ্যারিসন *Studies in Theogenis* (১৯০২) গ্রন্থে। কবি মিমনেরমোস সম্বন্ধে বিশদ পরিচয়ের জন্য ভাল্লোলিনির *Mimnermus* (১৮৮৩) দ্রষ্টব্য। চিওসের সিমোনিদেস পারসিক যুদ্ধের সময় অজস্র কবিতা লিখে দেশবাসীকে শত্রুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি ৫৬ বার কবিতা প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর শোকের কবিতা পিণ্ডারের চেয়েও বেশী আদৃত হত, একথা লিখেছেন কুইন্টালিয়ন। তাঁর রচনাসমূহ সর্বপ্রথম সম্পাদনা করেছিলেন স্কোনেইডেউইন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর *Danae* কবিতাটি পৃথক্‌ভাবে সম্পাদনা করেন এহেরন্স ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রীক এলেজি ও এলেজি লেখকদের জন্য থিওডোর বের্গক রচিত *Poetae Lyrici Graeci* (১৮৮২) এবং সি. এম বাওরা রচিত ***Early Greek Elegists*** গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

এবং এফিসাসের হিপ্পোনাক্স (Hipponax)। শেষোক্ত জন কোলিয়াম্বোস বা স্কাজোন আইয়াম্বোস বা খঞ্জ আইয়াম্বিক ছন্দের স্রষ্টা। আসলে তিনি আইয়াম্বিক ছন্দের সঙ্গে ট্রোকি ছন্দের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এথেন্সের বিখ্যাত আইন-প্রণেতা সোলোন অজস্র আইয়াম্বিক কবিতা রচনা করেছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর কবিতাসমূহের ৫,০০০ লাইন পাওয়া গেছে। তাঁর কবিতার বহু অংশ ডিমস্থেনেস ও আরিস্টোটলের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। কবি হেরোদেস বা হেরোন্দাস (৩০০ খ্রীঃ পূঃ) একটি বিশেষ ধরনের আইয়াম্বিক গীতিকবিতার সূচনা করেছিলেন।[১]

গীতিকাব্যের বিবর্তনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়গুলি আইওনীয় কবিদের হাতে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রকৃত লিরিক গড়ে উঠেছিল এওলীয় ও ডোরীয়দের মধ্যে, কেননা এই দুই জাতিরই সঙ্গীতের প্রতি মানসিক প্রবণতা ছিল। বিশুদ্ধ গীতিকবিতার মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন তেরপান্দের (Terpandros) যাঁর নিবাস ছিল লেসবসের অন্তর্গত আন্টিসা নগর। তিনি নোমোস (nomos) নামক একটি বিশেষ ধরনের গীতিকবিতার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। নোমোস ছিল অ্যাপোলোদেবের উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীত। এইগুলি ডোরীয়দের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পাইথিয়ান অ্যাপোলোর উৎসব প্রতিবছর হত ডেলফিতে যেখানে এই সঙ্গীতগুলি পরিবেশিত হত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে। তেরপান্দের এই নোমোস সঙ্গীতকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। তাঁর নিজের রচনাসমূহে তিনি হোমারের কাব্যকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের প্রয়োজনে তিনি বিভিন্ন ধরনের সুরের প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে নতুন ধরনের নোমোসের প্রবর্তন করেছিলেন টেগেয়ার অধিবাসী ক্লোনাস (Clonas)। এওলীয় গীতিকবিতার মূল সুরটি বিষাদের। টেরপান্দেরের পর মাইটিলেনের অধিবাসী

১। আর্কিলোকাসের কবিতা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য রচনা হচ্ছে লাসেরে রচিত *Les E'podes d'Archilogie* (১৯৫০)। আমোরগোসের সিমোনিদেসের কবিতাবলী সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন ওয়েলেকার (১৮৩৫) এবং মাসুনা (১৯০০)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গ্রীক কবিতার ইতিহাসে সিমোনিদেস ছিলেন তিনজন। প্রথম জন যিনি ছিলেন চিওসের অধিবাসী তাঁর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তৃতীয় জন ছিলেন সামোসের সিমোনিদেস যাঁর রচিত ১১৮ লাইনের একটি কবিতার অংশমাত্র পাওয়া গেছে। কবি হিপ্পোনাক্স সম্বন্ধে বিশদ তথ্যাবলী পেলৎসারের *De Parodica Graecorum Poese* (১৮৫৫) গ্রন্থে দেওয়া আছে।

কবি আলকিওসের (খ্রীঃ পূঃ ৬০০) হাতে এই ধারাটির পূর্ণতা ঘটে। তাছাড়া তাঁর সমকালীন কবি সাফো ও তৎশিষ্য এরিন্না এওলীয় গীতিকাব্যে অনেক নূতনত্বের আমদানী করেছিলেন। টিওসের আনাক্রেয়ন প্রেম ও সুরা নিয়ে ছোট ছোট গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন যা পরবর্তী কালে স্কোলিয়া নামে পরিচিত হয়েছিল। এ সব কবিরা প্রত্যেকেই ৬৫০ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[১]

ডোরীয় গীতিকবিতার চরিত্র কিছুটা ভিন্নধরনের। এওলীয় গীতিকবিতার ধরন ছিল মোটামুটি একই রকম, কিন্তু ডোরীয় গীতিকবিতার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। গ্রীসের অপরাপর অঞ্চলের কবিতার মত ডোরীয় গীতিকবিতাও ছিল সমবেত সঙ্গীত বা কোরাল লিরিক। এই সমবেতকণ্ঠে-গাওয়া কবিতাগুলি বিভিন্নধরনের ছিল এবং প্রতিটি ধরনের নামও ছিল পৃথক্। আমরা সেগুলি একে একে আলোচনা করছি যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব। (ক) পেয়ান্স (*Paeans*—গ্রীক *Paian, Paieon*)—এগুলি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হত আপোলোদেবের উদ্দেশে। নামটি এসেছে চিকিৎসক দেবতা পিয়নের নাম থেকে। সম্ভবত রোগমুক্তির জন্য এই গানগুলি গাওয়া হত। (খ) হুপোর্কেমাতা (*Hyporchemata*)—এগুলিও ছিল আপোলোদেবের উদ্দেশ্যে রচিত। এই গানগুলি গাওয়া হত নৃত্যসহযোগে। বোধ হয় আদিতে এগুলি যাদু-বিশ্বাসমূলক ছিল। (গ) হিমন্স (*Hymns*)—দেবতাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রাবলী। (ঘ) প্রোসোদিয়া (*Prosodia*)—মার্চিং সং বা রণসঙ্গীত; এগুলিও সমবেতকণ্ঠে গাওয়া হত আপোলোদেবের উদ্দেশে। (ঙ) পার্থেনিয়া (*Parthenia*)—ধর্মীয় সঙ্গীত যা কুমারীরা গাইত। (চ) ডিথুরাম্বস (*Dithyrambs*)—দেবতা ডাওনিসোসের উৎসবে এক একটি দল এই সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করত। ডোরীয় কবিদের মধ্যে অনেকেই ডিথুরাম্বস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কোরিন্থের আরিয়ন,

১। তেরপান্দেরের রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা ও আলোচনা করেছেন Lowie তাঁর *De Terpandri Lesbiiaetate* (১৮৬৯) নামক গ্রন্থে। আলকিওসের জন্য ইয়াসবি স্মিথ রচিত *The Songs of Alceus* (১৯০১), সাফোর জন্য স্টেইনারের *Sappho: Life and Work* (১৯১০), এবং আনাক্রেয়ন ও তৎরচিত *Anacreontea*-র জন্য থিওডোর বের্গক রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এরিন্না রচিত *Distaff*-এর সম্পাদনা সর্বপ্রথম করেছিলেন পেলেগ্রিনো ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

হার্মিওনের লাসোস ও তার শিষ্য পিন্দার, সিমোনিদেস, বাক্কাইলিদেস, মেলোসের মেলানিপ্পিদেস, সাইথেরার ফিলোক্সেনোস, মিলেসাসের তিমোথিউস, পলিসাইদেস ও তেলেস্তেস। এঁদের কথা আমরা পরে আবার বলব। (ছ) এনকোমিয়া (*Encomia*)—বিজয় উৎসবের শোভাযাত্রার গান; (জ) এপিনিকিয়া (*Epinicia*)—ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সম্মানে যা গাওয়া হত; (ঝ) এপিথালামিয়া (*Epithalamia*)—বিবাহকালে সমবেতকণ্ঠে যা গাওয়া হত; (ঞ) হুমেনিয়া (*Humenoea*)—বৈবাহিক শোভাযাত্রা-কালে গীত লঘুরসের সঙ্গীত; (ট) থ্রেনোই (*Threnoi*) শোকসঙ্গীত।

ডোরীয় গীতিকবিতার ঐতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ: আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিডীয় কবি আলকমান (Alcman) স্পার্টার তেরপান্দেরের আদর্শ অনুযায়ী গীতিকবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন হিমেরার স্তেসিকোরোস (Stesichorus)। এরপর আরিওন ও ইবাইকোসের হাতে ডোরীয় গীতিকবিতার অপূর্ব বিকাশ ঘটে। পরবর্তী ডোরীয় গীতি-কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কিওসের বাক্কাইলিদেস এবং সর্বোপরি থিবসের পিন্দার। বাক্কাইলিদেসের কাব্যের সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে, পিন্দারের অবস্থাও তথৈবচ। পরবর্তী লেখকদের রচনায় পিন্দারের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে তা দেখে মনে হয় তিনি সত্যই খুব উঁচুদরের কবি ছিলেন। পিন্দার জন্মগ্রহণ করেছিলেন থিবসে ৫২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। পরবর্তী কালে আলেকজাণ্ডার যখন থিবসে ধ্বংস করেন তখন তিনি শ্রদ্ধাবশত পিন্দারের বাড়ির কোন ক্ষতি করেন নি। এরপর আসছে চারজন মহিলা কবির কথা, যাঁদের নাম যথাক্রমে মুর্তিস, কোরিন্না, প্রাক্সিল্লা ও তেলেসিল্লা, এবং সর্বোপরি ছিলেন ইলাইসাসের স্যাফোফেরন। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের লোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এঁদের রচনার খুব সামান্য নিদর্শনই বর্তমান আছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যে দুজন কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ফিলোক্সেনোস (মৃত্যু ৩৮০ খ্রীঃ পূঃ) এবং তিমোথিউস (মৃত্যু ৩৫৭ খ্রীঃ পূঃ)। ফিলোক্সেনোসের দুটি কাব্য এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, একটির নাম সাইক্লোপস (Cyclops) যার বিষয়বস্তু একচক্ষু পলিফেমোনের সঙ্গে গালাতিয়া নামক একটি পরীর প্রেমের কাহিনী, কিন্তু যা প্রকৃতপক্ষে সাইরাকিউজের একজন স্বৈরাচারী শাসককে ব্যঙ্গ করে লেখা, এবং অপরটির নাম 'ভোজসভা' যা একটি লঘুরসের কাব্য। তিমোথিউস

ডিথুরাম্বস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং তিনি ছাড়া আরও যে দুজন কবির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন পলেইদোস ও তেলেস্তেস। তাঁদের কোন কাব্য এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি সামান্য দু-একটি কবিতার টুকরো ছাড়া। ৫০০ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীক কাব্যসাহিত্যের বিকাশের এইটুকুই তথ্য পাওয়া গেছে।[১]

আলেকজান্দ্রীয় যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের পর থেকে কাব্যসাহিত্যের ধারায় অবনতির চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন থিওক্রিতোস (৩২৫-২৬৭ খ্রীঃ পূঃ)। তিনি গ্রাম্যজীবনের অপূর্ব চিত্রাবলী কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতাসমূহ ইডিল (idylls) নামে খ্যাত এবং এই নামটিই পরবর্তী কালে রাখালী কবিতা-সমূহের দ্যোতক হয়েছে। আলেকজান্দ্রীয় যুগের ভাবধারার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন কাল্লিমাকোস যাঁর কথা আমরা ইতিপূর্বে মহাকাব্য ও এলেজি প্রসঙ্গে বলেছি। আলেকজান্দ্রীয় যুগের অপরাপর কবিদের মধ্যে আরাতোস ও নিকান্দেরের নাম উল্লেখযোগ্য।[২]

১। এঁদের রচনা সম্পর্কে বের্গকের পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। প্যাপিরাসের উপর লেখা আলকমানের রচনার নকল প্রথম পাওয়া গেছে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। আরিওন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন হেরোডোটাস (১।২৩) এবং ঈবাইকোসের কথা বলেছেন প্লুতার্ক ও কিকেরো এবং তাঁর রচনা-বলীর সম্পাদনা করেছেন শ্নেনেইডেউইন, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। পিন্দারের রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন ফেনেল (১৮৭৯-৮৩) এবং তাঁর সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যাবে নবিনের *Pindar* (১৮৭৯) গ্রন্থে। বাক্কাইলিদেসের রচনাবলীর সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছিলেন কেন্‌য়ন (১৮৯৭), জুরেক্কা (১৮৯০) এবং ব্লাস। কোরিন্নার উল্লেখ করেছেন পাউসানিয়াস (৯.২২.৩)। তাঁর সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের জন্য দ্রষ্টব্য এডমান্ডসের *New Fragments of Corinna*। তিমোথেয়স, মুরতিস, প্রাক্সিল্লা, তেলেসিল্লা, ফিলোক্সেনোস, পলেইদোস, তেলেস্তেস প্রভৃতির রচনা সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক ভাবে আলোচিত হয়েছে এমন কোন গ্রন্থের সন্ধান আমি করে উঠতে পারিনি।

২। থিওক্রিতোসের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তাঁর রচনাবলী গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন ল্যাঙ্গ (১৮৮০) এবং কবিতায় ক্যালভার্লি (১৮২৯)। কাল্লিমাকোস আনুমানিক ২৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে টলেমি ফিলাডেলফস কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং অদ্ভুত পরিশ্রম করে তিনি সেই গ্রন্থাগারের একটি বর্ণনামূলক ক্যাটালগ ১২০ খণ্ডে রচনা করেন। তাঁর নিজস্ব রচনাবলীর মধ্যে কিছু কবিতা যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে কোমা বেরিনিসেস ও তাঁর রচিত মহাকাব্য হেকালির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাল্লিমাকোসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন ডড (১৭৫৫), টাইটলার (১৭৯৩) এবং ব্যাঙ্কস (১৮৫৬)। কাল্লিমাকোসের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন ছিলেন আরাতোস। তিনি চিলিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং

গ্রীকভূখণ্ড রোমের অধীনে চলে যাবার পর রোমকগণ গ্রীক সভ্যতাকে নিজস্ব করে নেয়। কালক্রমে রোমকদের জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে শুরু করে, এবং সেই সঙ্গেই শুরু হয় গ্রীক ভাষা ও গ্রীক সাহিত্যের সার্বিক অবনতি। রোমক যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পর থেকে খুব অল্প কবিতাই গ্রীক ভাষায় রচিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কবিদের মধ্যে একজনেরই উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি হচ্ছেন ওপ্পিয়ান্ (Oppian) এবং যাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম হালিউতিকা (*Halieutica*)। ওই একই নামের আরও একজন কবি, যাঁর জন্মভূমি সিরিয়া, দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কাইনেজেতিকা (*Cynegetica*)। তৃতীয় শতকে আমরা জনৈক বাবরিয়োসের উল্লেখ পাচ্ছি, তিনি ঈশপের গল্পগুলিকে ছন্দে রূপদান করেছিলেন। তাঁর দুটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যথাক্রমে ১৮৪৪ ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। চতুর্থ শতকে গ্রীক চার্চের অনুপ্রেরণায় কিছু ধর্মীয় কবিতা লেখা হয়েছিল। আমরা সে কথায় পরে আসছি।[১]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে আমরা কয়েকজন গ্রীক কবিকে পুনরায় দেখতে পাচ্ছি। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবি নোন্নোস (Nonnus)। তিনি সপ্তমাত্রিক ছন্দে সেণ্ট জন কথিত সুসমাচারের অনুবাদ করেছিলেন (এঁর রচিত মহাকাব্য ডাওনিসিয়াকার (*Dionysiaca*) কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি)। মিশরের অধিবাসী কবি ত্রাইফিদোরোস ৬৯১টি শ্লোকে ইলিয়াম-বিজয় নামক একটি কাব্য লিখেছিলেন। কবি কোল্লুথোস ৩৮৫টি শ্লোকে হেলেন-ধর্ষণ কাব্য রচনা করেছিলেন। পঞ্চম শতকের অপর একজন কবি ছিলেন

ম্যাসিডোনীয় রাজা অ্যান্টিগোনাস গোনাটাসের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, নাম 'নভোমণ্ডলের দিকসমূহ ও আবহাওয়া নিরূপণ'। ব্যবহারিক গুরুত্ব থাকায় কাব্যটি ল্যাটিনে অনূদিত হয়েছিল (ইংরাজী অনুবাদ: ল্যাম্ব ১৮৪৮, পোস্ট ১৮৮০, ব্রাউন ১৮৮৫, প্রিস ১৮৯৫ এবং মেয়ার ১৯০১)। কবি নিকান্দের জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোলোফনে ১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর একটি কবিতার নাম থেরিয়াকা, বিষয়বস্তু হচ্ছে বিষাক্ত জীবের কামড় থেকে আত্মরক্ষার উপায়, এবং অপর একটি কবিতার নাম আলেক্সিফার্মাকা, অর্থাৎ খাদ্যে বিষক্রিয়ার চিকিৎসা।

১। ওপ্পিয়ানের হালিউতিকার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ডায়াপার ও জোন্স ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে। বাবরিয়োসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ডেভিস যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

মিউসিয়োস। তিনি হেরো ও লিয়ান্দারের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে একটি জনপ্রিয় কাব্যের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন।[১]

পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যে, যা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য বলে অধিকতর পরিচিত, অর্থোডক্স চার্চ বা গ্রীক চার্চের অনুপ্রেরণায় গ্রীক ভাষায় ধর্মমূলক বহু খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত রচিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই এই শ্রেণীর রচনাগুলির উদ্ভব এবং এই বিষয়ে পুরোধা ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ত এবং সেণ্ট মেথোদিয়োস। কালক্রমে এই ধর্মীয় সঙ্গীতগুলি কানোন নামে পরিচিত হয়। এই কানোনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আকাথিস্তোস মাতা মেরীর প্রশংসায় রচিত। কানোন রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দামাস্কাসের জন, জেরুসালেমের কোসমোস এবং ক্রীটের আর্কবিশপ আন্দ্রিয়োস।

৫ ॥ গ্রীক নাটকের কথা

গ্রীক নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে দেবতা ডাওনিসোসের নাম জড়িয়ে আছে। ডাওনিসোসের উৎসবসমূহ উপলক্ষে যে ডিথুরাম্বস নামক কোরাস গাওয়া হত, গ্রীক নাটকের বীজ তারই মধ্যে উপ্ত ছিল। আদিতে ডিথুরাম্বস ছিল রিচুয়াল-সং বা অনুষ্ঠান-গীতি, কালক্রমে ওইগুলির মধ্যে কাহিনী ও সংলাপ অনুপ্রবিষ্ট হয়। ক্রমশ পৃথক্‌ভাবে অভিনয়ের সূত্রপাত ঘটে এবং ডাওনিসোসের উৎসব উপলক্ষেই নাটক প্রদর্শনের রীতি গড়ে ওঠে। আদিতে গ্রীক নাটক কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না, রাষ্ট্রই নাটকের প্রযোজনা করত। ডাওনিসোসের উৎসব চলত তিনদিন ধরে, প্রথম দিন হত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, দ্বিতীয় দিন তিনটি টেট্রালজি (তিনটি কাহিনী ও একটি বাড়তি বিষয় বিশিষ্ট ট্রাজেডি) প্রদর্শিত হত এবং তৃতীয় দিনে দেখান হত পাঁচটি কমেডি।

১। লিয়ান্দার ছিল হেলেস্পণ্টের আবাইদোস নামক স্থানের একজন যুবক। তার প্রণয়িনী ছিল হেরো, সে বাস করত সেসবসের একটি নির্জন টাওয়ারে। প্রতিরাত্রে লিয়ান্দার হেলেস্পণ্ট থেকে সাঁতার কেটে সেসবসে হাজির হত; যে টাওয়ারে তার প্রণয়িনী বাস করত সেখানকার আলোকে নিশানা করে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিত। একদা ঝড়ের রাত্রে সেই আলো নিভে যায় এবং অন্ধকার সমুদ্রে নিশানা ঠিক করতে না পেরে হতভাগ্য লিয়ান্দার মারা যায়। পরদিন প্রভাতে ঠিক সেই টাওয়ারের তলায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই দৃশ্য দেখে লিয়ান্দারের প্রণয়িনী হেরো টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

নাট্যকার ও অভিনেতারা রাষ্ট্রের নিকট থেকেই পারিশ্রমিক (*Choregia*) লাভ করতেন। গোড়ার দিকে একজন অভিনেতাই সমগ্র নাটকটিতে অভিনয় করতেন এবং মূলত নাট্যকার নিজেই হতেন সেই অভিনেতা। এস্কাইলাস সর্বপ্রথম মঞ্চে দুজন অভিনেতা আমদানী করেন, এবং সফোক্লেস তিনজন। প্রথম অভিনেতাকে বলা হত প্রোতাগানস্তেস, (*Protagonistes*) দ্বিতীয় জনকে বলা হত দয়তেরাগানস্তেস (*deuteragonistes*) এবং তৃতীয় জনকে বলা হত ত্রিতাগানস্তেস (*tritagonistes*)। প্রতিটি নাটকে অন্যূন বারোটি করে কোরাস থাকত, সফোক্লেস কোরাসের সংখ্যা আরও বাড়িয়েছিলেন। আগে আগে পেশাদারী অভিনয়ের সৃষ্টি হয় এবং অনেকের কাছেই অভিনয় জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম দিকে গ্রীকমঞ্চের সাজসজ্জা বলতে কিছুই ছিল না, তবে অভিনেতারা বিশেষ ধরনের পোশাক ও মুখোশ ব্যবহার করতেন। প্রথম পেশাদারী মঞ্চ গড়ে ওঠে এথেন্সে এবং তারপর গ্রীক ভূখণ্ডের অন্যত্র।

গ্রীক নাটক তিন প্রকারের—ট্রাজেডি, কমেডি ও সাত্যুরি (Saturoo) গ্রীক ট্রাজেডির উৎস আমাদের পূর্বোল্লিখিত ডিথুরাম্বস, এবং বিশেষ করে যেগুলি আরিওনের রচিত। 'ট্রাজেডি' কথাটির অর্থ 'ছাগলের চামড়া'। সম্ভবত ট্রাজেডির অভিনেতারা ছাগচর্মের পরিচ্ছদ পরতেন, তা থেকেই ওই রকম নামকরণ হয়েছে। প্রথম ট্রাজেডি-লেখক ছিলেন সম্ভবত ইকারার থেসপিস (Thespis, ৫৩৫ খ্রীঃ পূঃ)। তাঁকে অনুসরণ করেন কিরিলোস (Choerilus), প্রাতিনাস (Pratinas) ও তৎপুত্র আরিস্তাস (Aristas) এবং ফ্রুনিকোস (Phrynichus)। পরবর্তী কালে এস্কাইলাস ও সফোক্লেস গ্রীক ট্রাজেডির আঙ্গিকে রীতিমত পরিবর্তন ঘটান।

কমেডি কথাটি এসেছে *Komodia* থেকে যার অর্থ ডায়োনিসোসের আনন্দময় শোভাযাত্রা। সম্ভবত মেগারার ডোরীয় অধিবাসীদের মধ্যেই প্রথম কমেডির বিকাশ ঘটে। আনুমানিক ৫৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুসারিয়ন (*Susarion*) অ্যাটিকায় কমেডির প্রচলন ঘটান এবং সিসিলিতে কমেডি আমদানী করেন কোসের এপিকারমোস (Epicharmus)। প্রাচীন কমেডি-লেখকদের মধ্যে ফোরমোস (Phormus) ও তৎশিষ্য দিনোলোকোস (Dinolochus), অ্যাটিকার কিওনিদে (Chionides) ও মাগনেসের (Magnes) নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের লোক

ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক কমেডির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে তা অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষকে সমালোচনা করার জন্যও ব্যবহৃত হত। পারসিক যুদ্ধের সময় সমগ্র গ্রীসেই কমেডি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। গ্রীক নাটকে কমেডির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে ক্রাতেস (Crates) এবং তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন ক্রাতিনোসের (Cratinus) হাতে এবং পরবর্তী কালে অয়পোলিস (Eupolis) ও আরিস্তোফানেসের হাতে।

গ্রীক নাটকের তৃতীয় ধারাটির নাম সাতুরি। সাতুর (Satyr) বলতে বোঝায় একশ্রেণীর জীব যারা ডাওনিসোসের সঙ্গে থাকত শিবের সঙ্গী ভূত-প্রেতের মত। এরা ছিল নরাকৃতি, অলস, কামুক ও দুর্বুদ্ধিপরায়ণ। ডাওনিসোসের কাহিনীগুলিতে তাদেরও কিছু ভূমিকা ছিল এবং সেগুলিকে পৃথকভাবে মঞ্চে দেখানো হত। মূলত দর্শকদের কিছুটা স্থূল ধরনের আনন্দ দেবার জন্যই এই ধরনের নাটকের সৃষ্টি, কালক্রমে যা ট্রাজেডির সঙ্গে যুক্ত হয়, দর্শককে মাঝে মাঝে একটু রিলিফ দেবার জন্য। গ্রীক সাহিত্যে একটিমাত্রই এই জাতীয় নাটক টিকে আছে, তা হচ্ছে ইউরিপিদেসের সাইক্লোপস (*Cyclops*)।

এস্কাইলাসকে গ্রীক ট্রাজেডির জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন ইউ-ফোরিয়োনের পুত্র, এথেন্সের নিকটে এলেউসিসে তাঁর জন্ম ৫২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রথম জীবনে তিনি ম্যারাথন, সালামিস ও প্লেটিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হন, যদিও ৪৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর পর্যন্ত তিনি স্বীকৃতিলাভ করতে পারেননি। ৪৭৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি সিসিলিতে রাজা হিয়েরোর সভাসদ ছিলেন, তারপর তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন সফোক্লেসের প্রথম নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন। পরে অবশ্য তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ৪৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজনৈতিক কারণে তিনি এথেন্স পরিত্যাগ করে সিসিলিতে ফিরে যান এবং সেখানে গেলা নামক স্থানে আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। এস্কাইলাসের নাটকের সংখ্যা ৯০টি, সেগুলির মধ্যে ৮২টির নামটুকু মাত্র বজায় আছে। তবে তাঁর সাতটি নাটক মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

সফোক্লেস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সের নিকট কোলোনোস নামক স্থানে। তাঁর পিতার নাম সোফিলোস। অল্পবয়সেই

সফোক্লেস ক্রীড়া, সঙ্গীত ও অভিনয়ে নাম করেছিলেন এবং মাত্র সাতাশ বছর বয়সে একটি নাট্য-প্রতিযোগিতায় এস্কাইলাসকে পরাজিত করেন। তাঁর বন্ধু চিওসের আইওনের অনুরোধে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। ৪৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সের সামোস অভিযানের দশজন সেনাপতির মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। ৪৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি পুরোহিতেরও কাজ করেছেন। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর বন্ধু ছিলেন। সফোক্লেসের নাটকের সংখ্যা ১৩০টি, যেগুলির মধ্যে ১০০টির নাম আমাদের জানা আছে, যদিও এ পর্যন্ত তাঁর ৭টির বেশী নাটক পাওয়া যায়নি।

ইউরিপিদেসের জন্ম সালামিস দ্বীপে ৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি দার্শনিক আনাক্সাগোরাস ও সক্রেটিসের সাহচর্য লাভ করেছিলেন, শিক্ষালাভ করেছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত সফিস্ট প্রোতাগোরাস ও প্রোদিকোসের কাছে। রাজনীতিতে আগ্রহ থাকলেও তিনি নিজেকে রাজনীতিতে লিপ্ত করেননি, তাঁর সময়ের অধিকাংশই কেটেছে কার্যত গ্রন্থাগারে। তিনি দুবার বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সুখী ছিলেন না। ৪০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি এথেন্স পরিত্যাগ করে থেসালিতে গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখানেই ৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচনার সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে কেউ বলেন ৭৫, কেউ বলেন ৭৮, কেউ বলেন ৯২। এ পর্যন্ত তাঁর ১৮টি নাটক পাওয়া গেছে।

এস্কাইলাসের যুগে একটি দীর্ঘ কাহিনীকে তিন ভাগে ভাগে ভাগ করে তিনটি নাটক পৃথক্‌ভাবে রচনা করার রীতি ছিল। এইরূপ তিন অংশ-বিশিষ্ট নাটকের নাম ছিল ট্রিলজি। কখনো কখনো এর উপর আরও একটি সাতুরি যুক্ত হত যার ফলে গঠিত হত টেট্রালজি। এস্কাইলাসের অধিকাংশ রচনাই ট্রিলজি শ্রেণীভুক্ত। যেমন তাঁর পের্সে নাটকটি একটি ট্রিলজির মধ্যবর্তী অংশ। এই সিরিজের প্রথমটির নাম ফেনাস এবং তৃতীয়টির নাম গ্লকাস পোতনিয়াস। অবশ্য প্রথম ও তৃতীয়টির কোন চিহ্ন এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে হেপ্তা এপি থেবাস একটি ট্রিলজির সবশেষ অংশ, প্রথম দুটি, অর্থাৎ লেইয়োস ও ইডিপাস, অবশ্য শুধু নামেই বর্তমান। হিকেতিদেস নাটকটিও একটি ট্রিলজির প্রথম অংশ।

এবার আমরা এস্কাইলাসের নাটকগুলির বিষয়বস্তু এবং সেগুলির সঙ্গে

একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা সফোক্লেস ও ইউরিপিদেসের নাটকগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করব। এস্কাইলাসের পের্সে (*Persae*) নাটকটি একটি ট্রিলজির মধ্যবর্তী অংশ, বিষয়বস্তু হচ্ছে সালামিসের যুদ্ধে গ্রীকদের নিকট পারসিকদের পরাজয়। নাটকটি শুরু হচ্ছে একটি কোরাস দিয়ে, যা গাইছে পারস্যরাজের সভাসদ্‌গণ। পরবর্তী দৃশ্যে আছে পারস্যরাজ জারেক্‌সেসের মাতার দুঃস্বপ্ন দর্শন। এরপরেই আসছে সালামিসের যুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়ের সংবাদ, এবং সর্বশেষে ভগ্নহৃদয়ে সম্রাট জারেকসেসের প্রত্যাবর্তন। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল ৪৭২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই নাটকটির উপর ঈষৎ পূর্ববর্তী যুগে রচিত ফ্রাইনিকোসের দুটি নাটকের প্রভাব আছে। একটি হচ্ছে মিলেসিউ হালোসিস (মিলেসাস অধিকার) ও অপরটি হচ্ছে ফিনিসসে (*Phoenissae*)।

এস্কাইলাসের দ্বিতীয় নাটকের নাম হিকেতিদেস (*Hiketides*), ল্যাটিনে সুপ্লিকেস, ইংরাজীতে সাপ্লায়ান্টস। এটি একটি ট্রিলজির প্রথম অংশ, বাকি দুটি অংশের নাম যথাক্রমে এগুপ্‌টি (*Aegyptii*) এবং দানাইদেস (*Danaides*) যদিও এই দুইটি নাটকের কোন চিহ্নই বর্তমানে নেই। সুপ্লিকেস নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে আর্গোসে দানায়ুস ও তাঁর কন্যাদের সংবর্ধন। দানায়ুস ছিলেন মিশরের রাজা। তার ভাই ইগিপ্তাস তাকে মিশর থেকে তাড়িয়ে দেয়। তার কারণ দানায়ুসের পঞ্চাশটি কন্যা ছিল এবং ইগিপ্তাস তার পঞ্চাশটি পুত্রের সঙ্গে এই পঞ্চাশটি কন্যার বলপূর্বক বিবাহ দেবার চেষ্টা করে। আর্গোসের রাজা এই ব্যাপারে উভয়-সংকটে পড়েন, কেননা দানায়ুস ও তার মেয়েদের আশ্রয় দিলে ইগিপ্তাসের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, পক্ষান্তরে তাদের আশ্রয় না দিলে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বিবেচনার দায়িত্ব দেশবাসীর উপরেই ন্যস্ত করা হয় এবং তারা দানায়ুস ও তাঁর কন্যাদের আশ্রয় দেবার পক্ষেই মতামত দেয়।[১]

১। কাহিনীটির অবশিষ্ট অংশ হচ্ছে এই যে আর্গোসে দানায়ুস আশ্রয় লাভ করায় ক্রুদ্ধ ইগিপ্তাস আর্গোস আক্রমণ করে এবং তার পঞ্চাশটি পুত্র বলপূর্বক দানায়ুসের পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করে। ক্রুদ্ধ দানায়ুস তখন তাঁর কন্যাদের আদেশ দেন যে তারা যেন রাত্রে বিছানায় ছুরিকাঘাতে তাদের স্বামীদের হত্যা করে। পঞ্চাশজনের মধ্যে উনপঞ্চাশজন এই আদেশ পালন করে। শুধু একজন, হাইপারমেনস্ত্রা, পিতার আদেশ অমান্য করে স্বামী লাইনসেয়াসকে নিয়ে পলায়ন করে।

এরপর আসে এস্কাইলাসের অপর বিখ্যাত নাটক প্রমিথিউস ভিংকৃতোসের (*Prometheus Vinctus*) কথা। এই নাটকটিও একটি ট্রিলজির মধ্যবর্তী অংশ। নাটকের নামটি তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'বন্দী প্রমিথিউস'। এই ট্রিলজির প্রথম ও তৃতীয় অংশ দুটির নাম যথাক্রমে প্রমিথিউস পুরফোরোস (অগ্নিবাহক প্রমিথিউস) এবং প্রমিথিউস লুওমেনোস (মুক্তিপ্রাপ্ত প্রমিথিউস)। প্রথম ও তৃতীয় অংশটি অবশ্য পাওয়া যায় না। প্রমিথিউস ছিলেন একজন টাইটান, অর্থাৎ তিনি দেবগোষ্ঠীর একটি ভিন্নতর শাখায় অবস্থান করতেন। দেবতাদের সঙ্গে টাইটানদের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রমিথিউস শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং দেবতারাও অনেক সময় তাঁর উপদেশ মেনে চলতেন। কিন্তু দেবরাজ জিউস তাঁকে হিংসা করতেন। প্রমিথিউসের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ মানব-প্রেমিক। প্রমিথিউসের পরামর্শেই দেবরাজ জিউস একটি যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু পরে প্রমিথিউস জানতে পারেন যে দেবরাজ জিউস মানবজাতিকে নির্মূল করে তার জায়গায় অন্য জীব সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। মানব-দরদী প্রমিথিউস এতে ভীষণ দুঃখ পান এবং মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাদের আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে দেন। আগুনের ব্যবহার শিখে মানুষ উন্নততর জীবনযাত্রায় পদক্ষেপ করায় দেবরাজের মতলব ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রমিথিউস ট্রিলজির প্রথম অংশের সম্ভাব্য কাহিনী বোধ হয় এইটাই। যাই হোক, এই অপরাধে প্রমিথিউসের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান হয়। তাঁকে সমুদ্রের ধারে একটি পাহাড়ের উপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। যেহেতু প্রমিথিউস অমর, সেই হেতু তাঁর জন্য এক নির্মম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যহ নতুন করে তাঁর যকৃতের সৃষ্টি হবে এবং একটি ঈগল এসে প্রত্যহ তা ভক্ষণ করবে। প্রমিথিউসের বন্দী জীবনের এই যন্ত্রণাকর দিকগুলিই প্রমিথিউস ভিংকৃতোস নাটকের বিষয়বস্তু। শেষ পর্যন্ত মহাবীর হেরাক্লেস সেই ঈগলটিকে বধ করেন ও প্রমিথিউসকে উদ্ধার করেন।

থেবীয় কাহিনীচক্র অবলম্বনে এস্কাইলাস একটি ট্রিলজি রচনা করেছিলেন যার তৃতীয় অংশটিই শুধু পাওয়া যায়। এই নাটকটির নাম হেপ্তা এপি থেবাস, (*Hepta epi Thebas*), ল্যাটিনে সেপ্তেম কন্ত্রা থেবাস। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'থেবেসের বিরুদ্ধে সাত জন'। প্রথম দুটি নাটক লেইয়োস এবং ইডিপাসের কোন চিহ্ন বর্তমানে পাওয়া যায় না। ইডিপাস-কাহিনীর জন্য সফোক্লেসের শ্রেষ্ঠ ইডিপাসই (রাজা ইডিপাস) আমাদের

একমাত্র সম্বল।[১] এস্কাইলাস ইডিপাসের কাহিনীকে কিভাবে এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা গ্রহণ করেছিলেন তা জানার কোন উপায় নেই। এস্কাইলাসের হেপ্তা এপি থেবাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইডিপাসের মৃত্যুর পর থেবেসের সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ। থেবেস নগরের সাতটি দুয়ারেই যুদ্ধ হয়েছিল এবং সপ্তম দুয়ারে ইডিপাসের দুই পুত্র একে অপরকে হত্যা করে। ইডিপাসের এক পুত্রের নাম এতিওক্লেস এবং অপর পুত্রের নাম পলিনেইসেস। প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু অবলম্বনে সফোক্লেস লিখেছিলেন আন্তিগোনি (*Antigone*)। আন্তিগোনি ছিল ইডিপাসের কন্যা যে সর্বদা তার পিতার সঙ্গে থাকত। থেবেসের সিংহাসন নিয়ে ইডিপাসের দুই পুত্রের মধ্যে বিরোধ শুরু হলে, সফোক্লেসের কাহিনী অনুযায়ী, এক পুত্র এতিওক্লেসের হাতে অপর পুত্র

১। এখানে ইডিপাস-কাহিনীটিকে সংক্ষেপে বলা দরকার। থেবেসের সম্রাট লেইয়োস দেববাণী শুনেছিলেন যে তিনি তার পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। তাঁর পত্নী আইওকাস্তির গর্ভে ইডিপাস জন্মগ্রহণ করলে তাকে বিনষ্ট করার জন্য তার ক্রীতদাস পলিবোসকে আদেশ দেন, কিন্তু পলিবোস শিশুটিকে হত্যা না করে তাকে নিয়ে করিন্থে পালিয়ে যায়। অতঃপর ইডিপাস যৌবনে উপনীত হয়ে একদা ডেলফির আপোলোদেবের মন্দিরে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই কথা জানতে পারলেন যে তিনি তাঁর পিতাকে নিহত করবেন ও নিজের মাতাকে বিবাহ করবেন। তিনি পলিবোস ও তার পত্নীকেই নিজের পিতামাতা বলে জানতেন, কাজেই তিনি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে করিন্থ পরিত্যাগ করলেন ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য। কিন্তু ভাগ্যও তার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। তার আসল পিতা সম্রাট লেইয়োস তখন ডেলফিতে আসছিলেন। কে কাকে পথ ছেড়ে দেবে এই নিয়ে বচসা হতে অকস্মাৎ ইডিপাস রাগের মাথায় লেইয়োসকে হত্যা করে বসলেন। এইভাবে দৈববাণীর প্রথম অংশ সফল হল। সম্ভবত এইটি হচ্ছে এস্কাইলাসের থেবীয় ট্রিলজির প্রথম অংশ লেইয়োসের কাহিনী। তারপর নানা ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে ইডিপাস থেবেসের সম্রাট হলেন এবং তাঁর সঙ্গে লেইয়োসের বিধবা পত্নী তার নিজের গর্ভধারিণী আইওকাস্তির বিবাহ হল যার ফলে তাঁদের চারটি সন্তান জন্মাল। বহুকাল কেটে যাবার পর ব্যাপারটি জানা গেল, এবং তা জানার পর লজ্জায় ও দুঃখে তার গর্ভধারিণী ও স্ত্রী আইওকাস্তি আত্মহত্যা করলেন এবং ইডিপাস নিজের চক্ষু দুটি নিজেই উৎপাটন করলেন এমন একটি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যে অপরাধের জন্য কোন দায়িত্বই তাঁর নেই। তাঁর পুত্ররা তাঁকে থেবেস থেকে তাড়িয়ে দিল। এই কাহিনী অবলম্বনেই সফোক্লেসের রাজা ইডিপাস এবং সম্ভবত এস্কাইলাসের অধুনালুপ্ত ইডিপাসের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। ইডিপাসের বিড়ম্বিত শেষ-জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। সফোক্লেস তাঁর ইডিপাস কোলোনোস নাটকে দেখিয়েছেন যে তাঁর উপর আরোপিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে শেষ পর্যন্ত আপোলোদেবের নির্দেশে ইডিপাস কোলোনোসে (সফোক্লেসের জন্মভূমি) এসে হাজির হন যেখানকার শীতল ভূমির নীচে তাঁর অভিশপ্ত জীবন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শান্তির স্পর্শ লাভ করে।

পলিনেইসেসের মৃত্যু ঘটে। আন্তিগোনি তখন মৃত ভ্রাতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। এই অপরাধে আন্তিগোনিকে একটি ঘরে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। তার বাগ্‌দত্ত হোমোন তার মৃতদেহের পাশে নিজেও আত্মহত্যা করে। ইডিপাসের মৃত্যুর পর থেবেসের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে তাঁর দুই পুত্রের বিরোধের কাহিনী নিয়ে নাট্যকার ইউরিপিদেসও রচনা করেছিলেন ফিনিসে (*Phoenissae*)। এস্কাইলাসের থেবীয় কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচনাটি আসলে একটি টেট্রালজি। চতুর্থ অংশটি একটি স্যাতুরি, নাম স্ফিংকস। এই রচনাটির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

এস্কাইলাসের অপর বিখ্যাত ট্রিলজি হচ্ছে ওরেস্তেয়া (*Orestea*)। এখানে তিনটি নাটকের মাধ্যমে একটি ঘটনা-পরম্পরা ব্যক্ত হয়েছে, যেগুলির নাম যথাক্রমে আগামেমনন (*Agamemnon*), কোয়েফোরি (*Choephori*) এবং ইউমেনিদেস (*Eumenides*)। ওরেস্তেস-কাহিনীচক্র অবলম্বনে সফোক্লেস লিখেছিলেন ইলেক্ট্রা (*Electra*) এবং ইউরিপিদেস লিখেছিলেন ওরেস্তেস, ইলেক্ট্রা এবং ইফিজেনিয়ার কাহিনী অবলম্বনে আরও তিনটি নাটক। আগামেমনন ছিলেন ট্রয়যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি যখন ট্রয়যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় তাঁর স্ত্রী ক্লাইতিমেনেস্ত্রা এগিস্থোস নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আগামেমনন ফিরে এলে এরা দুজন চক্রান্ত করে তাকে হত্যা করে। এস্কাইলাসের আগামেমনন নাটকের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। কোয়েফোরি নাটকে আগামেমননের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আগামেমননের পুত্র ওরেস্তেস তাঁর মা ও মায়ের প্রেমিক উভয়কেই হত্যা করেন। স্পার্টান মহিলাগণ আগামেমননের সমাধির উপর যে বার্ষিক অনুষ্ঠান করতেন, এবং সেই উপলক্ষে যে কোরাস গাওয়া হত, তার নাম কোয়েফোরি যা থেকে এই নাটকের নামকরণ হয়েছে। ওরেস্তেস-কাহিনীর শেষ অংশ ইউমেনিদেস নাটকে বর্ণিত হয়েছে মাতৃহত্যার অপরাধে ওরেস্তেসের বিচার কাহিনী। অ্যাপোলোদেবের উপদেশে ওরেস্তেস এথেন্সের গণআদালত বা আরিওপেগাসে আত্মসমর্পণ করেন। এই বিচারে দেবী আথেনা প্রধান বিচারক ছিলেন এবং প্রধান সাক্ষী ছিলেন দেবতা অ্যাপোলো। বিচারে ওরেস্তেসের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটসংখ্যা সমান হয়। তখন দেবী আথেনা তাঁর কাস্টিং ভোটটি ওরেস্তেসের পক্ষে দেন যার ফলে ওরেস্তেস নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। অনুরূপ কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপিদেসের

ওরেস্তেস নাটকও গড়ে উঠেছে। সফোক্লেস ও ইউরিপিদেসের ইলেক্ত্রা নাটকের নায়িকা আগামেম্‌নের কন্যা ইলেক্ত্রা যিনি ভ্রাতা ওরেস্তেসকে পিতৃহন্তার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং পরে ওরেস্তেসকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছিলেন। ইফিজেনিয়া ছিলেন আগামেম্‌ননের অপর এক কন্যা এবং ওরেস্তেসের ভগিনী যাঁর কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপিদেস দুটি নাটক লিখেছিলেন। গ্রীক নৌবাহিনী যখন ট্রয়ের অভিমুখে যাত্রা করেছিল তখন দেবী আর্টেমিস হাওয়া বন্ধ করে সব জাহাজের গতি রুদ্ধ করে দেন। আগামেম্‌ননের প্রতিজ্ঞা ছিল যে সবচেয়ে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তাঁর সর্বাধিক প্রিয়জনকে তিনি দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেবেন। গ্রীক নৌবহর বেজায়গায় আটকে পড়লে মেনেলাস আগামেম্‌ননকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, এবং তার কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দেওয়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকেন। তখন বাধ্য হয়ে আগামেম্‌নন অ্যাকিলিসের সঙ্গে বিয়ে দেবার নাম করে ইফিজেনিয়াকে আউলিস নামক স্থানে নিয়ে আসেন। এই কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপিদেসের প্রথম নাটকটি রচিত হয়েছে যার নাম আউলিসে ইফিজেনিয়া। যখন পুরোহিতের নির্দেশে ইফিজেনিয়াকে বলি দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, দেবী আর্টেমিস বলি দেবার স্থানে একটি হরিণ রেখে ইফিজেনিয়াকে নিয়ে শূন্যপথে তৌরি (বর্তমান ক্রিমিয়া) নামক স্থানে চলে যান, এবং সেখানে ইফিজেনিয়া দেবীর পুরোহিতানী হয়ে থাকেন। দীর্ঘকাল পরে ইফিজেনিয়ার ভাই ওরেস্তেস দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয়ে দেবী আর্টেমিসের মূর্তি আনার জন্য তৌরিতে যান। নিয়ম ছিল যে কোন বহিরাগত তৌরিতে গেলে তাকে দেবীর সামনে বলি দেওয়া হবে। ওরেস্তেসকেও বলি দেবার জন্য নিয়ে আসা হয়। সেই সময় ভ্রাতা ভগ্নীর নাটকীয় সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত দেবীর কাঠের মূর্তি নিয়ে দুজনেই গ্রীসে চলে আসে, যা দ্বিতীয় নাটকটির কাহিনীর উৎস।

ট্রয়যুদ্ধ সংক্রান্ত কয়েকটি কাহিনীও গ্রীক ট্রাজেডির বিষয়বস্তু হয়েছে। সফোক্লেসের আজাক্স (*Ajax, Aias, Aiax*) নাটকে ট্রয়যুদ্ধের অন্যতম বীর সেনাপতি বড় আজাক্সের জীবনের বিষাদময় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। দেবী থেটিস ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকবাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে অ্যাকিলিসের বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করেছিলেন, এবং ন্যায়ত তা আজাক্সেরই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তাঁকে না দিয়ে তা অডিসিউসকেই দেওয়া হয়। সেই

কোডে শেষ পর্যন্ত আজাক্স আত্মহত্যা করেছিলেন। ফিলোক্তেতেস (*Philoctetes*) আখ্যানটির নাট্যরূপদান এস্কাইলাস, সফোক্লেস ও ইউরিপিদেস তিনজনেই করেছিলেন, তবে এস্কাইলাসের নাটকটি বহুদিন পূর্বেই অবলুপ্ত হয়েছে। ফিলোক্তেতেস ছিলেন এটার অন্তর্গত মালিয়দের রাজা পিয়াসের পুত্র যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে হেরাক্লেসের ধনুঃশর পেয়েছিলেন। ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাতটি জাহাজের তিনি ছিলেন অধিনায়ক। কিন্তু যাত্রাপথে তিনি লেমনস নামক স্থানে সর্পদষ্ট হন এবং সেই ক্ষতের জন্য অডিসিউসের নির্দেশে তাঁকে রোইসি দ্বীপে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। সেই দ্বীপে দীর্ঘ দশ বছর তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করেন। হেলেনোসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হেরাক্লেসের তীর ব্যতিরেকে ট্রয়-বিজয় অসম্ভব ছিল, এই কারণে দাইওমেদেস এবং অডিসিউস ফিলোক্তেতেসকে ফিরিয়ে আনেন এবং মাচাওন তাঁকে নিরাময় করেন। তাঁর তীরেই শেষ পর্যন্ত প্যারিসের মৃত্যু হয় যার ফলে ট্রয়-বিজয় সম্পূর্ণ হয়। ট্রয়যুদ্ধ সংক্রান্ত কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপিদেস অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। হেকুবা (*Hecuba, Hekobe*) নাটকে ইউরিপিদেস ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের কন্যার জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। ট্রয়ের পতনের পর হেকুবা বন্দিনী হন এবং লুঠের মাল হিসাবে অডিসিউসের ভাগে পড়েন। হেকুবার পুত্র পলিদোরাস থ্রেসের রাজা পলিমেস্তরের হাতে নিহত হয়েছিল। তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন হেকুবা স্বহস্তে পলিমেস্তরের চক্ষু দুটি উৎপাটন করে। অবশ্য এইজন্য তাঁকে নির্মমভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ট্রয়যুদ্ধ অবলম্বনে ইউরিপিদেস আরও কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে— আন্দ্রোমাকে (*Andromache*), যেখানে ট্রয়-ভরসা হেক্টরের পত্নী আন্দ্রোমাকের বিড়ম্বিত জীবনের কথা বলা হয়েছে, হেলেনা (*Helena*), যার বিষয়বস্তু ইলিয়াডের নায়িকার জীবনের একটি অধ্যায়, রেসোস (*Rhesus*), যা এক ভাগ্যহত থ্রেসীয় যোদ্ধার কাহিনী যে ট্রোজান পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে আকস্মিকভাবে দাওমেদেস ও অডিসিউসের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল; এবং ত্রোয়াদেস (*Troades*), যা ট্রয়নগর ধ্বংসের পরবর্তী কালের কাহিনী অবলম্বনে রচিত

হেরাক্লেস-কাহিনীচক্র অবলম্বনে সফোক্লেস রচিত একটি এবং ইউরিপিদেস রচিত দুটি নাটক পাওয়া গেছে। সফোক্লেসের ত্রাকেনিয়ে (*Trachonioe*) হেরাক্লেসের মৃত্যুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। দেবরাজ জিউস ঘোষণা

করেছিলেন যে পের্সিওসের জনৈক বংশধর পৃথিবীর অধিপতি হবে। সেই বংশধর ছিলেন হেরাক্লেস। কিন্তু জিউস-পত্নী হেরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পের্সিওস-বংশীয় অপর একজনের জন্ম তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দেন। সে হচ্ছে ইউরেস্থিওস। জিউস-কথিত সৌভাগ্য অতঃপর তারই উপর বর্ষিত হল এবং হেরাক্লেস ভাগ্যের দোষে তারই দাস হয়ে রইলেন। এই ইউরেস্থিওস হেরাক্লেসকে অত্যন্ত ঈর্ষা করত এবং তার আজব খেয়াল মেটানোর জন্য হেরাক্লেসকে পরপর বারোটি বিপৎসঙ্কুল অ্যাডভেঞ্চার করতে হয়। তাঁর বীরত্বের এই সব নিদর্শন দেখে, বিশেষ করে তাঁর কীর্তির দ্বারা খ্যাতির অধিকারী হওয়া দেখে, দেবী হেরা অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর উপর নানাভাবে পীড়ন করতে শুরু করেন। পরিণামে শেষ পর্যন্ত হেরাক্লেস পাগল হয়ে যান। উন্মত্ত অবস্থায় তিনি তাঁর পত্নী মেগারার গর্ভজাত তিনটি সন্তানকে হত্যা করেছিলেন যে কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপিদেস 'উন্মত্ততায় হেরাক্লেস' নামক নাটকটি রচনা করেছিলেন। হেরাক্লেসের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর দ্বিতীয় নাটক হেরাক্লিদির (*Heraclidæ*) বিষয়বস্তু আথেন্সের দেমোফোন কর্তৃক ইউরেস্থিওসের প্রতিহিংসার হাত থেকে হেরাক্লেসের বংশধরদের রক্ষার ঘটনা।

ইউরিপিদেসের নাটকে গ্রীক পুরাণের আরও কয়েকটি কাহিনী স্থান পেয়েছে। থিসিউস-কাহিনীচক্র অবলম্বনে তাঁর রচিত সাপ্লিয়ান্তসের বিষয়বস্তু হচ্ছে, রাজা থিসিউসের নিকট সাতজন নিহত বীরের মাতাদের আকুল আবেদন, যাতে তাদের যথাযোগ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। হিপ্পোলাইতাস নাটকের নায়ক রাজা থিসিউসের পুত্র, যে তার সৎমা ফিদ্রার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল। প্রত্যাখ্যাতা ফিদ্রা থিসিউসের নিকট অভিযোগ করে যে হিপ্পোলাইতাস তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। এতে কুপিত হয়ে থিসিউস হিপ্পোলাইতাসকে খতম করার জন্য তাঁর পিতা দেবতা পসেইডনের সাহায্য চান এবং পসেইডন একটি উন্মত্ত বৃষের দ্বারা তাকে হত্যা করান। এই ঘটনার পর ফিদ্রার মনে অনুতাপ আসে এবং সেও আত্মহত্যা করে। ইউরিপিদেসের মিদিয়া নাটকটি একটি প্রতিশোধের কাহিনী এবং এই কাহিনীরও উৎস গ্রীক পুরাণ। ঈসনের পুত্র জেসন ইয়া দ্বীপ থেকে সেখানকার রাজকন্যা মিদিয়াকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছিল। দশ বছর সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করার পর জেসন ক্রেয়নের কন্যা কেরুসাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়। তখন মিদিয়া জেসনের নববিবাহিত বধূকে একটি বিষাক্ত পরিচ্ছদ

পাঠিয়ে দেয়, যা পরিধান করে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। এরপর মিদিয়া তার বিশ্বাসহন্তা স্বামীর ঔরসজাত নিজের দুই পুত্রকে হত্যা করে দেশান্তরে চলে যায়। ইউরিপিদেসের অপর নাটক বাক্কি-র (*Bacchoe*) বিষয়বস্তু হচ্ছে থেবেসে ডাওনিসোসের আগমন ও পেনথিওসের হত্যা। পেনথিওস ছিলেন থেবেসের রাজা ইডিপাসের মা ও স্ত্রী আইওকাস্তির প্রপিতামহ। দেবতা ডাওনিসোস থেবেসে এলে সেখানকার নারীরা চিথেরন পাহাড়ে যে মদ্যপানের উৎসব শুরু করেছিল তাতে বাধা দেবার জন্য তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভুল করে কোন বন্য পশু মনে করে তাঁকে তার মা এবং অপরাপর মেয়েরা হত্যা করে। আলকেস্তেস (*Alcestes*) নাটকে ইউরিপিদেস পেলিয়োসের কন্যা আলকেস্তেসের প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তার বিবাহ হয়েছিল ফেরেসের পুত্র আদমেতোসের সঙ্গে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আদমেতোসের মৃত্যু হলে আলকেস্তেস তার নিজের আয়ু দান করে তার স্বামীকে বাঁচিয়েছিল। আইওন (*Ion*) নাটকে একটি মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর দুঃখময় জীবন এবং পরিশেষে মাতার সঙ্গে তার মিলনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইউরিপিদেসের সাইক্লোপস গ্রীক সাহিত্যের একমাত্র টিঁকে-থাকা সাতুরি নাটক।

এস্কাইলাস মানব-প্রেমিক, পিথাগোরীয় দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী, মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলিই তার নাটকে ফুটে উঠেছে। দেবতাদের চরিত্রকেও তিনি মানুষের মত করে গড়েছেন। তবে পণ্ডিতদের মতে তাঁর নাটকের গতি কিছুটা শ্লথ। যদি এস্কাইলাসকে গ্রীক ট্রাজেডির স্রষ্টা বলা হয় সফোক্লেসের হাতে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এস্কাইলাস একটি কাহিনীকে তিনটি নাটকে ব্যক্ত করতেন, সফোক্লেস এই রীতির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। মঞ্চরীতির দিক থেকেও তিনি এস্কাইলাসের উপর আরও সংযোজন করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রসসৃষ্টিতে সফোক্লেস আরও বেশী সার্থক। পক্ষান্তরে, ইউরিপিদেসের নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাঁর প্রতিটি নাটকেরই সুর বিভিন্ন : করুণ রস সৃষ্টিতে ইউরিপিদেস এস্কাইলাস ও সফোক্লেসকে ছাড়িয়ে গেছেন। ধর্মীয় আদর্শের দিক থেকে এস্কাইলাস ও সফোক্লেসের থেকে তাঁর মনোভাব ছিল পৃথক্। তাঁর চোখে দেবতারা মোটেই উচ্চ পর্যায়ের জীব নয়, বরং নৈতিক শক্তিকে তারা মানুষের নীচে। মেয়েদের প্রতিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার ছিল না, বরং তাঁকে

নারী-বিদ্বেষী বলা যায়। পুরাণ থেকে তিনি সেই সব কাহিনীই বেছে নিয়েছিলেন, যে সব কাহিনীতে মেয়েদের চরিত্রের খারাপ দিকটাই বেশী প্রকট। ইউরিপিদেস মঞ্চসজ্জায় বাহুল্য পছন্দ করতেন না, এবং মঞ্চকে বর্ণাঢ্য করে তোলাও ছিল তাঁর আদর্শ বিরুদ্ধ। তাঁর চরিত্রগুলির কেউই সাধারণতার উপরে উঠতে পারেনি ; মহৎ ভাবের চেয়ে জাগতিক জ্ঞানই তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। এই সব মিলিয়ে এস্কাইলাস ও সফোক্লেসের সঙ্গে ইউরিপিদেসের পার্থক্য অনেকখানি।[১]

গ্রীক কমেডির উৎপত্তির কথা আমরা আগেই বলেছি। গ্রীক ট্রাজেডি বলতে যেমন এস্কাইলাস-সফোক্লেস-ইউরিপিদেস এই তিনজন নাট্যকারকেই বোঝায়, সেই রকম কমেডির ক্ষেত্রেও যে তিনজনকে একসঙ্গে বোঝায় তাঁরা হচ্ছেন ক্রাতিনোস, ইউপোলিস ও আরিস্তোফানেস। কিন্তু এঁদের মধ্যে শেষোক্ত জনই স্থায়ী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ক্রাতিনোসের জন্ম ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, মৃত্যু ৪২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি একুশটি নাটক রচনা করেছিলেন, এবং পুরস্কার পেয়েছিলেন নয়বার। তিনি শেষ পুরস্কার লাভ করেন আরিস্তোফানেসের লেখা নেফেলাই (*Nephelai*) নাটককে পরাজিত করে। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে পাইতিনে (*Pytine*) যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'মদ্যভাণ্ড'। এই নাটকে তিনি নিজেকে একটি পাঁড় মাতালরূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর হাস্যরসের মধ্যে আছে বুদ্ধির দীপ্তি যদিও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তীব্র শ্লেষ। রাজনীতির উপর লেখা তাঁর নাটকগুলি নামেই বর্তমান।

ইউপোলিসের জন্ম ৪৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, মৃত্যু পেলোপনেশীয় যুদ্ধকালে। মাত্র সতের বছর বয়সেই তিনি নাট্যকার হিসাবে আবির্ভূত হন এবং সাতবার

১। এস্কাইলাস, সফোক্লেস ও ইউরিপিদেসের সামগ্রিক অনূদিত সংকলনের জন্য গ্রীন ও ল্যাটিমোর কৃত *Complete Greek Tragedies* (১৯৫৯) দ্রষ্টব্য। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এস্কাইলাসের নাটকগুলির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন মিলম্যান ও ব্রাউনিং, মোরসেড, গিলবার্ট মারে, ট্রেভেলান ও কুকসন এবং তাঁর সাতটি নাটকেরই একত্র অনুবাদ করেছেন লেউইস ক্যাম্পবেল ও হেডআলম দম্পতি। সফোক্লেসের জন্য জেব অনূদিত *The Tragedies of Sophocles* (১৯০৫) দ্রষ্টব্য। এছাড়া Loeb Classical Series-এ এঁদের রচনাবলীর মূল সহ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে (১৯১২-১৩)। বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত অংশসমূহ *Tragicorum Graecorum Fragmenta* (১৯২৬) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

পুরস্কার লাভ করেন। কথিত আছে, স্বৈরাচারী শাসক অলকিবিয়াডেস তাঁকে হত্যা করান, কেননা ইউপোলিস একটি নাটকে তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তাঁর পনেরটি নাটকের নাম ও কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেছে। প্রাচীন লেখকেরা তাঁদের রচনায় ইউপোলিসের কল্পনার ঐশ্বর্য, মাত্রাজ্ঞান ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করেছেন। আরিস্তোফানেসের মত তিনিও তৎকালীন দুর্নীতি ও অধঃপতনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

আরিস্তোফানেস ছিলেন গ্রীক কমেডির সম্রাট। জন্ম ৪৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, মৃত্যু ৩৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কথিত আছে, তিনি মোট চুয়াল্লিশটি নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর মাত্র এগারোখানি নাটক পাওয়া গেছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী আরিস্তোফানেসের নাটকগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে পৌরাণিক, প্রহসন ও প্যারোডি। এই ধরনের দুটি রচনার উল্লেখ পাওয়া গেছে, দিদালোস (*Daedalos*) ও দানাইদেস্ (*Danaides*), কিন্তু নাটক দুটির কোন অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলিকে Comedies of Fancy বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে যে দুটি নাটককে ফেলা হয় সেগুলি হচ্ছে গেরাস (*Geras*) এবং ওরনিথেস (*Ornithes*)। প্রথম নাটকটির বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় 'বৃদ্ধ বয়স'। এই নাটকটিও লুপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় নাটকটির, অর্থাৎ ওরনিথেস-এর, ইংরাজী নাম দি বার্ডস। এটি আরিস্তোফানেসের ষষ্ঠ নাটক যা সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে। অনেকে এই নাটকটিকেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে মনে করেন। রঙ্গরসের মাধ্যমে নাট্যকার এখানে আথেন্সের সিসিলি অভিযানের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন। এরপর আসছে তাঁর সামাজিক নাটকগুলির কথা। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নেফেলাই (*Nephelai*), ইংরাজী নাম ক্লাউড্স্। রচনাকাল ৪২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এটি আরিস্তোফানেসের তৃতীয় নাটক এবং তাঁর নিজের বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ, যদিও ক্রাতিনোসের একটি নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই নাটকটি বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। নেফেলাই নাটকে সফিস্ট নামক দার্শনিক শ্রেণীর শিক্ষাদান-পদ্ধতির উপর তীব্র আক্রমণ চালানো হয়েছে এবং নাটকের নায়ক সক্রেটিসকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। সামাজিক সমস্যাবলীর উপর রচিত আরিস্তোফানেসের আরও একটি শ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে স্ফেকেস (*Sphekes*), যার ইংরাজী নাম ওয়াস্পস্। এটি আরিস্তোফানেসের চতুর্থ নাটক যা রচিত হয়েছিল ৪২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই নাটকে আথেনীয়দের

মামলা-মোকদ্দমা-প্রিয়তার প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। নাটকটির দুটি প্রধান চরিত্রের মধ্যে একজন পিতা ফিলোক্লেয়ন ও আর একজন তাঁর পুত্র বেদিলিক্লেয়ন। বিষয়বস্তু হচ্ছে যে একটি কুকুর ঘর থেকে পনির চুরি করে খেয়েছে এবং সেই ঘরে একটি আদালত বসানো হয়েছে। ফ্রগ্‌স আরিস্তোফানেসের অপর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক। এটি তাঁর নবম রচনা, বিষয়বস্তু হচ্ছে ট্রাজেডি-লেখকদের ব্যর্থতা। দেবতা ডাওনিসোস গ্রীক ট্রাজেডির মানের অধঃপতন দেখে শেষ পর্যন্ত হেরাক্লেসের ছদ্মবেশে নিজ প্রিয় নাট্যকারের সন্ধানে মৃতের রাজ্যে যাত্রা করলেন এবং সেখানে ইউরিপিদেসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। লঘুরসের এই নাটকটির একটি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হচ্ছে এস্কাইলাসের সঙ্গে ইউরিপিদেসের প্রতিযোগিতা। আরিস্তোফানেসের অপর একটি সামাজিক স্যাটায়ার হচ্ছে এক্লেসিয়াৎসুসি (*Ecclesiazusoc*)। এটি তাঁর রচিত দশম নাটক যেখানে তিনি একটি মাতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। সম্ভবত এই নাটকটির উপর প্লেটোর মতবাদের প্রভাব আছে। এইগুলি ছাড়া আরিস্তোফানেস রচিত আরও কয়েকটি সামাজিক নাটকের টুকরো টুকরো অংশ পাওয়া যায়, যেমন দেইতালেস, হোরাই, লেমনিয়াই, গেরাইতাদেস ইত্যাদি। আরিস্তোফানেসের চতুর্থ শ্রেণীর নাটকগুলি যুদ্ধ সংক্রান্ত রচনা। এই রচনাগুলি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, কেন না তিনি নিজে পেলোপনেশীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অভিজ্ঞতাই তাঁকে শান্তিবাদী করে তুলেছিল। এই পর্যায়ের নাটকগুলি হচ্ছে আকার্নিয়ানস, এইরিনি ও লুসিস্ত্রাতে। তাঁর পঞ্চম শ্রেণীর নাটকগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজনৈতিক। এই শ্রেণীর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাবুলোনি এবং হিপ্পি। শেষোক্ত নাটকটির ইংরাজী নাম *The Knights* যেখানে ক্লিয়নকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। এইগুলি ছাড়া আরিস্তোফানেসের আরও দুটি নাটক আছে যেগুলিকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। একটি হচ্ছে থেস্‌মোফোরিয়াৎসুসি যেখানে ইউরিপিদেসের নারীবিদ্বেষ এবং তার ফলে তাঁর নাকাল হবার কৌতুকাবহ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্লুতোস। ধনাধিপতি এই দেবতা কিভাবে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেলেন সে কাহিনী এখানে বলা হয়েছে। সমসাময়িকতাকে রচনার উপজীব্য করেছিলেন বলেই আরিস্তোফানেসের সৃষ্টি কালোত্তীর্ণ হয়নি। তবুও মহাজ্ঞানী প্লেটো তাঁর সিম্পোজিয়াম গ্রন্থে আরিস্তোফানেস সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা অবশ্যই স্মরণীয়। "বিদ্যাদেবী

তাঁর এক চিরস্থায়ী মন্দিরের জন্য আরিস্তোফানেসের আত্মাকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল ভাব ও কল্পনা যা খুব অল্প প্রাচীন কবিদের মধ্যেই ছিল। তাঁর সুতীব্র দৃষ্টি তৎকালীন সমাজের মর্মমূলে পৌঁছেছিল, যে সমাজ ছিল অজস্র দুর্নীতির আকর। ঘৃণ্যের প্রতি ঘৃণা, এবং দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল প্রাক্-ম্যারাথন দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে, এবং এই জন্যই কোন কিছুর পরোয়া না করে, যা কিছু মানবতা-বিরোধী তার সবগুলিকেই অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এসেছেন।" এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে?

আরিস্তোফানেসের পরে রচিত কমেডিগুলিকে Middle Comedy বলা হয়। এই যুগের কমেডিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আন্তিফানেস ও আলেকসিস। আন্তিফানেসের জন্ম ৪০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি থেসালি থেকে আথেন্সে এসে বসবাস করেছিলেন, এবং ৭৪ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কথিত আছে, তিনি ২৬০টি নাটক রচনা করেছিলেন, যেগুলির মধ্যে ২০০টি নাটকের নামটুকু মাত্র পাওয়া যায়। এই কারণেই তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে তাঁর পরবর্তী যুগের লেখকেরা তাঁদের রচনায় আন্তিফানেসের নাটকের প্রশংসা করেছেন। আলেক্সিস ৩৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে থুরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০৬ বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, এবং কথিত আছে, ২৪৫টি নাটক রচনা করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর রচনার চিহ্নমাত্র নেই।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দের পরবর্তী কমেডিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দিফিলোস, ফিলেমন এবং মেনান্দার। দিফিলোস ছিলেন সিনোপের অধিবাসী। কথিত আছে যে তিনি শতাধিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর ৫০টি নাটকের নামটুকু পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা বলেন যে প্লতাসের কাসিনা (*Casina*) ও রুদেন্স (*Rudens*) নাটকদ্বয় দিফিলোসের দুটি নাটককে মডেল করে গড়ে উঠেছে। তেরেন্স তাঁর *Adelphi* নাটকে দিফিলোসের থেকে কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করেছিলেন। নাট্যকার ফিলেমন ৩৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাইরাকিউজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় নাট্যকার, তাঁর ৯৭টি নাটকের মধ্যে ৫৭টির নাম এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এবং তাঁর রচনার কিয়দংশের ল্যাটিন অনুবাদ প্লতাসের রচনায় রক্ষিত আছে। নাট্যকার মেনান্দার (*Menandros*) আথেন্সে ৩৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শতাধিক

নাটক রচনার কৃতিত্ব তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর একটি নাটকও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। শুধু পাওয়া গেছে ৭৩টি রচনার নাম এবং কিছু কিছু অংশ যা প্লতাস ও তেরেন্সের কয়েকটি নাটকে অনূদিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। এ ছাড়া লুসিয়ান এবং আলক্রিয়ন তাঁদের গ্রন্থে মেনান্দেরের রচনার উল্লেখ করেছেন।[১]

৬॥ গ্রীক গদ্যসাহিত্যের সূচনা

কবিতার মত গদ্যেরও প্রথম বিকাশ হয়েছিল আইওনীয়দের মধ্যে। প্রথম গদ্যলেখক হিসাবে যাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন সাইরাসের ফেরেসাইদেস, যদিও তাঁর রচনার চিহ্নমাত্র নেই। এর পরেই আসে ঈশপের কথা যাঁর Fable বা গল্প জগদ্বিখ্যাত। ইনি আসলে ফ্রিজিয়ার লোক ছিলেন, ক্রীতদাস অবস্থায় গ্রীসে আনীত হয়েছিলেন। শোনা যায়, সক্রেটিস তাঁর বন্দী জীবনের শেষ দিনগুলিতে ঈশপের গল্পগুলিকে পদ্যে অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন। ঈশপের গল্পগুলি প্রথম সংকলিত হয় ফালেরামের দেমেত্রিয়োসের চেষ্টায় ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অ্যাটিক যুগের গদ্যসাহিত্য মূলত দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকদের হাতে গড়ে উঠেছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক গদ্যসাহিত্যের ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

গ্রীক দার্শনিকদের রচনার মাধ্যমে গদ্যসাহিত্য বহুলাংশে পুষ্ট হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য মিলেসাসের থালেস (মৃত্যু ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), যিনি জলকেই সমস্ত কিছুর উদ্ভবের আদি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনার কোন চিহ্নই এখন নেই। পরবর্তী দার্শনিক আনাক্সিমান্দের (মৃত্যু ৫৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) জগতের মূল কারণ হিসাবে গুণবর্জিত এক অনির্বচনীয় সত্তাকে নির্দেশ করেছিলেন যা বিপরীতধর্মী দুটি শক্তির দ্বারা চালিত। তাঁর

১। ক্রাতিনোস ও ইউপোলিসের রচনাবলীর অংশবিশেষ *Comicorum Atticorum Fragmenta* (১৮৮০-৮৫) গ্রন্থে রক্ষিত আছে। এ ছাড়া Norwood-এর *Greek Comedy* (১৯৩১) ও Edmund-এর *Fragments of Attic Comedy* (১৯৫৭) গ্রন্থদ্বয়েও অনুবাদ সহ এঁদের রচনার নিদর্শন পাওয়া যাবে। আরিস্তোফানেসের নাটকসমূহের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন রোজার্স (১৯০২-১৬) এবং ওই অনুবাদ Loeb Classical Series-এ (১৯২৪) প্রকাশিত সংস্করণে মূল গ্রীকের ল্যাটিন অনুবাদের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে; পরবর্তী যুগের নাট্যকারদের জন্ত ওয়েবষ্টারের *Studies in Later Greek Comedy* দ্রষ্টব্য।

রচনার মাত্র কয়েকটি লাইন এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন আনাক্সিমেনেস বায়ুকেই জগতের আদি কারণরূপে গণ্য করেছিলেন যা বিভিন্ন অবস্থায় আগুন, মেঘ, জল ও মাটিতে রূপান্তরিত হয় বলেই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এই দার্শনিকের রচনাও এখন লুপ্ত। দার্শনিক হেরাক্লাইতোস (*Herakleitos*) আগুনকেই আদি সত্তা বলে ঘোষণা করেছিলেন। আধুনিক দর্শনে যাকে বলে দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী (Dialectic) হেরাক্লাইতোস তারই আদি প্রবক্তা। আইওনীয় ভাষায় তাঁর লেখা প্রকৃতি তিনখণ্ডে বিভক্ত, রচনার ভাষা কর্কশ এবং রীতিতেও কোন বাঁধুনি নেই। সামোসের পিথাগোরাস দর্শনকে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রচনার উল্লেখ তাঁর অনুগামীদের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর নামে প্রচলিত 'স্বর্ণাভ বচনসমূহ' তাঁর লেখা নয় বলেই পণ্ডিতদের বিশ্বাস। আনাক্সাগোরাসের জন্ম এশিয়া মাইনরে আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর দর্শনের মূল কথা হচ্ছে যে, এই বিশ্বচরাচর গঠিত হয়েছে অগণ্য ধ্বংসহীন মৌলিক উপাদান দিয়ে, যেগুলিকে গুণগতভাবে পৃথক্ করা যায় এবং যেগুলির একের সঙ্গে অন্যের সমন্বয় হয়েছে এক পরম শক্তির অব্যক্ত ক্রিয়ায়, যে শক্তিটি বস্তুনিরপেক্ষ হয়েও বর্তমান। দেমোক্রিতোসের (Demokritos) জন্ম আবডেরায়, আনুমানিক ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁকে বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন পারমাণবিক ধারণারও উদ্গাতা। প্রোতাগোরাসও আবডেরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। নাস্তিক্যের সমর্থনে তাঁর বিখ্যাত "দেবতাদের সম্বন্ধে" শীর্ষক গ্রন্থের জন্য তিনি আথেন্স থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তাঁর উক্তি "মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি" আজ প্রবচনে পরিণত হয়েছে। গোর্গিয়াসের জন্মস্থান সিসিলি। তিনি ছিলেন নেতিবাদী দার্শনিক। তাঁর বক্তব্যঃ কোন কিছু নেই, যদি কিছু থাকে, তা জানা যাবে না, যদি কিছু জানা থাকে, তা বলা যাবে না। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় দার্শনিক সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তের মতবাদও হুবহু এই। তাঁর নামে প্রচলিত দুটি রচনা এপর্যন্ত পাওয়া গেছে, 'হেলেনের প্রশংসা' এবং 'পালামেদেসের প্রতি সমর্থন'। মহাজ্ঞানী প্লেটো ও তৎশিষ্য আরিস্টোটল জন্মগ্রহণ করেছিলেন যথাক্রমে ৪২৮ ও ৩৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এঁদের কথা আমরা পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করব। এই সব দার্শনিকের রচনায় গ্রীক গদ্যসাহিত্য রীতিমত পুষ্ট হয়েছে।

হিপ্পোক্রাতেস ছিলেন গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক, জন্ম ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে

কস দ্বীপে। পেলোপনেশীয় যুদ্ধের সময় তিনি আথেন্সে ছিলেন, শেষ জীবনে বাস করেছেন থেসালিতে। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার তিনিই ছিলেন প্রবর্তক এবং কথিত আছে, চিকিৎসাশাস্ত্র-বিষয়ক ৭২টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'সূত্রসমূহ' মধ্যযুগ পর্যন্ত বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। পরবর্তী কালে রোমক এবং আরও পরে আরব পণ্ডিতদের রচনার উপর এই গ্রন্থটির অনেক প্রভাব পড়েছে। হিপ্পোক্রাতেস শুধু চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েই লেখেননি। আবহতত্ত্ব, সাহিত্যতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্বের উপর তার মৌলিক চিন্তাধারার কথা প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেছেন। রোমক যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রে দায়োস্কোরিদেস, সোরানোস এবং গালেন চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর এবং থিওন, নিকোমাকোস, দিওফানতোস ও পাপ্পোস অঙ্কশাস্ত্রের উপর গ্রীকভাষায় মৌলিক গবেষণা করেছিলেন।

সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্যতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপরও রচনার অভাব গ্রীক সাহিত্যে নেই। এ বিষয়ে আরিস্টোটলকেই পুরোধা বলা যায়, যদিও তাঁর পূর্বে কেউ কেউ এই সব বিষয়ের উপর কিছু কিছু আলোকপাত করেছেন (আরিস্টোটল দ্রষ্টব্য)। আলেকজান্দ্রীয় যুগে জেনোদোতোস (২৭৫ খ্রী: পূ:), বাইজানসিয়ামের আরিস্তোফানেস (১৭৫ খ্রী: পূ:), ক্রাতেস (১৭০ খ্রী: পূ:) এবং আরিস্তারকোসের (১৫৩ খ্রী: পূ:) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এঁদের রচনাবলীর তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। রোমক যুগে ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে আপোলোনিয়োস দাইস্কোলোস এবং তাঁর পুত্র হেরোদিয়ান, এথেনিয়োস, স্তোরিয়োস এবং হার্মোগেনেস উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।[১]

গ্রীক গদ্যলেখকগণ ভূগোলশাস্ত্রেও তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই বিষয়ের সর্বপ্রাচীন লেখক হলেন হেকাসিওস (৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আলেকজান্দ্রীয় যুগের এরাতোস্থেনেস (মৃত্যু ১৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রকৃত অর্থে

১। গ্রীক দার্শনিকদের জন্য আডামসনের *Development of Greek Philosophy* (১৯০৮), বার্নেটের *Greek Philosophy* (১৯২০) এবং গোম্পার্ৎসের (Gompertz) *Greek Thinkers* (চার খণ্ড, ১৯১২), হিপ্পোক্রাতেস ও গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য অ্যাডামসের *The Genuine Works of Hippocrates* (১৮৪৯), মুনের *Hippocrates and His Successors* (১৯২৩) এবং সিঙ্গারের *Greek Biology and Greek Medicine* (১৯২২) ও সামগ্রিকভাবে গ্রীক গদ্যসাহিত্যের জন্য জেবের *Companion to Greek Studies* এবং কাউলারের *History of Ancient Greek Literature* দ্রষ্টব্য।

বৈজ্ঞানিক ভূগোলশাস্ত্রের জনক'। তিনি ভূগোল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চারটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেগুলির নাম জিওগ্রাফিকা (*Geographica*), ক্রোনোগ্রাফিয়া (*Chronographia*), কাতালোগোই (*Catalogoi*) এবং কাতাস্তেরিস্‌মোই (*Catasterismoi*)। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত ভূগোলবিদ্‌ ছিলেন স্ত্রাবো ও টলেমি। স্ত্রাবোর জিওগ্রাফিকা মোট সতের খণ্ডে আজও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ডে স্ত্রাবো তাঁর পূর্বতন ভূগোলকারদের সমালোচনা করেছেন, যদিও সর্বত্র তাঁর সমালোচনা যথার্থ হয়নি। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রাকৃতিক ভূগোলের গাণিতিক আলোচনা যা তাঁর গ্রন্থের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। তৃতীয় খণ্ডে আছে স্পেনের ভূগোল, চতুর্থ খণ্ডে গল, বৃটেন, আয়র্ল্যাণ্ড ও আল্পস, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে ইটালী, সপ্তম খণ্ডে ড্যানিয়ুব পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ইউরোপ, অষ্টম থেকে দশম খণ্ড পর্যন্ত গ্রীস, একাদশ থেকে ষোড়শ খণ্ড পর্যন্ত এশিয়া এবং সপ্তদশ খণ্ডে আফ্রিকা। টলেমি ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্‌ ও ভূগোল-বিশারদ। তাঁর ভূগোল-সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস (*Geographice Hyphegesis*)। আট খণ্ডে লেখা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে গাণিতিক ভূগোল এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের হিসাব, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম খণ্ডে আছে তাঁর রচিত বিশ্বের মানচিত্রের স্থান-নাম ও পরিচয় এবং অষ্টম খণ্ডে আছে আবহাওয়ার কথা। তাঁর অপরাপর গ্রন্থ: আলমাগেস্ত (জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক) এবং হারমোনিকস (সঙ্গীত-বিষয়ক)। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের আরও একজন বিখ্যাত পর্যটক ও ভূগোলকার ছিলেন পজানিয়াস। তিনি নিজে সমগ্র গ্রীকভূমি পর্যটন করে তার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন দশ খণ্ডে, নাম পেরিগেসিস্‌ (*Periegesis*)। সমগ্র গ্রন্থটি অবিকৃত আছে এখনো পর্যন্ত এবং গ্রীকবিদ্‌দের নিকট পজানিয়াসের মূল্য বড় কম নয়।[১]

১। স্ত্রাবোর রচনাবলী *Loeb Classical Series* কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে জোনস-কৃত ইংরাজী অনুবাদ সহ। টলেমির ভূগোলের ল্যাটিন অনুবাদ হয়েছিল ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের একমাত্র প্রামাণ্য ইংরাজী অনুবাদ স্টাইনস্যাণ্ডের *Geography of Ptolemy*। তা ছাড়া তাঁর ভূগোলের ভারত-সংক্রান্ত অংশগুলি অনুবাদ করেছেন McCrindle, *Ancient India as Described by Ptolemy* এই নামে। তাঁর অপরাপর রচনা *Bibliotheca Graecorum Scriptorum* গ্রন্থে রক্ষিত আছে। পজানিয়াস সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ফ্রেজারের *Pausanias's Description of Ancient Greece* (ছয় খণ্ড, ১৮৮৮)।

ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাও প্রথম আইওনিয়া থেকে শুরু হয়। আদি ইতিবৃত্তকারগণ (Logographoi) তাঁদের রচনা অবশ্য গদ্যেই লিখেছিলেন, এবং তাঁদের রচনার অতি অল্প অংশই বর্তমানে টিঁকে আছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিলেসাসের কাদমোস, ডাওনিসোস, হেকাসিওস, সার্দিসের জানথোস, লেসবসের হেল্লানিকোস, লাম্প্‌সাকোসের চারোন, লেরসের ফেরেকাইদেস প্রভৃতি। এঁরা পারসিক যুগের পূর্ববর্তী।

লোগোগ্রাফারগণ ইতিহাসধর্মী রচনার সূত্রপাত করলেও হেরোডোটাসকেই ইতিহাসের প্রকৃত জনক বলা হয়। ৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরের হালিকারনাসাসে হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি সামোস দ্বীপে পালিয়ে যান। তারপর শুরু হয় তাঁর বিখ্যাত দেশভ্রমণ। পূর্ব দিকে পারস্য পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মিশর পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণ-সূচীর অন্তর্গত ছিল। এই সকল দেশের অবস্থা চাক্ষুষ পরিদর্শন করে, এই সকল স্থানের লোকবৃত্তিসমূহ, নৃতত্ত্ব, পৌরাণিক কাহিনী, রাজবৃত্ত, লেখমালা, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করে তিনি ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিহাসের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটি মতবাদ ছিল যা পুষ্ট হয়েছিল তাঁর ভূয়োদর্শনের দ্বারা। তিনি তাঁর ইতিহাস অবশ্য সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, তবে তিনি যা লিখেছিলেন তার কিছুটা অংশ এখনো পাওয়া যায় যা পরবর্তী কালে ল্যাটিন ভাষায় এবং এযুগে বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থটিকে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন নামে আখ্যাত করা হয়েছে। ইংরাজী নাম দি হিস্ট্রীজ।

সমসাময়িক যুগের নিখুঁত ইতিহাস রচনা করে থুকিদিদেস অমর হয়েছেন। তাঁর জন্ম ৪৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি ছিলেন দার্শনিক আনাক্সাগোরাস ও গোর্গিয়াসের ছাত্র। রাজনৈতিক কারণে তিনিও আথেন্স থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, এবং কুড়ি বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। যখন বিখ্যাত পেলোপনেশীয় যুদ্ধ শুরু হয়, তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধ পরিধি ও ঘটনার দিক থেকে পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধকে ছাপিয়ে যাবে। আথেন্সের বাইরে থাকার জন্য তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঘটনাসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই কারণেই তাঁর ইতিহাস প্রকৃতই তথ্যমূলক ও নিরপেক্ষ হতে পেরেছিল। থুকিদিদেসের পেলোপনেশীয় যুদ্ধের ইতিহাস তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আছে আর্কিদামীয় যুদ্ধ থেকে

নিকিয়াসের সন্ধি পর্যন্ত (১-৫।২৪)। দ্বিতীয় ভাগে আছে সিসিলি অভিযান ও তার পরবর্তী ঘটনা (৫-২৫।৭)। তৃতীয় ভাগে আছে দেকেলীয় যুদ্ধ।। প্রথম চারটি অধ্যায়, এবং সিসিলি অভিযানের দুটি অধ্যায় (ষষ্ঠ ও সপ্তম) এক কথায় অনবদ্য। পঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার মূল অন্বেষণ, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং নিরপেক্ষতা। ইতিহাস যে কতদূর কাব্যময় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পেরিক্লেসের সমাধিভাষণে।

জেনোফোনও ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, জন্ম ৪৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। পেশায় তিনি ছিলেন একজন যোদ্ধা। যখন কাইরাস ব্যাবিলনে কুনাক্সার যুদ্ধে পরাজিত হলেন, এবং গ্রীক সেনাপতিরা পারসিকদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হলেন, তখন জেনোফোন স্পার্টার সেনাপতি ক্লিসোফাসের সঙ্গে হতাশ দশ সহস্র গ্রীক সৈন্য নিয়ে মেসোপটেমীয় অঞ্চল হয়ে আর্মেনীয় মালভূমির উপর দিয়ে এবং আরও বহু স্থান ঘুরে, নানা রকম বিপৎসঙ্কুল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত স্বদেশে ফিরে আসেন। দশ সহস্রের এই ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের কাহিনী জেনোফোন লিখেছেন সাতটি খণ্ডে বিভক্ত আনাবাসিস গ্রন্থে। থুকিদিদেসের পেলোপনেশীয় যুদ্ধের অসমাপ্ত ইতিহাস তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন তার হেলেনিকা গ্রন্থে।[১]

আলেক্সান্দ্রীয় যুগে, অর্থাৎ ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে ইতিহাস রচনার প্রবণতা দেখা যায়। ক্লিতার-কোস (৩০০ খ্রীঃ পূঃ) বারো খণ্ডে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর তথ্যাবলী মারাত্মকভাবেই অবিশ্বাস্য যার চোদ্দ আনাই অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। তবে লিখনভঙ্গীর গুণে তার রচনা জনপ্রিয় হয়েছিল। তিমিওস (২৫৬ খ্রীঃ পূঃ) লিখেছিলেন আদিকাল থেকে ২৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত

১। জেনোফোন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কাইরাসের জীবনী অবলম্বনে তিনি রচনা করেছিলেন কাইরোপেদিয়া। তাঁর স্মৃতিকথা আপোম্নেমোনুমাতা এবং সিম্পোজিয়াম এই দুই খণ্ডে তিনি তাঁর গুরু দার্শনিক সক্রেটিসের জীবনের খণ্ড খণ্ড দিকগুলি আলোচনা করেছেন। তাঁর অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আগেসিলাওস (জনৈক স্পার্টার রাজার জীবনী), ইকনমিকোস (গার্হস্থ্য অর্থনীতি) হেয়িরোন (দুজন স্বেরাচারী নায়কের সংলাপ), হিপ্পার্কিকোস (যুদ্ধবিদ্যা) এবং কুনেগেটিকোস। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী লাটিন অনুবাদে পাওয়া গেছে: দে রিপাবলিকা লাকেদেমোনিওরুম (স্পার্টার সংবিধান), দে রিপাবলিকা আথেনিয়েন্সিয়ুম (আথেনীয় সংবিধান), দে রে এক্যুয়েস্ত্রি (অশ্বপালন ও পরিচালনা) এবং দে ভেক্তিগালিবুস (রাজস্বনীতি)। এই গ্রন্থগুলি থেকেই জেনোফোনের প্রতিভার একটা সার্বিক পরিচয় পাওয়া যায়।

সিসিলির ইতিহাস ৬৮ খণ্ডে। এ ছাড়া তিনি আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, কিরাসের অভিযান। আপোলোদোরোস (১৪০ খ্রীঃ পূঃ) ছিলেন ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ্ ও বৈয়াকরণ। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম ক্রনিকা, বিব্লিওথেকা এবং 'দেবতাদের সম্পর্কে'। পলিবিওস (১২২ খ্রীঃ পূঃ) ছিলেন রোম অধিকৃত গ্রীসের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক প্রতিভা। তিনি ২২০ এবং ১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যকালের ইতিহাস চল্লিশ খণ্ডে রচনা করেন, নাম 'সর্বজাগতিক ইতিহাস'। প্রথম দুই খণ্ডে তাঁর রচনার ভূমিকা হিসাবে তিনি ইটালী, আফ্রিকা ও গ্রীসের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রচ্ছদ, রোমের আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রোমের অভ্যুত্থানের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তৃতীয় থেকে বিংশতিতম খণ্ডে তিনি ২২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কিভাবে রোম হ্যানিবলীয়, ম্যাসিডোনীয় ও স্পেনীয় যুদ্ধসমূহের ভিতর দিয়ে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করতে চলেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। একবিংশ থেকে চল্লিশতম খণ্ডে তিনি ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন।

রোমক যুগের গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় দিওদোরোস ও দিওনিসোসের। এঁরা দুজনেই ছিলেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। দিওদোরোস, যাঁর উপাধি ছিল সিকুলোস, চল্লিশ খণ্ডে লিখেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস। দিওনিসোসের রচনার বিষয় ছিল রোমের পুরাবৃত্ত। দ্বিতীয় শতকের সর্বাধিক বিখ্যাত লেখক ছিলেন প্লুতার্ক। তিনি ছিলেন মূলত জীবনীসাহিত্য-লেখক এবং তাঁর রচনার যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে—তিনি জোড়ায় জোড়ায় জীবনী লিখেছিলেন, একটি গ্রীক চরিত্র এবং তার অনুরূপ একটি রোমক চরিত্র নিয়ে। তাঁর রচিত এই রকম জীবনীগ্রন্থ মোট ছেচল্লিশটি পাওয়া গেছে।[১] দ্বিতীয় শতকের আরও দুজন বিখ্যাত

১। এই ৪৬টি জীবনীগ্রন্থ ছাড়া আরও ৮৩টি নানাধরনের রচনা তাঁর আছে। কয়েকখণ্ডে রচিত মোরালিয়া, পাঁচখণ্ডে রচিত দর্শনের ইতিহাস যার রোমক নাম দে প্লাসিতিস ফিলোসোফোরাম, পুরাণচর্চামূলক তিনটি গ্রন্থ যেগুলির ইংরাজী নাম আইসিস এণ্ড ওসিরিস, ওরাক্‌লস অফ দি পাইথিয়ান প্রিস্টেস এবং ডিকে অফ দি ওরাক্‌লস, প্লুতার্ককে পরবর্তী গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার আসন দিয়েছে। কিন্তু রচনার সাহিত্যগুণ সবচেয়ে বেশী ফুটে উঠেছে তাঁর শেষ গ্রন্থ যার ল্যাটিন নাম কোয়েস্তিওনেস কনভিভিয়ালেস্ বা কথোপকথন, যেখানে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা সরস কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঐতিহাসিক ছিলেন আপ্পিয়ান ও আরিয়ান। আপ্পিয়ান ছিলেন ঐতিহাসিক, রোমক সাম্রাজ্যের আদিযুগ থেকে ট্রাজানের যুগ পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। তাঁর ২৪টি গ্রন্থের মধ্যে এ পর্যন্ত মোট ১১টি পাওয়া গেছে যেগুলি হচ্ছে স্পেন (ষষ্ঠ), হানিবল (সপ্তম), কার্থেজ (অষ্টম), সিরিয়া (একাদশ), মিথ্রিদাতেস (দ্বাদশ), রোমক গৃহযুদ্ধ (ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ) এবং ইলিরিয়া (ত্রয়োবিংশ)। আরিয়ান ছিলেন দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। তিনি সম্রাট হাদ্রিয়ান, আন্তোনিয়াস পায়াস এবং মার্কাস অরেলিয়াসের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এপিক্‌তেতোসের দর্শনের উপর তাঁর দুটি বিখ্যাত রচনা আছে, ডিসকোর্সেস ও এন্‌কেইরিদন। তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে আলেকজাণ্ডারের অভিযান। নিয়ার্কোসের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তিনি ভারত সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, নাম ইণ্ডিকা। তাঁর অপরাপর রচনাবলীর মধ্যে আছে পেরিপ্লোস পন্তি ইউক্‌সেনি (সমুদ্রযাত্রার বিবরণী) এবং সাইনেগেটিকাস (শিকারকাহিনী)। বহুমুখী প্রতিভার জন্য তাঁকে "ছোট জেনোফোন" বলা হত। তৃতীয় শতকে দিওকাসোস ৮০ খণ্ডে লিখেছিলেন রোমের ইতিহাস, ইনিয়াসের রোমে আগমন থেকে তাঁর নিজের যুগ অর্থাৎ ২২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ওই একই শতকে হেরোদিয়ান অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসরে লিখেছিলেন তাঁর যুগের রোমের ইতিহাস, মার্কাস অরেলিয়াসের মৃত্যুর পর থেকে তৃতীয় গর্দিয়ানাসের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত (১৮০-২৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)।[১]

১। গ্রীক ঐতিহাসিকদের অধিকাংশ রচনাই Loeb Classical Series-এ প্রকাশিত হয়েছে। হেরোডোটাস রচিত ইতিহাসের ল্যাটিন অনুবাদ হিস্তোরিকুম লিব্রি ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে, সেটি পুনরায় সংশোধিত হয় ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। হেরোডোটাসের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন লিটলবুরি (১৭৩৭), আইজাক টেলর (১৮১৯), রলিনসন (১৮৫৮-৬০) ও মেকলে (১৮৯০)। পেঙ্গুইন সিরিজে সম্প্রতি প্রকাশিত অনুবাদ এখন সহজলভ্য। থুকিদিদেসের প্রামাণ্য অনুবাদ করেছেন জওয়েট (১৮৮৩); জেনোফোনের, ডেকাইনস (১৮৯০-৯৪, *Complete Works of Xenophon*); পলিবোসের, প্যাটন এবং স্ফুৎস (১৮৬৬-৭১, *Selections from Polybus*); দিওদোরোসের, স্পেলম্যান (১৭৫৮); প্লুতার্কের, ফিলেমন হল্যাণ্ড (১৬০৩, আংশিক) ও জন এবং উইলিয়াম ল্যাঙহোর্ন (১৯২৪-২৬); আপ্পিয়ানের, হোয়াইট (১৮৯৯) এবং আরিয়ানের, ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল (১৮৭৯), চিনোক (১৮৯৩) ও রুক (১৯১২)। গ্রীক ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে বিশদ তথ্যের জন্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য বিউরির *Ancient Greek Historians* (১৯০৮)।

৭॥ প্লেটো ও আরিস্টোটল

মহাদার্শনিক প্লেটো (Platon) ও তৎশিষ্য আরিস্টোটলের বিশেষ উল্লেখ না করলে গ্রীক সাহিত্যের পরিচয় দান অসম্পূর্ণ হবে। প্লেটো জন্মগ্রহণ করেছিলেন আথেন্সে ৪২৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২১শে মে তারিখে। প্রাচীন গ্রীক বিশ্বাস অনুযায়ী ওই দিনটি অ্যাপোলোদেবের জন্মদিন। প্লেটো ছিলেন কোদোরাস নামক নৃপতির বংশজাত, পিতার নাম আরিস্তোন। তাঁর মা পেরিকাতিওন ছিলেন বিখ্যাত আথেনীয় আইন-প্রণেতা সোলোনের পরিবারের মেয়ে। প্লেটোর আসল নাম আরিস্তোক্লেস, প্লেটো নামটি তাঁর গুরু সক্রেটিসের দেওয়া।

প্লেটোর যৌবনকালটা ছিল পেলোপনেশীয় যুদ্ধের কাল। অবক্ষয়ের লক্ষণ তখন আথেন্সের সমাজদেহে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছিল। তা প্লেটোর দৃষ্টি এড়ায় নি। এই কারণেই তিনি সমসাময়িক রাজনীতি থেকে নির্লিপ্ত ছিলেন, যদিও যে পারিবারিক ঐতিহ্যে তিনি গঠিত হয়েছিলেন তাতে রাজনীতি করার সুযোগ তাঁর প্রচুর ছিল। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করেই জীবন কাটিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে কাব্যপাঠ ও কাব্যরচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তারপর তিনি ধীরে ধীরে দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। দার্শনিক হেরাক্লাইতাসের শিষ্য ক্রাতুলোস তাঁর প্রথম গুরু। কুড়ি বছর বয়সে তিনি সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন। ৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো মেগারায় গমন করেন এবং সেখান থেকে তাঁর সতীর্থ ইউক্লিদেসের সঙ্গে সাইরিন ও ঈজিপ্টে গমন করেন। তারপর তিনি সিসিলির স্বৈরাচারী শাসক দিওনিসোসের আমন্ত্রণে সিসিলিতে উপস্থিত হন, কিন্তু সেখানে কোন কারণে দিওনিসোসের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি আথেন্সে ফিরে আসেন।

৩৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি আথেন্সের একটি বাগানে তাঁর বিখ্যাত আকাদেমির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে তিনি চল্লিশ বৎসর একনাগাড়ে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যান। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ভিন্ন তাঁর জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এখানে তিনি বহু শিষ্য পেয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আরিস্টোটল, স্পেউসিপ্পোস এবং জেনোক্রাতেস। রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে প্লেটোর উপদেশ শুধু আথেন্সেই নয়, গ্রীসের অপরাপর রাজ্যেও গ্রহণ করা হত। প্লেটো শিক্ষাদান করতেন সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমে, তাঁর রচনাগুলিও কথোপকথনের ছলে

রচিত বলে সেগুলি ডায়ালগস্ নামেই অধিকতর পরিচিত। দার্শনিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবশ্য তিনি বক্তৃতা দিতেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁর কর্মশক্তির কোন ক্ষয় হয়নি। ৮১ বৎসর বয়সে যখন তিনি মারা যান তখনও তিনি ছিলেন লিখনরত। তাঁর আকাদেমির প্রাঙ্গণেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

প্লেটো মোট ৩৬টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেগুলি পরবর্তী কালে থ্রাসিলোস নামক নব্য পিথাগোরীয় গোষ্ঠীর এক দার্শনিক কর্তৃক নয়টি খণ্ডে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল।[১] এগুলি ছাড়া আরও আটটি রচনা প্লেটোর নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেগুলি যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাদটীকায় প্রদত্ত প্লেটোর রচনাবলীর মধ্যে অধিকাংশেরই নামকরণ হয়েছে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের নামে; পূর্বসূরীদের দার্শনিক মতবাদসমূহ বোঝানোর জন্যই তিনি এই গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন।

তাঁর নিজস্ব মতবাদসমূহ মূলত ব্যক্ত হয়েছে সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক ও বিধানাবলী নামক গ্রন্থে। তাঁর রিপাবলিক দশটি খণ্ডে বিভক্ত এবং বিধানাবলী (Laws) বারো খণ্ডে। শেষোক্ত গ্রন্থে শুধু যে গ্রীক রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত আইন কানুনেরই আলোচনা হয়েছে তা নয়, আইনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদসমূহও এতে স্থান পেয়েছে। রিপাবলিক গ্রন্থটি পূর্বোক্ত গ্রন্থটির সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়, কেন না এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই ন্যায়বিচারের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি। এই বিষয়টিই আবার বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে তাঁর সিম্পোজিয়ামে। তাঁর বিখ্যাত 'দার্শনিক সম্রাটের' ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে রিপাবলিকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক এবং অষ্টম থেকে দশম অধ্যায়ে সিদ্ধান্তসমূহ আলোচিত হয়েছে। রিপাবলিকে প্লেটোর নিজস্ব অধ্যাত্মবাদের নিরিখে

১। থ্রাসিলোসের বিন্যাস নিরূপণ: (১) *Euthyphro, Apology of Socrates, Crito, Phaedo,* (২) *Cratylus, Theoetetus, Sophistes, Politicus,* (৩) *Parmenides, Philebus, Symposium Phoedrus,* (৪) *Alchibiades, Hipparchus, Anterastoe,* (৫) *Theages, Charmides, Laches, Lysis,* (৬) *Euthydemus, Protagoras, Gorgias, Meno,* (৭) *Hippias, Ion, Menexenus,* (৮) *Clitopho, Republic, Timoeus, Critias,* (৯) *Minos, Laws, Epinomis, Letters,*

রাষ্ট্রনীতির আদর্শ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। পক্ষান্তরে, সিম্পোজিয়াম গ্রন্থের প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরনের। মানবজীবনই এর মূল বিষয় এবং মানবজীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্লেটো তাঁর নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছেন এই গ্রন্থে, এবং তা তুলে ধরতে তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। কামের দেবতা এরোস এই গ্রন্থের অনেকখানি জুড়ে আছে কিন্তু এ বিষয়ে প্লেটোর কল্পনা ও চিন্তার সঙ্গে গ্রীক পুরাণের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—প্রেম সম্বন্ধে বহুপ্রচলিত যে প্লেটোনিক ধারণার কথা প্রায়ই উচ্চারিত হয় সে বিষয়ে গভীর আলোচনা এই গ্রন্থেই বর্তমান। তাঁর কমিউনিজমেরও মূল এখানে।

প্লেটোর রচনাসমূহ মোটামুটি অবিকৃতভাবেই বর্তমান আছে, তার কারণ সেগুলি তাঁর যুগ থেকে শুরু করে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছাত্রগণ কর্তৃক পঠিত হয়ে এসেছে। তবুও তাঁর নামে প্রচলিত সব গ্রন্থই তাঁর নিজের রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ বর্তমান। তাঁর এপিনোমিস নামক গ্রন্থটি তাঁর বিখ্যাত বিধানাবলী গ্রন্থের পরিশিষ্ট, যা সম্ভবত রচনা করেছিলেন তাঁর ছাত্র ফিলিপ্পোস। তা ছাড়া প্লেটোর থিয়াগেস, মিনোস এবং ক্লিতোফো সম্ভবত তাঁর নিজস্ব রচনা নয়। প্লেটোর রচনাবলীকে কালানুক্রমিক সাজানোর বহু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সার্থকভাবে কোনো কিছুই হয়নি। তবে এটুকু মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ফিদ্রোসই তাঁর প্রথম গ্রন্থ। বিখ্যাত রিপাবলিক তাঁর জীবনের শেষ দিকে রচিত হয়েছিল।

প্লেটোর রচনাবলী শুধু গ্রীক সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিষয়বস্তু এবং সেইসঙ্গে ভাবের গভীরতা এবং রচনাশৈলী সব দিক্ থেকেই তা অনবদ্য। প্লেটো তাঁর বিষয়বস্তুকে কথোপকথনের ছলে ব্যক্ত করতেন এবং তাঁর রচনার কথোপকথনের নায়ক তিনি নন, তাঁর গুরু সক্রেটিস। ঘটনাবলীর নিখুঁত উপস্থাপন, চরিত্রচিত্রণ, বক্তাদের ব্যক্তিত্ব এবং তদনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে, এবং সর্বোপরি তাঁর অনবদ্য ভাষার গুণে মনে প্রশ্ন জাগে দার্শনিক প্লেটো, কবি প্লেটো ও শিল্পী প্লেটোর মধ্যে কোন্ জন বেশি প্রশংসা পাবার যোগ্য।[১]

১। প্লেটোর রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদের জন্য বাইডেন্হাম ও টেলরের *Works of Plato* (পাঁচখণ্ড) দ্রষ্টব্য। তাঁর *Republic*-এর একটি বঙ্গানুবাদও পাওয়া যায়।

প্লেটোর পরেই যে গ্রীক দার্শনিক জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন তিনি হচ্ছেন আরিস্টোটল (Aristoteles)। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৩৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে থে্রসের অন্তর্গত স্তাজেইরা নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন চিকিৎসক, নাম নিকোমাকাস। ১৭ বছর বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করে আথেন্সে চলে আসেন এবং প্লেটোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি কুড়ি বছর ছিলেন, প্রথমে ছাত্র হিসাবে এবং পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে।

প্লেটোর শিষ্য হলেও কিন্তু আরিস্টোটল প্লেটোর মতবাদের অনুগামী ছিলেন না, বরং নানাবিষয়ে গুরুর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যই ঘটত বেশী। তথাপি প্লেটো তাঁকে প্রচুর স্নেহ করতেন। তাঁকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন আকাদেমির 'মস্তিষ্ক' বলে, কেন না আরিস্টোটলের মত পাঠপ্রবণতা খুব কম লোকেরই ছিল। তাঁর অপর এক কৃতী ছাত্র জেনোক্রাতেসের সঙ্গে আরিস্টোটলের তুলনা করে প্লেটো বলেছিলেন, একজনের দরকার লাগাম আর একজনের চাবুক। পক্ষান্তরে, আরিস্টোটল ছিলেন সাক্ষাৎ গুরু-মারা চেলা। তিনি লিখেছেন, দার্শনিকদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব যেন সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাঘাত না ঘটায়। তবে তিনি তাঁর গুরু প্লেটোকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, প্লেটো ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কথায় ও কাজে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে মানুষকে সুখী ও সুন্দর হতে হয়।

৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন প্লেটো তাঁর ভাগ্নে স্পেউসিপ্পোসের হাতে নিজের বিদ্যালয়ের ভার তুলে দিলেন, তখন আরিস্টোটল আথেন্স ত্যাগ করে মাইসিয়ায় চলে এলেন। সেখানে তিনি ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের আমন্ত্রণ পেলেন তাঁর ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্র আলেকজাণ্ডারকে শিক্ষাদানের জন্য। আরিস্টোটল এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ম্যাসিডোনিয়ায় চলে গেলেন। ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডার উভয়েই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। দীর্ঘ আট বছর তিনি আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের এশিয়া অভিযানের সময় আরিস্টোটল আথেন্সে ফিরে আসেন এবং সেখানে তের বছর শিক্ষাদান করেন। প্রত্যহ প্রভাতে তিনি তাঁর পরিণত ছাত্রদের সঙ্গে আথেন্সের ছায়া সুশীতল পথগুলি দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে উচ্চতর দার্শনিক সমস্যাসমূহ আলোচনা করতেন। সন্ধ্যায় তিনি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জনসভায় দর্শন ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর আথেন্সে যখন ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাবলম্বীদের ব্যাপক বিতাড়ন (পার্জিং) শুরু হয় তখন দেমোফিলাস নামক জনৈক ব্যক্তি আরিস্টোটলের নামে অভিযোগ আনে। হয়ত সক্রেটিসের মত পরিণতি তাঁরও হত, কিন্তু তিনি ইউরিয়াতে পালিয়ে যান। সেখানে ৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আরিস্টোটলের অজস্র রচনাকে দুভাগে ভাগ করা হয়, একটি গবেষণাধর্মী, পণ্ডিতদের জন্য ; অপরটি কথোপকথনের ভঙ্গীতে লিখিত, সাধারণ লোকের জন্য। বিষয়বস্তু অনুযায়ী তাঁর রচনা চারভাগে বিভক্ত—ন্যায়শাস্ত্র, অধিবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র। এই রচনাগুলির গ্রীক নামের চেয়ে পরবর্তী যুগের ল্যাটিন নামই অধিকতর প্রচলিত। তার কারণ হচ্ছে আরিস্টোটলের রচনাসমূহকে অনেক দুর্গতি সহ্য করতে হয়েছে, যার ফলে মূল গ্রীক রচনা বহুক্ষেত্রেই লুপ্ত হয়েছে। একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার আগে সেগুলিকে ল্যাটিনে অনুবাদ করে নেওয়া হয়েছিল এইটুকু যা রক্ষা। সে কাহিনী আমরা পরে বলব।

ন্যায়শাস্ত্রের উপর আরিস্টোটলের রচনা প্রধানতঃ চারটি। প্রথমটির নাম 'ব্যাখ্যা' (*De Interpretatione*)। এখানে আছে তর্কশাস্ত্রে যাকে বলে জাজমেণ্ট ও প্রপোজিশন, অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রীয় প্রতিপাদ্য বচন ও তার ধারণা-সমূহের বিভিন্ন দিক্‌গুলির উপর বিস্তৃত আলোচনা। দার্শনিক পরিভাষা সমূহের আদি গ্রন্থ হিসাবেও এই রচনাটির গুরুত্ব অসাধারণ। এর পরের দুটি গ্রন্থ হচ্ছে আনালিতিকা প্রায়োরিয়া এবং আনালিতিকা পোস্তেরিওরা, প্রথমোক্ত রচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সিলোজিসম বা ন্যায় এবং শেষোক্ত রচনায় আছে তর্কশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা, বিভাজন এবং পদের ব্যাপ্যতা। চতুর্থ গ্রন্থ তোপিকা আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত যার বিষয়বস্তু হচ্ছে ন্যায়শাস্ত্রীয় অনুমান।

অধিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অপরাপর বিভাগের উপর আরিস্টোটলের রচনা-বলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সফিজ্‌ম্ যেখানে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সফিস্টদের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তের হেত্বাভাস প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ কাতেগোরিজ্, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের আদি বা প্রাথমিক রূপ ও ধর্মের পরিচয়। তৃতীয় গ্রন্থ মেটাফিজিক্‌স্ (নামটি পরবর্তীকালের লেখকদের দেওয়া) মোট চৌদ্দটি খণ্ডে বিভক্ত। এই অসমাপ্ত গ্রন্থটিকে তিনি 'প্রথম দর্শন' নামে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া আছে চারখণ্ডে রচিত হেভেন্‌স বা বিশ্বচরাচর এবং দুটি গ্রন্থ আছে জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে লেখা, 'সৃষ্টি' এবং 'ধ্বংস'। মনোবিজ্ঞানের

উপরেও তাঁর রচনা বড় কম নয়। এ বিষয়ে তাঁর তিনখণ্ডে রচিত 'আত্মা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তিনি মনোবিজ্ঞানের উপর অজস্র ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, যথা—'ইন্দ্রিয়সমূহ', 'প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়সমূহ', 'স্মৃতি ও অনুস্মৃতি', 'নিদ্রা ও জাগরণ', 'স্বপ্ন', 'সুষুপ্তি ও রূপান্তর' ইত্যাদি।

তাঁর বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাবলীর মধ্যে বিখ্যাত ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা আট খণ্ডে বিভক্ত। বায়ুমণ্ডল নিয়ে তিনি চার খণ্ডে রচনা করেছিলেন মেতেওরোলজিকা। এ ছাড়া 'বিশ্বচরাচর,' 'বাতাসের নাম ও গতিসমূহ' এবং 'সমস্যাবলী' নামক তিনটি গ্রন্থের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান-বিষয়ক তাঁর অপরাপর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে 'দেহতত্ত্ব' 'পরমায়ুর বৃদ্ধি ও স্বল্পতা', 'যৌবন ও বার্ধক্য', 'জীবন ও মৃত্যু', 'শ্বাসপ্রশ্বাস', 'শব্দ ও স্বর' ইত্যাদি। অঙ্কশাস্ত্রে লিভার ও ব্যালান্সের উপরে তাঁর রচিত 'যান্ত্রিক সমস্যাসমূহ' এবং 'অবিভাজ্য রেখাসমূহ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দশখণ্ডে রচিত 'জীব ইতিহাস', চারখণ্ডে রচিত 'উপাদানসমূহ', পাঁচ খণ্ডে রচিত 'প্রজন্ম' এবং এক খণ্ডে রচিত 'জীবগণের বিকাশ-পদ্ধতি', জীব-বিজ্ঞানের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী। এ ছাড়া 'উদ্ভিদ' ও 'জীবদের গতি' নামক দুটি গ্রন্থও তার নামে প্রচলিত।

এরপর আসে নীতিশাস্ত্রের উপর তাঁর বিখ্যাত রচনাসমূহ—দশ খণ্ডে রচিত 'নিকোমাকীয় নীতিশাস্ত্র', সাত খণ্ডে রচিত 'ইউদেমীয় নীতিশাস্ত্র' এবং দুইখণ্ডে রচিত 'মহৎ নীতিসার'। প্রথমটি তিনি তাঁর পুত্র নিকোমাকোসকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, বিষয়বস্তু এবং লেখার ভঙ্গীতে তা নিশ্চয়ই আরিস্টোটলীয়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি সম্ভবত তাঁর ছাত্র রোডসের ইউদেমোস রচনা করেছিলেন এবং তৃতীয়টি হচ্ছে প্রথম দুটি গ্রন্থের সার-সংকলন। এ ছাড়া 'পুণ্য ও পাপ' নামক একটি গ্রন্থও তাঁর নামে চলে। তাঁর নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হচ্ছে 'রাজনীতি', যা আট খণ্ডে রচিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ, যদিও তা অসমাপ্ত। এই গ্রন্থে আরিস্টোটল রাষ্ট্রের আদর্শ এবং উপাদান, বিভিন্নধরনের সরকার, রাষ্ট্রের কর্তব্য ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ১৫৮টি রাষ্ট্রের সংবিধানের উপর তিনি মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু এ ধায়ের একটি মাত্র বই এ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া দুই খণ্ডে রচিত 'অর্থনীতি'-র নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য; যদিও দুটির মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

অংশত তাঁর লজিক এবং অংশত তাঁর এথিক্সের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রচিত

হয়েছিল, তিন খণ্ডে 'অলঙ্কার' এবং আরও একটি অমূল্য গ্রন্থ 'কাব্যতত্ত্ব', বর্তমানে যা আমাদের হাতে এসেছে খণ্ডীকৃত ও পরিবর্তিত অবস্থায়। শেষোক্ত রচনাটি আরিস্টোটলের মনীষার অপূর্ব কীর্তি। এভিন্ন আরও কয়েকটি গদ্য রচনা আরিস্টোটলের নামে চলে। এগুলি হচ্ছে 'বর্ণসমূহ' 'মিরাবিলেস,' 'মেলিসোস,' 'জেনো' ও 'গোগিয়াস।' তা ছাড়া আছে তেষট্টিটি কবিতার সংকলন, নাম 'পেপ্লোস।' অবশ্য এগুলি আরিস্টোটলের রচনা কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আরিস্টোটল তাঁর নিজস্ব রচনাবলী প্রিয় ছাত্র থিওফ্রাস্তোসের হাতে অর্পণ করে যান। থিওফ্রাস্তোস আবার তাঁর শিষ্য নেলেওসকে আরিস্টোটলের রচনাবলীর উত্তরাধিকারী করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা আরিস্টোটলের রচনাবলী কঠিন আবরণে ঢেকে তাঁর সমাধির নীচে রেখে দেন। আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে টিওনের আপেলিকোন নামক একজন ধনী গ্রন্থ সংগ্রাহক আরিস্টোটলের রচনাবলী উদ্ধার করেন। সেগুলির তখন শোচনীয় অবস্থা। পরে রোমকরা আথেন্স জয় করে নিলে আরিস্টোটলের রচনাবলী সুল্লার হাতে গিয়ে পড়ে, যেগুলিকে তিনি রোমে নিয়ে আসেন। রোমের বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ্ তাইরানিয়ন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জরাজীর্ণ পুঁথিগুলির অনুলিপি করে নেন, এবং সেই অনুলিপির ভিত্তিতে পরবর্তীকালে রোডসের আন্দ্রোনিকোস আরিস্টোটলের রচনাবলীর একটি সংস্করণ প্রস্তুত করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরিস্টোটল অনেক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, সাহিত্য, সমালোচনা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব এমন কোন বিষয় নেই যার সূত্রপাত তিনি করে যান নি। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী লেখক, বাস্তব ঘটনা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে যিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। কোন কিছুই অকারণে ঘটে না, যা কার্যে ব্যক্ত তার মূল কারণে নিহিত, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর যা মূল কথা, আরিস্টোটলের প্রতি ছত্রে তা প্রকাশিত।

লেখক হিসাবে আরিস্টোটলের ব্যক্তিত্ব সেই বিরল পর্যায়ে পড়ে, যা কালের স্রোতে ধৌত হয়ে যায় না। প্লেটোর মতই তাঁর রচনাবলীর প্রভাব খ্রীষ্টীয় শতাব্দীগুলিতে অনুভূত হয়েছিল যা ছিল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রেরণাস্বরূপ। মধ্যযুগের ইউরোপে আরিস্টোটল কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদিনকার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছিলেন আরবীয় পণ্ডিতেরা, যাঁরা আরিস্টোটলের রচনাবলী নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। রেনেসাঁসের

যুগে ইউরোপে আরিস্টোটল চর্চার পুনরারম্ভ হয়। তাঁকে নতুন করে ইউরোপে পরিচিত করার মূলে আরব পণ্ডিতদের অবদান অনেকখানি।[১]

৮। উপসংহার

গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাসকে চারটি যুগে ভাগ করা হয়। প্রথম যুগের বিস্তৃতি হচ্ছে হোমার থেকে পারসিক যুদ্ধ পর্যন্ত, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব নবম থেকে ষষ্ঠ শতক। এই যুগ হচ্ছে গঠনের যুগ—হোমার ও হেসিওডের রচনাবলী, আদি দার্শনিক ও লোগোগ্রাফারদের রচনাসমূহ, গীতিকবিতার এওলীয় ও ডোরীয় ধারা বিশাল গ্রীক সাহিত্যের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল। পারসিক যুদ্ধকাল থেকে শুরু হয়েছিল গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়, যা অ্যাটিক যুগ নামে চিহ্নিত এবং যে যুগের ব্যাপ্তি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতক জুড়ে। পারসিক যুদ্ধের পর থেকেই গ্রীক জাতির মধ্যে নবজীবনের জোয়ার আসে। এই জোয়ারের তরঙ্গ সাহিত্যকেও রীতিমত আঘাত করেছিল। আথেন্সে পেরিক্লেসের যুগে চিন্তার ক্ষেত্রে যেন স্বর্ণযুগ এসেছিল। নাটক, মহাকাব্য, গীতিকবিতা, গদ্য-সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের চরম বিকাশ এ যুগেই ঘটেছিল। এ যুগেই জন্মেছিলেন ত্রয়ী ট্র্যাজেডিকার এস্কাইলাস, সফোক্লেস, ইউরিপিদেস, কমেডিকার আরিস্তোফানেস, ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, থুকিদিদেস, মহাজ্ঞানী প্লেটো ও আরিস্টোটল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে কিন্তু গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাসে অবক্ষয়ের যুগের সূত্রপাতের লক্ষণ দেখা দেয়। এই যুগকে বলা হয় আলেকজান্দ্রীয় যুগ। ম্যাসিডোনীয় অভ্যুত্থানের পর থেকেই আথেন্স শুধুমাত্র দার্শনিকদের শহরে পর্যবসিত হয়। হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আথেন্সের পরিবর্তে হয়ে ওঠে আলেকজান্দ্রিয়া। কিন্তু সেও স্বল্পকালের জন্য। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই রোমক আধিপত্যের বাহুপাশ ধীরে ধীরে গ্রীক ভূমিকে বেষ্টন করে ফেলে। ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই সমগ্র গ্রীক ভূমি রোমক শক্তির কবলিত হয়। শুধু মূল গ্রীক ভূখণ্ডই নয়, এশিয়া এবং আফ্রিকাতে যে গ্রীক উপনিবেশ ছিল সেগুলিও রোমক অধিকারে চলে যায়। এতদিন জ্ঞানবিজ্ঞান-সাহিত্যের পীঠস্থান ছিল আথেন্স, এবং পরবর্তী কালে আলেকজান্দ্রিয়া, এবারে সঙ্গে যুক্ত হল রোম। কিন্তু রোম শুধুমাত্র একটি নগরই নয়, তদানীন্তন জগতের রাজধানী বললেও অত্যুক্তি হয়

১। আরিস্টোটলের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যাবে স্মিথ এবং রস কৃত *The Works of Aristotle* (বারো খণ্ড, ১৯০৮-৫২) গ্রন্থে।

না। তাই সব জায়গা থেকেই গ্রীক পণ্ডিতেরা রোমে এসে জড় হয়েছিলেন। কিন্তু রোমের জাতীয় সাহিত্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীক সাহিত্যের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রোমক সম্রাটরা গ্রীক সাহিত্যের কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, যে কারণে গ্রীক সাহিত্যের মরাগাঙে আর একবার জোয়ার এসেছিল। কেন, না খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য প্রাচীন গ্রীক আদর্শ সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রতিযোগিতায় খ্রীষ্টধর্মই জয়ী হয়েছিল। কিন্তু গ্রীক ঐতিহ্য খ্রীষ্টধর্মকেও কিছুটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল, বিশেষ করে দর্শনের ক্ষেত্রে। বাইবেলের নূতন বিধির অনুবাদ সর্বপ্রথম গ্রীক ভাষাতেই হয়েছিল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মূল রোমক সাম্রাজ্য বারবেরিয়ানদের পদানত হয়ে গেলেও পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য, যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল, আরও বহুকাল স্বাধীন ছিল। গ্রীকভাষী অঞ্চলসমূহ পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় গ্রীকচর্চা মোটের উপর বরাবরই চালু ছিল। ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ন পৌত্তলিক গ্রীক শিক্ষায়তনসমূহ জোর করে বন্ধ করে দিলেও গ্রীকচর্চা ইউরোপ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি কোনদিনই।

রোমক সাহিত্য

১॥ সূচনা

ইউরোপে, এমনকি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে রোমকগণ গ্রীকদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও। যে ল্যাটিন ভাষাকে অবলম্বন করে রোমক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, তা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের ইতালীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত।[১] রোমের জাতীয় সাহিত্য হিসাবে ল্যাটিন সাহিত্য দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে, এবং নানা ধারার সমন্বয়ে, গড়ে উঠেছিল। এই সকল ধারার মধ্যে প্রধান ছিল ফেস্‌সেনিনি (Fescennini) বা গ্রাম্য উৎসবসমূহের সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের কাহিনীমূলক দিকগুলি। কিন্তু স্বতস্ফূর্ত বুদ্ধির প্রেরণাজাত সাহিত্য গড়ে তোলার মানসিক প্রবণতা আদি রোমকদের ছিল না।

প্রথম পর্যায়ের ল্যাটিন সাহিত্য গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ, কার্যত যার জনক ছিলেন দক্ষিণ ইতালীর জনৈক গ্রীক লিভিউস আন্দ্রোনিকুস (Livius Andronichus ২৮৪-২০৪ খ্রী: পূ:) যিনি প্রথম হোমারের মহাকাব্যকে রোমে আনয়ন করেন এবং সাতার্নীয় ছন্দে অডিসির ল্যাটিন অনুবাদ করেন। তিনিই প্রথম গ্রীক নাটকের রোমক অনুবাদ মঞ্চস্থ করিয়েছিলেন ২৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর অনূদিত গ্রীক কমেডিসমূহের সংকলনের নাম লুদি রোমানি। কয়েকটি ট্রাজেডিরও অনুবাদ তিনি করেছিলেন।[২]

২॥ নেভিউস, এন্নিউস, পাকুভিউস ও আক্কিউস

লিভিউসের সমকালীন ছিলেন কাম্পানিয়ার নেভিউস (Naevius, ২৭০-২০১ খ্রী: পূ:) যিনি দুটি মৌলিক নাটক রচনা করেছিলেন -রোমুলুস (*Romulus*) বা লুপুস (*Lupus*) এবং ক্লাস্তিদিউম (*Castidium*),।

১। ল্যাটিনে u-এর উচ্চারণ সর্বদাই 'উ' হয়, যেমন Fabius=ফাবিউস, ইং ফেবিয়াস। অভ্যাস-দোষে এখানে বহুক্ষেত্রেই ইংরাজী উচ্চারণ বজায় রাখা হয়েছে কারণ তাতেই আমাদের বেশি অভ্যাস। ল্যাটিনে c ক এবং ম দুই-ই হয়, ট-বর্গের পরিবর্তে ত-বর্গের ব্যবহারই বেশি ইংরাজীসহ পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ ভাষা ল্যাটিন হরফে লিখিত হয়।

২। তাঁর অনূদিত ট্রাজেডিসমূহ : আকিলিস, এগিস্থোস, আইয়াস, আন্দ্রোমিদা, দানা, ট্রোজান্স, হার্মোনিয়া, ইনো, তেরেসোস। তাঁর রচনাবলীর অংশবিশেষ মোরেল সম্পাদিত *Fragmenta Poetarum Latinorum* (Teubner Series ১৯২৭) গ্রন্থে রক্ষিত আছে। ইংরাজী অনুবাদ ওয়ারমিংটন-কৃত *Remains of Old Latin* (দ্বিতীয় খণ্ড Loeb, ১৯৩৬) গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

প্রথমটির বিষয়বস্তু রোমের পৌরাণিক প্রতিষ্ঠাতা রমুলাস ও রেমাসের কাহিনী, এবং দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু তাঁর কালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি সাতটি গ্রীক ট্রাজেডির স্বাধীন তর্জমা করেছিলেন যেগুলির অংশবিশেষ এখনও পাওয়া যায়। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর রচিত কাব্য বেল্লুম পিনিকুম (*Bellum Poenicum*), যার অন্য নাম কারমেন বেল্লি পিনিসি, রোমের প্রথম জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে সমাদৃত, যদিও রচনা হিসাবে তা অসার্থক। তাঁর রচিত কয়েকটি কমেডির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির কোন অস্তিত্ব নেই।

কালাব্রিয়ার এন্নিউস (Ennius, ২৩০-১৭০ খ্রীঃ পূঃ) ছন্দে রোমের জাতীয় জীবনের কাহিনী, ট্রয় ধ্বংস থেকে তাঁর সমকাল পর্যন্ত, বর্ণনা করেছেন আঠারটি খণ্ডে রচিত আনালেস (*Annales*) কাব্যে। কিকেরো এবং লুক্রেসিয়াস এই রচনাটির প্রশংসা করেছেন, এবং ভার্জিল বহুক্ষেত্রে এই গ্রন্থটিকে অনুসরণ করেছেন। ল্যাটিন ভাষায় এন্নিউস হোমারের স্টাইল অর্থাৎ সপ্তমাত্রিক ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন। ইউরিপিদেসের অনুকরণে রচিত তাঁর কুড়িটিরও অধিক ট্রাজেডির নাম এবং সেগুলির কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেছে. কিন্তু তাঁর রচিত কমেডিগুলির একটিও অবশিষ্ট নেই। আম্ব্রাসিয়া (*Ambracia*) নামে তাঁর একমাত্র প্রাপ্ত নাটকে নোবিলিওর কর্তৃক রোম দখলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর রচিত আরও একটি নাটকের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে যার নাম সাবিনা।

মার্কুস পাকুভিউস (Pacuvius, ২২০-১৩০ খ্রীঃ পূঃ) রচিত ১৩টি ট্রাজেডির নাম ও সেগুলির যৎসামান্য অবশেষ ছাড়া তাঁর বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই। পরবর্তী লেখক আক্কিউস (Accius, ১৭০-৯০ খ্রীঃ পূঃ) প্রায় ৫০টি নাটক লিখেছিলেন. কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর দুটি নাটকের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে, ব্রুটাস (*Brutus*) এবং দেসিউস (Decius)। ব্যাকরণ, সাহিত্যের ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি দুখানি বই লিখেছিলেন দিদাস্কালিকা (*Didascalica*) এবং প্রাগ্‌মাতিকা (*Pragmatica*)।[১]

১। নেভিউস, এন্নিউস, পাকুভিউস ও আক্কিউসের রচনাংশ রিবেক সম্পাদিত *Scaenicae Romanorum Poesis Fragmenta* (Teubner ১৮৯৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া মোরেলের পূর্বোক্ত *Fragmenta* এবং মমসেনের *History of Rome*, Vol. III, Ch. 14. এবং Vol. IV. Ch 13 দ্রষ্টব্য। ইংরাজী অনুবাদের জন্য ওয়ারমিংটনের পূর্বোক্ত *Remains* (Loeb ১৯৩৬) দ্রষ্টব্য।

৩। প্লতাস, সেসিলিউস ও তেরেন্স

প্রাচীন ল্যাটিন কমেডি লেখকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন প্লতাস (Plautus ২৫৪-১৮৪ খ্রীঃ পূঃ) যাঁর ১৩০টি রচনার উল্লেখ পাওয়া গেছে, যদিও সবগুলিরই লেখক তিনি নন। তাঁর মেনেচ্‌মি (*Menoechmi*) নাটকের বিষয়বস্তু অবলম্বনে শেক্‌সপীয়ারের কমেডি অফ এররস্‌ রচিত হয়েছিল। বেন জনসন ও মলিয়েরের রচনার উপর প্লতাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। নাটক ছাড়াও প্লতাস ভাষাতত্ত্ব, সমালোচনা ও সাহিত্যের ইতিহাসের উপরেও কিছু কিছু লিখেছিলেন। তাঁর রচনার মূল্য কিকেরোর যুগেও প্রচুর ছিল। পরবর্তী কালে ভারো (Varro) তাঁর উপর বহু আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁর আসল কমেডিগুলির সম্পাদনা করেছিলেন। ভারোর তালিকার ২১টি নাটকের মধ্যে ২০টি মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে।[১]

সেসিলিউস (Statius Caecilius) ছিলেন গলদেশের অধিবাসী যিনি ১৯৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোমে বন্দী অবস্থায় আনীত হয়েছিলেন। তাঁর ৫০টি নাটকের মধ্যে একটিও বর্তমান নেই। কিকেরো লিখেছেন, সেসিলিউসের নাটক মেনান্দেরের অনুকরণ, এবং তাঁর ল্যাটিন খুব বিশুদ্ধ নয়।

তেরেন্স (Terence) জন্মগ্রহণ করেছিলেন কার্থেজে ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর প্রথম নাটক আন্দ্রিয়া (আন্দ্রোসের কুমারী) মঞ্চস্থ হয় ১৬৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর দ্বিতীয় নাটক হেসাইরা (*Hecyra*, শাশুড়ী) বিশেষ রসোত্তীর্ণ নয় বলে পণ্ডিতদের ধারণা। তাঁর অপরাপর নাটক হচ্ছে আদেল্‌ফি বা ভ্রাতৃবৃন্দ এবং ফোর্মিও (*Phormio*)। তেরেন্স প্রবর্তিত কমেডি *Palliatae* নামে পরিচিত। তাঁর নাটকের উপর গ্রীক প্রভাব, বিশেষ করে মেনান্দেরের প্রভাব যথেষ্ট যদিও হেসাইরা ও ফোর্মিওর বিষয়বস্তু আপোলোদোরোস থেকে গৃহীত।[২]

১। প্লতাসের নাটকাবলী : *Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Captivi, Curculio, Casina, Cistellaria, Epidicus, Bacchides, Mostellaria, Menoechmi, Miles gloriosus, Mercator, Pseudolus, Poenulus, Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus* এবং *Vidularia*। এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন ভারো। নিক্সন-কৃত এইগুলির অনুবাদ পাওয়া যাবে Loeb Series-এ (১৯১৬-২৪)। তা ছাড়া নিবাচিত কয়েকটি নাটকের অনুবাদের জন্য রাইট ও রোগার্সের *Broadway Translations* (১৯২৩) দ্রষ্টব্য।

২। তেরেন্সের নাটকাবলীর প্রথম সম্পাদনা করেছিলেন বেন্টলি ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে যা কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদের জন্য Loeb Series দ্রষ্টব্য। সেসিলিউস সম্পর্কে আলোচনার জন্য রিবেকের *Scaenicae Romanorum* এবং মমসেন *op. cit.*, Vol. III, ch. 14 দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী পর্যায়ের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আফ্রানিউস, পম্পোনিউস এবং নোভিউস, এবং এঁদের অনুসারী ছিলেন লাবেরিউস এবং পিউব্‌লিউস সাইরুস। আফ্রানিউস সম্ভবত ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিকেরো তাঁকে চাতুর্যপূর্ণ সংলাপকার বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ৪০টি নাটকের নাম ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। তবে নীরোর যুগ পর্যন্ত তার নাটক যে অভিনীত হত তার প্রমাণ আছে। পম্পোনিউস • খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের লোক। তিনি এবং নোভিউস *Atellana* নামক এক ধরনের জনপ্রিয় নাটকের প্রবর্তন করেছিলেন, এবং তাঁদের নাটকসমূহে কথ্য ও গ্রাম্য ভাষার বহুল প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর ৭০টি নাটকের নামগুলি মাত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। নোভিউসের ৪০টি নাটকের নাম পাওয়া গেছে। কিকেরো তার কয়েকটি সংলাপ নিজ রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। লাবেরিউস এবং পিউব্‌লিউস সাইরুস একটি বিশেষ ধরনের প্রহসন ল্যাটিন সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাদের রচনার চিহ্নমাত্র বর্তমান নেই।

৪ ॥ গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত : কেটো

রোমক কাব্য ও কাব্যনাটকসমূহ গ্রীক সাহিত্যের নিকট ঋণী হলেও তার গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি ছিল বিশুদ্ধ স্বদেশী। রোমকগণ নিজেদের জাতীয় উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন গদ্য রচনার ভিত্তি হিসাবে দ্বাদশ বিধি (*Duodecim Tabuloe*) যা অবলম্বনে পরবর্তী রোমক আইন গড়ে উঠেছিল। রোমকরা যখন ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিজেদের জাতীয় ইতিহাস রচনার চেষ্টা করলেন তখন দেখা গেল যে, তাঁদের ব্যবহৃত ল্যাটিন ভাষা এই কাজের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নয়। এই কারণেই তারা গ্রীক ভাষাকেই তাদের ইতিহাস রচনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ল্যাটিন ভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচিয়ে যিনি তাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তুলেছিলেন তিনি হচ্ছেন মার্কো বা কেটো (Marcus Porcius Cato)। কেটো জন্মগ্রহণ করেছিলেন টাসকালামে ২৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। কেটোই প্রথম লেখক যিনি ল্যাটিন ভাষায় সর্বপ্রথম রোমের ইতিহাস লেখেন। সাত খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থের নাম ওরিজিনেস (*Origines*)। এ ছাড়া তিনি লিখেছিলেন দৈনিক আচরণবিধি যার নাম কারমেন দে মোরিবুস (*Carmen De Moribus*)। তাঁর যে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অবস্থায় আমাদের হাতে এসেছে সেটি

হচ্ছে কৃষিকার্য-সম্পর্কিত একটি মূল্যবান রচনা, যার নাম হচ্ছে দে রে রুস্তিকা (*De Re Rustica*)।

আইনই হচ্ছে একমাত্র বিজ্ঞান যা রোমকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছিল। সাহিত্য-সমালোচনা, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে গ্রীকদের মত আদি রোমক লেখকদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এই বিষয়ে একমাত্র এলিয়াস স্তিলো কিছু কিছু লিখেছিলেন।[1]

৫। স্বর্ণযুগের পথপ্রদর্শক কিকেরো

এ পর্যন্ত আমরা ২৪০ থেকে ৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। রোমক গদ্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগের সূত্রপাত হয়েছিল কিকেরো বা সিসেরোর (Marcus Tullius Cicero) হাতে। কিকেরো ছিলেন রোমের প্রসিদ্ধ বাগ্মী, জন্ম আরপিনাস নামক স্থানে, ৩রা জানুয়ারী ১০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল রোমে। সে যুগের বিখ্যাত বাগ্মীদ্বয়, ক্রাস্সস এবং আন্তোনিউসের বক্তৃতা শুনে তিনি আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্যক্তিগত মামলা-মোকদ্দমার সওয়াল করতেন, এবং তাঁর প্রথম বক্তৃতা প্রো-কুইন্‌কতিও (*Pro-Quinctio*) অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত আছে। ৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাত্র ২৬বছর বয়সে তিনি সেক্সতুস রোস্কিউস নামক এক ব্যক্তির মামলায় আইনজীবীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যক্তি পিতৃহত্যার দায়ে বিচারালয়ে নীত হয়েছিল। এই মামলায় সাফল্যলাভ করে তাঁর খ্যাতি প্রভূত বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী বৎসর কিকেরো গ্রীস ও এশিয়ায় ভ্রমণ করেন। আথেন্সে তিনি প্রখ্যাত দার্শনিকদের নিকট দর্শনশাস্ত্রে পাঠ নেন। রোডসে তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা নেন। ৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি আথেন্স থেকে ফিরে আসেন এবং পর বৎসর তেরেন্সিয়ার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বৎসরেই তিনি সর্বসম্মতিক্রমে কোয়াস্টার পদে নিযুক্ত হন এবং সিসিলিতে কার্যভার গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য তিনি ৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কিউরুল এইদিল পদে নির্বাচিত হন। তারপর সিসিলিবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি ভেরেস নামক একজন অভিজাত উচ্চপদস্থ দুর্নীতিগ্রস্ত

১। কেটোর জীবনী সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন প্লুতার্ক। কেটো ও তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যাবে স্মলার্ড রচিত *Roman Politics* (১৯৬১) নামক গ্রন্থে।

ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাঁর অসাধারণ বক্তৃতার ফলে এই লোকটি পদচ্যুত ও নির্বাসিত হয়। এতে কিকেরোর জনপ্রিয়তা অসাধারণ বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সর্বসম্মতিক্রমে প্রীটর পদে নির্বাচিত হন। ৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি কন্সাল পদে নির্বাচিত হন।

কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। রোমে তখন গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও একনায়কতন্ত্রী প্রবণতা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল। সীজার, পম্পেই, ক্রাসাস, ক্লডিয়াস প্রমুখ রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চারবাদীরা তখন রোমে নিজেদের একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখছিলেন। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী কিকেরো এদের চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে নির্বাসিত হন এবং প্রথমে থেসালী ও পরে ম্যাসিডোনিয়ায় গিয়ে বাস করেন। এই সময়টা তিনি নিজেকে সাহিত্য-রচনায় নিয়োজিত করেন।

অবশ্য পরে তাঁকে আবার রোমে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু ফিরে এসে তিনি জুলিয়াস সীজারের একনায়কতন্ত্রী মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তারপর সীজার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কিকেরোর রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। ৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সীজার নিহত হলে কিকেরো আবার রোমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। সীজারের মৃত্যুর পর রোমে যে গৃহযুদ্ধ লাগে তা মেটানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রোমে তাঁর অবস্থান বেআইনী ঘোষিত হয় এবং তিনি রোম থেকে ম্যাসিডোনিয়ায় পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু পথে শত্রুপক্ষের হাতে শোচনীয়ভাবে তাঁর জীবনান্ত হয় এবং তাঁর হত্যাকারীরা তাঁর মাথা ও একটি হাত রোমে নিয়ে আসে। তাঁর হত্যার তারিখ হচ্ছে ৭ই সেপ্টেম্বর ৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

ল্যাটিন গদ্যসাহিত্যের একজন অতি সার্থক লেখক ছিলেন কিকেরো। উপরন্তু তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহও যথেষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন। এ পর্যন্ত তাঁর ৫৭টি বক্তৃতা সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁর যুক্তিশীলতা তাঁর সাহিত্যকেও প্রভাবান্বিত করেছে। এখানে আমরা কিকেরোর রচনাবলীর একটি তালিকা পেশ করছি: (১) দে ওরাতোরে (*De Oratore*)—তিন খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে একজন বক্তার কি ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন, কিভাবে সে তার বক্তব্যসমূহকে তুলে ধরবে, তার প্রকাশভঙ্গী কি রকম হওয়া উচিত, ইত্যাদি। গ্রন্থটি কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত, রচনাকাল ৫৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

(২) ব্রুতাস বা দে ক্লারিস ওরাতোরিবুস (*De Claris Oratoribus*) গ্রন্থে আদিকাল থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত বাগ্মিতার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অপরাপর রচনাবলী হচ্ছে, (৩) দে রে পুব্লিকা, (৪) দে লেজিবুস, (৫) পারাদোক্সা স্তোয়িকোরুম, (৬) দে ফিনিবুস বোনেরুম এত্ মালোরুম, (৭) আকাদেমিকা, (৮) দে নাতুরা দিওরুম, (৯) দে দিভিনাসিওনে (১০) সাতো মাইওর বা দে সেনেক্‌তুতে, (১১) দে লিলিউস এবং (১২) দে অফিসিস। এগুলির অধিকাংশই রাজনীতি, ব্যবহারশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের উপর রচিত। এছাড়া আছে তাঁর বিপুলসংখ্যক পত্রাবলী যেগুলি কয়েকটি খণ্ডে সংকলিত হয়েছিল, যেমন এপিস্তুলে এদ্ ফামিলিয়ারেস, এপিস্তুলে এদ্ আত্তিকুম, ইত্যাদি।[১]

৬। জুলিয়াস সীজার ও তাঁর সমকালীনবর্গ

রোমের ইতিহাসের যে কোন ছাত্রই জুলিয়াস সীজারের (Gaius Julius Caesar) নাম ও কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত। তাঁর জন্ম ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং তিনি নিহত হয়েছিলেন ৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১৫ই মার্চ। এই দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন, এবং সেই অপরাধেই তাঁকে নিহত হতে হয়েছিল। অবশ্য সীজারের মৃত্যুর পর রোমে আর গণতন্ত্র ফিরে আসেনি, ধাপে ধাপে রাজতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

কিন্তু এই দিগ্বিজয়ী শাসকের সাহিত্যিক প্রতিভাও ছিল, এবং একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, ল্যাটিন গদ্যসাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাঁর রচনার যথেষ্ট মূল্য আছে। সীজারের প্রথম গ্রন্থ আনালোগিয়া রচিত হয়েছিল তাঁর গলদেশ অভিযানের প্রাক্কালে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ আন্তিসাতোনেস (*Anticatones*), সাতো বা কেটো বিরোধী বক্তব্যসমূহ, ৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মুণ্ডার যুদ্ধের সময় লেখা। জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে তাঁর রচিত দে আস্ত্রারিস তাঁর ক্যালেণ্ডার সংস্কারের ভিত্তি। তাঁর যে দুটি গ্রন্থ মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে সে দুটি হচ্ছে কমেন্তারি দে বেলো গালিকো এবং কমেন্তারি দে বেলো সিভিলি। তাঁর বিখ্যাত গলযুদ্ধের ইতিহাসের সামান্য অংশই তাঁর রচিত, অধিকাংশই লিখেছেন আউলুস হির্‌তিউস।

১। কিকেরোর সমুদয় রচনা প্রকাশিত হয়েছে Teubner Series-এ (১৮৬৬) এবং ইংরাজী অনুবাদ Loeb Series-এ। এছাড়া জীন্‌স রচিত *Life and Letters of Cicero* এবং হাণ্ট রচিত *The Humanism of Cicero* দ্রষ্টব্য।

সীজারের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন ঐতিহাসিক ছিলেন সাল্লুস্তিউস ক্রিস্পুস, যাঁর জন্ম ৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ইনি সীজারের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে রোমের প্রোকন্সাল পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি খুব উচ্চস্তরের লোক ছিলেন না, কিন্তু ইতিহাসলেখক হিসাবে তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর রচনার সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী নয়। তাঁর প্রথম রচনার নাম বেল্লুম কাতিলিনি (*Bellum Catilinoe*) যার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিখ্যাত কাতিলিনারীয় ষড়যন্ত্রের কাহিনী। দ্বিতীয় গ্রন্থে, অর্থাৎ বেল্লুম ইউগুর্থিনুম (*Bellum Iugurthinum*) গ্রন্থে তিনি ইউগার্থাইন যুদ্ধের নিখুঁত পটভূমিকা অঙ্কন করেছেন। কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে পাঁচ খণ্ডে রচিত হিস্তোরিয়া। অপরাপর ইতিহাসগ্রন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের পার্থক্য হচ্ছে যে এখানে ঘটনার চেয়ে ঘটনার গতিপথ ও গতি-পদ্ধতির উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পূর্বোক্ত লেখকদের সমকালীন ছিলেন কর্নেলিউস নেপোস যাঁর কাল ৯৪ থেকে ২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তিনিই প্রথম রোমক জীবনীলেখক যিনি ষোল খণ্ডে রচিত দে ভিরিস ইলুস্ত্রিবুস (*De Viris Illustribus*) গ্রন্থে স্বদেশের ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবনী রচনা করেছেন। তাঁর রচিত জীবনীগুলি সুখপাঠ্য কিন্তু প্লুতার্কের মত শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় সেগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে এই ষোল খণ্ডের এক খণ্ড, দে এক্সেলেন্তিবুস ডুসিবুস একস্টেরারুম জেনতিউম (*De Eccellentibus Ducibus Exterarum Gentium*), যে গ্রন্থে তিনি রোমের বাইরের দেশের সেনাপতিদের চরিত্র চিত্রিত করেছেন, বিষয়বস্তু এবং গুণের দিক্ দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।[১]

এরপর আমরা বিখ্যাত ল্যাটিন গদ্যলেখক ভারোর (Varro) কথা উল্লেখ করব। রোমক সাহিত্যে দুজন ভারো ছিলেন, এবং তাঁরা দুজনেই প্রায় সমকালীন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি যাঁর কথা আমরা পরে বলব। গদ্যলেখক ভারোর পুরো নাম মার্কুস তেরেন্তিউস ভারো, জন্ম ১১৬

১। সীজারের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী অনুবাদ Loeb Series-এ প্রকাশিত হয়েছে। জুলিয়াস সীজারের নামে আরও তিনটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে: *Bellum Alexandrinum* (আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধ), *Bellum Africum* (আফ্রিকার যুদ্ধ) এবং *Bellum Hispanum* (স্পেনের যুদ্ধ)। নেপোসের রচনাবলীর সম্পাদনা করেছেন কোবেট (১৮৮১), রোট (১৮৯১) এবং উইনস্টেড্‌ট (অক্সফোর্ড, ১৯০৪)।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি প্রথম যৌবনে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক এলিউস স্তিলোর নিকট শিক্ষালাভ করেন। পম্পেই, সীজার ও অক্টেভিয়ানের আমলে তিনি অনেক উচ্চ পদ ভোগ করেছেন। সম্ভবত ভারোই হচ্ছেন রোমের সবচেয়ে বেশি বই-এর লেখক। তিনি নিজেই একবার জানিয়েছিলেন যে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৪৯০টি। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে দে লিঙ্গুয়া লাতিনা। ২৫ খণ্ডে রচিত এই মহাগ্রন্থে তিনি ল্যাটিন ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এই ২৫ খণ্ডের মধ্যে পঞ্চম থেকে দশম খণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে আন্তিকুইতাসেস্ রেরুম্ হুমানুরুম্ এত্ দিভিনারুম্। ৪১ খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে রোমের পুরাতত্ত্ব, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির বিবরণ। ইমাজিনেস গ্রন্থে (রচনাকাল ৩৯ খ্রীঃ পূঃ) তিনি গ্রীস এবং রোমের ৭০০ জন বিখ্যাত লোকের জীবনী আলোচনা করেছেন। তাঁর অপর গ্রন্থ দিসিপ্লিনারুম লিব্রি সাত খণ্ডে রচিত বিশ্বকোষ। তাঁর ৭৬টি লিব্রি লোগিস্তোরিসি প্রাসঙ্গিক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর সাতুরে মেনিপ্পেই রোমের স্যাটায়ার সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আশী বছর বয়সে তিনি তিন খণ্ডে কৃষিবিষয়ক একটি গ্রন্থ লেখেন, নাম রেরুম্ রুস্তিকারুম লিব্রি। তিনি ২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পরলোকগমন করেন।[১]

৭। ঐতিহাসিক লিভি

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গমকালের অনন্য রোমক প্রতিভা হচ্ছেন তাইতুস লিভিউস, লিভি নামেই যিনি বেশি পরিচিত (৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। লিভি ছিলেন ইতিহাস-লেখক, ১৪২ খণ্ডে যিনি রোমের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন, রোম নগরীর পত্তন থেকে দ্রুসাসের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী যেখানে স্থান পেয়েছে। লিভির পূর্বেও অনেক রোমক ঐতিহাসিক রোমের আদ্যন্ত ইতিহাস লিখেছিলেন, কিন্তু লিভির মূল্য তাঁর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। তাঁর ইতিহাসে উপন্যাসের চমক আছে, তা বর্ণনাধর্মী এবং জীবন্ত। ঐতিহাসিকের বাঁধা পথ তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর রচনায় খুঁটিনাটি

১। ভারোর রচনাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে ওয়াকার রচিত *Les Catalogues Varroniens* (১৯২৭) নামক গ্রন্থে। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য ডাফের *Literary History of Rome* ১৯০৯

বিষয়ের উপর তেমন কোন গুরুত্ব পড়েনি। তাঁর যুগের রুচি ও চাহিদাই তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর গ্রন্থের সব কটি খণ্ড পাওয়া যায়নি। তিনিও থুকিদিদেসের মত স্বকপোলকল্পিত ভাষণ তাঁর ইতিহাসের চরিত্রগুলির উপর আরোপ করেছিলেন, যার ফলে যেমন একদিকে তা সুখপাঠ্য হয়েছিল অপরদিকে তা রোমক জাতীয় চরিত্রের গঠনে অত্যন্ত সাহায্য করেছিল। লিভির ইচ্ছা ছিল যে সম্রাট অগাস্টাসের যুগ পর্যন্ত তিনি তাঁর ইতিহাসকে টেনে নিয়ে যাবেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেয়নি।[১]

৮॥ প্রথম শতকের গদ্যসাহিত্য: প্লিনি, পেত্রোনিউস ও কুইন্তালিয়ান

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রোমক গদ্যসাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন প্লিনি (Gaius Plinius Secundus) তিনি ছিলেন সে যুগের জীবন্ত বিশ্বকোষ। প্লিনির জন্ম ২৩ খ্রীষ্টাব্দে। তরুণ বয়সেই তিনি অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। সমর-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, জীবনীসাহিত্য, ইতিহাস—কোন কিছু লেখাই তিনি বাদ দেননি। তাঁর রচিত দুটি ইতিহাসগ্রন্থ আছে, একটি ২০ খণ্ডে রচিত জার্মানীর (টিউটন) যুদ্ধের ইতিহাস, অপরটি ৩১ খণ্ডে রচিত তাঁর নিজের যুগের ইতিহাস। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাজ হচ্ছে ৩৭ খণ্ডে রচিত নাতুরালিস হিস্তোরিয়া। এই মহাগ্রন্থ তিনি তাঁর পৃষ্টপোষক টিটাসকে উপহার দিয়েছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে এই মহাগ্রন্থকে বিশ্বকোষের পর্যায়ে ফেলা যায়। মোট ২০,০০০ বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে এবং ১৭৪ জন লেখকের ২০০০টি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সার-সংকলন করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে প্লিনি তাঁর ব্যবহৃত লেখকদের নাম ও রচনাবলীর পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার তথ্যাবলী, তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ খণ্ডে ভূগোল ও জাতিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সপ্তম খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে নৃতত্ত্ব। অষ্টম থেকে একাদশ খণ্ডে প্রাণিবিজ্ঞান স্থান পেয়েছে। দ্বাদশ থেকে উনবিংশ খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে উদ্ভিদবিদ্যা। বিংশ থেকে সপ্তবিংশ খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন গাছগাছড়ার গুণাবলী, অষ্টাবিংশ থেকে দ্বাত্রিংশ

১। সংক্ষিপ্তাকারে লিভির রচনাবলী ইংরাজীতে প্রথম অনুবাদ করেছিলেন ফিলেমন হলাণ্ড ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। সম্প্রতি তা আবার নূতন করে প্রকাশিত হয়েছে।

খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাণিজগতের রহস্য, ত্রয়স্ত্রিংশ থেকে সপ্তত্রিংশ খণ্ডে স্থান পেয়েছে খনি, ঔষধ, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। প্লিনির এই বিশ্বকোষ যদিও তৎকালীন যুগের জ্ঞানের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ, তথাপি যুগ যুগ ধরে এই মহাগ্রন্থ পণ্ডিতদের নিকট আদৃত হয়ে এসেছে।[১]

পেত্রোনিউস ছিলেন প্লিনির সমকালীন, এবং তাঁর রচনার যেটুকু নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে তাঁকে ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের জনক বলা যায়। সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে তিনি লিখেছিলেন সাতুরি (*Saturoe*)। এই গ্রন্থের খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে, বরং সামগ্রিকভাবে তাঁর সেনা ত্রিমালচিওনিস গ্রন্থটি রক্ষিত আছে। চরিত্র-চিত্রণের অপূর্ব দক্ষতা এবং সামাজিক সমস্যাসমূহ খোলাখুলি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে আলোচনা করার ক্ষমতা তাঁর রচনাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করেছে।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত ক্যুয়োভাদিস উপন্যাসে এই পেত্রোনিউসই চিত্রিত হয়েছেন নীরোর সভাসদ হিসাবে। ইনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের চক্রান্তে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছিলেন একথা তাসিতুস (১৬।১৮-১৯) উল্লেখ করেছেন, এবং ওই উপন্যাসেও এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

কুইন্তালিয়ানের জন্ম ৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে। পেশায় তিনি ছিলেন বক্তা এবং সেই হিসাবে অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি যাতে বক্তারা নিজ পেশা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করে সেই উদ্দেশ্যে বারো খণ্ডে লিখেছিলেন দে ইনস্তিতুতিওনে ওরাতোরিয়া (*De Institutions Oratoria*)। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য তিনি একটি পাঠ্যগ্রন্থের সিরিজ প্রস্তুত করেছিলেন যা দেক্লামাতিওনেস (*Declamationes*) নামে পরিচিত। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বহুলাংশে মিলে যায়। ৯০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় কুইন্তালিয়ান মারা যান।[৩]

১। প্লিনির *Natural History*-র সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ করেন ফিলেমন হলাণ্ড ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে যার একটি সুলভ সংস্করণ মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তৃত অনুবাদ করেন বোস্টক এবং রিলে (১৮৫৫-৫৭)। Loeb Series-এ র‍্যাকহাম এবং জোন্সের অনুবাদ ১৯৩৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

২। পেত্রোনিউসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেন লোউই (Lowe) যা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। কুইন্তালিয়ানের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে Loeb Series-এ (১৯২১-২২), অনুবাদক বাটলার।

১। ট্যাসিটাস এবং পরবর্তী কালের গদ্যলেখকগণ

ট্যাসিটাস বা তাসিতুস (Cornelius Tacitus) ছিলেন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক যাঁর রচিত জার্মানীর ইতিহাস বা জার্মানিয়া (*De Situ, Moribus ac Populis Germanicoe*) আজও পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের নিকট বিশেষ মূল্য বহন করে। টিউটনদের প্রাচীন ইতিহাসের সকল তথ্যের আকর হচ্ছে এই মহাগ্রন্থ। ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর তারিখ সম্ভবত ১১৭ খ্রীষ্টাব্দ। জার্মানিয়া ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Dialogus de Oretoribus* কুইন্টালিয়ানের প্রভাবে রচিত, বিষয়বস্তু হচ্ছে তৎকালীন যুগে বাগ্মিতার অবক্ষয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ দে ভিতা এত্ মোরিবুস ইউলি আগ্রিকোলা তাঁর শ্বশুর বিখ্যাত এগ্রিকোলার জীবন অবলম্বনে রচিত। চোদ্দ খণ্ডে তিনি তাঁর নিজ যুগের ইতিহাস হিস্তোরিয়া রচনা করেছেন যার প্রথম চারটি খণ্ড এবং পঞ্চম খণ্ডের কিছু অংশ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তিনি অগাস্টাসের মৃত্যুর পর থেকে জুলিয়ান বংশের রাজাদের ইতিহাস লিখেছেন, যা আন্নালেস (*Annales*, আসল নাম *Ab Excessudivi Augusti*) নামেই পরিচিত। ট্যাসিটাস ছিলেন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সেই হিসাবে লিভির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল মৌলিক। লিভি যেখানে ইতিহাসের বর্ণনা-মূলক দিকটিকেই গ্রহণ করেছিলেন ট্যাসিটাস সেখানে বিশ্লেষণ-ধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ইতিহাসের নামে জমজমাট কাহিনী পরিবেশন করেন নি। বস্তুনিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসাই ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।[১]

ছোট প্লিনি ছিলেন বড় প্লিনির ভ্রাতুষ্পুত্র, জন্ম ৬২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন সম্রাট ট্রাজানের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি, এবং তৎকালীন সমস্ত মনীষীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর রচনাসমূহের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই, শুধু তাঁর পত্রাবলী ছাড়া। প্রথম শতকের অপরাপর লেখকদের মধ্যে ছিলেন ভেল্লেইউস পাতেরকুলুস যাঁর দুই খণ্ডে রচিত হিস্তোরিয়া

১। ট্যাসিটাসের প্রথম ইংরাজী অনুবাদক মার্ফি। এই অনুবাদের ওপর নির্ভর করেই চার্চ ও ব্রোডরিবের বিখ্যাত অক্সফোর্ড অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বিশিষ্ট ঐতিহাসিক গ্যাক্সেও ট্যাসিটাসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন।

রোমানা লিব্রি দুয়ো নামক গ্রন্থের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায় পাওয়া গেছে। এই লেখকের মৃত্যু হয়েছিল সম্ভবত ৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ভালেরিউস মাক্সিমুস ছিলেন ইতিহাসের গবেষক। পূর্ববর্তী ইতিহাসকারদের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ তিনি নয় খণ্ডে সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনটির নাম ফাক্তোরুম্ এত্ দিক্তোরুম্ মেমোরাবিলিউম্ লিব্রি যা তিনি সম্রাট টাইবেরিয়াসকে উৎসর্গ করেছিলেন। কুরসিউস রুফুস, যিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন, দশখণ্ডে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ইতিহাস লিখেছিলেন, যদিও তাঁর রচনার ঐতিহাসিক মূল্য সামান্যই। প্রথম শতকের অপরাপর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কলুমেল্লার কৃষিবিষয়ক রচনা দে রে রুস্তিকা। এই গ্রন্থের লেখক যেমন একদিকে পূর্ববর্তী কৃষিবিষয়ক রচনাসমূহকে ব্যবহার করেছিলেন অপরদিকে তেমনি স্পেন, ইটালী ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথাও লিখেছিলেন। এই গ্রন্থটি কলুমেল্লা রচনা করেছিলেন ভার্জিলের জিওর্জিকার পরিশিষ্ট হিসাবে। দ্বাদশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটির প্রথম দুটি অধ্যায়ে আছে সার ও বীজ, তৃতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে আছে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদের পদ্ধতি, ষষ্ঠ থেকে নবম অধ্যায়ে আছে যথাক্রমে পশু, পাখি, মৎস্য ও মক্ষিকাপালন পদ্ধতি, দশম অধ্যায়ে উদ্যান-চাষ, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষকের কর্তব্য। এরপর যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন ফ্রন্তিনুস্ (৪০-১০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এ পর্যন্ত তাঁর তিনটি রচনা পাওয়া গেছে। প্রথমটি শিরোনামাহীন, বিষয়বস্তু হচ্ছে সমর-বিজ্ঞান। দ্বিতীয় গ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত, বিষয়বস্তু হচ্ছে জমি জরিপ, নাম দে আর্গোরুম কোয়ালিতাতে এবং দে কন্ত্রোভের্সিস আর্গোরুম। তাঁর আর তাঁর আর একটি গ্রন্থ রোমনগরীর নালা-নর্দমার সমস্যা নিয়ে রচিত, নাম দে আকুইস্ উরবিস রোমা। পম্পোনিউস মেলা ছিলেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের ভূগোলবিদ্ যিনি তিন খণ্ডে রচনা করেছিলেন দে কোরোগ্রাফিয়া। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রোবুস এবং আসকোনিউস পোদিয়ানুস। প্রোবুস ভার্জিলের রচনার ওপর টীকা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আসকোনিউস কিকেরোর রচনাবলীর টীকাকার ছিলেন।[1]

হাড্রিয়ানের পরবর্তী কাল থেকেই রোমক সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ সূচিত

১। ছোট প্লিনির রচনাবলীর কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাবে ওয়েস্টকোট সম্পাদিত *Selected Letters* (১৮৯৯) গ্রন্থে। পাতেরকুলুসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন

হয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের ল্যাটিন গদ্যসাহিত্যে আইনবিষয়ক রচনাই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল যার পথিকৃৎ ছিলেন গাইউস, পাপিনিয়ান, উল্পিয়ান এবং পলুস্। এঁদেরই শ্রমকে ভিত্তি করে পরবর্তী কালে (ষষ্ঠ শতকে) সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ানের যুগে সংকলিত হয়েছিল কোর্পুস্ ইউরিস্ সিভিলিস্ (*Corpus Iuris Civilis*)। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকের ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন স্যুয়েতোনিউস্, ফ্লোরুস্, অগাস্তা, জাস্টিন, অরেলিউস্ ভিক্তর্, ইউট্রোপিউস্, আম্মিয়ানুস্ মার্সেলিনুস্ ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন স্যুয়েতোনিউস্। ভারোর মতই স্যুয়েতোনিউস্ নানাবিধ বিষয়ের রচনার দ্বারা ল্যাটিন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান কোন কিছুই তিনি বাদ দেননি। তাঁর বিশ্বকোষ তুল্য গ্রন্থ প্রাতা (*Prata*) দশ খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর রচিত দে ভিতা সীজারুম্ গ্রন্থে তিনি সীজার থেকে নীরো পর্যন্ত বারোজন সম্রাটের চরিত্র চিত্রিত করেছেন। তাঁর অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভিরিস্ ইলাস্ট্রিবুস যাতে তিনি রোমক কবি-সাহিত্যিকদের কথা বলেছেন। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে হিস্তোরিসিস্ এবং গ্রামাতিসিস্ এত্ রেতোরিবুস্।[১]

শেষ উল্লেখযোগ্য রোমক ঐতিহাসিক ছিলেন আম্মিয়ানুস্ মার্সেলিনুস্ যিনি ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ খণ্ডে রেরুম্ জেস্তারুম্ লিব্রি ((*Rerum Gestarum Libri* নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম তেরটি খণ্ড বিলুপ্ত

ওয়াটসন যা Bohn's Classical Library Series-এ প্রকাশিত। মানিলিয়ুসের রচনাবলীর সটীক সম্পাদনা করেছেন হালম (১৮৬৫) এবং কেম্‌ফ্ (১৮৮৮)। কুইনটিউস কর্টিয়ুসের রচনাবলীর প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন প্রাট্ যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে। কলুমেল্লার রচনাবলী সর্বপ্রথম ইংরাজীতে অনূদিত হয় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে, অনুবাদক ছিলেন ব্রাডলে। ফ্রন্টিনুসের রচনাবলীর সম্পাদনা করেছিলেন গার্সেন্ যা বোষ্টন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৯ ও ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, পরে Loeb Series-এ সেগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পম্পোনিউস মেলার রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ সর্বপ্রথম করেছিলেন আর্থার গোল্ডিং। পরে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ওই অনুবাদের আবও উন্নতিসাধন করেছিলেন ফিলিপ্।

১। স্যুয়েতোনিউসের রচনাবলীর প্রথম সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ফিলেমন্ হল্যাণ্ড ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে যা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে Tudor Translations-এ পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া Bohn's Classical Library গ্রন্থমালায় টমসন্ ও ফরেষ্টার কৃত অনুবাদ এবং Loeb Series-এ রোল্ফ্ ও রোজ্ কৃত অনুবাদও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হয়েছে।[১] চতুর্থ শতকের পর থেকেই ইতিহাস রচনায় খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচলন শুরু হয় এবং এই বিষয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন সুল্‌পিসিউস্ এবং ওরোসিউস্। এঁরা উভয়েই সামগ্রিকভাবে জগতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ব্যাকরণ রচনায় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন গেল্লিউস্, নোনিউস্, দোনাতুস্, চারিসিউস্, দিওমেদেস্, সার্ভিউস্, মাক্রোবিউস্, এবং প্রিস্কিয়ান্। এ যুগের ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থসমূহের যশস্বী লেখক ছিলেন মারিসিয়াহ্নুস্ কাপেল্লা এবং কাসিওদোরুস, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে লিখেছিলেন সেন্সোরিহ্নুস্, ফিরমিকুস্ ও মাতেবহ্নুস্, এবং কৃষিবিদ্যার লেখক ছিলেন পাল্লাদিউস। এঁরা প্রত্যেকেই তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন।

৩॥ ল্যাটিন কাব্যসাহিত্য

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে রোমক কবিতা ও কাব্যসাহিত্য গদ্যরচনার তুলনায় তেমন বিকশিত হতে পারেনি। পূর্বোল্লিখিত ভারো কবিতায় কিছু স্যাটায়ার রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন দার্শনিক-কবি লুক্রেসিউস (মৃত্যু খ্রী: পূ: ৫৫) যিনি এন্নিউস অবলম্বিত হোমারীয় পদ্ধতিকেই কাব্যরচনার আদর্শ করেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম দে রেরুম নাতুরা, যা ছয় খণ্ডে বিভক্ত। এই কাব্যগ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রীক দার্শনিক এপিকুরোসের মতবাদ প্রচার। মূলত আলেকজান্দ্রিয় গ্রীক কবিরাই ছিলেন এ যুগে রোমক কবিদের আদর্শ।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে ল্যাটিন কবিতায় যিনি যুগান্তর এনেছিলেন তিনি হচ্ছেন ভার্জিল (Publius Vergilius Maro) যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে। রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি জনজীবনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেন নি। ৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি গ্রীক কবি আসিনিউস্ পোলিওর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় দশটি দীর্ঘ কবিতা (*Eclogues*) লেখেন, যেগুলি পরবর্তী কালে বুকোলিকা (*Bucolica*) নামে প্রকাশিত হয়। এগুলি থিওক্রিতোসের আদর্শে রচিত। এগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে, কিন্তু গ্রাম্য পশুপালক জীবনের সহজ স্বাভাবিক ছবি এ কবিতাগুলির

১। ইংরাজী অনুবাদ: হল্যাণ্ড (১৬০৯) এবং ইয়োং (১৮৬২)।

মধ্যে ফুটে ওঠেনি। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে জিওর্জিকা (*Georgics, Georgica*)। এই কাব্যগ্রন্থটি ল্যাটিন সাহিত্যে এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যদিও বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাধারণ। মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যগ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে জমি তৈরী করার পদ্ধতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের উদ্যানসৃষ্টি, তৃতীয় অধ্যায়ের পশুপালন ও চতুর্থ অধ্যায়ের মক্ষিকাপালন। তাঁর তৃতীয় ও সর্বশেষ কাব্য হচ্ছে ইনিদ্ (*Aeneid*) যা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল যেন কাব্যটিকে সাধারণ্যে প্রচার না করে নষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুবর্গ তাঁর শেষ ইচ্ছা না মেনে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। ইনিদ্ প্রচুর জনসমাদর লাভ করেছিল। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে ট্রয়ের বিখ্যাত বীর ইনিয়াসের কাহিনী। কথিত আছে যে ট্রয় ধ্বংসের পর ইনিয়াস সেখান থেকে চলে আসেন এবং নানা বিপৎসঙ্কুল অবস্থার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ইটালীতে উপস্থিত হন। রোমের প্রতিষ্ঠাতা রোমুলাস ও রেমোস তাঁর বংশধর। সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হবার পরই ইনিদ রোমের জাতীয় মহাকাব্যরূপে পরিগণিত হয়, রোমের জনজীবনে এই গ্রন্থটির প্রভাবও প্রচুর। কিন্তু কাব্য হিসাবে ইনিদ্ খুব উৎকৃষ্ট নয়, কাব্যগুণের দিক থেকে কবির জিওর্জিকা ইনিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভার্জিলের পরিকল্পনা ছিল যে এই কাব্যে তিনি ইলিয়াড ও অডিসির নির্যাসের মেলবন্ধন ঘটাবেন—প্রথম ছয় অধ্যায়ে অডিসিউসের অ্যাডভেঞ্চারের মতই ইনিয়াসের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের চিত্র অঙ্কিত করবেন এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে ল্যাটিনামের সিংহাসনের জন্য যুদ্ধের বর্ণনা দেবেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আরও বহু কবিতা ভার্জিলের নামে চলে, তবে সেগুলি তাঁর লেখা নয়। ভার্জিল মারা গিয়েছিলেন ১৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে।

ভার্জিলের পরে এবং ওভিদের পূর্বে তিনজন শক্তিমান কবির নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হচ্ছেন হোরেস, তাইবুল্লুস এবং প্রোপার্টিউস। হোরেসের জন্ম ৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। প্রথম যৌবনে সীজার-বিরোধী বিপ্লবে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভা লক্ষ্য করে ভার্জিল তাঁকে নিজ পৃষ্ঠপোষক মেসেনাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সারমোনেস (*Sermones*) শিরোনামায় তিনি কয়েকটি স্যাটায়ার প্রকাশিত করেন। তাঁর দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে ইপোদেস্ (*Epodes*) যা আইয়াম্বিক ছন্দে রচিত

গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত। প্রকৃত ল্যাটিন গীতিকবিতা হোরেসের হাতেই পূর্ণতা লাভ করে। এ বিষয়ে তাঁর চার খণ্ডে রচিত কারমিনা (*Carmina*) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তিনি ব্যঙ্গধর্মী এক অদ্ভুত পত্র-সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন যার নাম এপিস্তুলি (*Epistulae*)। হোরেসের মৃত্যু হয়েছিল ৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে। কবি তাইবুল্লুসের জন্ম ৫৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তিনিও হোরেসের মত দুঃখবাদী এবং তাঁর রচনায় দুঃখবাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কবির ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থ প্রেমই তাঁকে দুঃখবাদী করে তুলেছিল। তাঁর দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ দেলিয়া এবং নেমেসিস্ নামক দুজন রমণীকে কেন্দ্র করে লেখা যারা তাঁর জীবনে প্রচণ্ড দুঃখের কারণ হয়েছিল। কবি প্রোপারসিউসও (জন্ম ৫০ খ্রীঃ পূঃ) প্রেমের কবিতা লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত কবিতাই সিন্থিয়া নামক তাঁর এক মানসীর উদ্দেশ্যে লিখিত। তাঁরও মোট চারটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে এবং সবগুলিই তাইবুল্লুসের কবিতাগুচ্ছের মতই শিরোনামাবিহীন।[১]

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি ছিলেন ওভিদ্। হোরেস, তাইবুল্লুস এবং প্রোপারসিউস কাব্যের ক্ষেত্রে যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধারাটির পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ওভিদের হাতে। ওভিদের জন্ম ৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু ১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতার আশা ছিল যে ওভিদ্ আইনজীবী হবেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বাল্যকালে রোমে প্রেরিত হন যেখানে তিনি প্রখ্যাত আলঙ্কারিকদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষান্তে তিনি গ্রীস ও এশিয়াতে ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি মীদিয়া নামক একটি ট্রাজেডি রচনা করেছিলেন যেটি এখন লুপ্ত হয়ে গেলেও তৎকালীন সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। পরিণত বয়সে ওভিদ্ রোমক সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্য-

১। লুক্রেসিউসের কবিতাসমূহের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বেইলী যা অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। ভার্জিলের অনুবাদকের সংখ্যা বহু যাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ড্রাইডেন। এ ছাড়া আছেন কনিংটন, ম্যাক্কেল, মরিস, বাওয়েন প্রভৃতি। হোরেসের অনুবাদক কনিংটন, তাইবুল্লুসের ক্রাণ্টুন, এবং প্রোপারসিউসের নট, মুর, ক্রাণ্টুন, ফিলিমোর, গ্যার্ডিনার প্রভৃতি। এঁদের মূল রচনাবলীর নিদর্শনের জন্য পোষ্টগেটের *Selections* (ইংরাজী টীকা সহ) এবং ক্রাটনের *Specimens of Classical Poets* দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ মেতামোরফোসেস (*Metamorphoses*) রচনা করেছিলেন। কিন্তু ৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকস্মিকভাবে সম্রাট অগাস্টাস কর্তৃক কৃষ্ণসাগরের পরপারে নির্বাসিত হন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি তাঁর দণ্ডাজ্ঞা তুলে নেবার জন্ত সম্রাটের কাছে আবেদন করেন। তাঁর সেই সময়কার যন্ত্রণা তাঁর আত্মজীবনীমূলক কাব্যগ্রন্থ ত্রিস্তিয়ায় (*Tristia*) প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়নি। নির্বাসিত অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীর নিম্নরূপ তালিকা করা যায়: (১) ১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল আমোরেস (*Amores*) যাতে কবির ৪৯টি প্রেমের কবিতা আছে যেগুলি করিন্না নামক এক অজ্ঞাত কবিমানসীকে উদ্দেশ করে লেখা। (২) একুশটি পত্র-কবিতার সংকলন, নাম হেরোইদেস (*Heroides*) যার বিষয়বস্তু হচ্ছে স্বামী বা প্রণয়ীর নিকট স্ত্রী বা প্রেমিকার পত্র। মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্য সম্ভবত এই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থটি ওভিদের নামে চললেও এটি অপরের লেখা। (৩) মেদিকামিনা ফাসিই (*Medicamina Faciei*)—অসম্পূর্ণ এই কাব্যগ্রন্থটি নারীদের প্রসাধন সম্পর্কে রচিত। (৪) আমাতোরিয়া (*Amatoria*—তিনখণ্ডে রচিত এই কাব্যগ্রন্থটিতে মেয়েদের হৃদয় জয়ের কৌশল আলোচিত হয়েছে। (৫) রেমেদিয়া আমোরিস (*Remedia Amoris*)—এই কাব্যগ্রন্থটি পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট। (৬) মেতামোরফোসেস—এটি একটি ঐতিহাসিক কাব্য, ওভিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে স্বীকৃত। (৭) ফাস্তি (*Fasti*—রোমের বাৎসরিক উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল। (৮) আত্মজীবনী-মূলক কাব্য—ত্রিস্তিয়া। (৯) পন্থাস নামক এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাকারে পত্রাবলী—এপিস্তুলি এক্স পোন্তো (*Epistulae ex Ponto*) (১০) ইবিশ (*Ibis*)—কবি কালিমাকোসের এই নামেরই একটি কবিতার অনুসরণ। (১১) হালিউতিকা (*Halieutica*)—সপ্তমাত্রিক ছন্দে কৃষ্ণসাগরের মাছের উপর এই কাব্য রচিত।

রোমের ইতিহাসে সেনেকা ছিলেন দুজন, পিতা ও পুত্র, একজন বিখ্যাত বক্তা ও আলঙ্কারিক, অপরজন দার্শনিক, কবি, নাট্যকার ও গদ্যলেখক। দ্বিতীয় জনই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। প্রথম জীবনে তিনি সম্রাট ক্লডিয়াস কর্তৃক কর্সিকায় নির্বাসিত হন, পরে রাণী আগ্রিপ্পিনার অনুরোধে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তিনি আগ্রিপ্পিনার পুত্র নীরোর গৃহশিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে নীরো সম্রাট হলে সেনেকা কিছুকাল তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন।

লেখক হিসাবে সেনেকা তাঁর সরল স্টাইলের জন্য বিখ্যাত। তাঁর অজস্র গদ্য রচনার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের উপর রচনা দে ক্লেমেনসিয়া। এর পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর সাত খণ্ডে রচিত কুয়েস্তিওনেস নাতুরালিস। এ ছাড়া তাঁর পত্রাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেগুলি দে কনসোলাতিওনে শিরোনামায় সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু কবি ও নাট্যকার হিসাবেই সেনেকা অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বলতে গেলে সেনেকাই হচ্ছেন একমাত্র রোমক ট্রাজেডিকার। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত দশটি ট্রাজেডি পাওয়া গেছে: হারকিউলেস ফুরেন্স, হারকিউলেস ইতিউস থিয়েস্তেস, ফেড্রা, ইডিপাস ট্রোয়াদেস মিদিয়া, আগামেমনন, থেবাইস ও অক্টেভিয়া। এই ট্রাজেডিগুলির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক গ্রীক আদর্শে রচিত। কিন্তু চরিত্রসমূহের গঠন সম্পূর্ণ রোমক। এদিক থেকে এন্নিউস ও পাকুভিউসের সঙ্গে সেনেকার পার্থক্য মৌলিক।[১]

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে, অর্থাৎ মোটামুটি টাইবেরিয়াসের সময় থেকে ট্রাজানের মৃত্যু পর্যন্ত এক শতাব্দীর ইতিহাসে গদ্যসাহিত্যের যেমন উন্নতি হয়েছে, কবিতা ও কাব্যসাহিত্যের মানের দিক তেমন উঁচু পর্যায়ে যেতে পারেনি। তবে এ যুগে কবিতা ও কাব্যসাহিত্যের বিকাশ যে একেবারেই হয়নি তা নয়। এই শতকে আমরা তিনজন মহাকাব্যকারের উল্লেখ পাই—জার্মানিকুস, মানিলুস এবং লুসিলিউস। জার্মানিকুস (১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ১৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন ওভিদের সমকালীন এবং ওভিদ তাঁর ফাস্তি কাব্যটি জার্মানিকুসকে উৎসর্গ করেছিলেন। জার্মানিকুসের নিজস্ব রচনা বিলুপ্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর ফেনোমেনা কাব্যের মোট ৩২৫ লাইন পাওয়া গেছে। মহাকবি হিসাবে জার্মানিকুসের উল্লেখ একমাত্র ওভিদই করেছেন। মহাকবি বলে উল্লিখিত মানিলুস জ্যোতির্বিদ্যার উপর পাঁচ খণ্ডে রচনা করেছিলেন আস্ত্রোনোমিকা। তৃতীয় জন ছিলেন লুসিলিউস যাঁর এত্না কাব্যগ্রন্থের কিছু অংশ এ পর্যন্ত

১। ওভিদের রচনাবলী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের দ্বারা সম্পাদিত ও অনূদিত হয়েছিল। মার্লো এবং ড্রাইডেন ওভিদের বহু রচনার ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। ওভিদ ও তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে বিশদভাবে জ্ঞাত হবার জন্য টিঙ্কেলের *History of Roman Literature* দ্রষ্টব্য। তাঁর মূল গ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই সঠিক সম্পাদনা করেছেন আওয়েন। সেনেকার রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন মিলার (১৯০৮) এবং ক্লার্ক (১৯১০)।

পাওয়া গেছে। এঁদের যে কেন মহাকবি বলা হয়েছে তা বলা শক্ত, বোধ হয় এঁরা মহাকাব্যকারদের অনুসরণে সপ্তমাত্রিক ছন্দে লিখতেন বলে।[১]

ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছিলেন লুকান (মৃত্যু ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং সিলিউস ইতালিকুস (মৃত্যু ১০১ খ্রীষ্টাব্দ)। লুকান ছিলেন সেনেকার ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রথম জীবনে তিনি সম্রাট নীরোর সুদৃষ্টিতে ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং কবিপ্রতিভার অধিকারী নীরো লুকানের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সাধারণের মধ্যে তাঁর কবিতার আবৃত্তি নিষিদ্ধ করে দেন। শেষ পর্যন্ত লুকান সম্রাট নীরোকে হত্যার জন্য একটি চক্রান্তে লিপ্ত হন, কিন্তু অবশেষে ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফারসালিয়া। দশ খণ্ডে রচিত এই বিশাল কাব্যগ্রন্থে সীজার ও পম্পেইর গৃহযুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সিলিউস ইতালিকুসের জন্ম ২৫ খ্রীষ্টাব্দে। অবসর-জীবনে তিনি সতের খণ্ডে পিউনিকা নামে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এ যুগে বীররসপূর্ণ কাব্য রচনা করেছিলেন স্তাতিউস (মৃত্যু ৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ভালেরিউস ফ্লাকুস (মৃত্যু ৯০ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রাচীন যুগের বীররসপূর্ণ কাহিনীগুলিই ছিল স্তাতিউসের রচনার উপজীব্য বিষয়। ১২ খণ্ডে তিনি লিখেছিলেন থেবাইস, ইডিপাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্যলাভের জন্য সংগ্রামের কাহিনী। এ ছাড়া দু খণ্ডে আকিলিস নামক কাব্যগ্রন্থের কথাও উল্লেখযোগ্য। স্তাতিউসের মধ্যে গীতিকবির প্রতিভাও ছিল, এবং তাঁর একটি গীতিকবিতার সংকলনও পাওয়া গেছে, নাম সিল্‌ভি। ভালেরিউস ফ্লাকুস জেসন ও মীদিয়ার কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন আর্গোনতিকা। গ্রামজীবনের চিত্র কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন কালপুর্নিকুস সিকুলুস (মৃত্যু ৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর মোট সাতটি দীর্ঘ কবিতা পাওয়া গেছে যেগুলি ইক্‌লোগি (*Eclogue*) নামক সাধারণ শিরোনামায় রচিত। কবি হোরেস যে ব্যঙ্গমূলক কবিতার সূত্রপাত করেছিলেন পরবর্তী কালে তা অনুসরণ করেন পেসিউস (মৃত্যু ৬২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং জুভেনাল (মৃত্যু ১৩০ খ্রীষ্টাব্দ)

১। লুসিলিউসের এত্‌নার লেখকত্ব ভার্জিলের উপর আরোপিত হয়েছিল। ৬৪৪ লাইনের এই রচনাটি সম্পাদনা করেছেন রবিনসন এলিস, পোস্টগেটের *Corpus Poetarum Latinorum* গ্রন্থে। মানিলুসের *Astronomica*-র ইংরাজী অনুবাদ করেছেন গ্যারোড ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।

পের্সিউসের এ পর্যন্ত মোট ছয়টি ব্যঙ্গাত্মক রচনা পাওয়া গেছে। জুভেনালের প্রাপ্ত কবিতার সংখ্যা ষোলটি।[১]

রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে, অর্থাৎ হাড্রিয়ানের (১১৭ খ্রীঃ) যুগ থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত কবিতা ও কাব্যসাহিত্যের স্রোতে ভাটা পড়েছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে মোট চারজন কবির নাম আমরা পাই—অউসোনিউস্, ক্লডিয়ান, নমাতিয়ানুস্ এবং দ্রাকোন্‌সিউস্। অউসোনিউস্ ছিলেন বিস্ময়করভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক। নিজের মানসিক সংঘাতগুলিকে তিনি ছন্দোবদ্ধ করেছেন দুটি কাব্যগ্রন্থে, একটি হচ্ছে প্যারেন্তালিয়া, অপরটি মোসেল্লা। ক্লডিয়ান ছিলেন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি। তাঁর যুগে রোম বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত। কিন্তু ক্লডিয়ান ভ্যাণ্ডাল আক্রমণকারীদের নেতা স্টিলিকোর সুনজরে পড়তে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা হচ্ছে রাপ্তুস্ প্রোসার্পিনি 'প্রোসারপাইনের ধর্ষণ'। এই অসমাপ্ত মহাকাব্যে তাঁর কবিপ্রতিভার চরম স্ফুরণ হয়েছে। তাছাড়া তিনি প্রশস্তিমূলক বহু কাব্য লিখেছেন। দ্রাকোন্‌সিউস্ ছিলেন পঞ্চম শতকের কবি। পরবর্তী কালের লেখকেরা তাঁর রচনার সুখ্যাতি করে গেছেন, কিন্তু তাঁর রচনার সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা সাতিস্ফাক্‌তিও কিন্তু অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কবি নমাতিয়ানুস্‌ও পঞ্চম শতকের লোক। গথ-নেতা অ্যালারিক যখন রোম লুণ্ঠন করেন, তিনি তখন রোম ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যান। তাঁর সেই সময়কার অ্যাডভেঞ্চারসমূহ তাঁর দুই খণ্ডে রচিত কাব্যগ্রন্থ দে রেদিতু সুও-তে বর্ণিত হয়েছে।

১১॥ ইউরোপীয় ল্যাটিন সাহিত্য

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি তাতে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কেননা আসল রোম সাম্রাজ্যের

১। লুকানের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে মার্লো (১৬০০), গোর্জেস (১৬১৪), মে (১৬২৬), রো (১৭১৮) এবং রিডলে (১৯০৫)। সিলিউস ইতালিকুসের পিউনিকা *Corpus Poetarum Latinorum*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ওই একই গ্রন্থে স্তাতিউসের থেবাইস এবং আকিলিস স্থান পেয়েছে। সিলভির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন স্লাটার (অক্সফোর্ড, ১৯০৮)। ভালেরিউস ফ্লাকুসের জন্য সামার্স রচিত *Study of the Argonautica* দ্রষ্টব্য। কালপুর্নিকুসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন স্কট ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে। পের্সিউস ও জুভেনালের রচনাবলীর অনুবাদ করেছিলেন ড্রাইডেন, কনিংটন এবং র‍্যামজে (Loeb Series, ১৯১৮)।

ধ্বংস হলেও, কনস্ট্যান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্য ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। দ্বিতীয়ত যে সকল বারবেরিয়ান জাতি রোম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিল, ল্যাটিন সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে তাদের অনেক কিছুই গ্রহণ করবার ছিল। একথা যেমন রোমকগণ গ্রীস জয় করার পর নিজেরাই গ্রীক সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল সেই রকম বিজেতা বারবেরিয়ানগণও ল্যাটিন সংস্কৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়েছিল। তা ছাড়া খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত ল্যাটিন সাহিত্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও দর্শন চিন্তার বাহন হয়ে পড়েছিল, প্যাগান ধর্মমতসমূহের উপর শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মের বিজয়লাভ প্রকৃত অর্থে ল্যাটিন ভাষারই বিজয়লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রটি গীর্জার অধীনে থাকার জন্য ইউরোপের সকল স্থানেরই শিক্ষিত সমাজ ল্যাটিন ভাষাকেই আশ্রয় করেছিলেন।

চতুর্থ শতকের পর থেকেই কথ্য ও লেখ্য ল্যাটিনের মধ্যে ভেদ অধিকতর প্রকট হতে শুরু করে, এবং ওই যুগের খ্রীষ্টান লেখকরা যাঁরা ল্যাটিনেই ধর্মীয় তত্ত্বসমূহ জনগণের নিকট পৌঁছে দেবার প্রয়াস পেতেন তাঁরা রীতিমত সমস্যার সম্মুখীন হন। আফ্রিকাবাসী কয়েকজন লেখক খ্রীষ্টীয় ল্যাটিন সাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন তেরতুলিয়ান (বিখ্যাত আপোলোজিয়ার লেখক), মিনুসিউস্ ফেলিক্স, যাঁর রচিত গ্রন্থের নাম অক্তাভিউস্, সিপ্রিয়ান, আর্নোবিউস্, যাঁর টিকে-থাকা গ্রন্থের নাম আদ্‌ভেরসুস্ জেন্তেস্, এবং বিখ্যাত দিভিনি ইনস্তিতুসিওনেসের লেখক লাক্তানসিউস্। পঞ্চম শতকে কথ্য ও লেখ্য ভাষার ভেদ নিয়ে আরও সমস্যা দেখা যায়। কমোদিয়ানুস্ নামক একজন আফ্রিকাবাসী লেখক কথ্য ভাষায় প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কবিতা রচনা করেন। এই সমস্যা সেণ্ট অগাস্টাইনকেও পীড়িত করেছিল যা তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর 'খ্রীষ্টীয় মতবাদ' নামক গ্রন্থে। জেরোমও বাইবেল অনুবাদ করতে গিয়ে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অগাস্টাইনের রচনায় অলঙ্কারের বাহুল্য থাকলেও তা সাধারণ মানুষের বোধশক্তির অগম্য ছিল না। পঞ্চম শতকের অপরাপর রচনার তালিকা আমরা এখানে দিচ্ছি। বাইবেলের বিষয়বস্তু অবলম্বনে স্পেনবাসী জুভেনকুসের মহাকাব্য; বাইবেল অনুসরণে রচিত ইতালীবাসী সেডুলিউসের কারমেন পাস্‌কালে; ভিনিসীয় আভিতুস্ রচিত দে স্পিরিতালিস্ হিস্তোরে জেষ্টিস; ইতালীয় আরাতোর রচিত সঞ্জীবনী; প্রুদেনসিয়াস্ রচিত কাব্য কাথেমেরিনন্, পেরিস্তেফানন্, সাইকোমাকিয়া এবং

অপরাপর খ্রীষ্টীয় কবিতা। অপরাপর খ্রীষ্টীয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন পলিনুস, রুফিনুস, সুলপিসিউস্ সেভারুস্ এবং ওরোসিউস্। পঞ্চম শতকের অখ্রীষ্টান লেখকদের মধ্যে ছিলেন মাক্রোবিউস্ যাঁর সাতুরনালিয়া এবং কিকেরোর কয়েকটি গ্রন্থের উপর রচিত টীকা বিখ্যাত। অপরজন ছিলেন কাপেল্লা যাঁর রচিত গ্রন্থের নাম নুপতিস্ ফিলোলোগি এত্ মার্কুরি।[১]

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে ল্যাটিন সাহিত্যে সৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম হয়েছিল। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে অঞ্চলভিত্তিক রাজ্যসমূহ গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ইটালী তখন ছিল অস্ট্রোগথ-শাসিত, ফ্রান্সে তখন মোরোভিঞ্জিয়ন ফ্রাংকরা রাজত্ব করছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের উল্লেখযোগ্য ল্যাটিন রচনা তিনটি—বোয়েথিউসের দে কনসোলেসনে ফিলোসোফিয়ে,[২] গ্রেগরীর হিস্তোরিয়া ফ্রাংকোরুম্[৩] এবং ইসিডোরের ইতিমোলোজিয়ে।[৪] এগুলি ছাড়া কাসিওদোরুসের ইনস্তিতুসনেস এবং কবি ভেনানসিউসের ভেকসিল্লা রেজিস এবং পাঙ্গ লিঙ্গুয়া গ্লোরিওসা নামক কাব্যদ্বয়ের কথাও উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উল্লিখিত সকল রচনাগুলিরই চরিত্র খ্রীষ্টীয়। বস্তুত রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ল্যাটিন সংস্কৃতি খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতিরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। আয়ার্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্টধর্মের আলোকবর্তিকা নিয়ে গিয়েছিলেন সেণ্ট প্যাট্রিক। আইরিশ মঠসমূহও কালক্রমে ল্যাটিন চর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় যার ফলে

১। অগাস্টাইনের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির নাম *De Civitate Dei* (ঈশ্বরের নগর), *De Vera Religione* (সত্যধর্ম) এবং *De Trinitate* (ত্রিত্ববাদ)। এইগুলির এবং অপরাপর খ্রীষ্টীয় ল্যাটিন লেখকদের—যেমন তেরতুলিয়ান, লাক্তান্তিউস, ইত্যাদির—রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ কোয়াস্টেন এবং প্লাম্প সম্পাদিত *Ancient Christian Writers* (১৯৪৬—) এবং বেইলী সম্পাদিত *Library of Christian Classics* (১৯৫৩—) সিরিজে পাওয়া যাবে। অপরাপর লেখকদের জন্য রাইট ও সিনক্লেয়ার প্রণীত *History of Later Latin Literature* (১৯৩১) দ্রষ্টব্য।

২। বোয়েথিউসের গ্রন্থটির অ্যাংলো-স্যাক্সন তর্জমা করেছিলেন মহামতি আলফ্রেড এবং পরবর্তী কালে কবি চসার।

৩। গ্রেগরীর ফ্রাংক-ইতিকথার ইংরাজী অনুবাদক ছিলেন ড্যালটন। এই অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দুই খণ্ডে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। ইসিডোরের জন্মভূমি ছিল স্পেন এবং তিনি ছিলেন সেভিলের বিশপ। উল্লিখিত রচনাটি একটি বিশ্বকোষ। এই বিখ্যাত রচনাটির অসংখ্য মধ্যযুগীয় অনুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলির ভিত্তিতে গ্রন্থটির নূতন করে সম্পাদনা করেছিলেন লিণ্ডসে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে

আইরিশ-ল্যাটিন সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। কবি কলুম্বার রচনাবলী সপ্তম শতকের আইরিশ ধর্মীয় রচনাসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। গিলদাসের লোরিকাও আইরিস ল্যাটিন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ষষ্ঠ শতকে রচিত হিস্‌পেরিকা ফেমিনা গ্রন্থে স্থানীয় ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন ভাষার আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে।

ইংলণ্ডেও খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন চর্চার সূত্রপাত হয়। ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অগাস্টাইন রোম থেকে ইংলণ্ডে আসেন এবং জুট অধিকৃত কেণ্টে ক্যাণ্টারবেরী গীর্জার পত্তন করেন। তার পূর্বেই আয়র্ল্যাণ্ড খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। সেখান থেকেও ইংলণ্ডের নর্দাম্বিয়া অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়। কালক্রমে ক্যাণ্টারবেরীর গীর্জাই ইংলণ্ডে ল্যাটিন ভাষা অনুশীলনের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের প্রথম বিখ্যাত ল্যাটিনবিদ্ আলড্‌হেম (৬৫০-৭০৯) এই ক্যাণ্টারবেরীর গীর্জাতেই গড়ে উঠেছিলেন। তাঁর ল্যাটিন রচনার কিছু কিছু নিদর্শন এখনো বর্তমান আছে। গদ্য ও কবিতা উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তবে তাঁর ভাষা ছিল কৃত্রিম ও অলঙ্কার-বহুল। মূলত ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ছিল। আলড্‌হেমের সাহিত্যিক উত্তরাধিকারী ছিলেন বীডি (৬৭২-৭৩৫) যিনি নর্দাম্বিয়া মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যে রচনাটির জন্য বীডি বিখ্যাত তার ইংরাজী নাম ইক্লিজিয়াস্টিকাল হিস্ট্রী অফ দি অ্যাঙ্গলস যে গ্রন্থে জুলিয়াস সীজারের বৃটেন জয় থেকে শুরু করে ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃহত্তর ইংলণ্ডের সার্বিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ইংলণ্ডের তৃতীয় ল্যাটিন লেখক ছিলেন আল্‌কুইন (৭৩০-৮০৪)। ইনিও ছিলেন নর্দাম্বিয়া গীর্জার অন্তর্ভুক্ত এবং এঁর কবিতা-সমূহে ফ্রাংক সম্রাট শার্লামানের প্রশস্তি আছে।[১]

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ইংলণ্ডে নূতন করে ল্যাটিন সাহিত্য রচিত হতে শুরু করেছিল। অ্যাংলো-স্যাকসন সাহিত্যের আকস্মিক বিলুপ্তির ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূর্ণ করতে অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্যের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে ইংলণ্ডে ল্যাটিনের পুনরুত্থান সম্ভবপর হয়েছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে যে ল্যাটিন সাহিত্য ইংলণ্ডের মাটিতে গড়ে উঠেছিল তা মূলত ইতিহাসধর্মী। এগুলির মধ্যে আছে উইলিয়ম অ্য জুমিয়েগে রচিত "প্রথম উইলিয়মের ইতিহাস",

১। আলড্‌হেম, বীডি ও আলকুইনের রচনাবলী মিগ্‌নের *Patrology* গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

ওডেরিকাস্ ভিটালিসের 'ধর্মীয় ইতিহাস', মাল্‌মেস্‌বুরির উইলিয়ম রচিত 'ইংলণ্ডের রাজবৃত্ত', হান্‌টিংডনের হেনরী রচিত 'কিংবদন্তী' এবং মন্‌মাউথের জিওফ্রে রচিত বিখ্যাত 'বৃটনদের ইতিহাস'। এছাড়া গিরাল্‌ডাস্ কামব্রেনসিস রচিত গল্পসমূহ, ওয়াল্টার ম্যাপের লঘুরসাত্মক রচনা এবং নিগেল ওয়ারকেরের স্পেকুলাম্ স্তালতোরুম্ নামক একটি হাস্যরসাত্মক অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী ইংলণ্ডে নর্মান আমলে রচিত ল্যাটিন সাহিত্যের বিশেষ নিদর্শন।[1]

এই প্রসঙ্গে মনমাউথের জিওফ্রে রচিত বৃটনদের ইতিহাস (ল্যাটিন নাম হিস্তোরিয়া রেগাম বৃতান্নিয়ে) গ্রন্থটির সম্পর্কে দু চার কথা বলা উচিত। গ্রন্থটির রচনাকাল ১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, এবং লেখক এই রচনাটিকে প্রথম হেনরীর পুত্রের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি কেল্‌টীয় কিংবদন্তী-সমূহকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেছেন। কেল্‌টীয় কাহিনী সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজা আর্থারের কাহিনী জিওফ্রের এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পরিবেশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী ল্যাটিন লেখক নেন্নিউসকে অনুসরণ করে জিওফ্রে বৃটনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কৌতূহলজনক কাহিনী লিখেছেন। এই কাহিনী অনুযায়ী বৃটনদের আদি পুরুষ ব্রুটাস ছিলেন ট্রোজান বীর ইনিয়াসের প্রপৌত্র যিনি বৃটেনে এসে ট্রোয়নোভাণ্ট বা নতুন ট্রয়নগরের পত্তন করেছিলেন যা পরবর্তী কালে লণ্ডন নামে কথিত হয়েছিল। সে যাই হোক, জিওফ্রের রচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশই অধিকার করে আছে আর্থারীয় কাহিনীচক্র। এখানে আর্থারকে বৃটনদের পরিত্রাতা ও রক্ষাকর্তারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। আর্থার অ্যাংলো-স্যাক্সন, পিক্ট ও স্কটদের জয় করেন, তা ছাড়া আয়র্ল্যাণ্ড, আইস্‌ল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও গল নিজ অধিকারে আনেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রোমক সম্রাটের সঙ্গে সংঘর্ষে আসেন এবং তাঁর উপর বিজয়লাভে সমর্থ হয়ে তিনি রোমকদের দাস করেন। সকল যুদ্ধের বিজয়ী এই আর্থার সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অবশ্য এগুলি নিছক কাহিনীমাত্র, ঐতিহাসিক সত্য নয়। তা সত্ত্বেও জিওফ্রের এই বর্ণনা জনপ্রিয় ছিল।

ইউরোপের অপরাপর অংশেও ল্যাটিন ভাষার সমাদর ছিল। প্রাচীন হাঙ্গেরী সম্বন্ধে আমরা যা কিছু বিবরণ পাই তা অধিকাংশই ল্যাটিন ভাষায়

১। দ্রষ্টব্য মোর্লে, *English Writers* (তৃতীয় খণ্ড); গেয়ার্ডনার, *Early Chroniclers of Europe* (১৮৭৯); কোর্থিল্‌ড, *English Literature from the Norman Conquest to Chaucer* (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

রচিত। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেস্তা হাঙ্গেরোরুম যাতে ম্যাগিয়ার জাতির উৎপত্তি ও আদি ইতিহাসের কিছুটা পৌরাণিক ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের লেখকের নাম জানা যায় না, তবে সম্ভবত তিনি পলাস মাজিস্টার যিনি প্যারিসে আইন পড়তে গিয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এরপর উল্লেখযোগ্য অপর একটি হাঙ্গেরীয় ইতিবৃত্ত ক্রনিকন্ রেরুম্ হাঙ্গারিকারুম্, লেখক থুরোজের জন, রচনাকাল ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে যে মোঙ্গোল আক্রমণ হয় তার বিবরণী লিখেছিলেন রোজারিয়াস, গ্রন্থটির নাম কারমেন্ মিজেরাবাইল্। রাজা মাথিয়াসের দরবারে জানুস পান্নোনিকাস, নিকোলাস বাথোরি, জন ভিতেজ প্রমুখ ল্যাটিন পণ্ডিতগণ সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের গৌরবকীর্তন করে আন্তোনিও বোনফিনি লিখেছিলেন রেরুম্ হাঙ্গারিকারুম্ দিকাদিস্।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে নরওয়েতে ল্যাটিন ভাষায় তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। হিস্তোরিয়া দে আন্তিকুইতেত্ রেগুম্ নোরভাগিয়েনসিউম্ (১১৮০), প্রোফেক্‌সিও দানোরুম্ (১২০০) এবং হিস্তোরিয়া নোরভাগিয়ে। তিনটি গ্রন্থই ইতিহাসমূলক, শেষোক্ত গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড থেকে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। ডেনমার্কেও ল্যাটিনভাষার রীতিমত চর্চা ছিল। ল্যাটিন কবিদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন অ্যাণ্ডার্স সুনেসেন্ (১১৬৭-১২২৮) ও মোর্টেন বোরাপ (১৪৪৬-১৫১৬)। ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন সোয়েন আগেগ্‌সেন যাঁর রচিত হিস্তোরিয়া রেগুম্ দানিকা কম্পেনদিওসা (১১৮৫) ডেনমার্কের ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিন্তু ডেনমার্কের ল্যাটিন পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান ছিলেন স্যাক্সো গ্রাম্‌মাটিকাস যিনি ষোল খণ্ডে রচনা করেছিলেন জেস্তা দানোরুম (*Gesta Danorum*), রচনাকাল ১১৮৫-১২২২। এই মহাগ্রন্থের প্রথম নয়টি খণ্ডে ডেনমার্কের সমুদয় লৌকিক ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থ থেকেই সেক্সপীয়ার তাঁর হ্যামলেট নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।[১]

আবার পশ্চিম ইউরোপের কথায় ফেরা যাক। শার্লামানের রাজসভায় জনৈক ঐতিহাসিক পলাস দায়াকোনুম্ হিস্তোরিয়া দায়াকোনুম্ নামক একটি

১। ডেনীয় মণিষী ক্রিস্টিয়েন্ পেডারসেন্, যিনি রিফমেশন আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, প্রথম *Gesta Danorum*-এর সম্পাদনা করেছিলেন এবং তা প্যারিস থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দশম ও একাদশ শতকে জার্মানী অঞ্চলের স্থানীয় কাহিনীসমূহ অবলম্বনে ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি মহাকাব্য রচিত হয়, যেমন ভালথারিউস্, একবাসিস্ কাপতিভি, রুদলিয়েব ইত্যাদি। ইতালীতেও এই যুগে ওরোমা নোবিলিস প্রভৃতি কয়েকটি ল্যাটিন কাব্য রচিত হয়েছিল। পরবর্তী যুগে ইতালীতে ল্যাটিন সাহিত্যের আরও কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের জনকস্বরূপ দান্তে ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ল্যাটিনে রচিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ দে ভালগারি ইলোকোয়েন্থা ভাষাতত্ত্বমূলক আলোচনা, যেখানে তিনি ইতালীর ভবিষ্যৎ জাতীয় ভাষা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর বিদগ্ধ মতামতসমূহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ল্যাটিন রচনা হচ্ছে দে মনার্কিয়া যে গ্রন্থে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদসমূহ স্থান পেয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ ইকোলোগ একটি রাখালী কাব্য যা সপ্তমাত্রিক ছন্দে রচিত, রচনাকাল ১৩১৯। চতুর্থ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র, নাম কোয়েশ্চিও দে আকোয়া এত্ তেরা যে গ্রন্থে তিনি গ্রীক দার্শনিক থালেসের মতই জলকেই জগৎ সৃষ্টির আদি উপাদানরূপে বর্ণনা করেছেন।[১]

ইতালীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্ক মূলত ল্যাটিন সাহিত্যেরই লেখক ছিলেন। এখানে তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হল: এপিস্তলে মেত্রিকে (১৩১৮-১৯, মাতার মৃত্যুশোকে রচিত কবিতাবলী), আফ্রিকা (১৩৩৮-৪১, দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত মহাকাব্য), দে ভিরিস ইলাস্ত্রিবুস্ (১৩৩৮-৫৩, বিখ্যাত রোমকদের জীবনী), ফামিলিয়ারিউম্ রেরুম্ লিব্রি, সেনিলিউম্ রেরুম্ লিব্রি ও পোস্তেরিতাতে (পত্রাবলী), দে ভিতা সোলিতারিয়া, দে ওসিও রেলিজিওসো এবং দে রেমেদিস ইউত্রিয়াস্ক ফর্তুনে (১৩৪৬, ১৩৪৭, ১৩৫৬-৬৬, ধর্মীয় ও দার্শনিক রচনাবলী), এবং দে সুই ইপ্সিউস্ এত্ মালতোরুম্ ইগনোরেন্সিয়া (সাহিত্য সমালোচনা)।[২] পেত্রার্কের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীন বোকাচিও

১। দান্তের ল্যাটিন রচনার ইংরাজী অনুবাদ (হাওয়েল ও উইকস্টী কৃত Temple Classics Series-এ দ্রষ্টব্য। প্যাজেট্ টয়েন্‌বি কৃত *A Dante Dictionary* (১৮৯৮) গ্রন্থটির কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২। এই প্রসঙ্গে হুইলকিন্সের *Studies in the Life and Work of Petrarch* (১৯৫৫) দ্রষ্টব্য। তাঁর আত্মজীবনীও ল্যাটিনে রচিত।

মূলত স্থানীয় ভাষার লেখক হলেও ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর ল্যাটিন রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষধর্মী জেনিয়া লোগিয়া দেওরুম্ জেন্তিলিয়ুম্, সমকালীন ঘটনাসমূহের উপর রচিত বোলিকুম্ কারমেন, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ দে ক্লারিস্ মুলিয়েরিবুস্ এবং দান্তের জীবনী। এ ছাড়াও তিনি ল্যাটিনে পুরাতন ভৌগোলিক নামসমূহ সংকলন করেছিলেন।

রেনেসাঁসের পর ইউরোপে আবার নূতন করে ল্যাটিন চর্চার ধুম পড়ে যায়। নিভে যাবার আগে যেমন প্রদীপ একবার সর্বশক্তিতে জ্বলে ওঠে, এও সেই রকম। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টধর্মের আসল কথাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বিরোধী প্রচারকেরা আঞ্চলিক ভাষা সমূহকেই নিজেদের মতবাদ প্রচারের বাহন করেন। সেই থেকেই আঞ্চলিক ভাষা সমূহের শ্রীবৃদ্ধির এবং ল্যাটিন ভাষার অস্তিমকালের সূচনা দেখা যায়। তথাপি অভিজাত পণ্ডিতবর্গ ও বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের গবেষণার ফল ল্যাটিনেই প্রকাশ করার রীতি বজায় রেখেছিলেন অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। তারপর সমস্তই ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ভাষা সমূহের অধিকারে চলে আসে। রোমান ক্যাথলিক গীর্জা কিন্তু ল্যাটিনকে ত্যাগ করেনি যদিও শেষ পর্যন্ত ল্যাটিন ভাষার ব্যবহার কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রার্থনাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতি সম্প্রতি রোমান ক্যাথলিক চার্চ নির্দেশ দিয়েছে যে অতঃপর প্রার্থনামন্ত্রগুলিও স্থানীয় ভাষা সমূহে পাঠ করা যেতে পারে। তবে সংস্কৃতের মত এখনো কিছু কিছু গ্রন্থ ল্যাটিনে রচিত হয়, বলা বাহুল্য লেখকেরা তা শখ করেই লেখেন, এবং ক্লাসিকাল ভাষা হিসাবে ল্যাটিন আজও পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন কি কলকাতাতেও, পড়ানো হয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যের উদ্ভব

১॥ সূচনা

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই ইউরোপীয় দেশগুলিতে সভ্যতার বিকাশ স্বাধীনভাবে গড়ে উঠ্‌তে দেখা যায়, রোমক আমলে যা স্পষ্ট বোঝা যায় নি। এর একটি বড় কারণ ছিল ইউরোপের আঞ্চলিক ভাষাগুলির পিছিয়ে পড়ে থাকা অবস্থা। মূলত রোমক পণ্ডিতদের চেষ্টাতেই প্রাচীন ইউরোপের আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে, এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলী মূলত ল্যাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে ইতিহাস আলোচনা করার পরিসর এখানে নেই, তবে আমরা একথা বলে শুরু করতে পারি যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই, অর্থাৎ রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই, ইউরোপের আঞ্চলিক ভাষাগুলির স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার এবং ল্যাটিনের বন্ধন কাটাবার প্রবণতা দেখা যায়।

প্রকৃত অর্থে ইউরোপীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ রেনেসাঁসের আমল থেকে। একথা পূর্ব ইউবোপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খাটে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণভাবে। পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত রেনেসাঁস আন্দোলনের পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সকল সাহিত্যকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা মূলত উদ্ভবের নজীর, যেখানে প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের সংঘাত সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সংঘাত থেকেই কালক্রমে ওই দুই ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছিল, এবং তার ফলে যে গুণগত পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরিণাম আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ।

বর্তমান অধ্যায়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের সংঘাত ও পরিণামে সমন্বয় ঘটেছিল, বিভিন্ন সাহিত্যগত নিদর্শন থেকে তা প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হবে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের বিবর্তন ও বিভিন্ন ধারার বিকাশের প্রকৃত পটভূমিকাটিকে বুঝতে সুবিধা হবে।

২॥ প্যাগান ঐতিহ্য : টিউটন এড্ডা, ইত্যাদি

প্যাগান শব্দটিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মূলত প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয় বহুদেববাদী ধর্ম ও সংস্কৃতিসমূহকে বুঝে থাকেন। ব্যাপক অর্থে অবশ্য শব্দটি

খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী যে কোন সংস্কৃতিকেই বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসগত অসংখ্য পৌরাণিক কথা ও কাহিনী ইউরোপীয় সাহিত্যের আদি পর্যায়টিকে চিহ্নিত করেছে। প্যাগান ঐতিহ্যের অধিকাংশ বিষয়ই অলিখিত, লোকপরম্পরায় মৌখিকভাবে তা প্রচারিত, যদিও পরবর্তীকালে সেগুলিকে লিখিত আকার দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এই প্রাচীন বিশ্বাসসমূহের সংঘাতের বহু পরিচয় পাওয়া যায়, যা থেকে ইউরোপে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাসটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বহু ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্মকে প্যাগান সংস্কৃতিসমূহের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে, পুরাতন আমলের অনেক দেবতা ও বীর খ্রীষ্টধর্মে স্থান পেয়েছেন সেণ্ট হিসাবে, অনেক প্যাগানীয় কাহিনীর খ্রীষ্টীয়করণও হয়েছে।

এড্‌ডা (Edda): স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন আইসল্যাণ্ডে পাওয়া গেছে তা এড্‌ডা নামে পরিচিত, যার দাবিদার শুধু আইসল্যাণ্ডই একা নয়, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও জার্মানীও। টিউটন ঐতিহ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এই এড্‌ডার সংখ্যা দুটি—পদ্য-এড্‌ডা ও গদ্য-এড্‌ডা। পদ্য-এড্‌ডাই প্রাচীনতর যদিও ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের স্কালাহোল্‌টের বিশপ ব্রাইনৎসোলফ্‌র স্বেইসন কর্তৃক আবিষ্কারের পূর্বে এই গ্রন্থের পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। গদ্য এড্‌ডা আবিষ্কার করেছিলেন আইসল্যাণ্ডের প্রাচীন যুগের বিখ্যাত লেখক স্নোরি স্টারলুসন।[১] পদ্য-এড্‌ডার তুলনায় বয়সে অর্বাচীন হলেও টিউটন কথা ও কাহিনীর আকর গ্রন্থ হিসাবে গদ্য-এড্‌ডা দীর্ঘকাল ধরে প্রামাণ্য বিবেচিত হয়ে এসেছে। স্যাক্সো গ্রামমাটিকাসের ল্যাটিন গ্রন্থ *Gesta Danorum*-এ উভয় এড্‌ডা-বর্ণিত কয়েকটি কাহিনী আছে। জার্মান ও ইংরাজী সাহিত্যের আদিপর্ব গঠনে এড্‌ডার অবদান অনেকখানি। ইংলণ্ডের জাতীয় মহাকাব্য বেওয়ুল্ফ (*Beowulf*) এবং জার্মানীর নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েট্ (*Nibelungenlied*) এড্‌ডার কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

১। জন্ম ১১৭৯; ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইসল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন, কিন্তু নানা কারণে তাঁকে পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করতে হয়। ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়েরাজের প্ররোচনায় তিনি নিজ জামাতা কর্তৃক নিহত হন। গদ্য এড্‌ডা ছাড়াও তিনি আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি হচ্ছে হাইমস্ক্রিঙ্গল বা নর্স রাজাদের কাহিনী এবং অপরটি হচ্ছে ওলাফের ইতিহাস। হাইমস্ক্রিঙ্গলের ডেনীয় অনুবাদ করেছিলেন নরওয়েজীয় পেডার ক্লসন ফ্রিস (১৫৪৫-১৬১৪ খ্রীঃ)।

পত্ত এড্ডা দুভাগে বিভক্ত—দেবগাথা ও বীরগাথা। চৌত্রিশটি কাব্যময় আখ্যানে বিভক্ত দেবগাথার বিষয়বস্তু বিশ্বচরাচর, দেবদেবী, দেবাসুর দ্বন্দ্ব, থরের কাহিনীসমূহ, বল্ডারের আখ্যান এবং মহাপ্রলয়। বীরগাথা অংশে আছে বেওয়াল্ফের উপাখ্যান, হোথার ও বলডারের কাহিনীসমূহ, হ্যামলেটের উপাখ্যান, নিবেলুঙ্গেনলিয়েট, ফোলসুঙ্গদের কাহিনী, ইত্যাদি। গদ্য এড্ডা পাঁচটি অংশে বিভক্ত: ফোরমালি বা প্রস্তাবনা যাতে বাইবেল কথিত সৃষ্টি রহস্য বর্ণিত হয়েছে (খ্রীষ্টীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়); স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পুরাণ, অর্থাৎ সমগ্র পত্ত-এড্ডার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু, কবিতার দেবতা ব্রাগির উক্তিসমূহ যেখানে দেবদেবীদের বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে; কবিতার কলাকৌশল সম্পর্কে এইগিরকে প্রদত্ত ব্রাগির উপদেশসমূহ; এবং স্নোরি স্টারলুসনের নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার।

এড্ডায় বর্ণিত টিউটন দেবদেবীরা মূলত বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রতীক। তাঁদের কাহিনীগুলির মধ্যে অতীতের জাতিগত স্মৃতিরও পরিচয় আছে। 'আশা' ও 'ভানা' এই দুই দেবগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে টিউটনদের দুটি শাখার প্রতিনিধি। বিভিন্ন দৈত্য ও রাক্ষসবংশ, তাদের রাজ্য অথবা নির্দিষ্ট এলাকাসমূহ, টিউটনদের শত্রু জাতিসমূহের প্রতীক, যদিও কোন কোন সময়ে টিউটনদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, টিউটন পুরাণের দৈত্যগণ পূর্ববর্তী কোন জাতির পুরাণ অবলম্বনে কল্পিত হয়েছে—যেমন গ্রীক ওলিম্পিয়ানদের সঙ্গে টাইটানদের যুদ্ধ, আইরিশ ডানান্দের সঙ্গে ফোমরদের যুদ্ধ প্রভৃতির কাহিনী সম্ভবত তাদের প্রভাবিত করে থাকবে। সকল প্রাচীন মানুষের ধর্মই ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব, আলো ও আঁধার, গ্রীষ্ম ও শীতের দ্বন্দ্বের রূপকে প্রকাশ করে। গ্রীক পুরাণে, প্রভাতের দেবতা হার্মেস রাত্রি-দেবতা আর্গোসকে বধ করছেন। কেল্ট পুরাণে সূর্যদেবতা লুঘ রাত্রিরূপী বালোরকে পরাজিত করছেন। এই যুদ্ধ এড্ডাতেও বর্তমান। কিন্তু এখানে দেখা যায় অসৎ সৎকে জয় করছে, তমসা জ্যোতিকে গ্রাস করছে। গ্রীষ্ম-দেবতা বল্ডার নিহত হচ্ছেন শৈত্যের লতা মিস্ল্টোর দ্বারা। দেবতাদের পতন ঘটাচ্ছে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় মেফিস্টোফিলিস, লোকি। আলো পরাজিত হচ্ছে অন্ধকারের কাছে, বসন্ত শীতের কাছে, ন্যায় অন্যায়ের কাছে। সবশেষে আসছে দেবতাদের গোধূলি, রাগনারোক, যেখানে দেবতারা নিহত হচ্ছেন, দেবীরা ধর্ষিতা হচ্ছেন, ত্রিভুবন তমসায় আবৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্বের কাহিনীগুলির পটভূমি স্বর্গ নয়, পৃথিবী, দেবতা নয়,

মানুষ। কিন্তু এখানেও নায়কেরা দেবতাদের মতই চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত, শেষ পর্যন্ত ন্যায়েরই পরাজয় ঘটেছে, অন্যায়ের কাছে। টিউটন পুরাণের এই বৈশিষ্ট্যটি সত্যই রহস্যময়। সকল কাহিনীই মূলত একই ধরনের। নায়ক মহাবীর, যে বাহুবলে শত্রুকে জয় করেছে, নিজের গুণপনার পরিচয় দিয়ে নায়িকার হৃদয় জয় করেছে, কিন্তু পরে সে সর্বদাই একজন খল নায়কের চক্রান্তের বলি হয়েছে। প্রথম পর্বের স্বিপভাগের যা কাহিনী, সেই একই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে বেওয়াল্‌ফে, হ্যামলেটে, সিগুর্টে, সিয়েগ্‌ফ্রিটে। এখানে নায়ক-নায়িকাদের নাম শুধু ভিন্ন, কাহিনী সেই একই।

তবে দ্বিতীয় পর্বের কাহিনীগুলির কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। এই কাহিনীগুলির পটভূমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। অলৌকিক বিষয়গুলি বাদ দিলে ঘটনাগুলির বাস্তব হতে কোন বাধা নেই। টিউটন পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রে মূলত টিউটনভাষী জাতিগোষ্ঠী অভিনয় করেছে। রোম সাম্রাজ্যকে যারা ধ্বংস করেছিল তাদের মধ্যে টিউটনেরা ছাড়াও আরও বহু ট্রাইব ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদেরও কিছু বিষয় টিউটন পুরাণে স্থান পেয়েছে, যেমন হূণ অ্যাটিলা বা ডিয়েট্রিখের কাহিনী। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে, যা হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ। টিউটনদের দেবলোক ও সংস্কৃতি প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় প্যাগান ঐতিহ্যের নিদর্শন। তারা দ্বাদশ শতকের পূর্বে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়নি। তবুও মাঝে মাঝে টিউটন পুরাণে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। টিউটন দেবতা ও বীরপুরুষরা সচরাচর চিতায় শুয়েছেন, কিন্তু হ্যামলেটকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর সিয়েগফ্রিটকে তা দেওয়া হয়েছে গীর্জার প্রাঙ্গনে।[১]

১। পদ্য এড্‌ডার প্রধান পাণ্ডুলিপি হচ্ছে কোডেক্স রেগিউস যা কোপেনহেগেনের রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে গ্রন্থটির প্রথম সম্পাদনা ঘটেছিল মোলিয়াস্‌, সোফাস বাগ্‌গি, হিলেব্রাণ্ড্‌ট, সিগিমন্‌স্‌ গেরিং, জনসন, নেকেল, হেইন্‌ৎসেল প্রমুখ পণ্ডিতদের দ্বারা। পদ্য এড্‌ডার বারোটি আখ্যানের ইংরাজী অনুবাদ সর্বপ্রথম করেছিলেন আমোস কোট্‌ল ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবি গ্রে এড্‌ডার কিছুটা অংশের কাব্যানুবাদ করেছিলেন; প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বেঞ্জামিন থোর্প (১৮৬৬), তারপর অলিভ গ্রে (১৯০৮) এবং এইচ. এ বোলসের। গদ্য এড্‌ডার সবচেয়ে ভাল সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন কোপেনহেগেনের আর্নামাগ্‌না সোসাইটি জন সিগুরোসনের নেতৃত্বে গঠিত একটি পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটির ডেনীয় এবং আইসল্যাণ্ডীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯০০ এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিন্নুর জনসনের সম্পাদনায়। গদ্য এড্‌ডার ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন মালে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে, যা থেকে ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন পেয়সি। মূল থেকে ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন এণ্ডারসন (১৮৮০) এবং ব্রোডেয়ার (১৯১৬)। শেষোক্ত অনুবাদটি সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য।

ফোলসুঙ্গ সাগা : আইসল্যাণ্ডীয় ভাষায় সাগা বলতে বোঝায় যে কোন কাহিনী, তা ইতিহাস, পুরাণ যাই হোক না কেন, হোক না তা লিখিত বা অলিখিত। তবে আইসল্যাণ্ডীয় সাগার নায়কেরা সাধারণত হতেন নরওয়ের রাজারা এবং আইসল্যাণ্ডের অথবা আদি টিউটন বীরেরা, যাঁরা মূলত চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে জন্মেছিলেন। খ্রীষ্টীয় সেণ্টরাও সাগা সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে আছেন, যে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

প্যাগান ঐতিহ্যবাহী সাগাসমূহের মধ্যে নজ্‌ল্‌স্‌, ফোলসুঙ্গ, থিওরিক্‌স্‌ (নরওয়েতে রচিত এবং আইসল্যাণ্ডে আনীত জার্মান কাহিনীসমূহের সংকলন) এবং হ্রল্‌ফ্‌স্‌ ক্রাকা (সুইডীয়-ডেনীয় আখ্যান সংগ্রহ ; এতে বেওয়াল্‌ফ প্রভৃতি আদি ইংরাজী সাহিত্যের উপাদানও আছে) উল্লেখযোগ্য। চতুর্দশ শতকের একটি আইসল্যাণ্ডীয় সংকলনের নাম হউক্‌স্‌বোক যার ভোলুপ্‌সা অংশটি এড্‌ডায় বর্ণিত টিউটন দেবদেবীদের বিনাশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

এই সকল রচনার মধ্যে ফোলসুঙ্গ সাগা (*Volsung-saga*) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা ইউরোপীয় সাহিত্যের কয়েকটি বিখ্যাত আদিগ্রন্থের মূলে এর প্রভাব আছে। ফোলসুঙ্গ সাগার অনেকটা অংশই পদ্য এড্‌ডার দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান। ফোলসুঙ্গ ছিল দেবরাজ ওডিনের মানবীয় বংশধর। তার পুত্র সিগমুণ্ট ও পৌত্র সিগুর্টের বীরত্ব ও আত্মীয়দের চক্রান্তে তাদের করুণ মৃত্যুর কথা ফোলসুঙ্গ সাগার উপজীব্য। লাক্সডোয়েলা সাগাতেও সিগুর্ট ও গুডরুণের ট্রাজেডি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ফোলসুঙ্গ সাগার অজস্র শাখাকাহিনীও এখানে আছে, যেমন সিগমুণ্টের অপর পুত্র হেল্‌গির (হুণ্ডিংস্‌বেন) সঙ্গে রাজা হোগনির কন্যা সিগ্‌রুনের প্রেমোপাখ্যান, সিগমুণ্টের ভাগ্নে সিন্‌ফ্‌জোটেলের কাহিনী, দানবরূপী রেগিনের কথা, ব্রাইনহিল্‌ডের বেদনাময় পরিসমাপ্তি, গুডরুনের স্বামীহত্যার প্রতিশোধ, শেষ ফোলসুঙ্গ অস্‌লোগের কাহিনী, ইত্যাদি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েট্‌ নিয়ে আলোচনার কালে ফোলসুঙ্গ-সাগার মূল কাহিনীটি আমরা উল্লেখ করব।

৩। নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েট্‌

নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েট্‌ আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মধ্য জার্মান সাহিত্যের একটি বহু আলোচিত বীরগাথা বা মহাকাব্য হিসাবে আখ্যাত হয়েছে। আদিতে সম্ভবত রচনাটির নাম ছিল নিবেলুঙ্গনোট। যে বাক্যটি দিয়ে এই মহাকাব্য সমাপ্ত হয়েছে তা হচ্ছে *Das ist der Nibelunge Not* অর্থাৎ এতক্ষণ

নিবেলুঙদের ধ্বংসের কাহিনী বলা হল। এই নিবেলুঙ বলতে কাদের বুঝিয়েছে সেটা বলা শক্ত, কেননা মহাকাব্যটির প্রথমার্ধ অনুযায়ী নিবেলুঙ শব্দটির দ্বারা নায়ক সিয়েগফ্রিটের দেশ, গোষ্ঠী ও সম্পদ সূচিত হয়েছে, পক্ষান্তরে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মনে হয় যে তা যেন বার্গাণ্ডীয়দেরই অপর একটি নাম। চতুর্দশ শতকের একটি পাণ্ডুলিপিতে 'নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েটের' পরিবর্তে 'ক্রিয়েমহিল্‌ডের কাহিনী' এই শিরোনামা দেওয়া হয়েছে।

নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েটের মোট তিনটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, এবং বলাই বাহুল্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনটির মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি হচ্ছে Hohenems-Munich পাণ্ডুলিপি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে St. Gallen পাণ্ডুলিপি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে Hohenems-Lassberg পাণ্ডুলিপি। লাখ্‌মান্‌ (Lachmann), যিনি প্রথমটির সম্পাদনা করেছেন, মনে করেন যে প্রথম পাণ্ডুলিপিটিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে হোল্‌ৎসমান্‌ (Holtzmann) এবং ৎসার্নকে (Zarncke) তৃতীয়টির উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরবর্তীকালে কিন্তু দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটিরই গুরুত্ব বেড়েছে যেটির সম্পাদনা করেছেন কার্ল বার্টশ (Karl Bartsch)।

বহু পুরাতন টিউটন ভাবধারা বহনকারী বর্তমান মহাকাব্যটি বিভিন্ন কাহিনীর সংমিশ্রণ। এই কাহিনীগুলিকে পৃথক করার দুর্লভ কৃতিত্ব হচ্ছে আণ্ড্রেয়াস হয়েস্‌লের (Andreas Heusler)-এর যিনি প্রতিটি কাহিনীর বিভিন্ন উৎস প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্য থেকে আবিষ্কার করেছেন। কার্ল লাখ্‌মান্‌-ও দেখিয়েছেন যে বর্তমান আকারের নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েটে ছোট বড় মিলিয়ে অন্যূন কুড়িটি বিভিন্ন যুগের কাহিনী সংমিশ্রিত হয়ে আছে। নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েটের অন্যতমা নায়িকা ব্রুনহিল্‌ডের কাহিনী স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যের আদিগ্রন্থরূপে বিবেচিত এড্‌ডা (*Edda*)-য়ে, এবং ওই সাহিত্যেরই আইসল্যাণ্ডীয় শাখার ফোলসুঙ্গ-সাগা (*Volsung-saga*)-য় উল্লিখিত। নায়ক সিয়েগফ্রিটের দুটি বিশেষ ধরনের বীরত্বকাহিনী—ড্রাগনবধ ও সম্পদলাভ—যা মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে বর্ণিত হয়েছে, এড্‌ডা-য় উল্লিখিত, এবং নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েটের দ্বিতীয়ার্ধ, নিঃসন্দেহে এড্‌ডা সাহিত্যের অন্তর্গত *Atlakvida* (অ্যাটিলার কাহিনী) অধ্যায়টি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এ ছাড়া ১১৩১ খ্রীষ্টাব্দে Saxo Grammaticus রচিত *Gesta Danorum* নামক ল্যাটিন গ্রন্থেও নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েটের অন্তর্গত ক্রিয়েমহিল্‌ড প্রসঙ্গ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আমরা নিবেলুঙেনলিয়েটের মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। প্রথম এবং দ্বিতীয় সর্গে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নায়িকার নাম ক্রিয়েমহিল্ড যার সৌন্দর্যের খ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত। সে বার্গাণ্ডীয় বংশের রাজকুমারী, এবং তার ভ্রাতা ওর্মসের রাজা গান্থারের তত্ত্বাবধানে বাস করে। নায়ক সিয়েগফ্রিট দক্ষিণ রাইন অঞ্চলের একজন রাজকুমার, যার রূপ ও বীরত্বের খ্যাতি পর্যাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ থেকেই কাহিনীর বিস্তারের সূত্রপাত। ক্রিয়েমহিল্ডের রূপগুণের খ্যাতি সিয়েগফ্রিটের কর্ণগোচর হবার পর থেকে সে তাকে লাভ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে এবং তার পিতামাতার নিষেধ অমান্য করেই সে ওর্মসে হাজির হয়। ওর্মসের রাজা গান্থারের মন্ত্রণাদাতা হ্যাগেন, যে এই কাহিনীর খলনায়ক, সিয়েগফ্রিটকে দেখামাত্রই চিনতে পারে, যদিও সে পূর্বে তাকে কখনো দেখেনি। সে তখন রাজা গান্থারের নিকট সিয়েগফ্রিটের অতীতের বীরত্বপূর্ণ কার্য কলাপের চিত্র এমন ভাবে তুলে ধরে, যা রাজা গান্থারকে উত্তেজিত করে তোলবার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। ফলে পরিস্থিতি এমন একটা আকস্মিক মোড় নেয় যে সিয়েগফ্রিট সোজাসুজি গান্থারকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে।

শেষ পর্যন্ত হ্যাগেনের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের একটা আপোস হয়, এবং সিয়েগফ্রিট রাজা গান্থারের রাজসভাতেই বাস করতে থাকে। রাজা গান্থারও সিয়েগফ্রিটকে এই ভেবে খাতির করতে শুরু করে যে ভবিষ্যতে সিয়েগফ্রিটের শক্তি, বীরত্ব ও সাহস তার কাজে লাগবে। রাজার প্রতি হ্যাগেনেরও এই ছিল সুচিন্তিত নির্দেশ। বস্তুত সিয়েগফ্রিটকে কাজে লাগাবার একটা সুযোগও এসে যায়। ডেন ও স্যাক্সনরা আচম্বিতে ওর্মস আক্রমণ করে। এই বিপদে রাজা গান্থার হ্যাগেনের পরামর্শমত সিয়েগফ্রিটের সাহায্য চায়। সিয়েগফ্রিট সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে শত্রুদের পরাস্ত ও নির্মূল করে। অতঃপর রাজা গান্থারের রাজসভাতে সিয়েগফ্রিটের খাতির অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সিয়েগফ্রিট, তার মনের বাসনা, অর্থাৎ রাজা গান্থারের ভগ্নী ক্রিয়েমহিল্ডকে পত্নীরূপে পাবার বাসনা কারো কাছে প্রকাশ করেনি।

ইতিমধ্যে আর একটি নূতন পরিস্থিতির উদয় হয়। ইজেনস্টেইন নামক স্থানে ব্রুনহিল্ড নামক এক রাজকন্যা বাস করত যার রূপ ও দৈহিক শক্তি উভয়েরই খ্যাতি ছিল। ব্রুনহিল্ডের প্রতিজ্ঞা ছিল তাকে যে যুদ্ধে পরাস্ত

করতে পারবে তার গলায় সে মালা দেবে। ইতিমধ্যে অনেকেই ব্রুনহিল্ডের পাণি-প্রার্থনা করতে গিয়ে পরাস্ত হয়েছিল। রাজা গাম্থার ভাবল যে যদি সিয়েগফ্রিটের সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে সে ব্রুনহিল্ডকে বিবাহ করতে পারবে। সিয়েগফ্রিটের কাছে গাম্থার তার এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে সিয়েগফ্রিট তাকে সাহায্য করতে রাজি হয় এই শর্তে যে যদি রাজা গাম্থার ব্রুনহিল্ডকে বিবাহ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার সঙ্গেও ক্রিয়েমহিল্ডের বিবাহ দিতে হবে। রাজা গাম্থার এই প্রস্তাবে রাজি হয়।

অতঃপর তারা সদলবলে ব্রুনহিল্ডের রাজ্যে যাত্রা করে। সর্বাগ্রে রাজা গাম্থার এবং তারপর সিয়েগফ্রিট। ব্রুনহিল্ড দূর থেকে দেখেই সিয়েগফ্রিটকে পছন্দ করল। তারা ব্রুনহিল্ডের দুর্গে উপনীত হলে ব্রুনহিল্ড সিয়েগফ্রিটের সঙ্গেই কথাবার্তা বলল গাম্থারকে উপেক্ষা করে। সিয়েগফ্রিট জানালো যে রাজা গাম্থারই তার পাণিপ্রার্থী, এবং সে নিজে রাজার একজন অধীনস্থ প্রজা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রুনহিল্ডের কাছে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হল কারণ সিয়েগফ্রিটের চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল যেন সে জগতের সম্রাট হবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। যাই হোক শর্তানুযায়ী ব্রুনহিল্ডের সঙ্গে রাজা গাম্থারের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যবস্থা হল। বর্শা হাতে প্রস্তুত ব্রুনহিল্ডকে দেখেই রাজা গাম্থার প্রমাদ গণল। বিশেষ শক্তি বলে অদৃশ্য হয়ে সিয়েগফ্রিট রাজার পাশে রইল, এবং বস্তুত তার শক্তিতেই শেষ পর্যন্ত রাজা গাম্থার ব্রুনহিল্ডকে পরাস্ত করতে সমর্থ হল। এরপর চুক্তি অনুযায়ী ব্রুনহিল্ডের সঙ্গে রাজা গাম্থারের বিবাহ হল, এবং সিয়েগফ্রিটের সঙ্গেও গাম্থারের ভগিনী ক্রিয়েমহিল্ডের বিবাহ সম্পন্ন হল।

ব্রুনহিল্ড কিন্তু সিয়েগফ্রিট ও ক্রিয়েমহিল্ডের বিবাহ ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখেনি। সিয়েগফ্রিটকে দেখে সে মনে মনে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যচক্রে তাকে না পাওয়ার বেদনাবোধটা তার মনে খুব তীব্র ভাবে দেখা দিয়েছিল। যে ঘটনাগুলি তার জীবনে অতি দ্রুত ঘটে গেল তার পিছনে কোন একটি রহস্য আছে এটা সে অনুধাবন করতে পেরেছিল। একদা একটি ভোজ সভায় সে এই সন্দেহের কথা প্রকাশই করে ফেলল। রাজা গাম্থার কেন একজন তার প্রজার সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহ দিয়েছে এই প্রশ্ন সে তুলে বসল। ফলে ভোজসভার মধ্যে ক্রিয়েমহিল্ডের সঙ্গে ব্রুনহিল্ডের তুমুল বিবাদ শুরু হল, এবং এই বিবাদের কালেই প্রকাশ হয়ে পড়ল যে গাম্থার নিজ শক্তিতে

ক্রনহিল্ডকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করেনি, সিয়েগফ্রিট অদৃশ্যভাবে তাকে সাহায্য করেছিল।

এর ফলে ক্রনহিল্ডের মানসিক প্রতিক্রিয়া সকলের উপরই অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠল, এবং সে সিয়েগফ্রিটের উপর সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। পঞ্চম সর্গে দেখা যায় হ্যাগেন চরিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে। হ্যাগেন এই বিবাদে ক্রনহিল্ডের পক্ষ গোপনে অবলম্বন করে, এবং ক্রনহিল্ডও সিয়েগফ্রিটকে হত্যার জন্য গান্থারকে উত্তেজিত করে। একদা সুযোগও এসে যায়। দল বেঁধে সকলে একদিন শিকারে যায়। সারাদিন শিকার করে ক্লান্ত হয়ে যখন সিয়েগফ্রিট বিশ্রাম করছিল, হ্যাগেন পিছন থেকে এসে অতর্কিতে তাকে বর্শাবিদ্ধ করে, এবং তৎক্ষণাৎ সিয়েগফ্রিটের মৃত্যু ঘটে। কাহিনীটির একটি ভিন্ন পাঠ অনুযায়ী হ্যাগেন এই আঘাতটি করে যখন সিয়েগফ্রিট তার দিকে পিছু ফিরে একটি ঝর্ণা থেকে জলপান করছিল।

ষষ্ঠ সর্গ থেকে মূল কাহিনীতে ক্রনহিল্ড অনুপস্থিত। এই সর্গটি শুরু হচ্ছে ক্রিয়েমহিল্ডের বিলাপ ও সিয়েগফ্রিটের সমাধিকে কেন্দ্র করে। ক্রিয়েমহিল্ড এরপর থেকে কোনদিন হ্যাগেনকে ক্ষমা করতে পারেনি। তার সর্বক্ষণের চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কিভাবে হ্যাগেনকে হত্যা করে সিয়েগফ্রিড হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া যায়। ক্রিয়েমহিল্ড এটাও জানতো যে সিয়েগফ্রিটকে হত্যার চক্রান্তের সঙ্গে তার ভাই গান্থারেরও যোগাযোগ ছিল। সিয়েগফ্রিটের বিপুল ধন-সম্পদও তার কাছে গচ্ছিত ছিল। কিন্তু হ্যাগেন তা অপহরণ করে রাইনের জলে ডুবিয়ে রেখেছিল।

নিবেলুঙ্গেনলিয়েট্ মহাকাব্যের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ণিত হয়েছে ক্রিয়েমহিল্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী। এই কাহিনীর সূত্রপাত হচ্ছে হূণরাজ এটজেলকে দিয়ে। বিপত্নীক হবার পর হূণরাজ এটজেল দ্বিতীয়বার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ক্রিয়েমহিল্ডকে সে বিশেষভাবে পছন্দ করে। ক্রিয়েমহিল্ড সিয়েগফ্রিট হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হতে পারে এই ভেবে এই বিবাহে সম্মতি দেয়, যদিও হ্যাগেন রাজা গান্থারকে এ বিষয়ে সাবধান করে দেয়। বিবাহের পর ক্রিয়েমহিল্ডের অনুপ্রেরণায় এটজেল বার্গাণ্ডীয়দের তার রাজসভায় আমন্ত্রণ জানায়। গান্থার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, কিন্তু হ্যাগেনের মন্ত্রণায় তারা সকলে সশস্ত্র হয়ে যায়। রাজা এটজেল চায়নি যে এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তার দুর্গে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটুক। কিন্তু

ক্রিয়েমহিল্ড অর্থের লোভ দেখিয়ে কিছু যোদ্ধাকে হস্তগত করে রাখে। এছাড়া বের্ণের অধিপতি ডিয়েট্রিখও এটজেলের রাজসভায় সদলে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। ক্রিয়েমহিল্ড তারও সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়।

ভোজসভায় ক্রিয়েমহিল্ডের পুত্রকে উপলক্ষ করে বচসা বেধে ওঠে, এবং ক্রিয়েমহিল্ডের নির্দেশে প্রাসাদের বৃহৎ দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপরই শুরু হয় যুদ্ধ। বার্গাণ্ডীয়রা একে একে সকলেই নিহত হয়। সর্বশেষে মারা যায় গান্থার। ডিয়েট্রিখ হ্যাগেনকে বেঁধে এনে ক্রিয়েমহিল্ডের সামনে ফেলে দেয়। তার সামনে খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে ক্রিয়েমহিল্ড তার কাছ থেকে জানতে চায় তার সম্পদ সে কোথায় রেখেছে। হ্যাগেন তা জানাতে অস্বীকার করলে ক্রিয়েমহিল্ড তলোয়ারের এক কোপে তার মুণ্ডটি নামিয়ে দেয়। এভাবেই সিয়েগফ্রিটের মৃত্যুর নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

ক্রিয়েমহিল্ড কিন্তু এরপরে বেঁচে থাকেনি। ক্রিয়েমহিল্ড যখন হ্যাগেনকে হত্যা করে, সেই দৃশ্য দেখে বিভ্রান্ত হয়ে হিলডেব্রাণ্ড নামক ডিয়েট্রিখের এক বৃদ্ধ সৈনিক তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের কাহিনীর সমাপ্তি এখানেই—*Das ist der Nibelunge Not*।

টিউটন ভাষাগোষ্ঠীর ট্রাইবরা যখন পশ্চিম ইউরোপ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করছিল, নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের কাহিনীর সূত্রপাত বোধ হয় তখন থেকেই। ইতিহাস অনুযায়ী ওর্মসের বার্গাণ্ডীয় রাজত্ব ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হূণগন কর্তৃক ধ্বংস হয়েছিল। ক্রিয়েমহিল্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী সম্ভবত উক্ত ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। সিয়েগফ্রিট ও ব্রুনহিল্ডের কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবত ফ্রাঙ্কদের মধ্য থেকে হয়েছে। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কদের মেরোভিঞ্জিয়ান গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই এর উদ্ভব বলে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন। ওই গোষ্ঠীর এক রাজকুমারীর নাম *Bruniohildis*। এ ছাড়া ব্রুনহিল্ড নামটিও ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও রাইন অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত।

নিবেলুঙ্গেন্লিয়েট্ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি যেখানে এই মহাকাব্যে বর্ণিত কাহিনীর কোন কোন অংশ পরিবর্তিত অথবা পল্লবিত আকারে স্থান পেয়েছে। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত *Das Lied vom Hurnen Syefrid*-এও সিয়েগফ্রিটের কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া *Daurel e Beton* নামক মহাকাব্যেও নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের কাহিনীর কিছু অংশ

পরিবর্তিতরূপে বর্তমান। ত্রয়োদশ শতকে রচিত *Thidrek Saga*-তেও সিয়েগফ্রিটের বাল্যজীবন বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েট্ মহাকাব্যের আসল উৎস এড্‌ডা গ্রন্থদ্বয় এবং ফোলসুঙ্গ সাগা। এখানে উল্লিখিত কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভিন্ন বর্তমান আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। এই উভয় ক্ষেত্রে নায়কের নাম সিয়েগফ্রিট নয়, সিগুর্ট। এই সিগুর্ট বাল্যকালে রেগিন নামক এক ব্যক্তির নিকট পালিত হয়। রেগিনের প্ররোচনায় সিগুর্ট ফাফ্‌নার নামক একটি ড্রাগনকে হত্যা করে তার বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়। মৃত্যুকালে দানব ফাফ্‌নার সিগুর্টকে জানায় যে রেগিন তার ভাই এবং তার সম্পদের লোভেই রেগিন সিগুর্টকে দিয়ে তাকে হত্যা করিয়েছে। রেগিন সিগুর্টকেও প্রবঞ্চিত করবে। এ ছাড়া সে মৃত্যুকালে তার সম্পদের প্রতি এই অভিসম্পাত দিয়ে যায় যে ওই সম্পদ কারো ভোগে লাগবেনা।

ড্রাগনকে হত্যা করে ফিরে আসার পরই রেগিন তার কাছ থেকে ওই সম্পদ দাবি করে বসল। এই বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হল, এবং শেষ পর্যন্ত রেগিন সিগুর্টকে আক্রমণ করে বসল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে রেগিন নিহত হল। এরপর একটি গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করবার সময় সিগুর্ট শুনতে পেল দুটি পাখি তার সম্পর্কেই কথা বলছে। কৌতূহলী হয়ে সে জানতে পারল যে ফ্রাঙ্কদের দেশে ব্রাইনহিল্‌ড (নিবেলুঙ্গেন্‌লিয়েটের ক্রনহিল্‌ড) নামক একটি রাজকন্যা দীর্ঘকাল ধরে নিদ্রিত অবস্থায় আছে, এবং তাকে জাগাবে সিগুর্ট। কালবিলম্ব না করে সিগুর্ট ব্রাইনহিল্‌ডের দেশে উপস্থিত হল, এবং বলাই বাহুল্য তার হাতের ছোঁয়ায় রাজকন্যার ঘুম ভাঙল। উভয় উভয়কে ভালবাসল, এবং সিগুর্ট প্রতিজ্ঞা করল যে সে ব্রাইনহিল্‌ডের কাছে ফিরে আসবে।

এরপর সিগুর্ট গুইকি রাজ্যে গেল। সেখানকার রানী যাদুশক্তিসম্পন্না ছিল। তার ইচ্ছা হল নিজকন্যা গুডরুনের সঙ্গে সে সিগুর্টের বিবাহ দেবে। সে মন্ত্রবলে জেনে নিয়েছিল যে সিগুর্টের মন পড়ে আছে ব্রাইনহিল্‌ডের প্রতি। সে একটি যাদুশক্তিসম্পন্ন পানীয়ের দ্বারা সিগুর্টের মন থেকে ব্রাইনহিল্‌ডের চেতনা লোপ করে দিল। তারপর গুডরুণের সঙ্গে সিগুর্টের বিবাহ হয়ে গেল। এদিকে ঘটনাচক্রে গুডরুণের ভাই গুন্নারের সঙ্গে ব্রাইনহিল্‌ডের বিবাহ হল। কিন্তু ব্রাইনহিল্‌ডের মনে শান্তি ছিল না, কেননা সে জানত যে তার কথা ঔষধ প্রয়োগে সিগুর্টের মন থেকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সিগুর্টের অস্তিত্ব তার কাছে অসহ্য মনে হত। গুডরুণের সৌভাগ্যে সে অত্যন্ত জ্বালা

বোধ করত। অবশেষে সে একদিন এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে গুন্নারকে সিগুর্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল, যার পরিণামে গুন্নার সিগুর্টের নিদ্রিতাবস্থায় তাকে হত্যা করল। কিন্তু ব্রাইনহিল্ড দেখল যে এতেও তার সমস্যার সমাধান হল না। তাই সে সিগুর্টের চিতায় নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দিল।

সিগুর্টের মৃত্যুর পর গুডরুণ হুণরাজ আটলি-কে (অ্যাটিলা) বিবাহ করল। সিগুর্ট অর্জিত ফাফ্নার ড্রাগনের ধনসম্পদের উপর আটলির লোভ ছিল। সেই ধনসম্পদ গুন্নারের কাছে আছে এই কথা জানিয়ে আটলিকে সে এই বলে প্ররোচিত করল যে গুন্নারকে সদলে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসে হত্যা করলেই সেই সম্পদ আটলির হাতে আসবে। নিমন্ত্রিত হয়ে গুন্নার সদলে এল, এবং তার পরেই ভোজসভায় শুরু হল নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গুন্নারের রক্তে সিগুর্ট হত্যার ঋণ পরিশোধ করা হল, এবং পরিশেষে সুযোগ বুঝে গুডরুণ হুণরাজ আটলিকেও হত্যা করল।

এড্ডা এবং ফোলসুঙ্গ-সাগায় বর্ণিত উক্ত কাহিনীটির সঙ্গে নিবেলুঙ্গেনলিয়েটের কাহিনীর ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকলেও দুটি কাহিনীর সাদৃশ্য এতবেশি যে একটি অপরটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ সিদ্ধান্ত না করলে চলে না। সিগুর্টের স্থলে সিয়েগ্ফ্রিট, ব্রাইনহিল্ডের স্থলে ব্রুনহিল্ড, গুডরুণের স্থলে ক্রিয়েমহিল্ড, গুন্নারের স্থলে গান্থার এবং আটলির স্থলে এটজেলকে বসিয়ে নিলেই, এড্ডা-বর্ণিত কাহিনীকে নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটে রূপান্তরিত করা মোটেই কষ্টকর নয়। আর তাছাড়া গান্থারের রাজসভায় সিয়েগফ্রিটের সম্পদলাভের যে কাহিনী হাগেন বর্ণনা করেছিল, তা আসলে সিগুর্টের ফাফ্নার-ড্রাগন বধ ও রেগিন বধের কাহিনী। সিয়েগফ্রিটের কাহিনীর উপর আরও দুটি টিউটনীয় কাহিনীর প্রভাব আছে, একটি স্বিপডাগের কাহিনীর অপরটি বেওয়াল্ফ-এর।[১] স্বিপডাগের কাহিনীও নায়কের বীরত্ব ও ব্যর্থতার ইতিহাস।

১। Karl Bartsch সম্পাদিত সংস্করণটিই (১৮৭০) বর্তমানে প্রামাণ্য হিসাবে স্বীকৃত যার একটি সটীক সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেছেন বুর (H. D. Boor, ১৯২৬)। নিবেলুঙ্গেন্লিয়েট্‌ চর্চার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে আবেলিং (T. Abeling) রচিত *Das Nibelungenlied und seine literatur* (১৯০৭ এবং পরিশিষ্ট ১৯০৯) এবং M. Thorp রচিত *The Study of the Nibelungenlied* (১৯৪০) গ্রন্থদ্বয়ে। ইংরাজী অনুবাদ: M. Armour (Everyman's Library ১৯০৮)।

৪। টিউটন বনাম কেল্ট : ইংরাজী সাহিত্যের সূচনা

কিছুকাল আগে পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের বাঘা বাঘা ঐতিহাসিকগণ মনে করতেন যে অ্যাংলো-স্যাক্সন ও ফ্রাংকো-নর্মান এই দুই সংস্কৃতির সমন্বয় যবে থেকে ইংলণ্ডের মাটিতে ঘটতে শুরু করেছিল তখন থেকেই ইংরাজী সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে, এবং চসারই (চতুর্দশ শতক) হচ্ছেন ইংরাজী সাহিত্যের জনক। এখনকার ইংরাজ পণ্ডিতরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকেই ইংরাজী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন এবং কবি সীড্‌মন এবং বেওয়াল্‌ফের অজ্ঞাতনামা লেখককেই তাঁদের প্রথম কবি হিসাবে গণ্য করেন। তাঁরা আরও পিছিয়ে যেতে রাজি আছেন, যদি অবশ্য কোন সূত্র পান। বিষয়টির মধ্যে কিছু রহস্য আছে যা ব্যাখ্যা করার দরকার।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়ম হেস্টিংসের যুদ্ধে হ্যারল্ডকে পরাজিত করে ইংলণ্ডে নর্মান (ফরাসী) শাসনের প্রবর্তন করেন। নর্মান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ সপ্তম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন জাতি সমবায়ে ইংলণ্ডে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাকে বলা হয় অ্যাংলো-স্যাক্সন সংস্কৃতি। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে টিউটন ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা হূণদের তাড়া খেয়ে এল্‌ব্‌ ও ওডার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং ডেনীয় উপকূলে পালিয়ে আসে। সেখান থেকে তারা গ্রেট বৃটেনের পূর্বাঞ্চলে অভিযান করে এবং দুশো বছর ধরে ইংলণ্ডকে পদানত রাখে। কালক্রমে এই আগন্তুক জাতিগুলি বৃটেনের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়, এবং সামগ্রিক ভাবে তারা যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করে তা অ্যাংলো-স্যাক্সন সংস্কৃতি নামে খ্যাত।

কিন্তু এই অ্যাংলো-স্যাক্সন সংস্কৃতিই বৃটেনের আদি সংস্কৃতি নয়, কেননা টিউটনদের আসার আগেও ইংলণ্ডে মানুষ ছিল, যারা ছিল কেল্টীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত এবং যারা সুপ্রাচীন কালে আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে গ্রেট বৃটেনে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এদেরই একটি শাখা ছিল গেলীয় বা আইরিশ এবং অপর একটি শাখা ছিল বৃটন যাদের নাম থেকে বৃটেনের নামকরণ হয়েছে। এ ছাড়া ওয়েলস্‌, কর্ণোয়াল অঞ্চল এবং মান-দ্বীপ কেল্টীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। ইংরাজী সাহিত্যের বিকাশের মূলে এই কেল্টীয় ধারার প্রভাব বড় কম নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইংরাজী সাহিত্যের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ তাঁদের কেল্টীয় উত্তরাধিকারের উপর ততটা গুরুত্ব দেননি যতটা দিয়েছেন জার্মান বা টিউটনীয় উত্তরাধিকারের উপর। এ কারণ দুটি। প্রথম, ইংরাজেরা বরাবরই

আয়র্ল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্ বাসীদের কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত, এবং দ্বিতীয়, কেল্টীয়দের সঙ্গে ইংরাজদের রক্তের গভীর সম্পর্ক থাকলেও কেল্টীয় সংস্কৃতির চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার ঘটেছে ফরাসী সাহিত্যে। আর্থার ও অপরাপর কেল্টীয় কাহিনীচক্র সমূহ, আমরা পরে দেখব, ইংরাজী সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ফরাসী সূত্র থেকে।

নর্মান আক্রমণের আগেই অ্যাংলো স্যাক্সনদের হাতে ইংরাজদের জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, এই কথাটা ইংরাজী সাহিত্যের আদি ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করলেও অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখতে তাঁরা সঙ্গতভাবেই রাজি ছিলেন না। কিন্তু পরে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল একটি শক্তিমান জাতি হিসাবে জার্মানদের গড়ে ওঠার ফলে। জার্মানরা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় তারা কারোর চেয়ে খাটো নয়, এবং যারা শেক্সপীয়ার ও মিল্টনের জন্ম দিয়েছে সেই জাতি আসলে টিউটন বা জার্মান বংশোদ্ভূত। জার্মানদের উন্নতি এবং পারদর্শিতা লক্ষ্য করে এবং কতকটা ফরাসী বিদ্বেষের বশে, ইংরাজরা জার্মানদের সঙ্গেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে চাইল। এই প্রবণতা কোলরিজ, ডি কোয়েন্সি এবং কার্লাইলের রচনা সমূহের মধ্যে প্রকট, এবং এই প্রবণতাই শেষ পর্যন্ত অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্যকে জাতে তুলে ইংরাজী সাহিত্যের পরিধির অঙ্গীভূত করে নিল এবং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হল যে প্রাক্-খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাহিত্যিক উত্তরাধিকার জার্মানী এবং অপরাপর দেশের মত ইংলণ্ডেরও আছে।

ইংরাজী সাহিত্যের ভিত্তি গঠনে তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে কেল্টীয় যা কিছুটা উপেক্ষিত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অ্যাংলো-স্যাক্সন যা প্রথমে উপেক্ষিত কিন্তু পরে প্রবলীকৃত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ফ্রাঙ্কো-নর্মান যার সূত্রপাত হয়েছে নর্মান বিজয়ের পর। অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য চারটি প্রধান পাণ্ডুলিপি সংকলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এবং যেগুলির সংকলনকাল আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। এইগুলি হচ্ছে: (১) সীডমন বা জুনিয়াস পাণ্ডুলিপি যা বোডলিয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, বিষয়বস্তু কবি সীডমনের রচনাবলী। (২) কোডেক্স এক্সোনিয়েন্সিস বা এক্সটার বুক যা এক্সটার ক্যাথেড্রাল গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপিটি ওই গ্রন্থাগারে জমা দিয়েছিলেন বিশপ লিওফ্রিক একাদশ শতকে, এবং আশ্চর্যের বিষয়, এই

পাণ্ডুলিপির কথা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যত অজ্ঞাত ছিল। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে কয়েকটি ধর্মমূলক কবিতা, যেগুলি কিছুটা প্যাগান এবং কিছুটা খ্রীষ্টীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, কিছু শাস্ত্রীয় বচন, ইত্যাদি। (৩) ভারসেলি বুক যা উত্তর ইতালীর ভারসেলি গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া গেছে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। এই রচনাগুলি হচ্ছে প্রধানত ধর্মীয় কবিতা ও সাধুজীবনী। (৪) বেওয়াল্ফ কোডেক্স পাণ্ডুলিপি যা বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত (এ/১৫ সংখ্যক) এবং যাতে আছে বেওয়াল্ফ-গাথা সমেত জুডিথ নামক একটি কাব্যগ্রন্থ এবং কয়েকটি খণ্ড কবিতা। এগুলি ছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত আরও কিছু রচনা অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যকে সম্পূর্ণ করেছে।

৫ ॥ বেওয়াল্ফ্

যে বেওয়াল্ফ্ (*Beowulf*) গাথা থেকে ইংরাজী সাহিত্যের উদ্ভব ধরা হয় তা কিন্তু ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনকে প্রতিফলিত করে না। বর্তমানে যে আকারে ও যে বিষয়বস্তুতে বেওয়াল্ফ্ গাথা পাওয়া যায়, মূল কাহিনী কিন্তু তার চেয়ে পুরাতন যার উদ্ভব পদ্য এড্ডার-প্রথমাংশে বর্ণিত বলডারের ও স্বিপডাগের কাহিনী থেকে। টিউটন পুরাণ অনুযায়ী দেবকুলের কলংক লোকির চক্রান্তে দেবতা বলডারের অকালমৃত্যুর সংবাদ শুনে দেবরাজ ওডিন জানতে চেয়েছিলেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ কে নেবে। প্রতিশোধ নিয়েছিল ওডিনের পুত্র বো অথবা বাও, যার জন্ম হয়েছিল রিণ্ডার গর্ভে। এই বাও একটি নেকড়েবাঘ (উল্ফ্, ওয়াল্ফ্) মেরেছিল, যে জন্য তার নাম বাওয়াল্ফ্ (বেওয়াল্ফ্)। এখান থেকেই বেওয়াল্ফ্ কাহিনীসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। কালক্রমে এই পৌরাণিক বেওয়াল্ফ্ই রক্তমাংসের মানুষ বেওয়াল্ফে রূপান্তরিত হয়। আমাদের আলোচ্য বেওয়াল্ফ্ গীটশ দেশের জনৈক সামন্ত।

হ্রোথগার যখন ডেনমার্কের সম্রাট তখন গ্রেণ্ডেল নামক একটি নরভুক রাক্ষস প্রত্যহ রাত্রে রাজসভায় প্রবেশ করে যাকে সামনে পেত তাকেই খেয়ে ফেলত। কোন অস্ত্র দিয়েই তাকে আঘাত করা যেত না। ফলে সম্রাট বড়ই কষ্টে দিনযাপন করছিলেন। এই রাক্ষস হচ্ছে আবেল-হন্তা কেনের জ্ঞাতি। এখানে কোন খ্রীষ্টান অনুলেখক বাইবেলের কাহিনী ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কেন ও আবেল আদম ও ইভের দুই পুত্র, একজন কৃষিজীবী অপরজন পশুপালক।

ডেনমার্কের যখন এই বিপদ তখন তার পরিত্রাতা হয়ে এলেন বেওয়াল্‌ফ্‌, সে যুগের যিনি ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তি। রাক্ষস গ্রেণ্ডেল ও তার মা, দুইজনকেই বেওয়াল্‌ফ্‌ বধ করলেন। সম্রাট হ্রোথগার তাঁকে প্রচুর সম্মান ও উপহারে ভূষিত করলেন। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বেওয়াল্‌ফ্‌ তাঁর সম্রাট হাইগেলাককে প্রাপ্ত সমুদয় উপহার সমর্পণ করলেন। রানী হাইগিডকে তিনি দিলেন একটি সুন্দর পরিচ্ছদ ও তিনটি মূল্যবান অশ্ব। বেওয়াল্‌ফের বীরত্বের কাহিনী শুনে প্রীতিলাভ করে রাজা হাইগেলাক তাঁকে একটি সোনার তরবারি, একটি জমিদারি এবং রাজপুত্রের সমতুল্য মর্যাদা অর্পণ করলেন।

ফ্রিসীয় এবং হুণদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা হাইগেলাক মারা যান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেওয়াল্‌ফ্‌ তাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করতে সক্ষম হন, এবং নাবালক রাজপুত্র হেয়ারড্রেডের রক্ষক হিসাবে কাজ চালিয়ে যান। পরে যখন এই তরুণ রাজপুত্র এয়ানমুণ্ড নামক এক কুচক্রীর হাতে নিহত হয়, বেওয়াল্‌ফ্‌ সেই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এরপর রাণী হাইগিডের অনুরোধে তিনি সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বিবাহ করেন।

পঞ্চাশ বছর বেওয়াল্‌ফ্‌ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে একটি ভয়াল ড্রাগন ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। বৃদ্ধ বেওয়াল্‌ফ্‌ মাত্র বারোজন সঙ্গী নিয়ে এই ড্রাগনকে বধ করতে যান। এদের মধ্যে এগারো জনই ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে, শুধু ডিগ্‌লাফ নামক একজন বরাবর তাঁর সঙ্গে ছিল। একা বেওয়াল্‌ফ্‌ এই ড্রাগনটিকে বধ করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু হয়। সারা দেশের লোকই তাঁর জন্য শোক করেছিল, কেননা তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সাহসী, শক্তিমান, দয়ালু এবং মহানুভব।[১]

৬॥ কেল্টীয় পুরাণ: মাবিনোগিয়ন, ইত্যাদি

কেল্টীয় সংস্কৃতির কিছু পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কেল্টীয় পুরাণ সাহিত্য সুবিস্তৃত এবং তাতে নানা ধারার সমন্বয় হয়েছে। আয়র্ল্যাণ্ড

১। বেওয়াল্‌ফের আধুনিক ইংরাজী অনুবাদ করেছেন ক্লার্ক হল (J. Clark Hall) এবং রেন (C. H. Wrem, ১৯৫০) ও রাইট (D. Wright, ১৯৫৭, ১৯৫৯); পদ্যানুবাদ: বোন্‌ (G. Bone ১৯৪৫) এবং মর্গান (E. Morgan ১৯৫২); উনিশ শতকের অনুবাদ: J. Earle (১৮৯২) J. M. Garnett (পদ্যানুবাদ ১৮৮৩), W. Morris এবং A. J. Wyalt (১৮৯৮); দ্রঃ R. W. Chambers, *Beowulf: An Introduction to the Study of the Poem* (১৯২১)।

অঞ্চলের গেলীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী আদিতে তিনটি দেববংশ পরপর রাজত্ব করেছিল। প্রথম দুটির নাম যথাক্রমে পার্থোলন এবং নেমেদ, যারা সম্ভবত প্রাক্-কেল্ট ঐতিহ্যের, এবং তৃতীয়টির নাম তুয়াহ্-দায়ে-দোনান, অর্থাৎ দেবী দনুর বংশ যাতে দুয়াদা, দগ্‌দা, ব্রিজিৎ, এঙ্গাস, মিদার, ওগ্‌মা, বদব্ প্রভৃতি বিখ্যাত দেবতারা জন্মেছিলেন। দেবী দনুর প্রতিদ্বন্দ্বিনী আরও একজন মাতৃদেবী ছিলেন দমনু যাঁর গর্ভে ফোমর অর্থাৎ দৈত্যরা জন্মেছিল, যাদের মধ্যে প্রধান ছিল একচক্ষু বালোর, ইণ্ডেখ, এলাথান, ব্রেস প্রভৃতি। গেলীয় পুরাণ এই দেবাসুর যুদ্ধের ইতিহাস যেখানে সূর্যদেবতা লুঘের নেতৃত্বে দৈত্যরা নির্মূল হয়ে যায়। এই দেবকাহিনী ছাড়া কেল্টীয় পুরাণের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে কুচুলাইন-কাহিনীচক্র, যার বিষয়বস্তু নায়ক কুচুলাইনের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ এবং অন্তিম ব্যর্থতা। তাঁর চরিত্র এবং কাহিনীগুলি হেরাক্লেস, সিগুর্ট, সিয়েগফ্রিট্, বেওয়াল্ফ্ প্রভৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কুচুলাইন-চক্র ছাড়া আছে ফিন ও ফেনীয়গণের কাহিনী। স্বর্গের দেবরাজ পদ নিয়ে দেবগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে দেবতা মিদার ফিন-ম্যাক-কাউল নামক একজন বীর মানুষের সাহায্যে জয়ী হন। এই ফিন ও তাঁর বংশধরদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ নিয়ে ফেনীয় কাহিনীচক্র গড়ে উঠেছিল। এই ফেনীয়দেরই একজন, যাঁর নাম ওসিয়ান, তাঁকে নিয়ে আরও একটি কাহিনীচক্র গড়ে ওঠে, যাতে প্যাগান ঐতিহ্যের এই বীরকে খ্রীষ্টীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। বৃটেন অঞ্চলের প্রচলিত পুরাণে তিনটি দেববংশের পরিচয় আছে—আদি মাতৃদেবী ডনের বংশ, তাঁর পুত্র আকাশের দেবতা লুডের বংশ এবং সমুদ্রদেবতা লিরের বংশ। লুডের পুত্র ইংলণ্ডের বর্তমান সেণ্ট পল গীর্জাটি পূর্বে লুডের মন্দির ছিল) গুইনকে নিয়ে পৃথক কাহিনীচক্র রচিত হয়েছে। দেবতা লিরের যে নির্বুদ্ধিতার কাহিনীচক্র জিওফ্রে বর্ণনা করেছেন তা অবলম্বনেই শেক্সপীয়ার কিং-লিয়ার নাটকটি রচনা করেন। লিসেস্টারের (লির-সেস্টার) নদীতটে দেবতা লিরের জনশ্রুতি-কথিত সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজা আর্থারের কাহিনীচক্র গেলীয় ও বৃটিশ উভয় পুরাণেই বর্তমান, যা আমরা একটি পৃথক্ অনুচ্ছেদে আলোচনা করব।[১]

১। কুচুলাইন সংক্রান্ত কাহিনীগুলির রচনাকাল সপ্তম থেকে একাদশ শতক, প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রন্থ হচ্ছে *Tain Bo Cuailgne*; লিরের কাহিনীচক্র নিয়ে লেখা হয়েছিল *Oidheadh Cloinne*; এছাড়া উল্লেখযোগ্য *Scel Mucce Mic Da Tho* (ম্যাক দ' থোর শূকর), *Imram*

ওয়েলসের পশ্চিমাঞ্চলে সাইভারওয়াইডেড্ (Cyvarwyddyed) নামক মৌখিক রচনার একটি ট্রাডিশন গড়ে উঠেছিল। এই সব মৌখিক রচনাগুলিই কালক্রমে মাবিনোগিয়ন (*Mabinogion*) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মাবিনোগিয়নের রচনাকাল একাদশ থেকে চতুর্দশ শতক, সঙ্কলকদের নাম অজ্ঞাত। এতে মোট এগারোটি কাহিনী আছে, যে-গুলির মধ্যে পিউইল, ব্রানওয়েন, মানাউইদান এবং মাথ অত্যন্ত প্রাচীন যুগের ঐতিহ্যবাহী। পিউইল ও মানাউইদানের কাহিনী প্রাচীন যাদুবিশ্বাস অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন কৌতুকাবহ ঘটনায় সেগুলি ভরপুর। ব্রানওয়েনের কাহিনীর বিষয়বস্তু একজন ব্যভিচারী ও একজন ব্যভিচারিণীর শাস্তি। এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা হচ্ছে দেবদেবী। মাবিনোগিয়নের অপরাপর কাহিনীগুলির মধ্যে কুলহেচ্ এবং অল্ওয়েন আর্থারীয় কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত, এবং লুনেদ (যা *Lady of the Fountain* নামে বিশেষ পরিচিত) গেরাইন্ত্, পেরেদিওর প্রভৃতি যদিও খুবই পুরাতন যুগের ঐতিহ্যবাহী, মাবিনোগিয়নে যে আকারে সেগুলি উপস্থাপিত হয়েছে, তা কিন্তু ফরাসী সূত্র থেকে নেওয়া।[১]

Brain (ব্রানের সমুদ্রযাত্রা, মাবিনোগিয়ন দ্রঃ), *Tochmare Etaine* (এটায়েনের অভিসার), *Fianna bater : nEmain* (আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় বীরদের বৃত্তান্ত), *Leabhar Gabhale* (বিজয়সমূহের কাহিনী, দেবতাদের যুগ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ইতিহাস), *Danta Gradha* (ছন্দে রচিত পুরাণ, দ্বাদশ শতক), *Agallamh na Seanorach* এবং *Cath Fionntragha* (দেববংশ, ফিন ও ফেনীয়গণ, ওসিয়ানচক্র, ইত্যাদি, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গেলীয় রচনার আদিতম নিদর্শন *Ogham* লিপিতে রচিত কিছু লেখমালা (চতুর্থ-পঞ্চম শতক)। দ্রষ্টব্য A. S. de Blacam, *Gaelic Literature Surveyed* (১৯২৯); K. Jackson, *Early Celtic Nature-Poetry* (১৯৩৫). T. F. O'Rahilly, *Early Irish History and Mythology* (১৯৪৬); R. Fowler, *The Irish Tradition* (১৯৪৭); M. Dillon, *Early Irish Literature* (১৯৪৮)।

১। মাবিনোগিয়নই ওয়েলসীয় গদ্যরচনার আদিতম নিদর্শন নয়। *Competus Fragment* গ্রন্থে রক্ষিত ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জ্যোতির্বিদ্যার উপর চব্বিশ লাইন রচনাকেই আদি ওয়েলসীয় গদ্য হিসাবে ধরা হয়। দ্বাদশ শতকে রচিত হিউয়েলদ্দার আ''নসমূহের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যেগুলি পরে *Black Book of Chirk* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আর্থারীয় কাহিনীগুলি ছাড়াও ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পার্শ্ববর্তী দেশ বৃটেন থেকে মাক্সেন, লুড ও লেভেলিসের কাহিনীগুলি, ল্যাটিন থেকে ইমাগো-মুন্দি (*Delwy Bet*), সাধুজীবনীসমূহ, মনমাউথের 'বৃটনদের ইতিহাস' প্রভৃতি এবং ফরাসী থেকে সাঁজ দ্য রোলাঁ ওয়েলসীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মাবিনোগিয়নের রচনাগুলি বর্তমানে *White Book of Rhyddrech* এবং *Red Book of Hergest* গ্রন্থদ্বয়ে রক্ষিত আছে।

৭ ॥ আর্থারীয় কাহিনীচক্র

কেল্টীয় পুরাণে রাজা আর্থার একটি সমস্তা, একথা পণ্ডিতেরা বলে থাকেন। সম্ভবত আর্থার ছিলেন দুজন, দেবতা আর্থার ও মানুষ আর্থার। এই দুটি চরিত্র একসঙ্গে মিশে গেছে। আর্থারের গোলটেবিল একদিকে যেমন গেলীয় কাহিনীর ফিন ও ফেনীয়দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরদিকে তেমনই গুইডিয়ন সংক্রান্ত বৃটিশ কাহিনীগুলির প্রভাবও আর্থারীয় উপকথাগুলির মধ্যে বিদ্যমান। আর্থার, তাঁর স্ত্রী গুইনহিউভার (গুইনভের) এবং তাঁর ভাগ্নে মেড্রট্ (মোরড্রেড্) প্রভৃতির প্রেমকাহিনীগুলি ফিন, তাঁর স্ত্রী গাইন এবং ভাগ্নে ডায়ারমায়েটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী আর্থারের মৃত্যু হয়নি, তিনি মহাযাত্রা করেছিলেন এভিয়ন দ্বীপের উদ্দেশ্যে। অনুরূপ কাহিনী ফিন ও ফেনীয়দের সম্পর্কেও বিদ্যমান।

আর্থারের গোলটেবিল সম্ভবত কোন দেবাদিদেবকে ঘিরে অপর দেবতাদের চক্রের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। তাঁর নাইটদের কার্যকলাপের সঙ্গে প্রাচীন দেবগণের ক্রিয়াকলাপের মিল পাওয়া যায়। আর্থারচক্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন মিরডিন যিনি পরবর্তী নর্মান-ফ্রেঞ্চ রোমান্সগুলিতে মের্লিন নামে পরিচিত। তাঁর স্ত্রী এলেন ওয়েল্স্ কাহিনীতে সুপরিচিতা। মের্লিন চরিত্রে গেলীয় দেবতা লুঘ এবং বৃটিশ দেবতা লিউ-র প্রভাব আছে। কথিত আছে, মের্লিন শেষজীবনে বন্দী হয়েছিলেন আকাশে। এ থেকেই বোঝা যায়, তিনি সূর্যেরই একটি মানবীয় কল্পনা। আর্থারচক্রের আরও একটি ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন কাই বা সার কে, সম্ভবত যিনি ছিলেন অগ্নির প্রতিরূপ। অপর একজন, যাঁর নাম মার্চ, সম্ভবত ফোমর মোর্কের চরিত্রের অনুকরণে গড়ে উঠেছেন। মার্চের শূকরসম্পদ আর্থার অপহরণ করেছিলেন, যেমন গুইডিয়ন অপহরণ করেছিলেন প্রাইদেরীর শূকরসম্পদ। আর্থারের স্ত্রী গুইনহিউভারের সঙ্গে তাঁর ভাগ্নে মেড্রট্ বা মোরড্রেডের প্রেম পরবর্তী কালের সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। এই নিয়ে উভয়ের যে যুদ্ধ হয় তার ফলে আর্থার মৃতকল্প হয়েছিলেন।

বৃটেনের জাতীয় বীর হিসাবে আর্থারের প্রতিষ্ঠা তাঁর বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের গুণে। বৃটেনের তেরটি মৌলিক সম্পদ উদ্ধার, জাতি ভ্রাতা কুলহুচের বধূপ্রাপ্তি নিয়ে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ, আয়র্ল্যাণ্ড বিজয়, প্রভৃতি কার্য তাঁকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসন দিয়েছে। বৃটেনে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকেরা আর্থার-কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর্থারকে খ্রীষ্টের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে,

এবং হোলি গ্রেল বা খ্রীষ্টের পবিত্র শেষ ভোজনপাত্রের অনুসন্ধান কার্যরূপ একটি কাহিনী আর্থারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাত্র অনুসন্ধানের জন্য আর্থারের নাইট্‌রা অ্যাডভেঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু এই অ্যাডভেঞ্চারের নায়করা—সার পেল্লাস, সার বোরস, সার পার্সিভাল, সার গালাহাড, প্রভৃতি—আসলে পরিবর্তিত-চরিত্র দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

তবে আর্থার চরিত্রে কিছুটা ঐতিহাসিকতাও থাকতে পারে। ইংলণ্ডের যিনি আদি লোকায়ত ঐতিহাসিক সেই জিওফ্রে অফ মনমাউথ তাঁর গ্রন্থের দুটি খণ্ডে আর্থার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে আর্থার আয়র্ল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, গথল্যাণ্ড এবং আরকেনি দখল করেছিলেন, এ ছাড়া নরওয়ে, ডাকিয়া (ডেনমার্ক ?), একুইটাইন ও গলদেশে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। তিনি অ্যাংলো-স্যাক্সন, পিক্ট, ও স্কটদের উপর জয়লাভ করেন। রোম সম্রাটও তাঁর নিকট পরাজিত হন। কিন্তু এরপর জিওফ্রের বর্ণনা পৌরাণিকধর্মী হয়ে গেছে। মরণাপন্ন আহত হয়ে আর্থার যখন এভিয়ন দ্বীপে যাত্রা করেন তখন তাঁর উত্তরাধিকারী হন ক্যাডোরের পুত্র কর্নোয়ালের ডিউক কনস্টান্টাইন। কিন্তু আর্থারের ভাগ্নে মোরড্রেড তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হন, এবং আর্থারের স্ত্রীকে বিবাহ করেন। অবশ্য এর প্রতিশোধ আর্থার নিয়েছিলেন কম্লার যুদ্ধে, যেখানে সকলেই মারা যায়, আর্থারও বাদ যাননি। জিওফ্রে আর্থারকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে স্থান দিয়েছেন।

পরবর্তী কালে গাইমার নামক একজন অ্যাংলো-নর্মান কবি আর্থার-কাহিনীকে ফরাসী কবিতায় রূপান্তরিত করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আর্থার তাঁর বিজয়সমূহের পরে সকল রাজাদের নিয়ে কায়েরলোন শহরে একটি বৈঠক করেন। এই কাহিনীর মধ্যেই বিখ্যাত আর্থার ও গোলটেবিলের কাহিনীচক্রের একটি বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায়। ওয়াল্টার ম্যাপ, যিনি ছিলেন নর্মান্ ও ওয়েল্‌স্ রক্তের সংমিশ্রণ, আর্থারীয় কাহিনী এবং হোলি গ্রেলের কাহিনীকে সমন্বিত করেন। তাঁর রচিত তিনটি কাহিনী—'পবিত্র পাত্রের অনুসন্ধান', 'লান্সেলট' এবং 'আর্থারের মৃত্যু'—অবশ্য তাঁর নিজস্ব নৈতিক মতবাদসমূহের ভিত্তিতে রচিত। ফরাসী সাহিত্যে আর্থারীয় কাহিনীচক্রকে যাঁরা রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—*Joseph d' Arimathe* এবং *Merlin*-এর লেখক

দ্য বোরোঁ এবং ক্রেতিয়ঁ দ্য ত্রোয় যিনি আর্থারীয় কাহিনী অবলম্বনে পাঁচটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। শেষোক্তের 'পার্সিভাল' বা 'হোলি গ্রেলের অনুসন্ধান'-এর বিষয়বস্তু নামেই ব্যক্ত। হোলি গ্রেল বলতে সচরাচর বোঝায় খ্রীষ্ট-ব্যবহৃত শেষ ভোজনপাত্র, কিন্তু আদিতে নিশ্চয়ই তা বোঝাত না।[১]

আর্থারের যে বারোজন নাইটের মধ্যে পাঁচজন এই অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ল্যান্সেলট, পার্সিভাল, গাওয়াইন, বোহোরট এবং গালাহাড, যাঁদের মধ্যে গালাহাডই শেষ পর্যন্ত তা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। পার্সিভালের কাহিনী ক্রেতিয়ঁ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলা যায় না। সূত্র হিসাবে তিনি তাঁর পৃষ্টপোষক ফিলিপ্পি দ্য আল্‌সেসের নাম করেছেন। পার্সিভালের জন্মাবার আগেই তার পিতা নিহত হন, এবং তাঁর মা তাঁকে নির্জন অরণ্যে মানুষ করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্সিভাল রূপে গুণে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন এবং আর্থারের সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর নাইটদের চ্যালেঞ্জ করেন। আর্থারের শত্রু রেড নাইটকে তিনি সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করেন। কিন্তু পার্সিভাল তখনও নাইটত্বে অভিষিক্ত হননি, সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন মাত্র, এবং সেই প্রস্তুতিপর্বে তাঁকে একটা ব্রত মেনে চলতে হত যা হচ্ছে কোন কিছুতে অযথা কৌতূহল প্রকাশ না করা। একদা একটি নির্জন অরণ্যে তিনি একটি খঞ্জ ব্যক্তিকে আবিষ্কার করেন ও তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। খাবার টেবিলে তিনি দেখেন যে সেই খঞ্জ ব্যক্তিটি একটি কোচে অর্ধশায়িত এবং তাঁর চারদিকে একটি অদ্ভুত মিছিল, যার পুরোভাগে একজন স্কোয়ার (শিক্ষানবীশ নাইট) একটি রক্তাক্ত তরবারি সহ, তার পিছনে বাতিদান হাতে কয়েকটি মহিলা, তাদের পিছনে একটি সুন্দরী রমণী যার হাতে একটি উজ্জ্বল ভোজনপাত্র যা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার পিছনে বাতিদান হাতে আরও কয়েকটি মহিলা। কিন্তু অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশের নিষেধ থাকায় পার্সিভাল কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না, যদিও মিছিলটি বারবার যাওয়া আসা করল। পরদিন ওই দুর্গের একজন মহিলা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন যে যদি তিনি এ বিষয়ে কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করতেন তাহলে ওই খঞ্জ দুর্গাধিপতি আরোগ্যলাভ করতেন, এবং দুর্গের এতগুলি মহিলা বিধবা হত না। ওই পাত্রটিই সেই বিখ্যাত হোলি গ্রেল যা বারো বছর ধরে ওই দুর্গে রক্ষিত

১। জার্মান কবি Wolfram Von Eschenbach তাঁর *Parzival*-এ grail-কে একটি পাথররূপে কল্পনা করেছেন যা নিশ্চয়ই কোন পুরাতন বিশ্বাসের স্মারক।

ছিল যা পার্সিভাল পরে শুনেছিলেন এক সাধুর কাছে। পার্সিভাল জীবনে আর ওই দুর্গ খুঁজে পাননি।

হোলি গ্রেলের কাহিনীকে দু বোরোঁ উপস্থাপিত করেছেন অন্যভাবে। ক্রেতিয়ঁর কাহিনীতে যেখানে প্যাগান প্রভাব বেশি, দু বোরোঁ সেখানে খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের উপরেই জোর বেশি দিয়েছেন। তাঁর আরিমাথের জোসেফ এবং মেলিন দুটি রচনাতেই খ্রীষ্টীয় আদর্শের অনুপ্রবেশ খুবই তীব্র। তাঁর কাছে খ্রীষ্টের শেষ ভোজন যা আরিমাথের জোসেফ তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন, এই পাত্রটি সেই ঐতিহ্যবাহী এবং আসলে তা ঈশ্বরের করুণারই প্রতীক। পার্সিভাল তা পাননি তাঁর হটকারী প্রকৃতির জন্য, বোহোরট এবং গাওয়াইন তা পাননি তাঁদের আত্মম্ভরিতা এবং ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের অভাবের জন্য, ল্যান্সেলট তা পাননি তাঁর লাম্পট্যের জন্য, কিন্তু গালাহাড তা পেয়েছিলেন তাঁর চরিত্রের পবিত্রতার জন্য। বীর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পূর্ববর্তীরা নাইটোচিত প্রতিটি সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন না।

ল্যান্সেলটের কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ক্রেতিয়ঁর *Chevalier a la Charette* গ্রন্থে। জিওফ্রের বৃটনদের ইতিহাস বা ওয়েসের রোমাঁ দ্য ব্র'তে বিখ্যাত লান্সেলোৎ দু'লাক (Lancelot of the Lake)-এর কাহিনী একেবারেই অনুপস্থিত। ক্রেতিয়ঁর বক্তব্য অনুযায়ী ল্যান্সেলট ছিলেন বেনোয়ার রাজা বানের পুত্র এবং বিখ্যাত সার গালাহাডের পিতা। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে তাঁর মা জনৈকা পরীর জিম্মায় রেখে দেন, যে তাঁকে একটি অদ্ভুত ধরনের হ্রদের ধারে মানুষ করেছিল যেখানে বাস করত শুধু দশ হাজার কুমারী। সাবালক হবার পর ল্যান্সেলট রাজা আর্থারের সভায় আসেন এবং শীঘ্রই নিজ কৃতিত্বে আর্থারীয় নাইটদের অগ্রগণ্য হন। জাদুকরদের হাত থেকে সুন্দরী গুইনভেরকে উদ্ধার করা তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরবর্তী কালে তাঁর পুত্র গালাহাডের কৃতিত্বে তিনি চাপা পড়ে যান। হোলি গ্রেল অনুসন্ধানের কাহিনীর সঙ্গে তিনিও যুক্ত, কিন্তু তাঁর দ্বারা তা খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। ক্রেতিয়ঁর ল্যান্সেলট-কাহিনী সম্ভবত মেলওয়াসের ভিতা গিল্ডে (*Vita Gildae* থেকে নেওয়া যেখানে গুইনভের উদ্ধারের কাহিনী আছে। আর্থারীয় কাহিনীচক্রের অংশ হলেও ল্যান্সেলটের কাহিনীগুলি স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছে।

সার গাওয়াইনের কাহিনীচক্রের একটি অবলম্বনে চতুর্দশ শতকের ইংরাজীতে

একটি কাব্য রচিত হয়েছিল যার নাম *Sir Gawain and the Green Knight*। রাজা আর্থার যখন তাঁর নাইটদের নিয়ে বড়দিন পালন করছিলেন, গ্রীন নাইট নামক একটি দৈত্য সেখানে কুঠার হাতে প্রবেশ করে তা দিয়ে তার নিজের শিরশ্ছেদ করানোর অনুরোধ করে এই শর্তে যে, যে তার শিরশ্ছেদ করবে, এক বছর পরে তাকে তার হাতে মাথা দিতে হবে। মর্যাদা রক্ষার জন্য সার-গাওয়াইন তার শিরশ্ছেদ করলেন, গ্রীন নাইট তার কাটা মাথাটিকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে বেরিয়ে গেল। পরের বছর সার গাওয়াইন তার দেশে হাজির হলে দৈত্য তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ওই দৈত্যের পত্নী তাঁকে একটি সবুজ সিল্কের উপর সোনা-বসানো মালা উপহার দিল যার গুণে সার গাওয়াইন পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী দৈত্যের কুঠারের সম্মুখীন হয়ে অনাহত রয়ে গেলেন। পরে জানা গেল সমগ্র ব্যাপারটি আর্থার এবং তাঁর অনুগত নাইটদের পরীক্ষা করার জন্য। স্পেন্সারের ফেয়ারী কুইনের একটি কাহিনীর উপর বর্তমান কাব্যটির প্রভাব আছে।

আর্থারীয় কাহিনীচক্র পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যেই স্থান করে নিয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাহিত্যে আর্থার ছাড়াও মের্লিন, পার্সিভাল, এবং হোলি গ্রেলের নানা কিংবদন্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ডাচ সাহিত্যে কোনিঙ্গ আর্তুর বোয়েক রাজা আর্থারের কাহিনী, যে গ্রন্থের লেখকের নাম লোদাভিয়া ফান ফেল্টহেম এবং এই কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে ফরাসী সূত্র থেকে। এছাড়া ডাচ রোমা ফান লাক্লেলোৎ ল্যান্সেলট-কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত, যে গ্রন্থের কেল্টীয় অনুপ্রেরণা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ডাচ সাহিত্যে হোলি গ্রেলের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন ইয়াকোব ফান মায়েৰ্লান্ত। মেৰ্লিনের কাহিনী অবলম্বনে তিনি রচনা করেছিলেন মেরিলিন্সস্ বোয়েক। এটি দ্য বোরোঁর রচনার অনুবাদ, রচনাকাল ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দ। বৃটেনের পৌরাণিক ইতিহাসের পক্ষেও গ্রন্থটি মূল্যবান। জার্মান কবি ভোলফ্রামের পার্সিৎফাল-এর কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া হাইনরিখ ফন টুর্লিন *Diu Krone* (১২২০ খ্রীঃ) নামক একটি কাব্য রচনা করেন যার বিষয়বস্তু গ্রেল অনুসন্ধান, নায়ক গাওয়াইন। ল্যান্সেলট কাহিনীচক্র নিয়ে মধ্য-জার্মান ভাষায় রচিত হয়েছিল লান্‌ৎসেলেট (১১৮৫ খ্রীঃ), রচয়িতা ৎসোটৎসিখোফেন। কেল্টীয় মাবিনোগিয়নের অন্তর্গত

Culhwch and Olwen আর্থারীয় কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত। *Owain and Luned* (*Lady of the Fountain*), *Geraint* এবং *Peredeur*-এর কাহিনীগুলি ক্রেতিয়ঁর *Le Chevalier, Erec* ও *Perceval*-এরও বিষয়বস্তু। ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় লায়ামন নামক জনৈক লেখক ওয়াশ রচিত ব্রুৎ ফরাসী (অ্যাংলো-নর্মান) ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। জিওফ্রের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থে বৃটনদের কথা, কেল্টীয় কাহিনীচক্র, বিশেষ করে আর্থারের কাহিনীসমূহ, বর্ণিত হয়েছে। অনুবাদক লায়ামন ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত, এবং তাঁর অনুবাদ মূলকে বিশ্বস্তভাবেই অনুসরণ করেছে।[১]

৮ ॥ আলেকজাণ্ডার চক্র

ম্যাসিডনীয় দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয়-সাহিত্যে অসংখ্য কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যেই নয়

১। ত্রয়োদশ শতকে পার্সিভাল ও তৎপরবর্তী নাইটদের কাহিনী সম্বলিত *Parlesvaus* ম্যালোরির মারফৎ ইংলণ্ডে আসে। ম্যালোরির নায়ক অবশ্য গালাহাড্। এই প্রসঙ্গে ইংরাজী *Syr Percyvelle of Gallis*-এর কথাও স্মর্তব্য, যা লিংকন ক্যাথেড্রাল লাইব্রেরীর থর্নটন পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে। *Parlesvaus*-এর ইংরাজী অনুবাদ: S. Evans (১৮৯৮, ১৯১০): গালাহাড কাহিনীচক্র: *Queste del Saint Graal*, সম্পাদনা A. Pauphilet (১৯২৩, ১৯৪৯), ইংরাজী অনুবাদ J. L. Weston (১৮৯১) ও M. F. Richey (১৯৩৫): এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য H. O. Sommer, *The Vulgate Version of Arthurian Romances*, আট-খণ্ড ১৯০৯-১৬ এবং E. Vinaver সম্পাদিত *The Works of Thomas Malory* (১৯৪৭); জিওফ্রের মের্লিন, সম্পাদনা J. J. Parry (১৯২৫) ; *La mort de roi Artu*, সম্পাদনা J. Frappier ১৯৩৬, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ নূতন মুদ্রণ ১৯৫৪ ; গাওয়াইন কাহিনীচক্র: *Diu Krone*, সম্পাদনা H. Scholl (১৮৫২), ইংরাজী অনুবাদ J. L. Weston, *Sir Gawain at the Grail Castle* (১৯০৪)। সমগ্র আর্থার কাহিনীচক্রের জন্য R. S. Loomis সম্পাদিত *Arthurian Literature in the Middle Ages* (১৯৫৯) দ্রষ্টব্য। সার্বিক ধারণার জন্য আলফ্রেড নাটের বিখ্যাত *Legends of the Holy Grail*. ব্রুসের (J. D. Bruce) *The Evolution of the Arthurian Romance*, দুই খণ্ড ১৯২৩-২৪ ; J. S. P. Tatlock, *The Legendary History of Britain* (১৯৫০) এবং R. H. Fletcher, *The Arthurian Material in Chronicles* (১৯০৬) দ্রষ্টব্য। দু বোরের *Joseph d' Arimathe* অবলম্বনে ইংরাজীতে একটি কাব্য রচিত হয়েছিল চতুর্দশ শতকে। লায়ামনের *Brut*-এর সম্পাদনা করেছেন F. Madden (১৮৪৭)।

প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যেও। বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনীর নায়কত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে, এমনকি ধর্মীয় ও দার্শনিক আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রেও লেখকেরা আলেকজাণ্ডারের চরিত্রকেই বেছে নিয়েছেন। এখানে একটি হিব্রু আখ্যানের উল্লেখ করা চলতে পারে যেখানে বলা হয়েছে যে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার স্বর্গের দরজা পর্যন্ত হাজির হয়েছিলেন, এবং স্বর্গের যিনি রক্ষক তিনি তাঁকে একটি মানুষের মাথার খুলি উপহার দিয়েছিলেন। জনৈক সাধুর পরামর্শে আলেকজাণ্ডার ওই খুলিটিকে তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত সোনা দিয়ে ওজন করেন, কিন্তু খুলিটি তার চেয়ে ভারী ছিল। রহস্যটি ব্যাখ্যা করে সাধু তাঁকে বলেন, ওই খুলির গর্তগুলি অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়সমূহ মানুষের অন্তহীন বাসনার আকর, কাজেই ভোগ্যবস্তু যতই চাপানো যাক না কেন তা দিয়ে কামনা-বাসনার ওই ওজনকে অতিক্রম করা যাবে না। অতঃপর সাধুর পরামর্শে খুলিটির নাক, কান, চোখ, মুখ, ইত্যাদি মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি রুদ্ধ করা হল এবং তারপর একটা সামান্য পাথরও তুলাদণ্ডে ওই খুলির চেয়ে বেশি ভারী হল। এই রকম বহু কাহিনী আলেকজাণ্ডারের উপর আরোপ করা হয়েছে। হিব্রু, আরবীয় ও ও পারসিক সাহিত্যে আলেকজাণ্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যাঁকে নিয়ে অনেক কাহিনী লেখা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে হাজির থাকা সত্ত্বেও কোন ভারতীয় কাহিনীতে আলেকজাণ্ডারের ক্ষীণতম উল্লেখ নেই। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই যে আলেকজাণ্ডার সম্পর্কিত ইউরোপীয় কাহিনীতে ভারতের, বিশেষ করে ভারতীয় সাধুদের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের কথোপকথন, বিশেষ করে উল্লিখিত হয়েছে।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানকালে যে-সব লেখক তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রদত্ত বর্ণনা অনুসরণ করে পূর্ববর্তী যুগের গ্রীক ও রোমক লেখকেরা তাঁর অভিযানের সত্যকার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন যার নিদর্শন পাওয়া যায় আরিয়ান, জাস্টিন, কুর্সিয়োস রুফোস, প্লুটার্ক প্রভৃতির রচনায়। কিন্তু পাশাপাশি আলেকজাণ্ডার সম্পর্কিত গালগল্পের সূচনাও হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে এই ধারাটিই অধিকতর পুষ্ট হয়েছিল। এই ধরনের লেখায় প্রথম সূত্রপাত করেন মিশরবাসী জনৈক গ্রীক আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। মূল রচনাটি বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় তার খেয়াল-খুশীমত অনুবাদের অভাব নেই। পরবর্তী কালে আরও গালগল্প ছড়ান কাল্লেস্থেনেস নামক

জনৈক গ্রীক লেখক যাঁর গ্রন্থের নাম *Historia Alexandri Magni*। ল্যাটিনে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে জুলিয়ুস ভালেরিউস আলেকজাণ্ডার সম্পর্কিত চলতি কাহিনীগুলি সঙ্কলন করেন তাঁর *Res Gestae Alexandri Macedonis* গ্রন্থে, যে গ্রন্থটির আর্মেনীয় ও সিরীয় ভাবানুবাদ হয় যথাক্রমে পঞ্চম ও সপ্তম শতকে। উক্ত গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে একাদশ শতকে নেপল্‌সের লিও ল্যাটিনে *Nativity et Victoria Alexandri Magni* রচনা করেন। গতিয়েরের *Alexandris* দ্বাদশ শতকের রচনা। এটির স্পেনীয় অনুবাদ *Libro de Alexandre* প্রকাশিত হয় ত্রয়োদশ শতকে। আইসল্যাণ্ডীয় ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন Brand Jonsson, মধ্য-ডাচ ভাষায় Jacob Van Maerlant (*Alexanders Geesten*) এবং জার্মান ভাষায় Ulrich Von Eschenback।

প্রাচীন ইংরাজীতে সম্রাট আলফ্রেডের অনূদিত ওরোসিয়াসের 'পৃথিবীর ইতিহাসে' আলেকজাণ্ডারের কাহিনী পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় দশম শতকেই অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় *Epistola Alexandri* ল্যাটিন থেকে অনূদিত হয়। এই গ্রন্থটিতে আরিস্টোটল এবং দিন্দিমুস নামক জনৈক ভারতীয় সাধুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। মধ্য-আইরিশে গ্রন্থটির অনুবাদ ঘটেছিল একাদশ শতকে। অ্যাংলো-নর্মান (ইংলণ্ডের ফরাসী) ভাষায় দ্বাদশ শতকে আলেকজাণ্ডারের কাহিনী কেন্টের টমাস রচিত *Le Roman de Tonti Chivalerie* গ্রন্থের বিষয়বস্তু হয়েছে। গ্রন্থটি পরে পুনর্লিখিত হয় ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে *Kyng Aliasunder* নামে। দ্বাদশ শতকেই ফরাসী ভাষায় বেসানসঁর আলব্রিশ *Roman d' Alexandre* রচনা করেছিলেন। ওই একই সময়ে Lambert le Tiot লিখেছিলেন *Alexandri* নামক একটি কাব্য আলেকজাণ্ডার সংক্রান্ত কাহিনীসমূহ অবলম্বনে। গতিয়েরের রচনার অনুবাদ ছাড়াও স্পেনীয় ভাষায় রচিত হয়েছিল *Alexandre* ও জার্মান ভাষায় *Alexanderlied*। ইতালীয় ভাষায় আলেকজাণ্ডারের কাহিনীসমূহ রচিত হয় চতুর্দশ শতকে। সুইডীয় ভাষাতেও *Konung Alexander* নামক গ্রন্থের পরিচয় মেলে। গেলীয় সাহিত্যে আলেকজাণ্ডার সংক্রান্ত কাহিনীসমূহ নিয়ে রচিত হয়েছিল *Togail Troi* বা ট্রয় বিজয়। স্কচ ভাষায় উইন্টনের অ্যাণ্ড্রু রচনা করেছিলেন *Buik of Alexander*, আনুমানিক ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে। পশ্চিম শ্লাভীয় পরিবারের পোল ভাষাতেও আলেকজাণ্ডারের কাহিনী বর্তমান। চেক ভাষায় ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে চাতিলোনের ওয়াল্টার *Alexandreid* রচনা করেছিলেন। চতুর্দশ শতকের

ইংরাজী সাহিত্যে আলেকজাণ্ডার নামক একটি রোমান্সের কিছু খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে।[১]

৯॥ রোমান্স ও কীর্তিগাথাসমূহ

শুধু আর্থারীয় কাহিনীই নয়, কেল্টীয় সূত্র থেকে আরও অনেক কাহিনী ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রবেশলাভ করেছে। ফরাসী ত্রিস্তাঁ (*Tristan, Tristram*) কাব্যটির বিষয়বস্তু ক্রেতিয়ঁ কেল্টীয় কাহিনী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। ফরাসী ত্রিস্তাঁর একটি অনুবাদ আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যে বর্তমান যার নাম ত্রিস্তান-সাগা। এই কাহিনীটিই আবার জার্মান কবি আইলহার্ট ফন ওবের্গে এবং গোটফ্রিয়েড এবং অ্যাংলো-নর্মান কবি টমাস নিজেদের রচনায় ব্যবহার করেছেন। স্পেনীয় সাহিত্যেও ত্রিস্তানের কাহিনী বর্তমান, যা ফরাসী থেকে অনূদিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। ত্রিস্তান ছিল কর্নোয়ালের রাজা মার্কের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সে মোরহোল্ৎ নামক একজন দৈত্যকে, যে ছিল আয়র্ল্যাণ্ডের রাজা, পরাজিত করে। কিন্তু যুদ্ধে ভীষণ আহত হয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য ওই দৈত্যেরই ভগ্নী ইসেউল্তের কাছে যেতে হয়। ইসেউল্তের সঙ্গে রাজা মার্কের বিবাহ হবার কথা ছিল, তাই তাকে ত্রিস্তানের সঙ্গেই কর্নোয়ালে পাঠানো হয়। কিন্তু পথে ত্রিস্তানের সঙ্গে ইসেউল্তের ভালবাসার সূত্রপাত ঘটে আর তারই ফলে ত্রিস্তানের জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে এবং সে বৃটানীতে পলায়ন করে। ঘটনাচক্রে সে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। পরে আর একটি যুদ্ধে ত্রিস্তান মারাত্মকভাবে আহত হলে ইসেউল্ৎ ব্যস্ত হয়ে তার সেবার জন্য আসে, কিন্তু ত্রিস্তানের ঈর্ষাকাতর পত্নী ইচ্ছা করেই তাকে উল্টো খবর দেয়, যার ফলে ত্রিস্তান ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করে এবং সেই শোকে ইসেউল্ৎ-ও ত্রিস্তানের মৃতদেহের পাশে আত্মহত্যা করে।

একটু ভিন্ন সুরের অ্যাডভেঞ্চারধর্মী একটি বিখ্যাত ফরাসী রোমান্সের নাম *Aucassin et Nicolette*। এটি অংশত গদ্যে এবং অংশত পদ্যে লিখিত,

১। দ্র: F. P. Magoun, *Gests of King Alexander of Macedon* (১৯২৯); G. Cary, *The Medieval Alexander* (১৯৫৬)। ক্যাল্লেস্থেনেসের (Pseudo-Callesthenes) *Historia Alexandri Magni* সম্পাদনা করেন W. Kroll (১৯২৬)। *Epistola Alexandri*-র সম্পাদনা করেছেন W. Boer (১৯৫৩)।

রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক। *Aucassin* জনৈক কাউণ্টের পুত্র এবং *Nicolette* একজন সারাসেন ক্রীতদাসী। উভয়ের প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশিত হলে দুজনকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কারারুদ্ধ করা হয়। শেষ পর্যন্ত উভয়েই কারাগার থেকে পলায়ন করে নানা প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করে একসঙ্গে মিলিত হয়। পরে জানা যায় যে Nicolette ক্রীতদাসী হলেও আসলে রাজকন্যা। তখন তাদের বিবাহ হতে আর কোন বাধা হয়নি। একই কাহিনী *Floire et Blanchefluer* নামক কাব্যেরও বিষয়বস্তু, শুধু পাত্র ও পাত্রী স্থান বদল করেছে। Floire স্পেনের জনৈক সারাসেন রাজার পুত্র, Blanchefluer জনৈক সদ্বংশজাত খ্রীষ্টানের কন্যা। ডাচ সাহিত্যে দিয়েত্রিক ফান আস্‌সেনেদ্ ওই একই কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন ফ্লোরিস এন্তে ব্লাঙ্কফ্লোয়ের। জার্মান ভাষাতেও ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরিস উন্ট ব্লাঙ্কেফ্লুর লিখিত হয়েছিল।[১] বোকাচিওর ফিলোকোলোর (রচনা ১৩৩৬) কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রোমান্স পর্যায়ের অপরাপর রচনার মধ্যে ফরাসী *Guillaume de Palerme* বা পালার্মের উইলিয়ামের কথা উল্লেখযোগ্য, যেখানে জনৈক সিসিলীয় রাজপুত্রের অলৌকিক অভিযানসমূহের কথা বর্ণিত আছে। এটি আগাগোড়া ছন্দে রচিত। এরপর আসছে জাঁ রেনাঁ রচিত *L' Escoufle* এবং মারী দ্য-ফ্রাঁ (দ্বাদশ শতক) রচিত *lais* (ইংরাজী *lay*) সমূহ যেগুলি প্রাচীন বিখ্যাত ছোট ছোট কাহিনী অবলম্বনে রচিত। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *Lanval* (একজন দরিদ্র নাইটের প্রেমে সাফল্য লাভের কাহিনী), *Eliduc* (এক ব্যক্তি ও তার দুই স্ত্রীকে কেন্দ্র করে হাস্যরসাত্মক কাহিনী), *Chavrefoil* (ত্রিস্তান কাহিনীচক্রের অন্তর্গত একটি উপকাহিনী), *Lanstic* (১৬০ লাইনের একটি আখ্যানমূলক প্রেমের কবিতা) ইত্যাদি। এইগুলি এবং সামগ্রিকভাবে প্রচলিত পশ্চিম ইউরোপীয় রোমান্সগুলি শুধু ফরাসী

১। ত্রিস্তানের জন্য দ্রষ্টব্য Thomas, *Roman de Tristan* (সম্পাদনা J. Bedier, ২ খণ্ড ১৯০২-০৫), Beroul, *Roman de Tristan* (সম্পাদনা E. Muret ১৯০৩, A. Ewert ১৯৩৯); E. Vinaver, *Etudes sur le Tristan* (১৯৩৫)। ফ্লোরেস ও ব্লান্সেফ্লুরের সম্পাদনা করেছেন M. Pelan (১৯৩৭), W. Wirtz (১৯৩৭), F. Kruger (১৯৩৮); ইংরাজী অনুবাদ A. Lang; আধুনিক ফরাসী অনুবাদ G. Michaut। *Aucassin et Nicolette*এ-র সম্পাদনা করেছেন F. W. Bourdillon (১৯১৯) এবং Mario Rogues (১৯২৫, ১৯৩৪)।

সাহিত্যকেই নয়, ইতালীয় স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাহিত্যকে রীতিমত প্রভাবিত, করেছিল।[১]

স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সূত্র থেকে অনূদিত দুটি ফরাসী রোমান্স অবলম্বনে প্রাচীন ইংরাজীতে ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে রচিত হয়েছিল হ্যাভেলক ও হর্ন। হ্যাভেলকের কাহিনী নিম্নরূপ: ইংলণ্ডের রাজা আথেল্‌ভোল্‌ডের কন্যা গোল্‌ডবুর তার পিতার মৃত্যুর পর কর্নোয়ালের আর্লের কাছে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু তার পিতৃব্য নিজেই সিংহাসন-অভিলাষী হয়ে হ্যাভেলক নামক পরিচয়হীন এক ব্যক্তির সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিয়ে নিজের সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করে নেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায় যে হ্যাভেলক ডেনমার্কের এক রাজপুত্র যে শত্রুর ষড়যন্ত্রে দেশছাড়া। পরে সে হৃতরাজ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয় এবং পত্নীর পিতৃব্যকেও পরাস্ত করে সিংহাসনের সত্যকারের উত্তরাধিকারিণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। হর্নের কাহিনী এর পরবর্তী ঘটনাসমূহ অবলম্বনে রচিত হয়েছে। হর্ন ছিলেন হ্যাভেলক ও গোল্‌ডবুরের পুত্র যার সংঘাতময় জীবন এবং রাজকন্যা রাইমেন্‌হিলডের সঙ্গে পরিণয়ের কাহিনী এই রোমান্সটির বিষয়বস্তু।[২]

১। আদি ইতালীয় সাহিত্য, বিশেষ করে ইতালীয় গদ্য সাহিত্য, ছিল প্রায়-ফরাসী ভাষায় লিখিত, যার পরিচয় পাওয়া যায় *Entree d' Espagne*, ভেরোনার নিকোলো রচিত *Prise de Pampelune*, রাফায়েল মার্মোরা রচিত *Aquilon de Bavieri* এবং *Huen d' Auvergn*-এর বিভিন্ন সংস্করণ থেকে। *Tristano riccardiano, Tavola ritonda, Fatti di Cesare, Istorietta troiana, Conti di antichi Cavalieri* (কুড়িটি বীরগাথার সঙ্কলন), *Conti Morali* (বারোটি নীতিমূলক উপাখ্যান) প্রভৃতি আদি ইতালীয় রচনাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে ফরাসী সূত্র থেকে অনূদিত। প্রোভেন্সাল সাহিত্যের *Jaufre, Guillem de la Barre* এবং *Blandin de Cornoalha* কার্যত ফরাসী রোমান্স সাহিত্যের ভিন্ন সংস্করণ যদিও আদি প্রোভেন্সাল উপন্যাসগুলি, যেগুলি কবিতায় রচিত, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার মধ্যে *Castia Gilos* (একজন স্বামী তার স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক সেজে তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে নানা ঘটনার পর কিভাবে স্ত্রীর প্রচণ্ড প্রহার খেয়ে পালিয়ে আসবে সেই বৃত্তান্ত), Arnaut de Carcasses রচিত *Novas del Papagai* (একটি তোতাপাখি কর্তৃক তার মালিকের প্রণয়কার্যে সহায়তা), এবং *Flamenca*-র (একজন শিথিল-চরিত্র নারীর সন্দেহপ্রবণ স্বামীকে এড়িয়ে গোপন অভিসারের কাহিনী, মোট ৮,০০০ লাইন পাওয়া গেছে, রচনাকাল ১২৩৪ খ্রীঃ) কথা উল্লেখযোগ্য। স্পেনীয় রোমান্স সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফার্নান মার্তিনেজ রচিত *El Caballero Caifer*, এ ছাড়া জোয়াও লোবেরা কেল্টীয় কাহিনীসমূহ নূতন করে লিখেছিলেন *Amadis de Gaula* গ্রন্থে। উভয়েই চতুর্দশ শতকের মানুষ।

২। হ্যাভেলক, সম্পাদনা W. W. Skeat, ১৯০২। হর্নের জন্য দ্রষ্টব্য Morris ও Skeat, *Specimens of Early English*, ১৯০৫, প্রথম খণ্ড।

একাদশ শতক থেকে ফরাসী সাহিত্যে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত ঘটে বিখ্যাত সাঁজ দ্য রোলাঁ (রোলাঁর গান) রচিত হবার পর থেকে। এই নূতন ধারাটির নাম *Chanson de Geste* বা কীর্তিগাথা, রচনাকাল একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক। এই পর্যায়ের ৮০টি রচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত রচনাগুলির লাইন-সংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশি। *Chanson de Geste*-এর নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গাস্তোঁ পারি-র মতে *gesta* বা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতকে *Chanson de Geste* বলা চলতে পারে। পেশাদার চারণ বা *jongleur*-রা আদিতে এগুলি গেয়ে বেড়াতেন। তখন ভাষা ও ছন্দের কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসরণ করা হত না। পরবর্তী কালে অবশ্য দশটি সিলেব্‌ল-এ বিভক্ত ছন্দে এবং কয়েকটি লাইন নিয়ে গঠিত স্তবকে (*laisses*) এইগুলি রচনা করার রীতি গড়ে উঠেছিল। লেখক বেশির ভাগ অজ্ঞাতনামা।

Chanson de Geste মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—*Geste du roi* বা শার্লামান কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত, *Geste de Guillaume* বা অরেঞ্জের উইলিয়ম সংক্রান্ত কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত এবং *Faulse Geste* বা কার্লোভিঞ্জিয়ন পরিবারের (শার্লামান এই বংশের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যারনদের কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইমিরি সন্তানদের বিদায়, আলিসাঁ এবং রায়েনোয়ার্ত, যেগুলি দক্ষিণাঞ্চলের বীরদের কীর্তিকলাপ অবলম্বনে রচিত। তৃতীয় শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে - যেগুলি উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহী ব্যারনদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত—দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পারিসে লা দুচেসে এবং আইমনের চার পুত্র। উপরি-উক্ত তিনটি শ্রেণী ছাড়া স্বাধীন রচনা হিসাবে পাওয়া যায় গি দ্য বুর্গোনে এবং আনসেই দ্য কারথাজ।

Geste du roi পর্যায়ে শার্লামানকে কেন্দ্র করে মোট সাতটি কাহিনীচক্র স্থান পেয়েছে। প্রথমটিতে শার্লামানের মায়ের জীবনকথা থেকে শুরু করে শার্লামানের জন্ম পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি রচনার নাম উল্লেখযোগ্য, বের্থা এবং আস্‌প্রেমোঁ, যেগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতক। দ্বিতীয় কাহিনীচক্রটি শার্লামান ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ওগিয়েরের বাল্যজীবনের ঘটনাসমূহ অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। তৃতীয় কাহিনীচক্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গে শার্লামানের যুদ্ধ এবং এই পর্যায়ের রচনাবলী হচ্ছে

গিরার্ত দ্য ভেনে এবং ওগিয়ের, যে-গুলির রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক। চতুর্থ কাহিনীচক্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে শার্লামান ও পূর্বদেশ, এবং এই বিষয়ে রচিত প্রধানতম গ্রন্থটির নাম জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা, রচনাকাল দ্বাদশ শতক। পঞ্চম কাহিনীচক্রটি হচ্ছে শার্লামানের স্পেন অভিযানের পূর্ববর্তী ঘটনা-সমূহ। এই পর্যায়ের বিখ্যাত রচনাগুলি হচ্ছে আইগুয়েঁ, ফিয়েরাব্রা এবং ওতিনাল।

ষষ্ঠ কাহিনীচক্রটি হচ্ছে শার্লামানের বিখ্যাত স্পেনীয় যুদ্ধ, যা অবলম্বনে রচিত হয়েছে সাঁজ দ্য রোলাঁ। শার্লামান ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু রাইন অঞ্চলের স্যাক্সনদের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ পিছিয়ে পড়ে মূল দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় পিরিনীজ অঞ্চলের বাস্ক উপজাতিদের দ্বারা তারা শোচনীয়ভাবে নিহত হয়। নায়ক রোলাঁ শার্লামানের বিখ্যাত অনুচর ও বন্ধু। আপ্রাণ লড়াই-এর পর যখন সে মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হল তখন সে শিঙা বাজিয়ে শার্লামানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। সেই ধ্বনি শুনে শার্লামান উদ্বিগ্ন হলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ভুল বোঝাল। এইটাই হচ্ছে কাহিনীর মূল কাঠামো, কিন্তু এর মধ্যে আরও অজস্র কাহিনী আছে। আদি গ্রন্থটি একাদশ শতকে চার হাজার লাইনে লেখা হয়েছিল। এই রোলাঁর গান পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে জার্মান রোলাণ্ডসলিয়েড বিখ্যাত। আইসল্যাণ্ডীয় ভাষায় রচিত কার্লামাগ্নুস সাগা অর্থাৎ শার্লামানের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দান্তের কমেদিয়া-তেও রোলাঁর উল্লেখ আছে। সপ্তম কাহিনীচক্রটি শার্লামানের মৃত্যুর কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত।[১]

ফরাসী সাহিত্যের মত প্রোভেন্সাল সাহিত্যেও *Chanson de Geste* পর্যায়ের কাব্যসাহিত্য গড়ে উঠেছিল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে। এই শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য *Girat de Rossillon*, যা চার্লস মার্টেল এবং তার সামন্ত রুশিলোঁর জেরার্দের সংঘাতের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল।

১। Chanson de Geste-এর জন্য G. Paris-এর *Historia Poetique de Charlemagne* (১৮৬৫) দ্রষ্টব্য। *Chanson de Rolland*-এর ইংরাজী গদ্যানুবাদ করেছেন I. Butler (১৯০৪), পদ্যানুবাদ করেছেন A. Way এবং F. Spencer (১৮৯৫) এবং C. S. Moncrieff (১৯১৯)।

এই ধরনের আরও দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম *Aigar e Maurin* এবং *Daurel e Belon*। আন্তিয়োখ দুর্গ অবরোধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি কাব্যগ্রন্থের মোট ৭০০ লাইন পাওয়া গেছে যা বিখ্যাত স্পেনীয় সঙ্কলন *Le gran Conquesta de Ultramar*-এ স্থান পেয়েছে। এটি আসলে আল্‌বিগেন্‌-সিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি ক্রুসেডের কাহিনী যা ১২১৩ থেকে ১২১৮-র মধ্যে ঘটেছিল।[১]

স্পেনীয় সাহিত্যের আদি গ্রন্থ *Poema de mio cid*, যা একটি মহাকাব্য-রূপে বিবেচিত, রদরিগো দিয়াজ দ্য ভিভর নামক একজন ঐতিহাসিক পুরুষের (১০৪০-১০৯৯ খ্রীঃ) কীর্তিকলাপ অবলম্বনে রচিত। এই রচনাটির মোট ৩,৭৪০টি লাইন পাওয়া গেছে। রদরিগোর চলতি নাম সিদি বা সিদ, জাতীয় বীর হিসাবে যিনি পরবর্তী কালেরও বহু কাহিনীর নায়ক হয়েছেন (*Roncesvalles* যার ১০০টি লাইন পাওয়া গেছে, রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক, *Cantar de Rodrigo*, সিদ-এর প্রথম যৌবনের কাহিনীসমূহ, রচনাকাল চতুর্দশ শতক, ইত্যাদি)। আলোচ্য মহাকাব্যটি তিনটি অংশে বিভক্ত, রচনাকাল একাদশ শতকের শেষাংশ।[২] এছাড়া ত্রয়োদশ শতকের *Fernan Gonzalez*-এর কথাও উল্লেখযোগ্য যা একটি হারিয়ে-যাওয়া পুনর্লিখিত মহাকাব্য, বিষয়বস্তু জনৈক কাউণ্টের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ যিনি শত্রুর হাত থেকে কাস্তাইলের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মূল কাহিনীটি দশম শতকের এবং রচয়িতারা এটিকে তিনশো বছর ধরে মুখে মুখে আবর্তিত করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পোর্তুগীজ সাহিত্যে *romanciero* নামক এক-ধরনের কীর্তিগাথা রচনার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল্‌ফোনসো গিরেল্‌দেস রচিত *Poema de batalha de salado* বা সালোদোর যুদ্ধের কবিতা। এইটিই প্রথম পোর্তুগীজ জাতীয় মহাকাব্য, রচনাকাল ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

ক্রনান্‌বুর এবং মাল্‌ডন অ্যাংলো-স্যাক্সন যুদ্ধকাব্যের দুটি বিশেষ নিদর্শন। প্রথম কবিতাটিতে বর্ণিত হয়েছে একটি বিরাট যুদ্ধজয়ের কাহিনী, ওয়েসেক্স ও

১। দ্রঃ D. Haskell, *Provencal Literature and Language* (১৯২৮)।

২। দ্রঃ E. Merimee, *History of Spanish Literature* (১৯৩১), A. F. G. Bell, *Castalian Literature* (১৯৩১), G. Brenan, *Literature of the Spanish People* (১৯৫১)।

মার্সিয়ার সম্রাট এথেলস্টান ও তাঁর ভাই এডওয়ার্ড কিভাবে ৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রুনানবুরের যুদ্ধে স্কটদের পরাজিত করলেন সেই কাহিনী। প্রথম কয়েকটি স্তবকে যুদ্ধের কারণ, তারপর আসল যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং যুদ্ধান্তিক রণক্ষেত্রের দৃশ্য ধাপে ধাপে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, মালডনে বর্ণিত হয়েছে একটি জাতীয় পরাজয়ের কাহিনী। এই কবিতাটির লাইনের সংখ্যা ৩২৫, এবং ব্রুনানবুরের মত এই কাহিনীর কবির নামও অজ্ঞাত। বিষয়বস্তু হচ্ছে নর্থমেনদের (সম্ভবত স্কট বা আইরিশ) হাতে স্যাক্সনদের পরাজয় এবং তাদের নেতা বাইর্টনোটের গৌরবময় মৃত্যু। এই কবিতাটিকে অনেকে সাঁজ দ্য রোলাঁর সঙ্গে তুলনা করেন।[১]

১০ ॥ শাস্সুন্ৎসি দাবিথ ॥ আর্মেনীয় ও জর্জীয় বীরগাথাসমূহ

পূর্ব-ইউরোপের ভাষাসমূহের মধ্যে আর্মেনীয় সাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন যার উদ্ভবের কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক। মূলত খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টায় আর্মেনীয় সহ অপরাপর পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলির আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, যা আমরা পরে দেখব।[২]

প্রাক্-খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া উভয় দেশের সাহিত্যেই বর্তমান, যার বিষয়বস্তু ছিল অনুষ্ঠানগীতি, মহাকাব্য, বীরগাথা ও নাটক। কিন্তু এই প্রাক্-খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের অধিকাংশই খ্রীষ্টীয় প্রচারক ও পুরোহিতদের